আমি সুভাষ বলছি

[প্রথম খণ্ড]

শ্রীশৈলেশ দে

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫-২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫

প্রচ্ছদ :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

গ্রন্থ-বাঁধাই :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
দি আর্যলক্ষ্মী বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

সেই দুর্গম পথযাত্রীর উদ্দেশ্যে



অগ্নিযুগের পটভূমিকায় লিখিত লেখকের অন্যান্য বই

ক্ষমা নেই

রক্ত দিয়ে গড়া

বিনয়-বাদল-দীনেশ

ফাঁসিমঞ্চ থেকে

শপথ নিলাম

ও

অন্যান্য বই

॥ যেসব বই ও পত্রিকা থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে ॥

সবার অলক্ষ্যে	ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়
বিপ্লব তীর্থে	,,
ভারতে সশস্ত্রবিপ্লব	,,
বাংলায় বিপ্লববাদ	নলিনীকিশোর গুহ
বিপ্লবের পথে	পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত
বিপ্লবী ললিত মোহন বর্মন	বারীন্দ্র রায়
শহীদ প্রদ্যোৎকুমার	ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র
স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম	গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী	কমলা দাশগুপ্তা
প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার (অগ্নিযুগ-সংখ্যা, উল্টোরথ	,,
ডালহৌসী স্কোয়ার ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত ,,	যতীশ ভৌমিক
ইতিহাস কই ,,	নিকুঞ্জ সেন
সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান কাহিনী	উত্তমচাঁদ মালহোত্রা
ভারতের বিপ্লব কাহিনী	হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস	সুপ্রকাশ রায়
চট্টগ্রাম বিপ্লব	মনোরঞ্জন ঘোষ
চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী	আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন	চারুবিকাশ দত্ত
চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ	অনন্ত সিংহ
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায় (সাপ্তাহিক বসুমতী)	,,
ইতিহাসের উপাদান ,,	ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত
পাক-ভারতের রূপরেখা ,,	প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী
গান্ধীবাদ কি সচল ? ,,	অধ্যাপক দিলীপ ঘোষরায়
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র ,,	শঙ্করীপ্রসাদ বসু
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র	নেপাল মজুমদার
জয়তু নেতাজী	মোহিতলাল মজুমদার
নেতাজী সুভাষচন্দ্র	দীনেশ মুখোপাধ্যায়

সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র	সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ	নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী
আজাদ হিন্দের অঙ্কুর	বিজয়রত্ন মজুমদার
নেহরু আত্ম-চরিত	
পত্রগুচ্ছ	(জওহরলাল সম্পাদিত)
মুক্তি-সংগ্রাম	সুভাষচন্দ্র বসু
পথের দাবী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্র রচনাবলী	(বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)
A Bunch of Old Letters	Nehru
On Gandhi	"
India Wins Freedom	Abul Kalam Azad
History of Freedom Movement in India	R. C. Mazumder
The Indian Struggle	Subhas Ch. Bose
History of Midnapore	Naren Das
The History of the Indian National Congress	Pattabhi Sitaramyya
The Last Years of British Rule in India	Michael Edwards

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশ্বভারতী : ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী : আনন্দবাজার পত্রিকা : অমৃতবাজার পত্রিকা ফরোয়ার্ড : হিন্দুস্থান টাইম্‌স : পূর্ণদাস স্মারক সংখ্যা : সাপ্তাহিক দেশ ও সাপ্তাহিক বসুমতী

আমি সুভাষ বলছি

সুভাষচন্দ্র,

'বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশ-নায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক।

বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশ্যে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি।......'

—রবীন্দ্রনাথ



স্বামী বিবেকানন্দ (মন্ত্র গুরু)



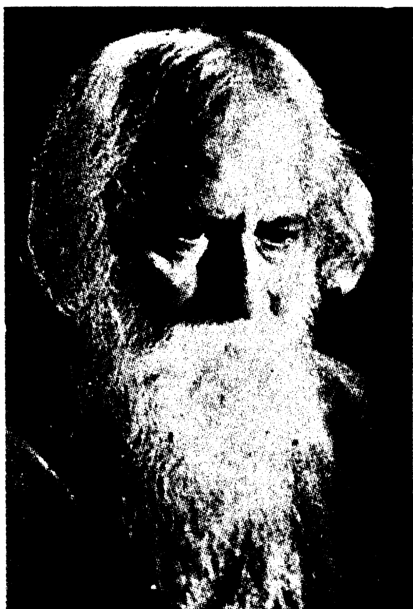
ঋষি অরবিন্দ (বিপ্লব গুরু)



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (কর্ম গুরু)



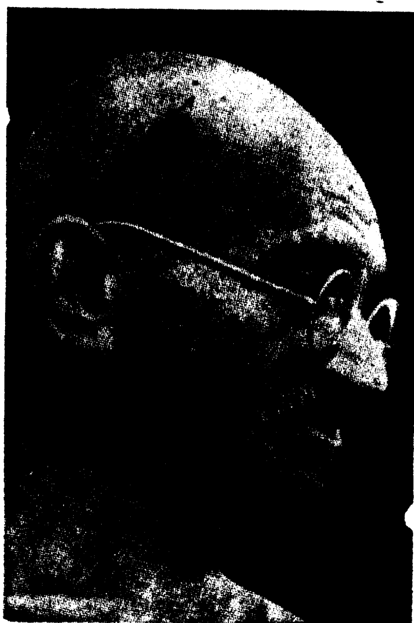
আচার্য বেণীমাধব দাস (শিক্ষা গুরু)



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



জহরলাল নেহরু



গান্ধীজী



বিদ্রোহী



ক্ষুদিরাম



প্রফুল্ল চাকী



কানাই লাল দত্ত



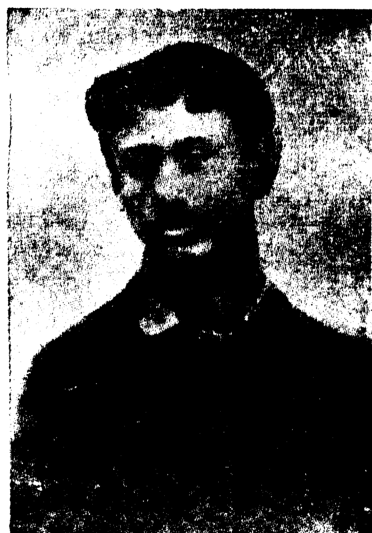
সত্যেন্দ্রনাথ বসু



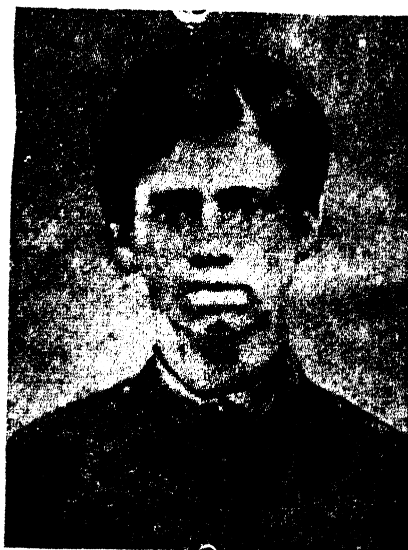
যতীন্দ্র নাথ মুখার্জী
(বাঘা যতীন)



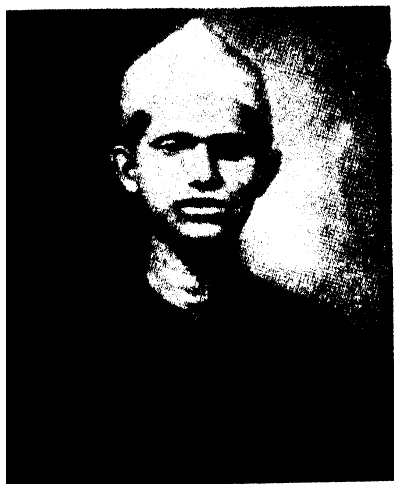
চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী



নীরেন দাশগুপ্ত



মনোরঞ্জন সেন



নলিনী বাগচী



তারিণী মজুমদার



গোপীনাথ সাহা



মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য



প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী



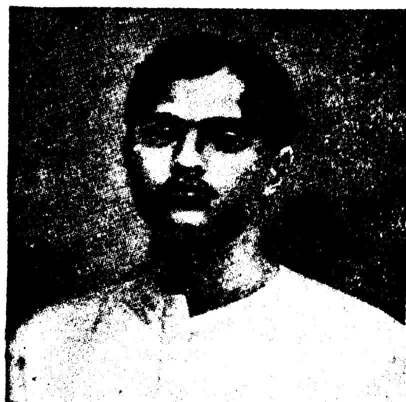
অনন্তহরি মিত্র

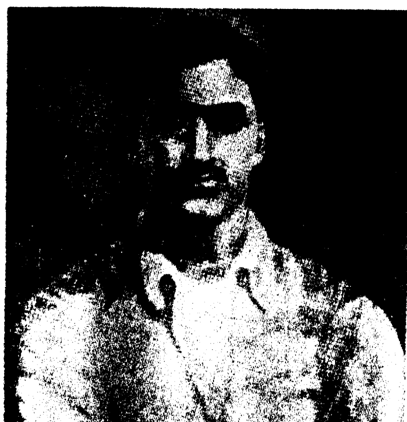


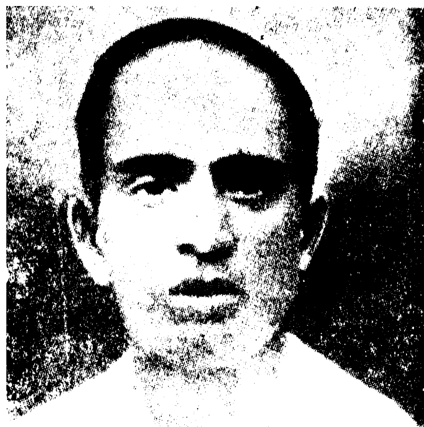
রামপ্রসাদ বিশমিল



ঠাকুর রোশন সিং







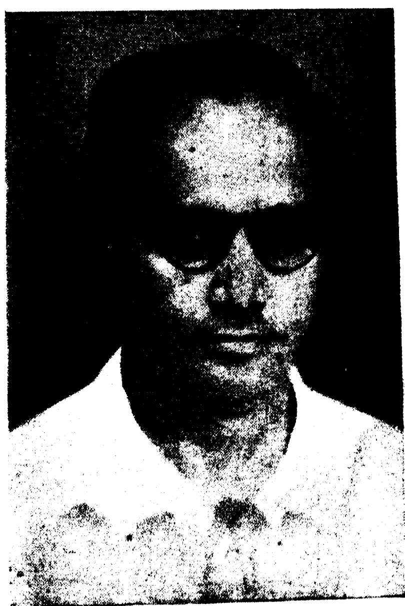
সূর্য সেন (মাষ্টারদা)
(সর্বাধিনায়ক চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ)



গণেশ ঘোষ



অনন্ত সিংহ



অম্বিকা চক্রবর্তী



লোকনাথ বল

ঐতিহাসিক জালালাবাদ সংগ্রামের শহীদবৃন্দ



নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন ও বিধু ভট্টাচার্য



টেগরা ও মতি কানুনগো



প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত ও নির্মল লালা



জিতেন দাস, মধু দত্ত ও পুলিন বিকাশ ঘোষ

যুব বিদ্রোহের অন্যান্য শহীদবৃন্দ



অমরেন্দ্র নন্দী



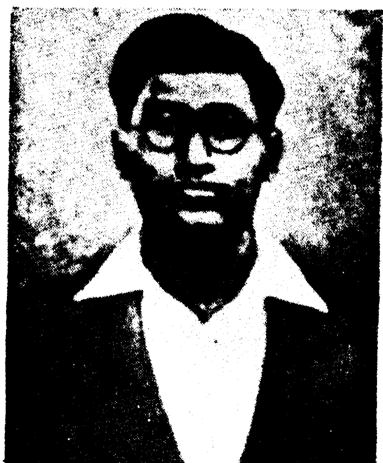
রজত সেন



দেবপ্রসাদ গুপ্ত



জীবন ঘোষাল (মাখন)



রামকৃষ্ণ বিশ্বাস



অপূর্ব সেন



প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার



তারকেশ্বর দস্তিদার



ভগৎ সিং



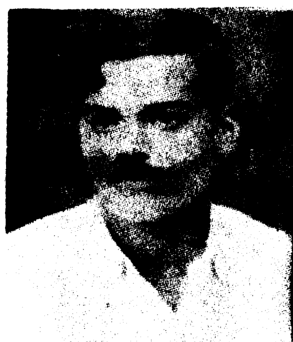
শুকদেব



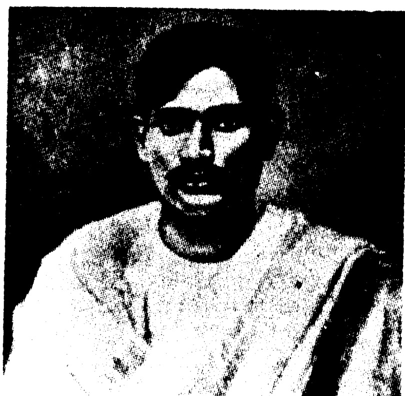
যতীন দাস



রাজগুরু



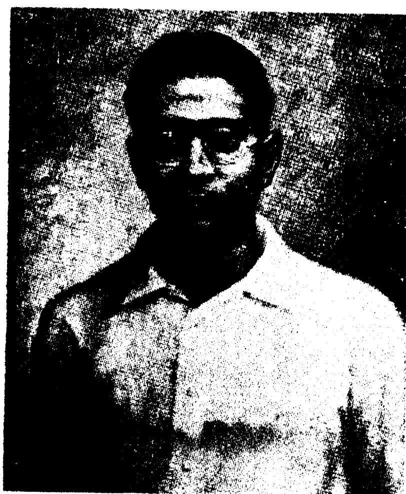
চন্দ্রশেখর আজাদ



দীনেশ মজুমদার



অমুজা সেন



সন্তোষ মিত্র



তারকেশ্বর সেনগুপ্ত



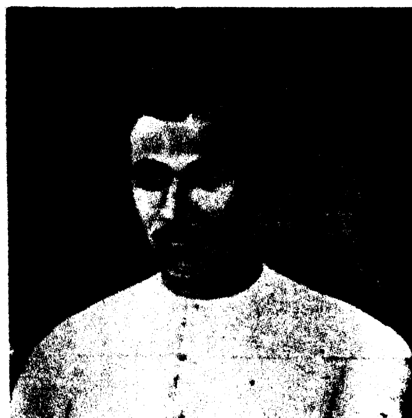
অনিল দাস



মহাবীর সিং



হরিকিষণ



অতুল সেন



অসিত ভট্টাচার্য

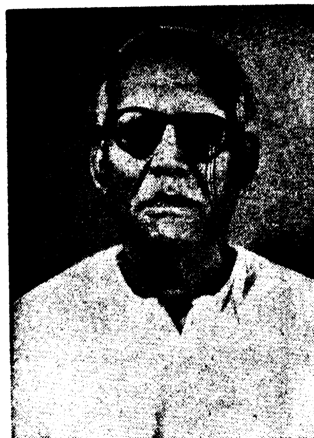


হেমচন্দ্র ঘোষ
(সর্বাধিনায়ক বি. ভি.)

ঐতিহাসিক রডা অস্ত্র লুণ্ঠনে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন



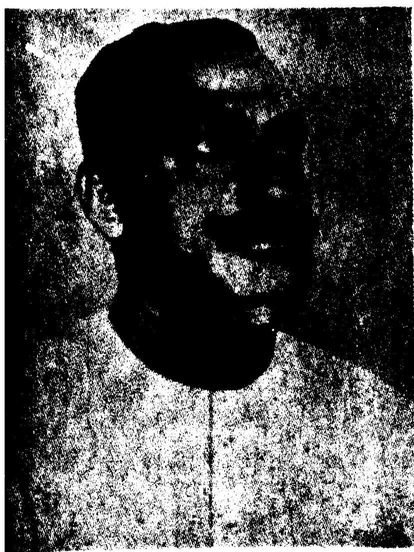
শ্রীশ পাল



হরিদাস দত্ত



সুরেন বর্ধন





অলিন্দ যুদ্ধের বীর শহীদ ত্রয়ী



বিনয়



বাদল



দীনেশ (ফাঁসির পূর্ব দিনে গৃহীত ছবি)



শহীদ দিবসে পুষ্প পত্রে সজ্জিত আলিপুর জেলের সেই ফাঁসি মঞ্চ



(মার খাবার স্মৃতি)
জালিয়ানওয়ালাবাগ শহীদস্তম্ভ



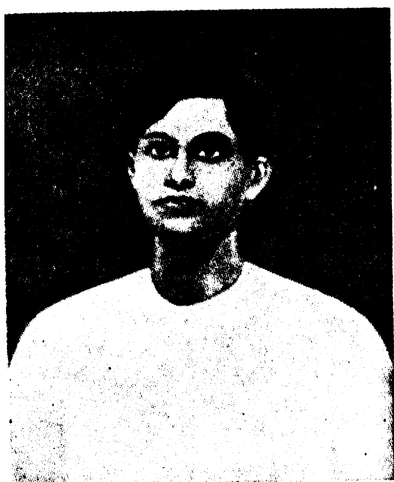
(মার দেবার স্মৃতি)
বিনয়-বাদল-দীনেশের শহীদস্তম্ভ (ডালহৌসী স্কোয়ার)
সামনে দাড়িয়ে (ডানদিক থেকে)—সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্যরঞ্জন বক্সী ও মেয়র গোবিন্দ চন্দ্র দে

অনুষ্ঠানে উপস্থিত হেমচন্দ্র ঘোষ ও সত্যরঞ্জন বক্সী

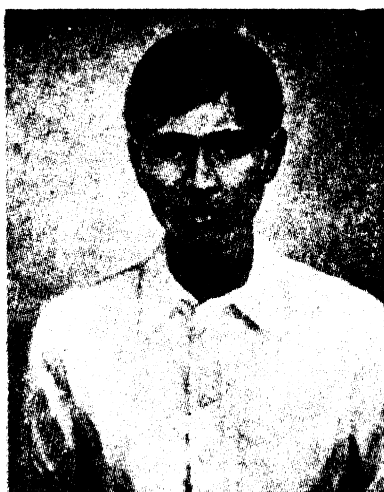


মেটিয়াবুরুজের দাদা বৌদি প্রতিষ্ঠিত শহীদস্তম্ভ

বি. ভি.-র অন্যান্য শহীদবৃন্দ



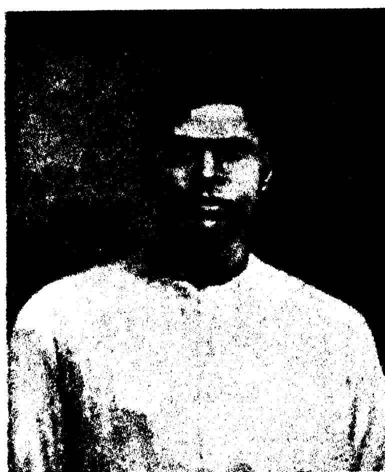
প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য



অনাথ পাঁজা



মৃগেন্দ্র দত্ত



রামকৃষ্ণ রায়



ব্রজকিশোর চক্রবর্তী



নির্মলজীবন ঘোষ



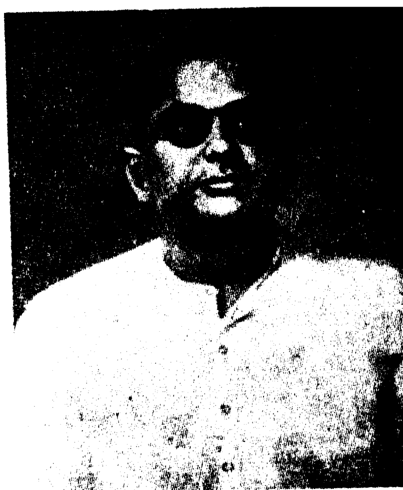
নবজীবন ঘোষ



মতি মল্লিক



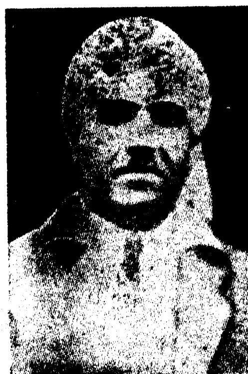
ভবানী ভট্টাচার্য



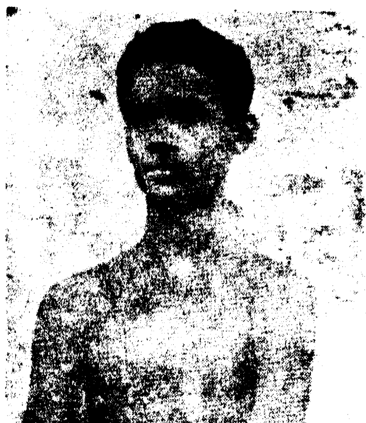
যতীশ গুহ



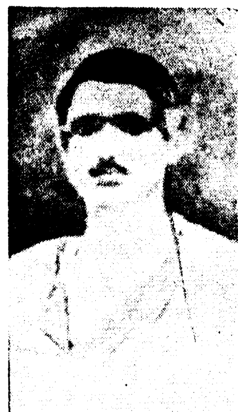
মদন লাল ধিংড়া



উধম সিং



সুশীল সেন



মোহিত মৈত্র



পেট সেলাই করা শোয়া অবস্থায় ছবি—কানাই ভট্টাচার্য (পুলিশ দপ্তর থেকে সংগৃহীত)

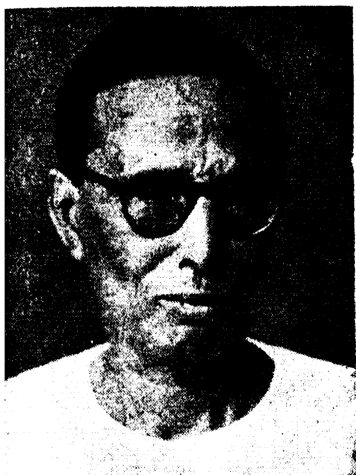


জ্যোতিশ পাল



পণ্ডিত রামরক্ষা

মেটিয়াবুরুজের দাদা-বৌদি এবং পেডি ও ডগলাস নিধনে অংশগ্রহণকারী দুজন



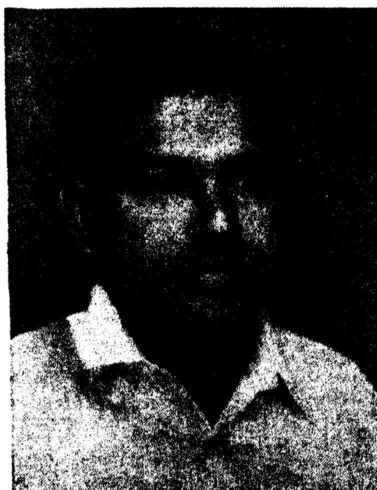
রাজেন্দ্র কুমার গুহ



সরযূ দেবী



বিমল দাশগুপ্ত
(জেলখানায় গৃহীত আলোকচিত্র)

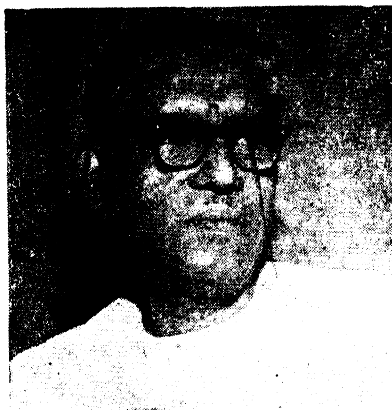


প্রভাংশু পাল

বি. ভি.-র এ্যাক্‌শন স্কোয়াড পরিচালকদের কয়েকজন



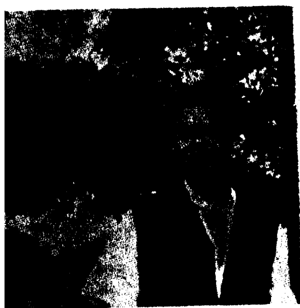
রসময় শূর



প্রফুল্ল দত্ত



সুপতি রায়



নিকুঞ্জ সেন



জ্যোতিষ জোয়ারদার

অগ্নিযুগের পঞ্চকন্যা



সুনীতি চৌধুরী (ঘোষ)



শান্তিসুধা ঘোষ (দাস)



কল্পনা দত্ত (যোশী)





বি. ভি.-র এ্যাক্‌শন স্কোয়াড পরিচালকদের কয়েকজন



রসময় শূর



প্রফুল্ল দত্ত



সুপতি রায়



নিকুঞ্জ সেন



জ্যোতিষ জোয়ারদার

অগ্নিযুগের পঞ্চকন্যা



স্থনীতি চৌধুরী (ঘোষ)



শান্তিসুধা ঘোষ (দাস)



কল্পনা দত্ত (যোশী)







নিবেদিতা



মাদাম কামা



সরলা দেবী চৌধুরাণী



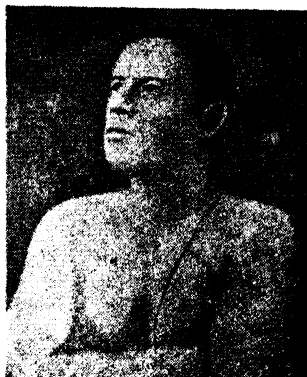
সরোজিনী নাইডু



পি মিত্র



ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত



ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়



বিপিন পাল







পুলিন দাস



যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

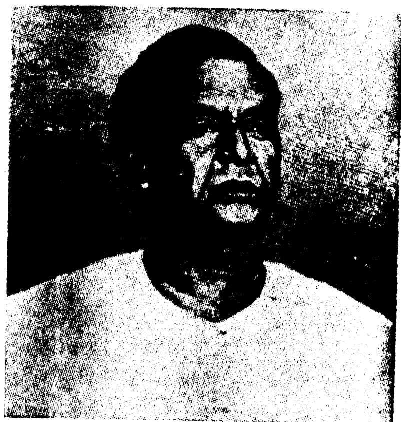


বারীন্দ্র কুমার ঘোষ





যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত



সতীন সেন



ললিত বর্ম্ণ



ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ)



রবীন্দ্র সেনগুপ্ত



যতীন্দ্র মোহন রায়



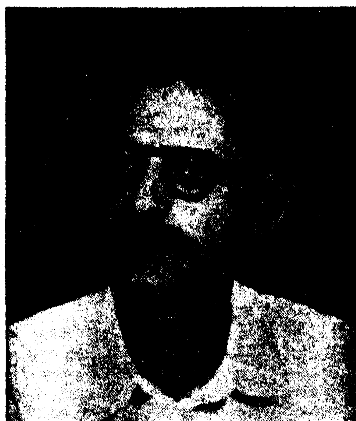
পঞ্চানন চক্রবর্তী



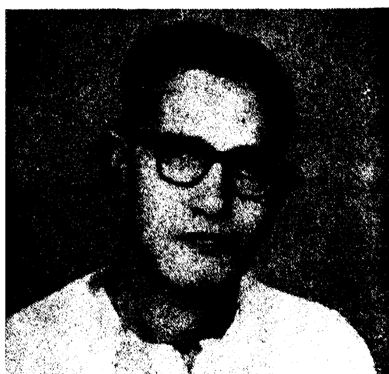
ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত

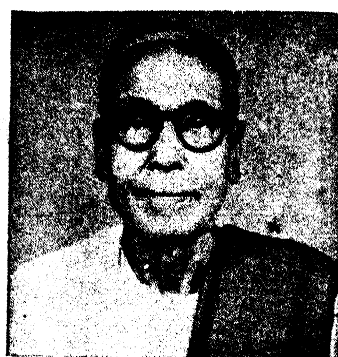


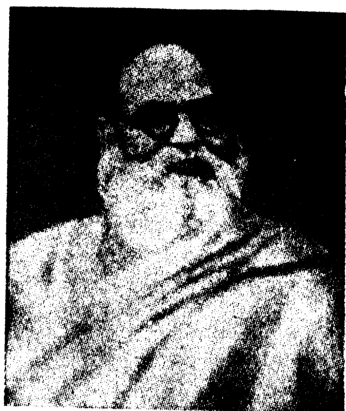
কিরণ মুখার্জী



পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত







মতিলাল রায়

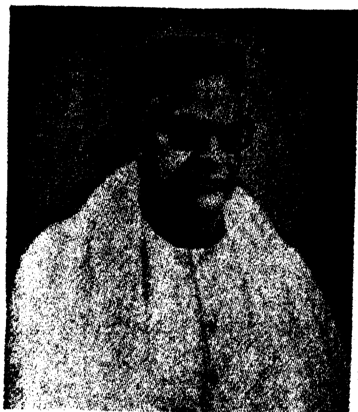


বীরেন্দ্র শাসমল



রসিকলাল দাস







বসন্ত মজুমদার



হেমপ্রভা মজুমদার

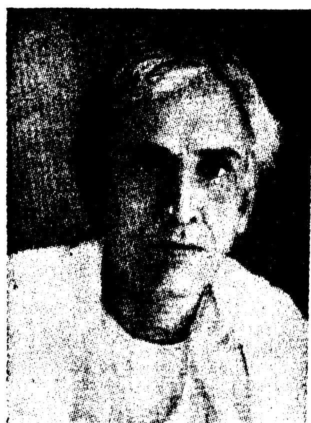


জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী



কমলা দাশগুপ্তা





শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



জ্যোতিষ ঘোষ
(মাষ্টার মশাই)



বিদ্রোহী কবি নজরুল



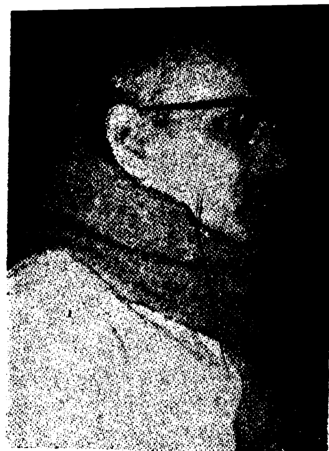
যোগেশ চাটার্জী



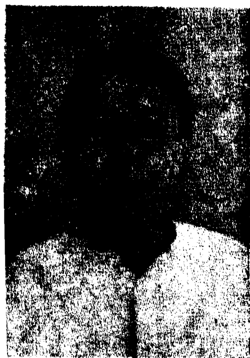
আচার্য পি. সি. রায়



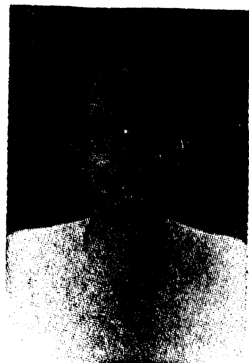
প্রতুল গাঙ্গুলী



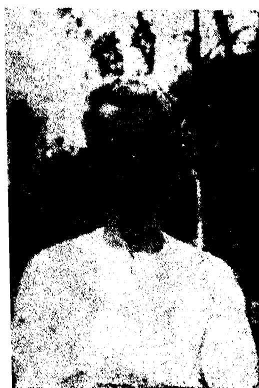
বটুকেশ্বর দত্ত



মনোরঞ্জন গুপ্ত



বিনোদ বিহারী দত্ত



সুকুমার ঘোষ



হরেন ঘোষ

'বিপ্লবী নিকেতন'বাসী: প্রখ্যাত বিপ্লবীদের কয়েকজন



বাঁ দিক থেকে দণ্ডায়মান : প্রফুল্ল আচার্য, ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র দাস, যুগল কিশোর দত্ত, দেবনাথ দাস (আই.এন.এ.)
উপবিষ্ট : হরেকৃষ্ণ বিশ্বাস, নির্বাণ স্বামী (সতীশচন্দ্র সরকার), নিখিলরঞ্জন গুহরায়, সুকুমার মিত্র ও তিনকড়ি গাঙ্গুলী।



এম. এন. রায়



বীর সাভারকর



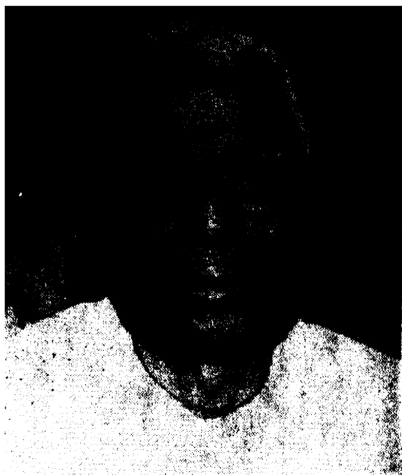
নরীম্যান



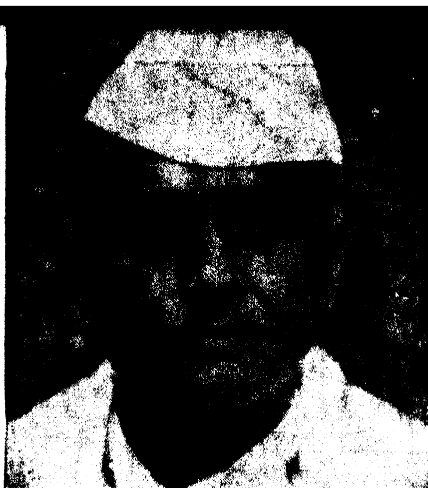
বিঠলভাই প্যাটেল



নিরঞ্জন সিং তালিব



সত্যরঞ্জন বক্সী

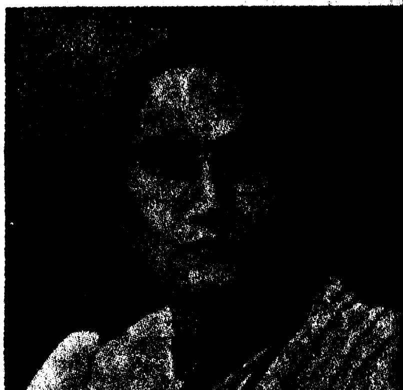


মেজর সত্য গুপ্ত



নীহারেন্দু দত্তমজুমদার







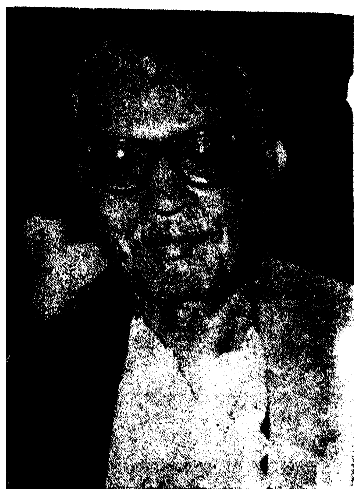
শরৎ চন্দ্র বসু



পূর্ণ দাস



আশ্রাবউদ্দিন







কলকাতা-কংগ্রেস

ডানদিক থেকে :—G.O.C. সুভাষ, অভিবাদনরত সভাপতি মতিলাল, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, মৌলানা আজাদ, পূর্ণ দাস, হেমন্ত বসু, হরিকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্র মোহন সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।



মেয়র

কিন্তু সে আশা সুদূরপরাহত। এখনো তাঁরা সেই চিরন্তন আবেদন-নিবেদনের বন্ধ্যানীতিতে আস্থাবান। এখনো তাঁদের ধারণা, এই আবেদন-নিবেদনের ফলেই একদিন স্বাধীনতা নামক বস্তুটি তাঁদের হাতের মুঠোয় এসে যাবে।

এ অবস্থায় কে তাঁদের বোঝাবে যে, সাপ মারতে হলে লাঠির দরকার, মনসা পুজোয় কোনদিনও সাপ মরে না। কে বোঝাবে যে, সশস্ত্র উত্থান ব্যতীত ব্রিটিশ সিংহকে ভারতের মাটি থেকে একচুলও নড়ানো সম্ভব নয়।

অবশ্য কংগ্রেসের সহযোগিতা না পাওয়া গেলেও অন্যান্য দলগুলোর আনুগত্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। ফরোয়ার্ড ব্লক, বাংলার বৈপ্লবিক সংস্থা বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি. ভি.), অনুশীলন সমিতি, পূর্ণ দাসের দল, অনিল রায় ও লীলা রায়ের শ্রীসঙ্ঘ ও উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন দলগুলোর সমর্থন সব সময়েই তাঁর পেছনে রয়েছে।

সাহসে, শৌর্যে, বীর্যে ও আত্মত্যাগে তাঁদের তুলনা নেই। সত্যিকার সৈনিকের যা থাকা প্রয়োজন, সব কিছুই তাঁদের আছে।

তবু তাই যথেষ্ট নয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রাম চালাতে হলে আরো কিছু চাই।

চাই আধুনিক অস্ত্রসম্ভার। চাই সুদক্ষ সেনাবাহিনী। চাই আরও অনেক কিছুই।

এই মুহূর্তে এখানে থেকে তা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই আঘাত হানতে হবে বাইরে থেকেই। ভারত এখন অগ্নিগর্ভ। বাইরে থেকে যথাযথভাবে আঘাত হানতে পারলে ভেতরে মহাবিপ্লবের আবির্ভাব সুনিশ্চিত। সুতরাং সর্বাগ্রে দরকার বাইরে যাওয়া।

ফরোয়ার্ড ব্লকের অন্যতম নেতা সর্দার নিরঞ্জন সিং তালিবকে কথাটা একদিন খুলেই বললেন সুভাষ।

আমি বাইরে যেতে চাই সর্দারজী। এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন। বলুন কি করা যায় এখন।

মনে মনে হাসলেন সর্দারজী। সুভাষবাবু যখন মনস্থির করেছেন, তখন তাঁকে রুখনেওয়ালা দুনিয়াতে কোই নেই হ্যায়। ঠিক আছে, ভেবে দেখি কি করা যায়।

ভাবতে ভাবতে একসময়ে বিশেষ একটি মানুষের কথা মনে পড়ে গেল সর্দারজীর।

বলদেব সিং। জামসেদপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বলদেব সিং। শক্ত মানুষ। বিশ্বাসীও বটে। তাঁকে একবার বলে দেখলে কেমন হয়। হয়তো কিছুটা কাজ হলেও বা হতে পারে।

শুনতে শুনতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বলদেব সিংয়ের মুখ। অপূর্ব! অপূর্ব প্রস্তাব! এরূপ দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা একমাত্র সুভাষবাবুর মতো লোকের পক্ষেই বুঝি সম্ভব। সত্যিই অপূর্ব!

কিন্তু কাজটা শক্ত। বিপজ্জনকও বটে। সুভাষবাবুর সম্বন্ধে পুলিশ কর্তৃপক্ষ সবসময়েই অত্যন্ত সজাগ। বিশেষ করে এখন যুদ্ধের সময় তো কথাই নেই।

হয়তো আড়াল থেকে প্রতিমুহূর্তেই তারা তাঁকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করে চলেছে। এ অবস্থায় তাদের নজর এড়িয়ে তাঁর পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে কি?

তাছাড়া হাঁটা-পথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে দুর্ধর্ষ উপজাতীয় এলাকা পেরিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করা মুখের কথা নয়। এ-পথ যেমন দুর্গম, তেমনি বিপদসঙ্কুল।

সুভাষবাবু সমতল ভূমির লোক। তিনি কি পারবেন ঐ দুর্গম গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করে নির্বিঘ্নে ওপারে পৌঁছে যেতে?

অবশ্য তা বলে পিছিয়ে গেলে চলবে না। ঝুঁকি এক্ষেত্রে কিছুটা নিতেই হবে।

তার জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন একজন অতি বিশ্বস্ত কর্মী, যিনি এ ব্যাপারে পুরোপুরি দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম। কোথায় পাওয়া যাবে তেমন লোক?

আরে! কি আশ্চর্য! সহসা কি একটা কথা মনে পড়ে গেল বলদেব সিংয়ের।

লোকের অভাব কি! পাঞ্জাব 'কীর্তি কিষাণ' পার্টির বিশ্বস্ত কর্মী কমরেড অচ্ছর সিং তো এখন পলাতক অবস্থায় তাঁর গৃহেই আত্ম-গোপন করে রয়েছেন। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখলেই তো হয়।

শুনে সানন্দে রাজী হলেন অচ্ছর সিং। এ তো বহুত খুশিকা বাত হ্যায়। আমার দ্বারা যদ্দূর সম্ভব নিশ্চয় করব। কথা দিলাম।

তক্ষুণি খবর চলে গেল পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টির কাছে। সুভাষবাবুর জন্যে এ কাজের ভার নিতেই হবে। বল, তোমরা রাজী আছ কিনা!

রাজী। যথাসময়ে উত্তর এল কীর্তি কিষাণ পার্টি থেকে। এ ব্যাপারে সবাই আমরা একমত। কমরেড রামকিষেণের উপর যাবতীয় ভার দেওয়া হল। সে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

দিন কয়েক বাদেই অচ্ছর সিং ও কমরেড রামকিষেণ,—দুজনে পাড়ি দিলেন পেশোয়ারের মর্দান জেলার 'খেল্লা ডের' নামক গাঁয়ের উদ্দেশ্যে। ওখানকার কমরেড ভগৎরামের সঙ্গে একবার যোগাযোগ করা দরকার।

ভগৎরাম শুধু কীর্তি কিষাণ পার্টির সভ্যই নন, ফরোয়ার্ড ব্লকের একজন অতি উৎসাহী কর্মী। পাহাড়ী এলাকার সব কিছু তাঁর নখদর্পণে।

আফ্রিদি, মোমান্দ প্রভৃতি উপজাতীয়দের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা। প্রায়ই তাঁকে ঘোরাঘুরি করতে হয় ঐ সব উপজাতীয় অঞ্চলে। একমাত্র তিনিই পারেন সুভাষবাবুকে নিরাপদে সীমান্তের ওপারে পৌঁছে দিতে।

সুভাষবাবু! খবর শুনেই উৎসাহে লাফিয়ে উঠলেন ভগৎরাম। ইয়া! ইয়া! এই তো শেরকা বাচ্চার মতো কথা। আমি তৈয়ার। সুভাষবাবুর জন্যে আমি সব কিছু করতে রাজী। জান কবুল।

দুরন্ত দুঃসাহসী কর্মী এই ভগৎরাম। বড়ভাই হরিকিষেণ পাঞ্জাব-গভর্ণর হত্যা চেষ্টার মামলায় ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ দিয়েছেন, তবু তিনি সমান বেপরোয়া। তাঁর একমাত্র প্রতিজ্ঞা, এর বদ্‌লা নিতে হবে। যারা তাঁর বড়ভাইকে খুন করেছে, তাদের খুনে হাত রাঙাতে হবে।

দায়িত্ব বুঝে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলেন ভগৎরাম। সুভাষবাবু শেরকা বাচ্চা। যে করে হোক, তাঁকে সীমান্তের ওপারে পৌঁছে দিতে হবে। তাঁর স্বপ্ন সার্থক হোক। ভারত স্বাধীন হোক।

কাজ এগিয়ে চলল অবিশ্বাস্য গতিতে। প্রস্তুতি-পর্ব প্রায় শেষ। হঠাৎ বিপর্যয় নেমে এল বিশেষ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

হলওয়েল মনুমেণ্ট আন্দোলনের তারিখ ধার্য করা হয়েছিল জুলাই মাসের ৩রা তারিখে। তার আগের দিনই সুভাষকে গ্রেপ্তার করে পাঠানো হল লৌহ-কারার অন্তরালে। ফলে গোটা ব্যাপারটাই চাপা পড়ে গেল সাময়িকভাবে।

সুভাষকে রাখা হল প্রেসিডেন্সি জেলে। ফল কিন্তু ভালই হল। সহবন্দী হিসেবে সেখানে তিনি পেয়ে গেলেন হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্য বক্সী, মণীন্দ্রকিশোর রায় প্রভৃতি বি. ভি.-র অন্যতম বিপ্লবী নায়কগণকে। ফলে আবার মন্ত্রণা শুরু হল নতুন করে।

কি করা যায় এখন! এতদূর এগিয়ে এসে সব কিছুই কি পণ্ড হবে এমনি করে?

অসম্ভব। তা হতে পারে না। এমন সুযোগ জীবনে আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না। যে করে হোক, যে কোন মূল্যে হোক, তাকে সার্থক করে তুলতেই হবে।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব! সে যে বিনা বিচারে আটক বন্দী। ইচ্ছা করলেই তো আর ইংরেজের কারাগার থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় না!

হ্যাঁ, তাও যায়। ইচ্ছা করলেই যায়। আগে জানা না থাকলেও এখন আর সে রহস্যটুকু অজানা নেই সুভাষের। তাই গোপনে তিনি তাঁর দাদা শ্রদ্ধেয় শরৎ বোসের কাছে খবর পাঠালেন—'অবিলম্বে বি. ভি.-র যতীশ গুহর মাধ্যমে পরেশ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব কিছু জেনে নিন।'

যতীশ গুহ বি. ভি.-র অন্যতম নায়ক। দলের প্রায় সবার কাছেই তিনি সুপরিচিত। কিন্তু পরেশ রায়! তিনি কে? কি তাঁর পরিচয়?

অগ্নিযুগের ইতিহাসে এই পরেশ রায়ের মতো এমন একটি বিচিত্র চরিত্র আর কোথাও তুমি খুঁজে পাবে না মল্লিকা।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার কাছে তিনি অবজ্ঞার পাত্র। সবাই জানে, তিনি একজন স্পাই বা গুপ্তচর। দেশদ্রোহিতাই তাঁর একমাত্র পেশা।

পরেশ রায় নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। তাছাড়া উপায় কি! অর্থের বিনিময়ে যে লোক দেশদ্রোহিতা করতে পারে, মুখ তুলে কথা বলার মতো সাহস তার কোথায়? বিশেষ করে সেই যুগে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি তিনি গুপ্তচর?

ভুল মল্লিকা, একেবারেই ভুল। দলীয় স্বার্থের প্রয়োজনে নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্য সারা পৃথিবীর ঘৃণা আর অবহেলা কুড়িয়ে এই পরেশ রায় যে দিনের পর দিন কি অসাধ্য সাধন করে চলেছেন, তা জানতেন শুধু বি. ভি.-র নেতৃস্থানীয় দু-একটি মাত্র লোক। আর কারো পক্ষেই তা জানা সম্ভব ছিল না।

অসাধ্য সাধন করেছিলেন এই পরেশ রায়। পুলিস বিভাগের একজন শ্বেতাঙ্গ আই. সি. এস. অফিসারকে তিনি এমনভাবে কায়দা করে ফেলেছিলেন যে, বেচারার আর কোনদিকে এতটুকুও নড়বার জো ছিল না।

অফিসারটি ছিল ভয়ানক মদ্যপ। মাইনের পুরো টাকাটাই

তার চলে যেত মদের দোকানে। ফলে মাসের সাতদিন যেতে না যেতেই পকেট গড়ের মাঠ। তাই নিয়ে সংসারে খিটিমিটি।

ঝোপ বুঝে কোপ মারতেন পরেশ রায়। খাও বাবা, খাও। পেট ভরে খাও। না খেলে শরীর টিকবে কি করে। টাকা! না না, এই গরীব থাকতে টাকার জন্য তুমি ভেবো না। তুমি শুধু খেয়ে যাও।

তবে আমি বাপু নগদ কারবারের কারবারী, তাই বিদেয়টাও হাতে হাতেই চাই। বিশেষ কিছুই নয়, শুধু মাঝে মাঝে দু-একটা করে ফাইল নিয়ে যাব।

না না, ভয়ের কিছু নেই। কাকপক্ষীও টের পাবে না। দু-একদিন বাদেই আবার যেখানের মাল, সেখানে ঠিক-ঠাক সাজিয়ে রেখে যাব। বল, রাজী?

রাজী না হয়ে উপায় কি! একদিকে মদের দোকানের বিল, অন্যদিকে সংসার। সোজা খরচ তো আর নয়।

ফলে যা হবার ঠিক তাই। পুলিস বিভাগের প্রতিটি ব্যাপার ছিল সেদিন বি. ভি.-র কর্মকর্তাদের নখদর্পণে। এমন কি কবে-কোথায়-কাকে-কিভাবে গ্রেপ্তার করা হবে, সে খবরও তাঁরা জানতে পারতেন আগে থেকেই।

প্রথমটাতে বিশ্বাসই করতে পারেননি সুভাষ। পুলিস দপ্তর থেকে গোপনে ফাইল পাচার করে আনা,—এ যে অবিশ্বাস্য কথা! তাও কিনা একজন শ্বেতাঙ্গ আই. সি. এস. অফিসারের হাত দিয়ে। অসম্ভব। এ হতেই পারে না।

মনে মনে সেদিন হেসেছিলেন অন্তরঙ্গ সুহৃদ বিপ্লবী নায়ক সত্য বক্সী। তারপরই একদিন একটা ফাইল তিনি তুলে দিয়েছিলেন সুভাষের হাতে।

এবার! এবার বিশ্বাস হল তো!

একি! সুভাষ স্তম্ভিত। এ যে তাঁর নিজের সম্বন্ধে পুলিসের গোপন রিপোর্ট। এ ফাইল এখানে এল কি করে! কে নিয়ে এল?

কে আবার! এনেছেন পরেশ রায়। তিনি ছাড়া এতবড় বুকের পাটা কার আছে! সংসারে পরেশ রায়দের জাতই আলাদা।

খুশি হয়ে সেদিন প্রচুর টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সুভাষ। এটা চালু রাখতে হবে। গোয়েন্দার উপর গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে যেতে হবে। এটা দরকার।

সত্যিই দরকার। দরকার বলেই এই জরুরী মুহূর্তে সুভাষ স্মরণ করলেন সবার উপেক্ষিত সেই পরেশ রায়কে। জেল থেকে তিনি নির্দেশ পাঠালেন—'পরেশ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পরেশ রায় গিয়ে হাজির হলেন সেই হুজুরের দরবারে। কেমন আছ সাহেব? ইস্। শুকিয়ে একেবারে আধখানা হয়ে গেছ দেখছি! কথায় বলে, আগে শরীর তারপর অন্য কথা। শরীরই যদি গেল তো আর রইল কি! যাক, একটা কাজের কথা বলি।

শুরু হল ধস্তাধস্তি। হাজার হোক, ইংরেজ। তার ওপর খাঁটি আই. সি. এস. অফিসার। এ ব্যাপারে কিছুতেই সে মুখ খুলতে রাজী নয়।

পরেশ রায়ও নাছোড়বান্দা। মুখ খুলিয়ে তিনি ছাড়বেনই। না খুলে যাবে কোথায়! মাইনের টাকা তো এরই মধ্যে ফুঁকে বসে আছে। তখন তো আবার হাত পাততে হবে এই পরেশ রায়ের কাছেই।

তা বাপু হাত যখন পাততেই হবে, তখন লজ্জা না করে এখন পাতলেই তো হয়। মোটা রকম কিছু না খসিয়ে যে ছাড়বে না, সে তো বুঝতেই পারছি।

অবশেষে এক মজার রিপোর্ট পাওয়া গেল পরেশ রায়ের দিক থেকে। সুভাষবাবুকে অসুস্থ হতে বলুন। আর শরৎবাবুকে বলুন দু-একদিন বাদে তাঁর মুক্তির জন্য আবেদন জানাতে। ব্যস, ওতেই হবে।

খবর চলে গেল কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। তোমাকে অসুস্থ হতে হবে সুভাষ। তারপর যা করার বাইরে থেকে আমরাই করব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

ইতিমধ্যে সুভাষ জেল থেকেই কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন অক্টোবর মাসের ২৮ তারিখে। তার একমাস বাদে, নভেম্বর মাসের ২৯ তারিখে ঘুম থেকে উঠেই সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল অভাবনীয় একটি খবর শুনে।

মুক্তির দাবিতে সুভাষ অনশন শুরু করেছেন। আমৃত্যু অনশন।

প্রতিবাদ শোনা গেল দেশের এখানে-ওখানে সর্বত্র। সুভাষকে বিনা বিচারে আটক রাখা চলবে না। অবিলম্বে তাঁর মুক্তি চাই।

সে দাবি আরো জোরদার হয়ে দেখা দিল শ্রদ্ধেয় শরৎবাবুর কণ্ঠে। সুভাষকে মুক্তি দেওয়া হোক। এভাবে তাঁকে আটকে রাখা বে-আইনী।

মুক্তি দেওয়া হল ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখে।

প্রায় একই সময়ে আরো একজনকে মুক্তি দেওয়া হল ভগ্নস্বাস্থ্যের অজুহাতে। তিনি হলেন বি. ভি.-র অন্যতম নায়ক শ্রীযুক্ত সত্য বক্সী। যাকে বলে মণি-কাঞ্চন যোগ।

এবার শুরু হল সুভাষের জীবনের এক নতুন অধ্যায়। কারো সঙ্গে দেখা নয়। এমন কি অন্তরঙ্গ সহচরদের সঙ্গেও নয়। রুদ্ধদ্বার কক্ষে সাধন-ভজন আর ধর্মচর্চার মধ্যেই তিনি নিমগ্ন হয়ে রইলেন সর্বক্ষণ।

ভেতরে ভেতরে কিন্তু তখনো সেই আগুন জ্বলছে। যেতে হবে। অনেক দূরে যেতে হবে। এ সুযোগ হারালে চলবে না।

কিন্তু আগেকার সেই যোগাযোগ এতদিনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কোথায় সেই দুরন্ত দুঃসাহসী কর্মী ভগৎরাম? বিরাট এই ভারত-বর্ষের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কোথায় এখন খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁকে?

না, কোন উপায় নেই। নতুন করেই আবার চেষ্টা করতে হবে।

যোগাযোগ করা হল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিশিষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা পেশোয়ারের আকবর শার সঙ্গে। সেই একই বক্তব্য। একই দাবি।

একজন বিশস্ত লোক চাই। চাই এমন একটি দুঃসাহসী মানুষ, যে সব কিছু তুচ্ছ করে তাঁকে সীমান্ত পার করে দিতে পারবে।

অনেক খুঁজে খুঁজে অবশেষে পাওয়া গেল একজনকে।

দেখে খুশিই হলেন আকবর শা। হ্যাঁ, সাঁচ্চা আদমী। যাকে বলে উপযুক্ত লোক।

মল্লিকা, খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত আকবর শা যে উপযুক্ত লোকটিকে নির্বাচিত করলেন, তিনি কিন্তু আসলে সেই দুরন্ত দুঃসাহসী কর্মী স্বয়ং ভগৎরাম ছাড়া আর কেউ নন। কি অদ্ভুত যোগাযোগ!

সেই একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল ভগৎরামের কণ্ঠে। হাতীকা দাঁত, আর মরদকী বাত। সুভাষবাবু শেরকা বাচ্চা। জবান দিচ্ছি, আমি নিজে তাঁকে কাবুল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব। জান কবুল।

আবার তোড়জোড় শুরু হল নতুন করে। ভগৎরামের মাধ্যমে আবার এগিয়ে এল পাঞ্জাবের সেই কীর্তি কিষাণ পার্টি। এ ব্যাপারে সবরকম সহযোগিতা করতে তারা প্রস্তুত।

তোড়জোড় শুরু হল বাংলাদেশেও। বিশেষ করে সত্যবাবুর তো কথাই নেই। দেহ অপটু, তাই নিয়ে তিনি একটানা খেটে চলেছেন নিরলসভাবে। শুধু কাজ আর কাজ। নিরবচ্ছিন্ন কাজ। সময় অল্প। তার আগেই যাবতীয় কাজ শেষ করে ফেলতে হবে।

ওদিক থেকেও তৎপরতার অন্ত নেই। ইতিমধ্যেই কীর্তি কিষাণ পার্টির তিনজন সদস্য চলে এসেছেন কলকাতায়। আশ্রয় নিয়েছেন মট্ লেনের একটা পাঞ্জাবী হোটেলের চার নম্বর ঘরে। উদ্দেশ্য,—এ ব্যাপারে সামনাসামনি কিছুটা আলাপ-আলোচনা করা।

সঙ্গে সঙ্গে সত্যবাবু সেখানে পাঠিয়ে দিলেন বি. ভি.-র অতি বিশ্বস্ত নেতৃস্থানীয় কর্মী বিনয় সেনগুপ্তকে। যাও, কথাবার্তা বলে এস। শুরুতেই আমাদের কোড-ওয়ার্ডটা উচ্চারণ করতে ভুলো না যেন। ফিরে এসে যা হয় আমাকে জানিও।

যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে হাজির হলেন বিনয়বাবু। হিসেবে কোথাও এতটুকু ভুল নেই। ভেতরে তিনজন লোকই রয়েছে। সবাই পাঞ্জাবী।

—কি চাই? প্রশ্ন করলেন একজন।

—ব্লক ফরোয়ার্ড। প্রথমেই কোড-ওয়ার্ড উচ্চারণ করলেন বিনয়বাবু।

—আইয়ে জী, আইয়ে। তিনজনেই সাগ্রহে আহ্বান জানালেন, ভিতর মে আইয়ে। আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

অনেক কিছুই আলাপ-আলোচনা হল রুদ্ধদ্বার কক্ষে। সবশেষে ঠিক হল,—দিন-সাতেক বাদে এখান থেকে একজনকে যেতে হবে লাহোরে। তার মারফতই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে সব কিছু জানিয়ে দেওয়া হবে বিস্তারিতভাবে।

নির্দিষ্ট দিনে দলের একজন বিশ্বস্ত কর্মী চলে গেলেন লাহোরে। গেলেন ছদ্মবেশে। ছদ্মনামে। ছদ্ম পরিচয়ে। সে কি তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদের ঘটা! যেন কোন উঁচু মহলের রইস্ মুসলমান আদমী আর কি!

আশ্রয় নিলেন ওখানকার একটা সাধারণ মুসলমানী হোটেলে। নিতেই হবে। খাঁটি মুসলমান যে! কি লাভ অন্য কোন হোটেলে আশ্রয় নিয়ে অহেতুক সন্দেহের সৃষ্টি করে!

বিপদ হল খাবার টেবিলে। হায় ভগবান! এ যে রুটি আর নিষিদ্ধ মাংস। এখন উপায়!

এক মুহূর্তের দ্বিধা, তারপরই তিনি অম্লানবদনে কাছে টেনে

নিলেন মাংসের প্লেটটা। স্বাধীনতার চাইতে সংস্কার বড় নয়। সুতরাং নিষিদ্ধ মাংসই সই। নইলে সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়।

দিন-তিনেক বাদেই কর্মীটি ফিরে এলেন যাবতীয় আলাপ-আলোচনা শেষ করে। খবর শুভ। কলকাতা থেকে কাবুল পর্যন্ত যাবার সমস্ত প্ল্যান প্রস্তুত। এমনকি দিন-তারিখও স্থির হয়ে গেছে।

কীর্তি কিষাণ পার্টির সভ্যদের মধ্যে কে, কবে, কোথায় সুভাষকে রিসিভ করে কাবুল সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন, তাও একদম পাকা। এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র।

এবার এক সমস্যা দেখা দিল সত্যবাবুর সামনে। সব চাইতে বড় সমস্যা। টাকা চাই। অনেক টাকা। নানাদিকে যোগাযোগ রাখা, প্রতিটি ঘাঁটি সুরক্ষিত করা ইত্যাদি ব্যাপারে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। কোথা থেকে আসবে এত টাকা!

যতীশ গুহ, বিনয় সেনগুপ্ত, কামাখ্যা রায় প্রমুখ বি. ভি.-র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা তখনো জেলের বাইরে ছিলেন, তাঁদের সবাইকে ডেকে এনে সমস্যার কথাটা বুঝিয়ে বললেন সত্যবাবু।

টাকা চাই। একদিন অন্তর একদিন, কম করে হলেও পাঁচশো করে টাকা। যে করে হোক, এর ব্যবস্থা করতেই হবে।

মহাসমস্যা। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সবাই স্বল্প বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। কোথায় পাওয়া যাবে এত টাকা! এ তো আর দু-দশ টাকার ব্যাপার নয়! দলের মেয়েদের একবার জিজ্ঞেস করে দেখলে কেমন হয়!

অনেক ভেবেচিন্তে শেষপর্যন্ত বিপ্লবী নায়িকা উজ্জ্বলা মজুমদারের কাছে গিয়ে হাজির হলেন বিনয়বাবু। যে করে হোক, কিছু টাকার ব্যবস্থা তোমাকে করেই দিতে হবে ভাই!

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নারীর অবদান তুচ্ছ নয়। কত মা, কত বৌদি, কত স্নেহময়ী দিদি যে বাংলাদেশের এই দুরন্ত দামাল ছেলেগুলোকে সেদিন ধৈর্য দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, সবরকম বিপদ

থেকে আগলে রেখেছিলেন, ইতিহাসও বোধ করি তার সঠিক হিসেব দিতে পারবে না। ঘরছাড়া, কুলহারা এই ছেলেগুলোর জন্যে তাঁদের শুধু বুকই ফেটেছে, কিন্তু মুখ ফোটেনি কোনদিনও।

এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলা মজুমদার তৎপর হয়ে উঠলেন সুবালা সেন, ঊষা সেন প্রমুখ দলের অন্যান্য নারী কর্মীদের নিয়ে। টাকা চাই। অনেক টাকা।

পাওয়া গেল বেশ কিছু অলঙ্কার। নারীর সব চাইতে প্রিয় জিনিস—অলঙ্কার। একান্ত প্রিয় সেই অলঙ্কারগুলোই তাঁরা স্বেচ্ছায় তুলে দিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে সুগম করে তুলতে। হে মহান বিপ্লবী, তোমার যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন হোক! তোমার সাধনা জয়যুক্ত হোক!

উজ্জ্বলা মজুমদার! নামটা চেনা চেনা ঠেকছে, তাই না মল্লিকা! হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছ তুমি। এই উজ্জ্বলা মজুমদারই একদিন বাংলার গভর্ণর এণ্ডারসনকে গুলী করার মামলায় দণ্ডিত হয়েছিলেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে। বর্তমানে ইনি উজ্জ্বলা রক্ষিত।

বি. ভি.-র বিশিষ্ট নায়ক কমেট দাশগুপ্ত তখন কাজ করতেন নাথ ব্যাঙ্কে। তাঁর সাহায্যে অলঙ্কারগুলো ওখানে গচ্ছিত রেখে পাওয়া গেল বেশ কিছু টাকা।

তবু সমস্যার কোন স্থায়ী সুরাহা হল না। এ টাকা আর ক'দিন! এ তো দেখতে দেখতেই ফুরিয়ে যাবে। তারপর কাজ চলবে কি করে!

হঠাৎ একটি বিশেষ মানুষের কথা মনে পড়ে গেল বিনয়বাবুর।

পঞ্চাবাবু। জামসেদপুরের বিশিষ্ট এঞ্জিনিয়ার পঞ্চাবাবু। মনে মনে তিনি সুভাষবাবুর অত্যন্ত ভক্ত। শ্রদ্ধাও করেন যথেষ্ট। কথাবার্তার মধ্য দিয়েই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বার বার। তাঁর কাছে একবার গেলে হয় না! দেখাই যাক না!

যে কথা, সেই কাজ। সঙ্গে সঙ্গে জামসেদপুর ছুটে গিয়ে

পঞ্চাবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন বিনয়বাবু। টাকা চাই। একদিন অন্তর একদিন পাঁচশো করে টাকা। কেন, কি বৃত্তান্ত, কিছুই বলতে পারব না। সময় হলে নিজেই জানতে পারবেন। শুধু এটুকু মনে রাখবেন যে, এর উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। বলুন, রাজী?

রাজী! রাজী! রাজী! সানন্দে হাতে হাত মেলালেন পঞ্চাবাবু।

পাঁচশো টাকা এখুনি নিয়ে যান। বাকি টাকার জন্যে আর এখানে আসতে হবে না। ওটা ঘরে বসেই পেয়ে যাবেন।

পঞ্চাবাবু তাঁর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে রেখেছিলেন, মল্লিকা। নিষেধ না করা পর্যন্ত যথানিয়মেই তিনি পাঁচশো করে টাকা পৌঁছে দিয়েছিলেন পূর্ব-নির্দিষ্ট ঠিকানা অনুযায়ী। এ ব্যাপারে কোনদিনও তাঁর দিক থেকে একটুও ভুলচুক হয়নি। বর্তমানে তিনি রৌরকেল্লা স্টীল প্ল্যান্টের সঙ্গে যুক্ত। ভাল নাম শৈলেশচরণ দাশগুপ্ত হলেও পঞ্চাবাবু নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিত।

এদিকে নেপথ্য নায়কদের মধ্যে ততদিনে সাড়া পড়ে গেছে নতুন করে। আর ভাবনা নেই। অর্থের কিছুটা সুরাহা হয়ে গেছে। এবার এগিয়ে চল!

পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও সেই একই রব। আর সময় নেই। এগিয়ে চল! এগিয়ে চল!

হাঁক শোনা গেল ভগৎরামের কণ্ঠে। হুঁশিয়ার ভাই সব, হুঁশিয়ার! তৈয়ার হো যাও! টাইম আ গিয়া!

লোকচক্ষুর আড়ালে নিজেকে সরিয়ে রাখলেও সুভাষ কিন্তু সেদিনও লৌহ-কপাটের অন্তরালে অবস্থিত তাঁর বিপ্লবী সতীর্থদের কথা ভুলে যাননি। বড়দিন উপলক্ষে একগাদা কেক্ তিনি পাঠিয়ে দিলেন তাঁদের কথা স্মরণ করে।

বিদায় বন্ধুগণ, বিদায়! আবার কবে দেখা হবে কে জানে! ভবিষ্যতে আর কোনদিনও দেখা হবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে! তবু তোমাদের কথা আমি ভুলব না। কোনদিনও না।

অবশেষে এল সেই ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সেই অবিস্মরণীয় দিন।

সুভাষ প্রস্তুত। প্রস্তুত কমরেড ভগৎরাম।

প্রস্তুত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা পেশোয়ারের আকবর শা। প্রস্তুত কীর্তি কিষাণ পার্টির ভারপ্রাপ্ত কর্মীর দল।

প্রস্তুত সত্য বক্সী, যতীশ গুহ, বিনয় সেনগুপ্ত প্রমুখ বি. ভি.-র অন্যতম নেতৃবৃন্দ। লগ্ন আসন্ন। এবার যাত্রা-শুরুর পালা।

রাত তখন একটা বেজে পঁচিশ মিনিট। গোটা এলগিন রোড সুপ্ত, নিস্তব্ধ। আলো নেই। জনমানব নেই। নেই কোলাহল। শুধু দূর আকাশে তারা জ্বলছে মিটিমিটি করে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন সুভাষ। এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। আর সময় নেই।

কিন্তু এ কোন্ সুভাষ! বিরাট বলিষ্ঠকায় এক পাঠান যুবকের আড়ালে এতদিনকার চেনা সুভাষ যেন নিঃশেষে হারিয়ে গেছেন। মনে হয়, এ যেন কোন ভিন্নসত্তা। চেনাই যায় না।

এবার যেতে হবে সুভাষকে। এই বাড়ির এই মৃত্তিকা তাঁর কত প্রিয়। কত দিবারাত্রির স্মৃতি জড়ানো এই ঘর। জীবনের মধুগন্ধে ভরা দিনগুলি যেখানে কেটেছে, তাকে ছেড়ে আজ তাঁকে চলে যেতে হবে বৃহত্তর কর্তব্যের প্রেরণায়। এ যে নিশির ডাক। এ ডাক যে একবার শুনেছে, সাড়া যে তাকে দিতেই হবে।

বুঝি একলহমার ব্যাপার, তারপরই সুভাষ নিঃশব্দে নিচে নেমে গেলেন কোনদিকে দৃকপাত না করে। পেছনে তাকাবার সময় এখন নয়। সামনে কঠিন কঠোর সংগ্রামের দিন। সেই সংগ্রামই এখন তাঁর জীবনে একমাত্র সত্য। একমাত্র লক্ষ্য।

রাত্রির নিস্তব্ধতা কাটিয়ে সহসা একটা প্রাইভেট গাড়ি তীব্রবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল এলগিন রোডের বাড়ি থেকে। একটু একটু করে

ছোট হতে হতে গাড়িটা একসময়ে মিলিয়ে গেল কুয়াশাচ্ছন্ন গাঢ় অন্ধকারের আড়ালে। আর তাকে দেখা গেল না।

রাত একটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট।

পথ-ঘাট জনমানবশূন্য। প্রাণের কোন স্পন্দনই নজরে পড়ে না আশেপাশে। শুধু দূরে অক্টোরলোনী মনুমেণ্টটা প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দ হয়ে।

মাত্র তুটি লোক গাড়িতে। গাড়ির চালক আর সুভাষ।

তুজনেই নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। সব কথা, সব উত্তরই বুঝি হারিয়ে গেছে মৌন রাতের অন্ধকারে।

হাওড়া···বেলুড়···বালি···উত্তরপাড়া···চন্দননগর···

শক্ত হাতে স্টিয়ারিং চেপে বসে আছেন গাড়ির চালকটি।

মাথার ওপর কর্তব্যের গুরুভার। সুভাষ শুধু তাঁর 'রাঙাকাকু'ই নন, ভারতের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের আশা ও ভরসার একমাত্র প্রতীক। পুলিসের নজর এড়িয়ে, যে করে হোক, তাঁকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতে হবে।

ভেতরে সুভাষ। আধ-বোজা চোখের কিনারে ঢেউ খেলে যায় ছবির পর ছবি। স্বপ্নের পর স্বপ্ন। ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের এক উজ্জ্বল স্বপ্ন।

লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌—লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌—লেফ্‌ট্‌···

তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে ভারতের নিজস্ব সেনা-বাহিনী। এগিয়ে চলেছে হাজার হাজার মুক্তিকামী তরুণবৃন্দ। চলেছে নারী-বাহিনী।

কণ্ঠে তাদের শেকলভাঙার গান। স্বাধীনতায় আমাদের জন্মগত অধিকার। আমরা স্বাধীনতা চাই-ই।

বু-বুম্‌-বুমমম্‌! বু-ম্‌-মমম্‌!

বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে এক এক করে ভেঙে পড়ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শক্ত ঘাঁটিগুলি। ধ্বসে পড়ছে তাদের দম্ভ ও স্পর্ধার প্রতীক ইউনিয়ন জ্যাক। তার পরিবর্তে লালকেল্লার শীর্ষে পত্ পত্ করে উড়ছে স্বাধীন ভারতের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা।

অজ্ঞাতেই বুঝি এক জ্যোতির্ময় পুরুষের ছবি ভেসে ওঠে চোখের সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে। বিবেকানন্দ। বীরেশ্বর বিবেকানন্দ।

শক্তি দাও স্বামীজী, শক্তি দাও। এই গুরুদায়িত্ব হাসিমুখে বইবার শক্তি দাও। আশীর্বাদ কর।

চুঁচুড়া-ব্যাণ্ডেল-শক্তিগড়-বর্ধমান-আসানসোল-বরাকর ব্রীজ—

সহসা কি দেখে সজাগ হয়ে উঠলেন গাড়ির চালকটি। সঙ্গে সঙ্গে স্পীডোমিটারের কাঁটাটা কেঁপে উঠল থর থর করে। শুধু স্পীড আর স্পীড।

পুব আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে একটু একটু করে। আর দেরি নয়। ভোর হবার আগেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে হবে।

যতই পাঠানের ছদ্মবেশে থাকুন না কেন, সুভাষ সুভাষই। অসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব। অতুলনীয় তাঁর রূপ। ঐ ভুবন-ভোলানো রূপ কি শুধুমাত্র গোঁফ-দাড়ি দিয়ে ঢাকা যায়! নাকি তা সম্ভব!

অবশেষে গাড়ি এসে থামল ধানবাদের কাছাকাছি একটা বাংলো বাড়ির সামনে। আজকের মতো যাত্রা-বিরতি। আবার যাত্রা শুরু হবে সূর্য অস্ত যাবার পরে।

সুভাষের ঠাঁই হল বাইরের ঘরে। এমন কি খাবার-দাবারের ব্যবস্থাও ঐ একই ঘরে।

উপায় কি! হলই বা ইনসিওরেন্স কোম্পানির একজন শিক্ষিত এজেন্ট, তবু আসলে সে অচেনা অজানা একজন তরুণ পাঠান জেনে-শুনে তাকে তো আর অন্দর-মহলে ঠাঁই দেওয়া যায় না।

সত্যিই পাঠান। যাকে বলে একেবারে খাঁটি পাঠান। বাংলা কথা না পারেন বলতে, না পারেন বুঝতে। তাই কথাবার্তা যা কিছু হ'ল সবই প্রায় ইংরেজীতে। বেশির ভাগই ইনসিওরেন্স সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে।

বাংলোভর্তি বয়-বাবুর্চির দল। কার মনে কি আছে কে বলতে পারে। সুতরাং সাবধানতার দরকার আছে বৈকি।

গোমো জংশন। এক পাশে উঁচু পাহাড়ের সারি। নিচ দিয়ে এঁকে-বেঁকে রেললাইন চলে গেছে বহুদূর পর্যন্ত।

রাত তখন অনেক। গোটা পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত। মাঝে মাঝে দু-একটা পাখির ডাক ছাড়া আর কোথাও কোনরকম সাড়াশব্দ নেই।

বেশ খানিকটা দূরে অন্ধকারে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রাইভেট গাড়ি। ভেতরে মোট চারজন যাত্রী। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা।

হাওড়া থেকে আগত দিল্লী-কালকা মেলের তখনো অনেকটা দেরি। মনে হয় আরও ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করতে হবে।

ঘুমন্ত গোমো জংশনটা জেগে উঠল মধ্যরাত্রিতে।

সিগন্যাল ডাউন। গাড়ির সময় হয়েছে। এরই মধ্যেই এঞ্জিনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে গোটা স্টেশন-অঞ্চলটা।

আস্তে আস্তে প্রাইভেট গাড়িটা এবার এগিয়ে গেল স্টেশনের দিকে। লগ্ন আসন্ন। এবার সুভাষকে বিদায় নিতে হবে। বিদায় দিতে হবে।

নিমেষে প্রস্তুত হয়ে নিলেন সুভাষ। এদিক-ওদিক ভাল করে দেখে নিয়ে পরক্ষণেই তিনি গাড়ি থেকে নেমে প্ল্যাটফরমের দিকে এগিয়ে গেলেন দৃঢ় পদক্ষেপে। বিদায়! এবার তোমরা ফিরে যাও।

রাত্রির অন্ধকারে তিনটি প্রাণী অসাড়, নিস্পন্দ হয়ে তাকিয়ে রইলেন দূরে অপসৃয়মান সুভাষের বলিষ্ঠ দেহটার দিকে।

সুভাষ চলে যাচ্ছেন। কত গ্রীষ্ম, কত বসন্তবেলা, কত কান্না-হাসির মালা গাঁথা দিন, সব পেছনে ফেলে সুভাষ আজ চলে যাচ্ছেন ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে।

ঐ যে গাড়িটা অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে সুভাষকে নিয়ে। ঐ যে তার পেছনের লাল আলোটা ক্রমশ ছোট হতে হতে হারিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

হে সর্বত্যাগী রুদ্র সন্ন্যাসী, এ সময়ে চোখের জল ফেলে তোমার যাত্রাপথকে আমরা পিচ্ছিল করে তুলব না।

তুমি যাও। তোমার যাত্রাপথ শুভ হোক।

আবার তুমি ফিরে এস ব্রত সাঙ্গ হলে। ফিরে এস স্বাধীন ভারতে। ফিরে এস বিজয়ীর দেশে। ততদিন আসমুদ্রহিমাচল তোমার পথ চেয়ে থাকবে।

সুভাষের রহস্যময় অন্তর্ধান সম্বন্ধে এ পর্যন্ত তোমাকে যা কিছু বলেছি, তার কোনটাই আমার মনগড়া কথা নয় মল্লিকা। সুভাষকে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয় দেখেছ। দেখেছ ছাত্রনেতা, মেয়র, রাষ্ট্রপতি, ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা—এমনি বিভিন্ন সব ভূমিকায়।

কিন্তু দেখেছ কি কোনদিন অনমনীয় বিপ্লবী সুভাষকে ?

দেখনি নিশ্চয়ই। শুধু তুমি কেন, অন্তরঙ্গ সহচর বলে যাঁরা চিহ্নিত, তাঁদের মধ্যেই বা ক'জন তাঁর বৈপ্লবিক কর্মধারাকে স্বচক্ষে দেখার মতো সুযোগ পেয়েছেন বল ?

দেখেছিলেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), রবি সেন, ভূপেন্দ্র-কুমার দত্ত, অরুণ গুহ, পূর্ণ দাস, অনিল রায় ও লীলা রায় প্রমুখ তখনকার দিনের বিভিন্ন দলের প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী নায়কবৃন্দ।

বিশেষ করে মহেন্দ্র ঘোষ, সত্যরঞ্জন বক্সী, মেজর সত্য গুপ্ত, মণীন্দ্রকিশোর রায় প্রমুখ বি. ভি.-র কর্মকর্তাগণ।

এই বি. ভি.-ই সেদিন তাঁর সেই অন্তর্ধানের ব্যাপারে জড়িত ছিল ওতপ্রোতভাবে। মূল্যও তার জন্য দিতে হয়েছিল যথেষ্ট। দিতে হয়েছিল অফুরন্ত প্রাণ-সম্পদে ভরপুর কয়েকটি অমূল্য জীবন।

সুভাষের রহস্যময় অন্তর্ধান সম্বন্ধে আজ তোমাকে যা কিছু বলছি, তার সবটাই গড়ে উঠেছে সেদিন যাঁরা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের দেওয়া সেই ঐতিহাসিক রিপোর্টকে ভিত্তি করে, কোন কাল্পনিক কাহিনীকে আশ্রয় করে নয়। যাক, পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

গোমো জংশন। ভারাক্রান্ত মনে তিনজন ফিরে এলেন সুভাষকে বিদায় দিয়ে। ফিরে এলেন শূন্য ঘরে। শূন্য মনে। তাঁদের কর্তব্য শেষ। ভগবানের অশেষ করুণা যে, এ ব্যাপারে তাঁদের কোন বড় রকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়নি।

কে এই তিনজন?

কে সেদিন মোটরে এত দূর-পথ পাড়ি দিয়েছিলেন সুভাষকে নিয়ে?

কি তাঁর পরিচয়?

শিশির বোস। সুভাষের ভাইপো ডাঃ শিশির বোস। তিনিই ছিলেন সেদিন সুভাষের সারথী।

এ সম্বন্ধে শিশিরবাবু পরবর্তীকালে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, এখানে তা হুবহু তুলে দিচ্ছি।

'অনশন অবলম্বনের পর নেতাজীকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি-লাভের পর তাঁহার যাত্রার আয়োজন চলিতে থাকে। ১৯৪১ সালের ১৬ই জানুয়ারি রাত্রি ১টা ২৫ মিনিটে আমরা একখানি মোটরযোগে সত্য সত্যই যাত্রা শুরু করিতে সমর্থ হই। আমি ও নেতাজী, মাত্র

এই দুজনেই ঐ গাড়ির আরোহী। নেতাজী পশ্চিমী মুসলমানের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া একটি সুটকেস, বিছানা ও একটি অ্যাটাচি কেস সঙ্গে লইয়াছিলেন।

এলগিন রোড হইতে যাত্রা শুরু করিয়া কলিকাতা শহর ছাড়াইয়া গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া তীব্রবেগে আমাদের গাড়ি চলিল। সমস্ত রাত্রি চলিবার পর প্রত্যূষে আমরা একস্থানে আত্মগোপন করিলাম।

সন্ধ্যায় আবার যাত্রা শুরু হইল। অধিক রাত্রিতে আমরা কলিকাতা হইতে আনুমানিক ২১০ মাইল দূরবর্তী গোমোতে পৌঁছিলাম এই দিনটি ছিল ১৯৪১ সালের ১৮ই জানুয়ারি।

শেষরাত্রিতে নেতাজী ট্রেনে উত্তর-ভারত অভিমুখে রওনা হইয়া যান। স্টেশনেই তাঁহার নিকট হইতে আমি বিদায় লইলাম।'

শিশিরবাবুর বক্তব্য এইখানেই শেষ। তবু একটা প্রশ্ন রয়ে গেল। তিনি বলেছেন—'প্রত্যূষে আমরা একস্থানে আত্মগোপন করিলাম।'

জায়গাটা কোথায়? কার বাড়িতে?

গোমো জংশনে তাঁর সঙ্গে যে আরো দুজন লোক দেখা গিয়েছিল তাঁরাই বা কে?

এ প্রশ্নের জবাব রয়েছে পরবর্তী বিবৃতিটির মধ্যে। এ বিবৃতি দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র বোসের বড় ছেলে শ্রীযুক্ত অশোক বোস। তিনি বলেছেন—

'On the 18th January, 1941, at about 5 O'clock in the morning as my wife and I were preparing to sit down for breakfast (at Bararee, Dhanbad), we found my brother Dr. Sisir Bose, driving in to the bunglow in one of my father's cars. He told me that, he brought Netaji in disguise out of Calcutta.

In the evening he (dressed as a Pathan) apparently took leave of us and left the bunglow on foot

ostensibly to catch a taxi at the nearest stand. The three of us, my brother, my wife and myself, then set out in the car after half an hour's interval and picked him up on the way. We drove along the Grand Trunk Road towards Gomoh.

Near about Gomoh, we stopped on the lonely roadside for an hour or so--as the train was not due to arrive at Gomoh before midnight—for a quite homely chat.

As the time of arrival of the (Delhi-Kalka mail) train was drawing near, we started for station and on arrival there quickly put him down and drove half a mile or so away from the station and waited for another half an hour after the departure of the train. Having satisfied ourselves that he had boarded the train safely, we then drove back to Dhanbad···'

[১৯৪১ সালের ১৮ই জানুয়ারি সকাল ৬টায় আমি ও আমার স্ত্রী যখন প্রাতরাশের জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, তখন আমার ভাই ডাঃ শিশির বোস আমার পিতার একখানা গাড়ি নিয়ে আমাদের বাংলোতে এসে ঢুকলেন এবং আমাদের জানালেন যে, তিনি কলকাতা থেকে ছদ্মবেশী নেতাজীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

সন্ধ্যার দিকে পাঠানের বেশে সজ্জিত হয়ে তিনি আমাদের কাছ থেকে লোক দেখানো ভাবে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। পায়ে হেঁটেই গেলেন। ভাবটা এই যে, পথে নিকটস্থ ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেবেন। আধঘন্টা বাদে আমরা তিনজন—আমি, আমার ভাই ও স্ত্রী, আমাদের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, এবং পথ থেকে তাঁকে তুলে নিলাম। তারপর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে গাড়ি চালিয়ে দিলাম গোমোর দিকে।

গোমোর কাছাকাছি গিয়ে আমরা একটা নির্জন পথের ধারে প্রায় ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করলাম, কারণ মাঝরাতের আগে ট্রেন আসার কথা ছিল না। এ সময়টা আমরা অল্পসল্প পারিবারিক আলাপ-আলোচনায় কাটিয়ে দিলাম।

ট্রেনের সময় হতেই আমরা স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাড়াতাড়ি তাঁকে নামিয়ে দিয়ে প্রায় আধ মাইল দূরে গাড়ি নিয়ে সরে এলাম। ট্রেন ছেড়ে যাবার পরেও প্রায় আধঘণ্টা আমরা সেখানে অপেক্ষা করলাম। তারপর এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ি করে ধানবাদ ফিরে এলাম।]

হু-হু করে ট্রেনটা ছুটে চলেছে ব্যাকুল মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। পিছনে ছুটে যাচ্ছে একের পর এক গ্রাম, শহর, নগর আর অন্ধকারে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়ের সবুজ উপত্যকা।

ভেতরে নিজের আসনে স্তব্ধ হয়ে বসে সুভাষ। সারা মুখে তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্পের রেখা। সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। স্বাধীনতার সংগ্রাম।

আর পেছনে তাকাবার সময় নেই। হিসেব-নিকেশেরও ফুরসৎ নেই। এই মরণপণ সংগ্রামই এখন তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত।

হয় কূল, নয়তো অতল সমাধি। এ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই তাঁর চোখের সামনে।

ভিক্ষায় কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না। তার জন্য যথাযোগ্য মূল্য দিতে হয়।

এমন কতজনই তো মূল্য দিয়েছেন। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, সত্যেন বোস, চারু বোস, বীরেন দত্তগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়, ভগৎ সিং, নীরেন, মনোরঞ্জন, গোপীনাথ, প্রমোদ, অনন্তহরি, বিনয়, বাদল, দীনেশ, আসফাকউল্লা, প্রদ্যোৎ, রামকৃষ্ণ, সূর্য সেন, তারকেশ্বর, প্রীতিলতা, অনাথ, মৃগেন, নির্মল, নবজীবন, রামকৃষ্ণ রায়,

ব্রজকিশোর, দীনেশ মজুমদার, ভবানী, কালীপদ, মতি মল্লিক— এমনি আরো কতজন।

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁকেও যদি তেমনি করে মূল্য দিতে হয় তো তার জন্য তিনি প্রস্তুত। তবু এবারের যুদ্ধ স্বাধীনতা-প্রাপ্তির যে অপূর্ব সুযোগ নিয়ে এসেছে, তাকে তিনি কোনমতেই হেলায় হারাতে রাজী নন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল এমনি করেই।

সুভাষ স্থির, অচঞ্চল। ঘুম আসে না। চোখ বুজে আসে, তবু ঘুম আসে না। আসে রাশি রাশি ভাবনা।

কলকাতার খবর কি, কে জানে। খবরটা পুলিসের কানে গেছে কিনা তাই বা কে বলতে পারে।

না গেলেও এ খবর বেশিদিন তাদের অজানা থাকবে না। তার আগেই তাঁকে বেড়াজাল ডিঙিয়ে চলে যেতে হবে অনেক দূরে, তাদের নাগালের বাইরে।

সহসা কি দেখে অলস দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে সুভাষের। কি একটা স্টেশনে গাড়ি থেমেছে। একজন চেকার এদিকেই যেন এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। আরো কাছে।

নিমেষে হাতের খবরের কাগজটা দিয়ে নিজেকে আড়াল করে বসলেন সুভাষ। এ পথ অতি কঠিন, কঠোর। জীবন ও মৃত্যুর এখানে পাশাপাশি বাস। বাঁকে বাঁকে ওত পেতে আছে ধ্বংস আর সর্বনাশ। বাঁচতে হলে এখন যুঝতে হবে প্রতি মুহূর্তে।

অবশ্য মৃত্যুভয়ে তিনি ভীত নন। মরণ তো বৈশাখী ঝড়। কখন কোন্‌দিক থেকে উড়ে আসবে, কেউ তা বলতে পারে না। তা বলে ভীরুর মতো মরতে তিনি রাজী নন। সর্বাগ্রে দেশের মুক্তি, তারপর অন্য কথা।

চেকার সরে যেতেই আবার মুখ থেকে খবরের কাগজটা সরিয়ে নিলেন সুভাষ। যাক, আপাতত নিশ্চিন্ত। তবে প্রতি মুহূর্তে

সজাগ থাকতে হবে। চারিদিকে হিংস্র ক্ষুধার্ত হায়েনার দল। এ অবস্থায় সর্বক্ষণ চোখ-কান খোলা রাখা দরকার।

আবার বাধা। এবার কামরায় ঢুকলেন একজন সম্ভ্রান্ত শিখ ভদ্রলোক। তিনিও অনেক দূরের যাত্রী।

সুভাষের দুচোখে নিবিড় সংশয়। একেবারে মুখোমুখি এসে আসন গ্রহণ করেছেন ভদ্রলোক। ছদ্মবেশটা ধরা পড়ে যাবে না তো ওঁর চোখে?

কিন্তু না, আশঙ্কা অমূলক। চিনতে পারেননি। কোনরকম সন্দেহও করেননি। করা সম্ভবও নয়। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, কোন পাকা ডিটেক্টিভের পক্ষেও এখন সুভাষকে দেখে কোনরকম সন্দেহ করা সম্ভব নয়। কারণ এ সুভাষ সে সুভাষ নয়।

পরনে শেরওয়ানী ও আঁটো-সাঁটো পায়জামা। মাথায় ফেজ। সারামুখে একদঙ্গল দাড়ি। দেখে মনে হয় ঠিক যেন কোন খাঁটি মৌলবী সাহেব।

—আপনি কোথায় যাবেন সাহেব? সহজ অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন শিখ ভদ্রলোক।

—আমি! বিশুদ্ধ উর্দুতে জবাব দিলেন সুভাষ, আমি যাব রাওয়ালপিণ্ডি।

—ওখানেই থাকেন বুঝি?

—না, দেশ আমার লক্ষ্ণৌতে। পেশায় ইনসিওরেন্স অর্গানাইজার। তাই মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে যেতে হয় ব্যবসায়িক প্রয়োজনে।

—আপনার নাম?

—জিয়াউদ্দিন। মৌলবী জিয়াউদ্দিন।

এমনি অনেক কথা। অনেক প্রশ্ন। প্রায় সারাদিন ধরে। তবে নিছক কথাই। একমাত্র সহজ সরল আন্তরিকতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না তার পেছনে। সামান্য ইঙ্গিতও না।

ওদিকে ততক্ষণে সাড়া পড়ে গেছে পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টির সভ্যদের মধ্যে। সুভাষবাবু রওনা দিয়েছেন। সবাই সতর্ক থাক। দেখো, হিসেবে যেন কোথাও গরমিল না হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা পেশোয়ারের আকবর শারও সেদিন ব্যস্ততার সীমা নেই। সুভাষবাবু আসছেন। লাইন ক্লিয়ার কর। দুশমনদের ওপর নজর রাখ। সব ঝুট-ঝামেলা হটিয়ে দাও।

আর সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী কমরেড ভগৎরামের তো কথাই নেই। উপজাতীয় এলাকায় মুহুর্মুহুঃ তাঁর হাঁক শোনা যেতে লাগল, হুঁশিয়ার ভাই সব, হুঁশিয়ার! শেরকা বাচ্চা আ গিয়া। হাতিয়ার লেকে সব তৈয়ার হো যাও। জান কবুল!

পেশোয়ার সিটি স্টেশন। গাড়ি আসার সময় হয়েছে। সিগন্যাল ডাউন।

প্ল্যাটফরমের এক কোণে নিজেকে যথাসম্ভব আড়াল করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা আকবর শা। এ গাড়িতে সুভাষবাবু আসবেন। বাংলার শের সুভাষ বোস।

বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও ভেতরে ভেতরে কিন্তু আকবর শার মনে তখন ঝড় বইছে। দুরন্ত ঝড়।

জোর লড়াই চলছে এখন গোটা ইয়োরোপ জুড়ে। স্বভাবতঃই ফ্রন্টিয়ার এখন অত্যন্ত সুরক্ষিত, অত্যন্ত সজাগ। তাদের নজর এড়িয়ে কি সুভাষবাবুকে এখান থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে?

খোদা মেহেরবান! কি আছে তাঁর মনে কে জানে!

দেখতে দেখতেই কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল গোটা স্টেশন-অঞ্চলটা। গাড়ি ইন করেছে। শুরু হয়েছে যাত্রীদের ওঠা-নামার পালা।

টুক করে সামনের একটা কামরায় উঠে পড়লেন আকবর শা। সুভাষবাবু এখানে নামবেন না। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁকে নামানো হবে পরবর্তী স্টেশন পেশোয়ার ক্যান্টনমেণ্টে।

তিনি কোথায়, কোন শ্রেণীতে, কত নম্বর কামরায় রয়েছেন খুঁজে দেখবার কোন প্রয়োজন নেই; ইতিমধ্যেই তাঁর কাছে সে সব রিপোর্ট এসে গেছে। সুতরাং অহেতুক ব্যস্ততার কোন কারণ নেই।

দেখতে দেখতেই এসে গেল পেশোয়ার ক্যাণ্টনমেণ্ট। দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পরে এবার যাত্রা-বিরতি।

সর্বাগ্রে নেমে গেলেন আকবর শা। তারপর তিনি সোজা গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলেন দিব্যি ভালমানুষটির মতো।

কি দরকার অকারণ ব্যস্ততা দেখিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করা। সুভাষবাবু ঠিক চলে আসবেন তাঁর পেছনে পেছনে। তাই ব্যবস্থা হয়ে আছে আগে থেকে।

গেট দিয়ে বেরিয়ে এবার একেবারে সোজা রাস্তায় গিয়ে পা দিলেন আকবর শা।

এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে কয়েকটি তরুণ পাঠান। আকবর শাকে দেখেই সহসা কিসের একটা ইঙ্গিত খেলে গেল তাদের চোখের তারায়। হুঁশিয়ার! বাঙ্গাল-কা শের সুভাষবাবু আজ আমাদের সম্মানিত অতিথি। তাঁর ভাল-মন্দ কিছু হলে সে লজ্জা শুধু তোমার-আমার নয়, গোটা পাঠান মুলুকের। সুতরাং হুঁশিয়ার। হাতিয়ার তৈয়ার রাখ।

হিসেবে ভুল হল না। পেছনে পেছনে পাঠান-বেশী সুভাষ দিব্যি বেরিয়ে এলেন পাঠানের মতোই বুক-টান করে। তারপর সামনের একটা টাঙ্গায় সোজা চেপে বসলেন কোনদিকে দৃকপাত না করে।

বুঝি একলহমার ব্যাপার, পরক্ষণেই টাঙ্গা গাড়িটা সুভাষকে নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল ঝড়ের গতিতে। কোন কিছু প্রশ্নেরও প্রয়োজন হল না। কোথায় যেতে হবে টাঙ্গাওয়ালা তা ভাল করেই জানে।

পেছনে পেছনে অন্য একটা টাঙ্গা নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করে চললেন আকবর শা। সারা মনে তাঁর কুলপ্লাবী আনন্দ। একটা বিপুল পরিতৃপ্তি।

খোদা সত্যিই মেহেরবান। এবারের মতো বিপদ কেটে গেছে। খোদার মর্জিতে এখন বাকি কাজগুলি যদি এমনি করে হাসিল করা যায় তো ভাবনার আর কোন কারণ নেই।

টাঙ্গা থামল তাজমহল হোটেলের সামনে গিয়ে। এবার নামতে হবে। আপাতত এখানেই সুভাষের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

টাঙ্গা থেকে নেমে অভ্যস্ত পরিচিত ভঙ্গিতে সুভাষ ঢুকে গেলেন হোটেলের অভ্যন্তরে। কোথায়, কোন কামরা, কোন কিছু জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন হল না। সব কিছুই তাঁর কণ্ঠস্থ।

আকবর শা কিন্তু নামলেন না। টাঙ্গা নিয়েই সোজা তিনি চলে গেলেন বিশেষ একটি আস্তানার উদ্দেশ্যে। সুভাষবাবু নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেছেন। খবরটা তাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার।

বোধহয় ঘণ্টাখানেকও হয়নি। সহসা বাইরে কার মৃদু, সতর্ক করাঘাত শোনা গেল—ঠক্-ঠক্—ঠক্-ঠক্।

দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলেন একটি বলিষ্ঠ পাঠান। দীর্ঘদেহী সুদর্শন যুবক। দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় বুদ্ধির পরিচয় সুপরিস্ফুট।

সুভাষের চোখে-মুখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা। কে এই যুবকটি? কি ওর পরিচয়?

—আমার নাম আব্দুল মজিদ খাঁ। হাসলেন যুবকটি, আমার বড়ভাই আব্দুল কাউম খাঁকে হয়তো আপনি চিনে থাকবেন। তিনি এখানকার মুসলীম লীগ নেতা।

মুসলীম লীগ! নিমেষে দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল সুভাষের। কি ব্যাপার! কি বলতে চায় ও?

—তবে আমি আকবর শার পার্টির লোক। তেমনি করেই

হাসলেন যুবকটি, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। বলে দিয়েছেন,—সব ঠিক আছে। কাল ভোরেই আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। আপনি প্রস্তুত থাকবেন। আমি এখন যাচ্ছি। ফিরে গিয়ে আকবর শার কাছে আবার রিপোর্ট দিতে হবে। আদাব।

কথামতো পরদিন ভোরেই হোটেল থেকে সুভাষকে সরিয়ে নেওয়া হল একটা গোপন আস্তানায়।

কিন্তু তাঁকে কাবুল পর্যন্ত পৌঁছে দেবার সমস্ত দায়িত্ব যিনি স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছেন, সেই দুরন্ত দুঃসাহসী কর্মী কমরেড ভগৎরাম কোথায়? তাঁর সঙ্গে যে একবার দেখা হওয়া প্রয়োজন।

দেখা হল ২১শে জানুয়ারি বিকেল ঠিক চারটেয়। সে কি আনন্দ ভগৎরামের! ইয়া! ইয়া! এই তো শেরকা বাচ্চা আ গিয়া! সব তৈয়ার। এখন শুধু হুকুমের অপেক্ষামাত্র। জান কবুল।

তবু দেরি হল। দেরি হল বেশ কয়েক দিন।

তার কারণও ছিল। ইতিমধ্যে কীর্তি কিষাণ পার্টির তরফ থেকে তাদের পূর্বেকার প্রোগ্রামের কিছু অদল-বদল করা হয়েছে। ঠিক হয়েছে—আগেকার পথের পরিবর্তে সুভাষকে যেতে হবে অন্য একটি নতুন পথ দিয়ে।

এ পথ যেমন দুর্গম, তেমনি বিপদসঙ্কুল। তবু কোন উপায় নেই। খাজুরি ময়দান হয়ে আফ্রিদি এলাকার ভেতর দিয়ে 'শিনওয়ারি' অতিক্রম করে যেতে পারলে দূরত্ব অনেকটা কম পড়বে। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে একটু ঝুঁকি তাঁকে নিতেই হবে।

ফলে মুশকিল হয়েছে ভগৎরামের। আগেকার রাস্তার প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপার ছিল তাঁর নখদর্পণে। কিন্তু এই পথ সম্বন্ধে তিনি ততটা ওয়াকিবহাল নন। সুতরাং সর্বাগ্রে দরকার একজন ভাল গাইড। গাইড ছাড়া এই অচেনা অজানা দুর্গম পথে এক পা-ও এগুনো সম্ভব নয়।

মনটা সায় দেয় না সুভাষের। ইতিমধ্যে তাঁর অন্তর্ধানের খবর পুলিস জেনে ফেলেছে কিনা কে জানে। না জানলেও দু-একদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই জানবে। সে অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁর গতিরোধ করার জন্য তারা তৎপর হয়ে উঠবে, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং দেরি করা কোনরকমেই সঙ্গত নয়।

এমনি একদিনের কথা। রাত তখন অনেক। হঠাৎ কি শুনে দারুণভাবে চমকে উঠলেন সুভাষ। কাদের যেন দূরাগত কণ্ঠ ভেসে আসছে—পাকড়ো! পাকড়ো!

শুনে সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষ ছুটতে শুরু করে দিলেন কোনদিকে দৃকপাত না করে। এ সময়ে কোনমতেই তাঁর ধরা দেওয়া চলবে না। ধরা দেওয়া মানেই তো স্বাধীনতা সংগ্রামকে পিছিয়ে দেওয়া। প্রাণ থাকতে তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

তবু রেহাই নেই। পেছনে পেছনে সমানে তেড়ে আসছে সেই হিংস্র হায়েনার দল। মুখে তাদের সেই একই রব—পাকড়ো! পাকড়ো! ঐ যে পালাচ্ছে! ধরো ওকে!

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল বিরাট একটা ঝাঁকুনি খেয়ে। স্বপ্ন! ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছিলেন এতক্ষণ।

কিন্তু যদি স্বপ্ন না হত! যদি তাঁর সন্ধান পেয়ে সত্যি সত্যিই পুলিস আজ এখানে এসে হানা দিত!

না, আর দেরি নয়। যেভাবে হোক, যে কোন মূল্যে হোক, বিশ্বস্ত একজন গাইড সংগ্রহ করা চাই। অবিলম্বেই চাই। এভাবে আর ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।

গাইড পাওয়া গেল ২৫শে জানুয়ারি বিকেলে। সঙ্গে সঙ্গে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল সর্বত্র। আর দেরি নয়। আজ ২৫শে জানুয়ারি। যাত্রা শুরু হবে আগামী কাল ভোর রাত্রে। স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে।

১৯৪১ সাল। ১৬শে জানুয়ারি।

ভারতের দিকে দিকে সেদিন নবজীবনের সাড়া। সবার কণ্ঠে নতুন শপথ। আজ স্বাধীনতা দিবস। আমরা স্বাধীনতা চাই।

কি আশ্চর্য যোগাযোগ! পেশোয়ার ত্যাগ করে সুভাষ দুর্গম গিরিপথে পা বাড়ালেন কিনা সেই স্বাধীনতা দিবসেরই পুণ্যলগ্নে।

সামনে দুর্ধর্ষ উপজাতীয় এলাকা। জীবন ও মৃত্যুর সেখানে পাশাপাশি বাস। যে কোন মুহূর্তে কিছু একটা বিপদ ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। তবু এ ব্যাপারে তিনি স্থির, দৃঢ়সঙ্কল্প।

স্বাধীনতা শিশুর হাতের খেলনা নয়। চাইলেই তাকে পাওয়া যায় না। তার জন্য চাই শক্তি। চাই সংগ্রাম। চাই ব্যাপক প্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতির জন্যই আজ তাঁর বাইরে যাওয়া প্রয়োজন।

তখনো রাতের অন্ধকার কাটেনি। সবেমাত্র পুব আকাশটা ফর্সা হতে শুরু করেছে একটু একটু করে।

শুরু হল ঐতিহাসিক যাত্রা।

মোট পাঁচজন যাত্রী গাড়িতে। সুভাষ, কমরেড ভগৎরাম, গাইড, আবাদ খাঁ ও ড্রাইভার।

পেশোয়ার মিলিটারি ক্যাম্পের গা ঘেঁষে গাড়িটা ক্রমশ এগিয়ে গেল শহরের সীমানা পেরিয়ে অনেক দূরে। লক্ষ্য—১১ মাইল দূরবর্তী 'খাজুরি ময়দান'।

চারিদিকে ঢেউ-খেলানো উপত্যকা। মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে পাহাড়ী পথ।

পথের দুধারে নানা জাতীয় বুনো ঘাস। কোথাও বা এলোমেলো-ভাবে ছড়িয়ে আছে বড় বড় পাথরের চাঁই।

বহু দূর-দূর আকাশের বুক ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক একটা ছায়া-ছায়া পাহাড়। তখনো তাদের ঘুম ভাঙেনি।

পুব আকাশে নতুন দিনের নতুন সূর্য ওঠে। মনেহয় প্রকৃতির বুকে কে যেন রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে মুঠি মুঠি।

গাড়ি এসে থামল খাজুরি ময়দানে। ড্রাইভার ও আবাদ খাঁকে এখান থেকেই বিদায় নিতে হবে। তারপর শুরু হবে পদযাত্রা।

সামনেই গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে দুটি খাড়া পাহাড়। তারই মাঝের ঢালু জায়গাটা দিয়ে চলে গেছে উঁচু-নিচু পায়ে-চলা পথ।

গাইডের নির্দেশে সেই গিরিপথ ধরেই সুভাষ এবার এগিয়ে চললেন ভগৎরামকে সঙ্গে নিয়ে। বিদায় বন্ধুগণ, বিদায়! তোমরা এবার গাড়ি নিয়ে পেশোয়ার ফিরে যাও। আকবর-শাকে আমার কথা বোল। অনেক ধন্যবাদ তাঁকে।

শুরু হল উঁচু-নিচুর লুকোচুরি খেলা। পথ কখনো উঠছে, কখনো নামছে। দুপাশে প্রায় নিরেট পাথরের প্রাচীর। তারই মাঝ দিয়ে চলে গেছে দুর্গম পাহাড়ী পথ।

সবার আগে গাইড। মাঝখানে সুভাষ। ঠিক পেছনেই অতন্দ্র প্রহরী কমরেড ভগৎরাম।

দুর্ধর্ষ উপজাতীয় অঞ্চল। কখন যে অলক্ষ্য থেকে চোরাগোপ্তা রাইফেলের গুলী ছুটে এসে কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে, কেউ তা বলতে পারে না। এ সময়ে সুভাষকে একমুহূর্তও তিনি তাঁর চোখের আড়াল হতে দিতে রাজী নন।

সুভাষের চোখের তারায় অজ্ঞাতলোকের স্বপ্ন। আরণ্যক পৃথিবীর এ কি ভয়ঙ্কর রূপ! শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে এ যেন এক স্বতন্ত্র জগৎ। বহুদিনের চেনা পৃথিবীর সঙ্গে কোথাও যেন এর এতটুকু মিল নেই।

দেখতে দেখতে প্রকৃতির চেহারাটাই পালটে গেল। শুধু পাথর আর পাথর। রুক্ষ ধূসর পাথর। শক্ত পাথরের ওপর পাথর উঠে গিয়ে নীল আকাশের বুকে মিশে গেছে।

পথ বলেও কিছু নেই। এখানে-ওখানে পাথরের ফাটল দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় বনস্পতির দল। তাদের শাখায় শাখায় জড়াজড়ি। ডালে ডালে জাল বোনা।

মাঝে মাঝে লতাগুলি পরস্পর জড়াজড়ি করে পথকে করে তুলেছে দুর্ভেদ্য। কোথাও নিচু হয়ে, কোথাও বা হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

এখানে-ওখানে ছড়ানো পাথরের চাঁইগুলো রীতিমত বিপজ্জনক। কখন যে পায়ের চাপে হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়বে, কারো পক্ষেই তা বলা সম্ভব নয়।

তাছাড়া যেমন আর্দ্র, তেমনি পিচ্ছিল। প্রায় সর্বত্রই পাথরের গায়ে শ্যাওলা জমেছে। অসম্ভব শ্যাওলা।

তবু সবার সঙ্গে সমান তালে সুভাষ এগিয়ে চললেন চড়াই-উৎরাই ভেঙে।

স্বাধীনতা তাঁর জীবন-স্বপ্ন। সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে করে হোক, সীমান্তের ওপারে তাঁকে যেতেই হবে।

বলা সহজ, কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ নয় মল্লিকা।

ভগৎরাম এবং গাইড, দুজনেই এ পরিবেশে পথ চলতে অভ্যস্ত। পাহাড়ী কামনা আর বাসনা নিয়েই তাঁরা এই অবারিত নীল আকাশের বুকে বড় হয়ে উঠেছেন একটু একটু করে। তাই চলার পথে কোথাও তাঁদের এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। জড়তা নেই। স্রোতস্বিনীর মতোই সহজ, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ তাঁদের গতি।

কিন্তু সুভাষ সম্বন্ধে সে-কথা খাটে না। সমতল ভূমির সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্নিগ্ধ ছায়ায় তিনি মানুষ। এ পথের ভয়ঙ্করতা সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ ধারণাও তাঁর নেই। এ অবস্থায় এই দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়া যে কি কষ্টকর, তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে কল্পনা করাও বুঝি সম্ভব নয়।

তবু সুভাষের পথ চলার বিরাম নেই। ক্লান্তিতে সর্বাঙ্গ ছেয়ে আসছে, আসুক। দেহ টলছে, পা কাঁপছে অসহ্য যন্ত্রণায়, বোবা বুকটা ফেটে পড়তে চাইছে,—যাক। তবু যেতে হবে।

এ আর কতটুকু পথ! এখনো দুস্তর পথ তাঁকে পাড়ি দিতে হবে। শুধু ভাগ্যদেবতাই জানেন, পথের শেষে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করে আছে। আশীর্বাদ, না অভিশাপ!

দুপুরের রোদ চনচনে হয়ে আসে। দিগন্তজোড়া আরণ্যক ভূমি খাঁ খাঁ করছে অসীম শূন্যতায়।

সামনেই উঠে গেছে একটা খাড়া পাহাড়। পাহাড়টা কত উঁচু অনুমান করা শক্ত। কারণ, তার শৃঙ্গটা ঢাকা পড়ে গেছে সাদা বরফের অন্তরালে।

সবাই এসে থামলেন এই পাহাড়ের নিচে। বড্ড ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। একটু বিশ্রাম দরকার।

কিন্তু এ পর্যন্ত কতটা পথ আসা হয়েছে খাজুরি ময়দান থেকে?

মাত্র দেড় মাইল।

দেড় মাইল! কেমন যেন একটা হতাশার সুর বেজে ওঠে সুভাষের কণ্ঠে, মাত্র দেড় মাইল! বর্ডার পার হতে এখনো তাহলে অনেকটা বাকি?

বর্ডার! ভগৎরাম অবাক। বর্ডার তো কখন পেরিয়ে এসেছি!

পেরিয়ে এসেছি! এতক্ষণে সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদ যেন নিমেষে দূর হয়ে গেল সুভাষের। জয় বীরেশ্বর বিবেকানন্দ! অশেষ করুণা তোমার। বিপদ কেটে কেছে।

আলু-সিদ্ধ ও ডিম সহযোগে ভোজন-পর্ব সেরে নেওয়া হল এখানে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম।

বিশ্রাম করার মতো জায়গাই বটে। চারিদিকে অসম্ভব ধরনের নির্জনতা। সবটা মিলিয়ে বিরাজ করছে এক অপার্থিব ধরনের স্তব্ধতা।

এমন কি পাখির কলরব পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে। তদুপরি অদ্ভুত অন্ধকার। মাথার ওপর আকাশ দেখা যায় না। পাহাড়ে পাহাড়ে সব আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পরেই আবার শুরু হল এগিয়ে যাবার পালা। অনেকটা পথ যেতে হবে আজ, তবেই রাত কাটানোর মতো আস্তানা মিলবে। নয়তো পথই একমাত্র ভরসা।

শীতের অপরাহ্ণ। দেখতে দেখতে ধোঁয়ার নিবিড় আস্তরণের মতো ঘন কুয়াশা নেমে এল পাহাড়ের ঢাল গড়িয়ে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন তিনজন। রুক্ষ উঁচু-নিচু বন্ধুর পথ। একটু অসতর্ক হলেই বিপদ। সামান্য এদিক-ওদিক হলে মারাত্মক কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

সূর্য ঢলে পড়েছে উঁচু পাহাড়ের আড়ালে। আলো-আঁধারীর খেলা শুরু হয়েছে পাহাড়ের মাথায় মাথায়, আর চড়াই-উৎরাইয়ের ভাঁজে ভাঁজে। একটু পরেই দিশাহীন প্রান্তরের বুকে নেমে আসবে সন্ধ্যার ম্লান ছায়া।

ঊর্ধ্বশ্বাসে তিনজন এগিয়ে চললেন বড় বড় পা ফেলে। আরো জোরে। আরো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এখনো অনেকটা পথ বাকি। কুইক মার্চ।

দেখতে দেখতে আকাশ থেকে সূর্যাস্তের শেষ রঙটুকু মুছে গেল। প্রান্তরের দিক থেকে নেমে এল নিবিড় অন্ধকারের কালো যবনিকা।

সহসা কি দেখে নিবিড় সংশয় ঘনিয়ে এল ভগৎরামের চোখের তারায়। ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। মনে হয় ঝড় উঠবে। মেঘের কুণ্ডলীতে যেন তারই আভাস।

অনুমান মিথ্যে হল না।

শুরু হল উন্মত্ত হাওয়ার মাতামাতি। গাছপালা সব দুলে দুলে সারা। হাওয়ার বেগে বড় বড় গাছগুলো এক-একবার মাটিতে নুয়ে পড়ে পরক্ষণেই আবার মাথা তুলে উঠতে লাগল আকাশের দিকে।

বিদ্যুৎ চমকে উঠল আকাশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত। ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরপাক খেতে লাগল রাশি রাশি ঝরা পাতা।

পাহাড়ের বুকে মসীকৃষ্ণ অন্ধকার। দুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না।

তদুপরি ধূলি-ঝঞ্ঝা। উদ্দাম বাতাসের ঝাপটায় ছোট ছোট নুড়িগুলো ছিটকে এসে দৃষ্টিকে অন্ধ করে দেয় যেন।

পাহাড়ী এলাকায় ঝড় উঠেছে। দুরন্ত ঝড়।

শুধু পাহাড়ী এলাকায় নয়, কলকাতার বুকেও কিন্তু সেদিন কম ঝড় ওঠেনি মল্লিকা।

পর পর কয়েকটা মামলা ঝুলছে সুভাষের নামে। অবিলম্বে কোর্টে হাজির না হলেই নয়।

কিন্তু কোথায় সুভাষ! আশ্চর্য, কোথাও তিনি নেই। তন্ন তন্ন করে সর্বত্র খোঁজা হয়েছে, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান মেলেনি।

একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ। সুভাষ নিখোঁজ। কি করে এটা সম্ভব হল!

সাদা পোশাকে মোট বাষট্টি জন গোয়েন্দা কর্মচারীকে নিযুক্ত রাখা হয়েছিল তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। তাদের নজর এড়িয়ে কি করে তাঁর পক্ষে অন্যত্র চলে যাওয়া সম্ভব হল! এ যে অভাবনীয়! অকল্পনীয়! অবিশ্বাস্য!

খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গে তার পাঠালেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তার পাঠালেন গান্ধীজী। কোথায় গেল সুভাষ? চিন্তিত আছি। সত্বর তার খবর জানাও।

কি জবাব দেবেন মেজদা শরৎবাবু? বলার আছেই বা কি?

সুবি যে তাঁর বড় আদরের। বড় গর্বের। ব্যথা-বেদনায় বুকটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে চাইলেও যে আজ তাঁকে মুখের হাসি জিইয়ে

রাখতে হবে সর্বক্ষণ। তাই সব কিছু জেনেও বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তাঁকে বলতে হল অন্য কথা।

সাধুসঙ্গের আকর্ষণে গৃহত্যাগ করা সুবির পক্ষে নতুন কিছু নয়। এবারও তেমনি কিছুই একটা হবে হয়তো।

একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা পাঞ্জাবের সর্দার শার্দুল সিং কবি শের-এর মুখে। সুভাষবাবু নিশ্চয়ই কোন উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে গৃহত্যাগ করেছেন। এমনি একটা আভাসই তিনি আমাকে দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে।

ভবী ভোলবার নয়, তাই সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আহত সিংহের অন্তিম আর্তনাদ। শুরু হল ক্ষণে ক্ষণে সতর্ক নির্দেশ।

হ্যালো নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার, হ্যালো পেশোয়ার মিলিটারী ক্যাম্প, হ্যালো সুর্মাভ্যালি লাইট হর্স রাইফেলস, হ্যালো ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস, সরকার বাহাদুরের পয়লা নম্বর শত্রু সুভাষ বোস পালিয়েছে। প্রতিটি ঘাঁটির ওপর কড়া নজর রাখো। কোনরকমেই যেন সে বর্ডার পেরিয়ে যেতে না পারে।

হ্যালো দিল্লী, বম্বে, করাচী, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্ট, প্রতিটি যাত্রীকে ভাল করে ওয়াচ্ কর। প্রতিটি পাস-পোর্ট নতুন করে পরীক্ষা কর। কোনরকম সন্দেহ হলেই আটক করবে।

হ্যালো কোচিন, ভাইজাগ, মাদ্রাজ, ক্যালকাটা, বম্বে, করাচী পোর্ট, প্রতিটি বিদেশী জাহাজ তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান কর। প্রতিটি নৌকার ওপর নজর রাখো। যে করে হোক, সুভাষ বোসকে ধরা চাই-ই।

সব বৃথা। কোথায় সুভাষ বোস! মাত্র ঘণ্টা খানেক আগেই পাখি শিকলি কেটে পালিয়ে গেছে সীমান্তের ওপারে। হাজার হাঁকডাক করলেও আর কোনদিনই তাঁর নাগাল পাওয়া যাবে না।

সামান্য একপশলা বৃষ্টির পরেই অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল বর্ষণস্নাত

আরণ্যক ভূমি। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে উঁকি দিল এক ফালি বাঁকা চাঁদ।

আবার শুরু হল যাত্রা।

চন্দ্রালোকে রহস্যময় বনপথ। দুপাশে বৃষ্টি ধোয়া গাছের সারি। মাঝে মাঝে পাতা থেকে জল ঝরছে টুপ টুপ করে।

যাত্রাবিরতি ঘটল রাত ঠিক বারোটায়। গাঁয়ের নাম 'পিশকান ময়না।' সুভাষ তখন রীতিমত ক্লান্ত। একে পথ-পরিক্রমার ক্লান্তি, তদুপরি অসহ্য শীত। সর্বাঙ্গে সূঁচের মতো বেঁধে যেন।

সামনেই একটা মসজিদ।

এগিয়ে গিয়ে ভগৎরাম এবার তার বন্ধ দরজার গায়ে সন্তর্পণে আঘাত করলেন—ঠুক্-ঠুক্-ঠুক্-ঠুক্!

কিছুক্ষণ বাদেই কে একজন দরজা খুলে দিল ঘুম-ঘুম চোখে।

ভেতরে জন পঁচিশেক লোক। প্রায় সবাই ঘুমে অচেতন মেঝেতে শয্যা পেতে। মাত্র দু-একজন তখনো জেগে রয়েছে প্রচণ্ড শীতের সঙ্গে লড়াই করে।

—আমরা পথিক। পুস্তভাষায় জানালেন ভগৎরাম, পেশোয়ার থেকে আসছি। আজকের রাতটা এখানেই থাকব বলে মনস্থ করেছি। কিন্তু বড় ক্ষুধার্ত। কিছু খাবারের ব্যবস্থা হয় না দোস্ত?

শহর থেকে অনেক দূরে বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে এ যেন এক আলাদা পৃথিবী।

লোকসংখ্যার বেশির ভাগই উপজাতীয়। জাগতিক সুখ-দুঃখের হিসেব-নিকেশ নিয়ে কোনদিনই তারা বড় একটা মাথা ঘামায় না।

সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম, তারপরই একটি পরিপূর্ণ নিটোল ঘুম, এর চাইতে বড় কাম্য বুঝি তাদের কাছে আর কিছুই নেই।

তবুও ভগৎরামের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গেই তারা কিছু 'মেজ'-এর রুটি ও চায়ের ব্যবস্থা করে দিল ক্ষুধার্ত অতিথিদের জন্য। স্বাধীনতা-প্রিয় উপজাতীয়দের কাছে অতিথি সব সময়েই আপন জন।

খাওয়া শেষ। এবার শোবার পালা। দেখতে দেখতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল একে একে।

শুধু ঘুম নেই সুভাষের চোখে। আসা সম্ভবও নয়।

ঘরে একটা মাত্র দরজা, তাও ভেতর থেকে বন্ধ। জানালারও কোন বালাই নেই।

এদিকে শীতের জন্য একপাশে আগুন জ্বলছে গন্‌গন্‌ করে। অসহ্য ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে। চোখ জ্বালা করে। বুক ফেটে যেতে চায়।

বাইরে হাড়-কাঁপানো শীত। বৃষ্টিধারার মতো তুষারপাত চলছে ঝুর ঝুর করে।

সঙ্গী ভগৎরামকে নিয়ে আস্তে আস্তে একসময় বেরিয়ে এলেন সুভাষ। তারপর সেই তুষারপাতের মধ্যেই বড় একটা আলগা পাথরের ওপর চুপচাপ বসে রইলেন বহুক্ষণ পর্যন্ত। ভেতরের ঐ অসহ্য অবস্থার চাইতে বাইরের তুষারপাত অনেক ভাল। অনেক আরামের।

প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল এমনি করেই।

পাহাড়ের বুকে অদ্ভুত কালো মসীকৃষ্ণ অন্ধকার। চারপাশে কেমন যেন অপার্থিব নিস্তব্ধতা। বাতাস স্তব্ধ। প্রাণের সাড়াশব্দও নেই আশে-পাশে।

তদুপরি বড় বড় গাছগুলি অতিকায় দৈত্যের মতো জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে ভয়াল মূর্তিতে। অজ্ঞাতেই যেন বুকটা ছমছম করে ওঠে।

সুভাষ তেমনি নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। দৃষ্টি তাঁর সুদূরে সীমাবদ্ধ। কেমন যেন ধ্যান-মৌন বলে মনে হয় দূরের ঐ ছায়া-ছায়া পাহাড়টাকে।

দূর দিগন্তের সীমারেখায় সে যেন কালের প্রহরী। মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে কোথাও বুঝি তার এতটুকু যোগাযোগ নেই।

মনটা সায় দেয় না ভগৎরামের। সুভাষবাবু এখন আর সুভাষবাবু নন, একজন খাঁটি পাঠান। পাঠানকে পাঠানের রীতিনীতিতেই অভ্যস্ত হতে হবে, নইলে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং তাঁর ঘরে ফিরে যাওয়া উচিত।

যুক্তিটাকে অস্বীকার করতে পারলেন না সুভাষ, তাই আবার তিনি ফিরে গেলেন সেই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে। ভেতরে সেই দম-বন্ধ-করা নিবিড় ধোঁয়ার আস্তরণ। সেই অসহ্য গুমোট। কিন্তু উপায় কি।

ঘণ্টাখানেক বাদেই আবার সুভাষ অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বাইরের খোলা হাওয়ায়। এমনি করে বেশ কয়েকবার।

অসহ্য! অসহ্য! কি যেন একটা নীরব ধ্বংস আর নিষ্ক্রিয় প্রাণহীনতা মুখ বুজে অপেক্ষা করছে ঐ বদ্ধ ঘরটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অনভ্যস্ত জীবনে বেশিক্ষণ তাকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

এমনি করে বারবার ঘর-বার করতে করতেই একসময়ে অন্ধকার তরল হয়ে এল একটু একটু করে। পুব আকাশে দেখা দিল প্রত্যূষের রক্তরাঙা ইশারা।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন সুভাষ। তবু ভাগ্যি যে, কারো মনে কোনরকম সন্দেহের উদ্রেক না করে রাতটা কেটে গেছে। এখন ভালোয় ভালোয় পথে পা দিতে পারলেই হয়।

চা ও পরোটা সহযোগে ব্রেকফাস্ট-পর্ব শেষ হল। এবার যাত্রা শুরু।

কার্যতঃ কিন্তু তা হল না। বরফে বরফে পথ-ঘাট, গাছ-পালা, সব কিছু আচ্ছন্ন হয়ে আছে। যতদূর চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ। আদিগন্ত বরফ।

তদুপরি সেই রক্ত-হিম-করা প্রচণ্ড শীত। এ অবস্থায় বাইরে পা বাড়ানো অসম্ভব।

—তোমরা কোথায় যাবে দোস্ত? প্রশ্ন করল জনৈক উপজাতীয়।

—আমরা! আগ বাড়িয়ে জবাব দিলেন ভগৎরাম, আমরা যাব পাশের গাঁয়ে। ওখানকার লতিফ খাঁ নতুন বাড়ি তুলবেন কিনা!

—কি কাজ কর তোমরা?

—আমরা রাজমিস্ত্রী। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ভগৎরাম, চলি এবার। অনেক বেলা হয়ে গেছে। দেরি হলে আজকের রোজগারটাই হয়তো মারা যাবে।

শুরু হল পথ চলার পালা।

কিন্তু কোথায় পথ! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাঁই একটার ওপর একটা সাজানো। তা থেকে চুইয়ে চুইয়ে জল ঝরছে টপ্ টপ্ করে। সরু সরু অসংখ্য বরফের কাঠি রাস্তার দুধারের দেওয়াল থেকে ঝুলছে। উজ্জ্বল সূর্যালোকে ঝকঝক করছে আয়নার মতো। চোখ ধাঁধিয়ে দেয় যেন।

সবার আগে গাইড। মাঝে সুভাষ। ঠিক পেছনেই ভগৎরাম।

স্বভাবতঃই গতি অনেকটা মন্থর। চারিদিকে তুষারের পাঁচিল। এই তুষার-পাঁচিলের ওপর নানা আকারের বিরাট বিরাট সব বরফের চাঁই বিক্ষিপ্তভাবে আলগা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মনে হয় একটু নাড়া দিলেই সব নেমে আসবে হুড়মুড় করে।

হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! ক্ষণে ক্ষণে গাইডের সতর্ক নির্দেশ শোনা যায়।

এ পথ অতি ভয়ঙ্কর পথ। প্রকৃতি যেন মানুষের জন্য এখানে মরণ-ফাঁদ পেতে রেখেছে। হাতের লাঠি দিয়ে ঠুকে ঠুকে বরফের স্তর পরীক্ষা করে তবেই সাবধানে পা ফেলতে হয়।

কোথায় কোন্ চোরা ফাটল রয়েছে কে জানে! একটু ভুলচুক হলেই তুষার ফাটলের অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে হবে।

এমনি করে পা টিপে টিপে পাশের গাঁয়ে যেতেই বেলা সেই বারোটা।

সুভাষের অবস্থা তখন দস্তুরমত কাহিল। গাইড বা ভগৎরামের কথা আলাদা। তাঁরা এ পথে চলতে অভ্যস্ত।

কিন্তু বিপদ হয়েছে সুভাষের। একে অসহ্য শীত, তদুপরি পথ-ঘাটের এই ভয়ঙ্কর দুরবস্থার ফলে এক পা এগুনোও তাঁর পক্ষে রীতিমত কষ্টকর। তাই অনেক ভেবেচিন্তে এখান থেকে আফগান সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য একটা খচ্চরের ব্যবস্থা করা হল। ভাড়া মাত্র আট টাকা।

ফলে যাত্রীসংখ্যা দাঁড়াল মোট চারজন। সুভাষ, গাইড, ভগৎরাম ও খচ্চরওয়ালা। খচ্চরের পিঠে শুকনো ঘাসের বস্তা। তার ওপরে সুভাষ। এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত।

তবু শেষরক্ষা হল না। বরফ-গলা দুর্গম পিচ্ছিল পথ। যেমন জল, তেমনি প্যাচপেচে কাদা! যে কোন সময়ে পা পিছলে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

অনুমান মিথ্যে হল না। প্রথমেই পা হড়কে পড়ে গেলেন অভিজ্ঞ পথযাত্রী ভগৎরাম। পরক্ষণে নিজে থেকেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন সারামুখে একগাল হাসি নিয়ে। যেন এ একটা মস্তবড় খেলা আর কি।

পরবর্তী পালা খচ্চরওয়ালার। ফল হল মারাত্মক। হাতের দড়িতে টান পড়তেই হঠাৎ খচ্চরটা লাফিয়ে উঠল তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেয়ে। ফলে অপ্রস্তুত সুভাষ সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকে পড়লেন শক্ত মাটির বুকে।

উন্মত্তের মতো ছুটে এসে সুভাষকে তুলে ধরলেন সঙ্গী ভগৎরাম। চোখ-মুখে তাঁর নিবিড় শঙ্কা। যেন আঘাতটা তাঁর গায়েই সব চাইতে বেশি লেগেছে।

না, না, কিছু হয়নি আমার। হাসলেন সুভাষ। সামনে দীর্ঘ

বিসর্পিত বন্ধুর পথ। এই পথই তো এখন একমাত্র সত্য। ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করার মতো অবকাশ এখন কোথায়!

ছত্রিশ ঘণ্টা। দীর্ঘ ছত্রিশ ঘণ্টা এই দুর্গম পথের চড়াই-উৎরাই ভেঙে অবশেষে পরদিন রাত একটায় সবাই গিয়ে হাজির হলেন আফগান রাজ্যের অভ্যন্তরে একটা গাঁয়ে। সেখানে শিনওয়ারি নামক পার্বত্য উপজাতীয়দের বাস।

আশ্রয় মিলল গাইডের পরিচিত একটি লোকের বাড়িতে।

রাত একটা। স্বভাবতঃই সবাই তখন ঘুমে অচেতন। তবু ডাকাডাকি শুনে এগিয়ে এসে অতিথিদের তারা আহ্বান জানাল পরম সমাদরে। খাবার-দাবারেরও কিছুটা ব্যবস্থা হল সঙ্গে সঙ্গেই।

দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার ফলে সুভাষ তখন রীতিমত অবসন্ন। সারাদেহে অসহ্য যন্ত্রণা। মনে হয় কে যেন দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু চুষে নিঙড়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এখন সর্বাগ্রে দরকার একটু পরিপূর্ণ বিশ্রাম। একটি নিটোল ঘুম।

কোথায় বিশ্রাম! কোথায় ঘুম!

সব কিছু ত্যাগ করতে হল খচ্চরওয়ালাটির মুখে একটি অভাবনীয় প্রস্তাব শুনে। হুজুর রাজী থাকলে সে তাঁকে পেশোয়ার-কাবুল রাস্তার সীমানা বরাবর 'গাড়ডি' গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। ভাড়া মাত্র তেরো টাকা।

তবে একটা শর্তে। এখুনি রওনা দিতে হবে। তার পক্ষে দেরি করা সম্ভব নয়।

সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন ভগৎরাম। অত্যন্ত লোভনীয় প্রস্তাব। আর্থিক দিক থেকেও সুবিধেজনক। অবশ্য সুভাষবাবুর খুবই কষ্ট হবে। কিন্তু উপায় কি! এ সুযোগ পরে নাও মিলতে পারে।

পেশোয়ার থেকে আনীত গাইডকে এখান থেকেই ছুটি দিলেন কমরেড ভগৎরাম। বিদায় কমরেড, বিদায়! এবার তুমি পেশোয়ার

ফিরে যাও। কমরেড আবাদ খাঁকে আমার এই চিঠিটা দিও। বোল যে, সব ঠিক আছে। চিন্তার কোন কারণ নেই।

বিশ্রামের আশা ত্যাগ করে আবার খচ্চরের পিঠে আশ্রয় নিলেন সুভাষ। আগে কাজ, তারপর অন্য কথা। এ সময়ে সুখ-সুবিধার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

'গাড়ডি' গ্রাম পাওয়া গেল পরদিন সকাল ঠিক দশটায়। দুর্গম পথের এখানেই শেষ। আর মাত্র খানিকটা যেতে পারলেই পেশোয়ার-কাবুল যাতায়াতকারী সড়ক।

এবার বিদায় নিল খচ্চরওয়ালা। বাকি রইলেন মাত্র দুজন। ভগৎরাম আর সুভাষ।

কিন্তু না, আর ভগৎরাম নয়। সুভাষও নয়। নতুন দেশ। নতুন পরিবেশ। তাই নামটাও নতুন হওয়া দরকার। সুতরাং ভগৎরামের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল এক পাঠান যুবক,—'রহমত খাঁ।' আর সুভাষ হলেন তার চাচা,—'জিয়াউদ্দীন'।

কথাবার্তা এখন থেকে যা কিছু বলা দরকার, সবই বলবেন রহমত খাঁ। কারণ, চাচা জিয়াউদ্দীন শুধু অসুস্থই নন, একাধারে তিনি মূক ও বধির দুই-ই।

খচ্চরওয়ালাকে বিদায় দিয়ে এবার পেশোয়ার-কাবুল সড়ক ধরে দুজনে হাঁটা দিলেন জালালাবাদের দিকে।

এ রাস্তায় মাঝে মাঝে মাল-বোঝাই ট্রাক যাতায়াত করে থাকে। বাসও দু-একটা যায় ক্বচিত কখনো। যা হোক একটা কিছু ধরতে পারলেই এবারের মতো নিশ্চিন্ত।

যেতে যেতে অজ্ঞাতেই কখন সুভাষের মুখ থেকে বেরিয়ে এল ছোট্ট একটি উক্তি,—অপূর্ব! সত্যিই অপূর্ব এই দেশ!

—অপূর্ব! ভগৎরাম অবাক। থাকার মধ্যে তো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে রুক্ষ ধূসর কতকগুলো ন্যাড়া পাহাড়। এ দেখে অমন মুগ্ধ হবার মতো কি আছে!

—তা হোক। রাশি রাশি স্বপ্ন এসে ভিড় করে সুভাষের চোখের তারায়, তবু এ যে স্বাধীন দেশ। স্বাধীন দেশের সব কিছু সুন্দর। তার ধূলি-কণাটুকুও পবিত্র।

সুভাষের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখে বুঝি আর পলক পড়ে না ভগৎরামের। যাঁর সমস্ত অস্থি-মজ্জায়, দেহের প্রতিটি ধূলি-কণায় মিশে রয়েছে এই অকৃত্রিম, অনাবিল, পবিত্র স্বাধীনতার স্বপ্ন, সংসারে কার সাধ্য, তাঁর অগ্রগতি রুদ্ধ করে!

না, কেউ তা পারবে না। আজ হোক, কাল হোক, তাঁর স্বপ্ন সার্থক হবেই। সুভাষবাবু জিন্দাবাদ!

ঘণ্টাখানেক চলার পর এল ছোট গ্রাম 'হারজানাও'। অনেকটা পথ হাঁটা হয়েছে। এবার পথপ্রান্তে বসে একটু বিশ্রাম করা যাক।

কোথায় বিশ্রাম! তার আগেই তাঁদের দেখে পাহাড় বেয়ে নেমে এল এক বিশালকায় পাঠান। কে ভাই তোমরা? কোথায় যাবে?

—আমরা মুসাফির। জবাব দিলেন ভকৎরাম, আর উনি আমার চাচা। কথা বলতে পারেন না। তাই আড্ডাশরীফ যাচ্ছি খোদার কাছে দোয়া চাইবার জন্য। বহুত ভারি বোখার কিনা!

—বহুত আফসোস কী বাত! পাঠানের কণ্ঠে সমবেদনার সুর, তা এসব রোগের কিছুটা ভাল দাওয়াই আমারও জানা আছে। দেখি তো ওর জিবটা।

কি আর করা। বাধ্য হয়েই ভগৎরাম মুখটা হাঁ করে তুলে ধরলেন সুভাষের, আর সেই অবসরে পাঠান তার নোংরা আঙুলটি দিয়ে জিভটা টিপে টিপে দেখতে লাগল পাকা হেকিমের মতো।

—হ্যাঁ, বহুত ভারি বোখার। তবে ভাবনার কোন কারণ নেই। দাওয়াই বাত্‌লে দিচ্ছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রেসক্রিপ্‌সন্‌ জেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে পা চালিয়ে দিলেন সামনের দিকে। মানে মানে সরে পড়াই ভাল। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কখন যে সাপ বেরিয়ে পড়বে তার ঠিক কি!

ঘণ্টাখানেক চলার পরে এল 'বাসোল' গ্রাম। এবার ট্রাক পাওয়া গেল। প্যাকিং করা চায়ের বাক্স বোঝাই-করা ট্রাক। লক্ষ্য তার জালালাবাদ।

ইঙ্গিত করতেই ট্রাকটা থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে উঠে বসলেন প্যাকিং-করা বাক্সগুলোর ওপরে। এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত।

খোলা ট্রাক। তুষার-ছোঁয়া হাওয়া বইছে হু-হু করে। তবু আরাম। তবু নিশ্চিন্ত।

দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় শরীর-মন দুই-ই ক্লান্ত। এবার সব কিছুর ইতি। আর দুর্গম চড়াই-উৎরাই ভাঙতে হবে না পা দুটোকে ক্ষত-বিক্ষত করে। জালালাবাদ এল বলে। আর দেরি নেই।

তবু দেরি হল। স্বয়ং জেলা অফিসার জালালাবাদ যাবেন, কিন্তু তিনি প্রস্তুত নন। সুতরাং ততক্ষণ পর্যন্ত ট্রাক-চালককে অপেক্ষা করতেই হবে। হাজার হোক জেলা অফিসার। তাঁর মর্জি না মেনে উপায় কি!

হুজুর এসে ড্রাইভারের পাশে আসন গ্রহণ করলেন পুরো দুঘণ্টা বাদে। ফলে জালালাবাদ যেতে যেতে রাত সেই দশটা।

পরদিন ভোরেই দুজনে সরাইখানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন আড্ডাশরীফ মসজিদ দর্শন করার জন্য। সেখান থেকে 'লালমা' গাঁয়ে।

ওখানকার হাজি মহম্মদ আমিন ভগৎরামের পূর্ব-পরিচিত লোক। তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে একটু পরামর্শ করা দরকার।

অবশ্য সুভাষের আসল পরিচয় হাজিসাহেবকে দেওয়া হল না। দেওয়া হল, পলাতক একজন বিপ্লবী কর্মী বলে। উদ্দেশ্য,—রুশ দেশে পালিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে হাজিসাহেবের বুদ্ধি-পরামর্শ প্রয়োজন।

শুনে খুশিই হলেন হাজিসাহেব। যেতে চায় তো যেতে পারে। তবে কাবুলের তেরো মাইল আগে 'বুদখাক' চেক-পোস্টটি সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার। ওটা পেরিয়ে যেতে পারলে আর কোন ভাবনার কারণ নেই।

আড্ডাশরীফ থেকে 'লালপুরা'। ভিস্তিওয়ালার সাহায্যে কাবুল-নদী পেরিয়ে আবার শুরু হল এগিয়ে যাবার পালা।

এবার আর হেঁটে নয়, টাঙ্গাতে। লক্ষ্য—'সুলতানপুর'। ওখানে গিয়ে কাবুল-গামী বাস বা ট্রাক ধরতে পারলেই ব্যস্।

কোথায় বাস! কোথায় ট্রাক!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, তবু বাস বা ট্রাক কোনটারই দেখা নেই। ক্রমশঃ সুলতানপুর ছাড়িয়ে তাঁরা আরো অনেকটা দূরে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু ফল দাঁড়াল একই।

অগত্যা একপ্রস্থ চা খেয়ে নিয়ে আবার শুরু হল সেই পদযাত্রা।

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় দুজনেই তখন কাতর। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। পা যেন আর চলতে চাইছে না। তবু এগিয়ে চলার বিরাম নেই। যেতেই যে হবে।

সারাদিন একটানা হাঁটার পর বিকেল পাঁচটা নাগাদ এল 'মিমলা' গ্রাম।

দুজনেই তখন মৃতপ্রায়। পেট জ্বলে যাচ্ছে ক্ষুধার তাড়নায়। মনে হয় সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত চেতনা বুঝি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

অবশেষে দুজনেই পথের একপাশে বসে পড়লেন অপরিসীম ক্লান্তিতে। একটু ক্ষীণ আশা, যদি কোন বাস বা ট্রাক এসে যায়।

এমনি করে কেটে গেল প্রহরের পর প্রহর।

দুচোখে অন্তহীন প্রতীক্ষা নিয়ে ঠায় বসে আছেন দুজন। এরই মধ্যেই কখন একসময়ে নিঝুম ঘুম নেমে এল সুভাষের চোখের পাতায়। অনন্ত নির্ভরতায়। নিশ্চিন্ত আরামে।

এভাবে সুভাষকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে অজ্ঞাতেই কখন মনটা কানায় কানায় ভরে ওঠে ভগৎরামের।

বিপ্লবের পথ কোনদিনই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ-পথ চিরদিনই দুর্গম ও ক্ষুরধার। এ-পথে যারা এসেছে, তাদেরই সর্বাঙ্গে বয়ে গেছে

রক্তের বসুধারা। পদে পদে তারাই হয়েছে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও জর্জরিত।

সুভাষবাবুও তার ব্যতিক্রম নন। শিক্ষা, দীক্ষা, সম্মান, চরিত্র, প্রাচুর্য, কিসের অভাব ছিল তাঁর! কি পাননি তিনি জীবনে!

সারা হিন্দুস্থানের মধ্যে এই একটি মাত্র মানুষ, যাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা ও আপসহীন মনোভাবের কাছে শুধু ইংরেজ সরকার নয়, গান্ধীজীর মতো অমন বিরাট ব্যক্তিত্বকেও থমকে দাঁড়াতে হয়েছে বার বার।

অসীম উপেক্ষায় সব কিছু পেছনে ফেলে এসে আজ সেই মানুষটি কত অসহায়ভাবেই না ঘুমিয়ে পড়েছেন ধূলি-ধূসর এই অচেনা পথের প্রান্তে।

ভারত চিরদিন পরাধীন থাকবে না। একদিন না একদিন স্বাধীনতা সে অর্জন করবেই। সেদিন সুভাষবাবুর এই দুঃসাহসিক একক প্রচেষ্টাকে কোন্ রঙে চিত্রিত করা হবে তা ঐতিহাসিকরাই বলতে পারেন।

তবে সবার অজ্ঞাত, অখ্যাত এই গরীব বান্দা ভগৎরাম বেইমান নয়। দেশের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সুভাষবাবুর আজকের এই ভয়াবহ কৃচ্ছ্রসাধনের কথা তাঁর অন্তরে রক্তের অক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল।

সহসা কল্পনার জগৎ থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে এলেন ভগৎরাম। খাবার চাই। যে করে হোক, কিছুটা খাবার সংগ্রহ করতে হবে।

সামনে কঠিন, কঠোর সংগ্রামের দিন। সুভাষবাবুকেই নিতে হবে সেই মহাযজ্ঞের পৌরোহিত্যের দায়িত্ব।

সেই দুরন্ত সংগ্রামে সিংহের মতো রুখে দাঁড়াতে হলে দেহকে সুস্থ ও সমর্থ রাখা একান্তভাবেই দরকার। সুতরাং নিজের জন্য

না হলেও অন্তত সুভাষবাবুর জন্য কিছুটা খাবারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বেশি দূর যেতে হল না। দু-পা এগুতেই পাওয়া গেল ছোট্ট একটি সরাইখানা। চাইতেই সেখানে খাবার মিলে গেল দুজনের মতো।

খাবার! ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসলেন সুভাষ। তারপরই ভগৎরামের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন অসীম ব্যগ্রতায়। সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় কেটেছে। এ সময়ে এই শুকনো রুটি যে অমৃতের চাইতেও মধুর।

হাতের খাবার হাতেই রয়ে গেল। তার আগেই সহসা কি দেখে সুভাষ চমকে উঠলেন দারুণভাবে।

একি! দূর থেকে ওটা কি এগিয়ে আসছে অজস্র ধূলি উড়িয়ে! ট্রাক! ট্রাক! বহু-আকাঙ্ক্ষিত কাবুলগামী ট্রাক!

নিমেষে প্রস্তুত হয়ে নিলেন দুজন। থাক পড়ে খাবার। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ট্রাক পাওয়া গেছে। এ সুযোগ হারালে চলবে না।

একটানা অনেকক্ষণ চলার পর ট্রাকটা 'গনডামক' গিয়ে থামল রাত ন'টায়। ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে আবার শুরু হল যাত্রা।

রাত দশটায় 'কাবুল মৎ'। আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম। সবশেষে ট্রাকটা যখন তার শেষ গন্তব্যস্থল সেই 'বুদখাক' চেক-পোস্টের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তখন ভোর হতে আর খুব একটা বেশি দেরি নেই।

প্ল্যান মতো ভগৎরাম একাই এগিয়ে গেলেন চেক-পোস্ট অফিসের দিকে। আর এই সুযোগে সুভাষ ড্রাইভারের পেছনে পেছনে দিব্যি চলতে শুরু করে দিলেন হোটেলের উদ্দেশ্যে। যেন ড্রাইভারেরই কোন পার্টনার আর কি।

কোথায় চেক-পোস্ট! কোথায় কি! সবাই ঘুমে অচেতন। কেউ জেগে নেই কাছে-কিনারে। এমন কি কোন পাহারাদার পর্যন্ত নেই।

হাসতে হাসতে ভগৎরামও এবার ফিরে চললেন নির্দিষ্ট সেই হোটেলের দিকে। যাক, বাঁচা গেল। এত সহজে যে চেক-পোস্টের ঝামেলা এড়ানো যাবে, তা কে ভাবতে পেরেছিল।

হোটেলে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে আবার দুজনে টাঙ্গায় চেপে বসলেন সকাল ঠিক ন'টায়। এবারের লক্ষ্য কাবুল শহর। দূরত্ব মাত্র তেরো মাইল।

খুশি ও তৃপ্তির প্রসন্নতায় দুজনেই তখন ভরপুর। পেশোয়ার থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল ২৬শে জানুয়ারি, স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে। আজ ৩১শে জানুয়ারি। দুরন্ত দুর্গম পথের আজই পরিসমাপ্তি। আর বিশেষ বাকি নেই। কাবুল এল বলে।

যেতে যেতে কি ভেবে সুভাষের হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নিয়ে নিজের হাতে বেঁধে নিলেন ভগৎরাম।

চাচাজী একে কালা, তার ওপর আবার বোখারি আদমী। তাঁর হাতে এই মূল্যবান ঘড়ি বড্ড বেমানান। তার চাইতে ওটা ভাতিজা রহমত খাঁর হাতেই থাক। জোয়ান ছেলে। মানাবে ভাল।

কেটে গেল আরো কিছুক্ষণ। তারপর এক সময়ে একটা বাঁক ঘুরতেই সহসা কি দেখে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন ভগৎরাম।

আ গিয়া! আ গিয়া! ওই যে কাবুল দেখা যাচ্ছে। আমরা এসে গেছি!

'শহীদ হরিকিষণ জিন্দাবাদ! তোমাকে আমি ভুলিনি ভাই। কোনদিনও ভুলব না।'

সুভাষকে নিয়ে কাবুলের মাটিতে পা দিতে দিতে অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে মনের মণিকোঠা জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে ভগৎরামের। মনে পড়ে সেই পুরনো দিনের কথা। পুরনো জীবনের ছন্দ।

তারিখটা ছিল ১৯৩০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর।

লাহোর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। পাঞ্জাবের গভর্ণর কুখ্যাত মোরেন্সি এসেছেন সেখানে ভাষণ দিতে। সহসা হরিকিষণের হাতের পিস্তল আগুন ছড়াল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

সঙ্গে সঙ্গে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মোরেন্সি। লুটিয়ে পড়লেন একজন পুলিস ইনস্‌পেক্টর, একজন সাব-ইনস্‌পেক্টর ও দুজন মহিলা। হরিকিষণের অব্যর্থ লক্ষ্য সেদিন কাউকেই রেহাই দেয়নি। সবাইকে রক্ত দিয়ে সেদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল একে একে।

তারপর একদিন শুরু হল বিচারের প্রহসন। যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, কাজেও তাই হল। ইংরেজ বিচারক আদেশ দিলেন—প্রাণদণ্ড, এবং সে আদেশ কার্যকরী হল যথা সময়েই।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীর অন্তিম বাসনা পূর্ণ করা যে কোন সভ্য রাষ্ট্রের রীতি। হরিকিষণের বেলায় তাও হয়নি। এমন কি প্রচলিত ধর্মমত উপেক্ষা করে মুসলমানদের কবরখানায় তাঁর মৃতদেহ সংকার করতেও সেদিন এতটুকু বাধেনি সুসভ্য ইংরেজ সরকারের। প্রমাণ তখনকার সময়ের সংবাদপত্র।

হরিকিষণের অন্তিম অভিলাষ

"আবার ভারতে জন্মগ্রহণ করিতে চাই"

'মিয়ানওয়ালী, ১০ই জুন। হরিকিষণের আত্মীয়গণের সহিত তাহার শেষ সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, গত ৮ই জুন প্রাতে হরিকিষণের আত্মীয়বর্গ মিয়ানওয়ালীতে আসিয়া উপস্থিত হন।···

বেলা ১১-১০ মিনিটের সময় হরিকিষণের আত্মীয়বর্গকে তাহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। সাক্ষাতের সময় জেল দারোগা এবং অন্যান্য জেল কর্মচারীরা তথায় উপস্থিত ছিল।

হরিকিষণকে সমস্ত সময় স্ফূর্তিযুক্ত ও আনন্দিত দেখাইতেছিল।

আত্মীয়গণের সহিত কিছুক্ষণ পারিবারিক কথাবার্তা চলিবার পর তাহার শেষ ইচ্ছা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে কিনা জানিতে চাওয়া হয়।

প্রকাশ, এই প্রশ্নের উত্তরে হরিকিষণ বলেন :—মাতৃভূমির শৃঙ্খল বন্ধন মোচন করিবার জন্য যেন পুনরায় ভারতে জন্মগ্রহণ করি, এই আমার ইচ্ছা। আমি দেশের দীন সেবকমাত্র। যদি আপনাদিগকে আমার মৃতদেহ সমর্পণ করা হয়, তবে শতদ্রু নদীর তীরে যে স্থানে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, সেইস্থানে আমারও যেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।'

মৃতদেহ সৎকার

'হরিকিষণের মৃতদেহ সৎকার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, মিয়ানওয়ালী জেলের পাশেই যেখানে বেওয়ারিশ মুসলমান কয়েদীগণকে কবর দেওয়া হয়, সেইস্থানে গভীর রাত্রিতে কড়া পুলিশ পাহারায় হরিকিষণের মৃতদেহ সৎকার করা হইয়াছে।' [আনন্দবাজার : ১৫ই জুন, ১৯৩১]

বড়ভাই হরিকিষণকে হারিয়ে সেদিন একটি মাত্র শপথবাক্যই বেরিয়ে এসেছিল ভগৎরামের মুখ থেকে। আমি এর বদ্‌লা নেব। এমন বদ্‌লা নেব, যা ঐ দুশমন ইংরেজ জীবনে কোনদিনও ভুলতে পারবে না।

দীর্ঘ এগারো বছর পরে আজ তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে। সুভাষবাবুকে ওদের উদ্ধত থাবার নাগাল থেকে ছিনিয়ে এনে আজ সেই ভ্রাতৃহত্যার তিনি উপযুক্ত বদ্‌লা নিয়েছেন।

প্রথম পর্ব শেষ। এবার সুভাষবাবু কোনরকমে একবার ইয়োরোপের মাটিতে পা দিতে পারলেই, ব্যস্‌। তারপরই শুরু হবে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই। সুভাষবাবু শেরকা বাচ্চা। কি করে জবাব দিতে হয়, তিনি তা ভাল করেই জানেন।

কিন্তু সর্বাগ্রে সুভাষবাবুর জন্য কিছু শীতবস্ত্র কেনা দরকার।

প্রচণ্ড শীত পড়েছে। ঐ সামান্য জামাকাপড় নিয়ে এই দুঃসহ শীতের সঙ্গে লড়াই করা সত্যিই সম্ভব নয়।

বাজার থেকে দুটো রেজাই (লেপ) কিনে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার দুজনে ফিরে এলেন লাহোরী গেটে অবস্থিত তাঁদের সেই নির্দিষ্ট সরাইখানায়।

নামেই সরাইখানা, আসলে দূরাগত উট-ব্যবসায়ীদের রাত কাটানোর মতো সাময়িক একটা আস্তানা মাত্র। যেমন নোংরা, তেমনি দুর্গন্ধ। দেখলেও গা ঘিন ঘিন করে। গা গুলিয়ে ওঠে।

আর খাওয়া! সেদিনের সেই ভয়াবহ কৃচ্ছ সাধনের কথা সুভাষের নিজের ভাষাতেই শোন।

'বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা। দরজা খুলে রাখা গেল না। ঘরের মধ্যে এত ধোঁয়া যে, নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। গোটা কতক শুকনো কাঠ যোগাড় করে আমরা আগুন পোহাবার ব্যবস্থা করলাম। ঠাণ্ডায় আমাদের সমস্ত শরীর জমে গিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় ভগৎরাম বাজার থেকে কয়েকটা মোমবাতি আর সেই সঙ্গে কিছু শুকনো রুটি আর কাবাব কিনে আনল। আমি রুটি খেতে পারছি না দেখে ভগৎরাম আমাকে এককাপ চা এনে দিল। চায়ে রুটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে আমি খেতে লাগলাম।' [হিন্দুস্থান টাইম্স্: ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭ সাল: উত্তমচাঁদ লিখিত ধারাবাহিক রচনা]

কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে পরদিনই সুভাষ রুশ দূতাবাসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন ভগৎরামকে সঙ্গে নিয়ে। যে করে হোক ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবার মস্কো যাবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রথমেই বাধা এল সদর ফটকে অবস্থিত সশস্ত্র প্রহরীদের কাছ থেকে। ইয়োরোপে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। এসময়ে অনুমতি-পত্র ছাড়া কাউকেই ভেতরে ঢুকতে দেওয়া সম্ভব নয়।

নিরুপায় দেখে ভেতরে যাতায়াতকারী প্রতিটি গাড়িকে মাঝপথে থামিয়ে নিজের বক্তব্য বোঝাতে চেষ্টা করলেন ভগৎরাম, কিন্তু তাতেও কিছু সুবিধা হল না। কাবুলে ফার্সী ভাষার প্রচলনটাই সর্বাধিক। ভগৎরামের পুস্তু ভাষা সেখানে কোন কাজেই এল না।

এবার চরম পন্থা অবলম্বন করলেন ভগৎরাম। খোদ এজেন্টকেই তিনি ধরে বসলেন রাস্তার মাঝে তাঁর গাড়ি দাঁড় করিয়ে। নিজের বক্তব্যও বোঝাতে চেষ্টা করলেন কিছুটা, কিন্তু ফল দাঁড়াল একই। প্রত্যুত্তরে দুর্বোধ্য ভাষায় কি একটা কথা বলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন নিজের গন্তব্যপথে। আর ফিরেও তাকালেন না।

তবু হার মানলেন না ভগৎরাম। পর পর তিন দিন তিনি এজেন্সি অফিস, এ্যাম্ব্যাসী অফিস, বিভিন্ন রাশিয়ান অফিসার এবং সবশেষে স্বয়ং রাশিয়ান এ্যাম্ব্যাসাডরের সঙ্গে আলাপ করলেন, তবু কোনদিক থেকে এতটুকু আশার আলো দেখা গেল না। অবস্থা যেমন ছিল, তেমনই রয়ে গেল।

মনে মনে বেশ একটু আহত হলেন সুভাষ। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, আর কেউ না হলেও অন্তত রুশ সরকারের কাছ থেকে সবরকম সহযোগিতা তিনি পাবেনই, কিন্তু কার্যত দেখা গেল ঠিক তার বিপরীত। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এ ব্যাপারে তারা এতটুকুও উৎসাহী নয়।

কি করা যেতে পারে এখন!

যুদ্ধের আগুনে সারা ইয়োরোপ এখন জ্বলছে। স্বভাবতঃই বিভিন্ন রাষ্ট্রের গুপ্তচরদের কাছে খোলা শহর কাবুল এখন স্বর্গভূমি। এ অবস্থায় এখানে বেশিদিন অপেক্ষা করাও যে বিপজ্জনক। কখন কি ঘটে যাবে কে বলতে পারে!

তাছাড়া আফগানিস্থান দুর্বল রাষ্ট্র। তেমন কিছু হলে চাপে পড়ে তারা যে তখন তাঁকে ইংরেজের হাতে তুলে দেবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি!

ভগৎরামের ধারণা কিন্তু অন্যরকম। হাজার চাপ দেওয়া সত্ত্বেও যে আফগানিস্থান ইতিপূর্বে বাবা ঈশ্বর সিং, বাবা পৃথ্বী সিং প্রমুখ পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয়নি, সুভাষবাবুর মতো এক-জন সর্বভারতীয় নেতার বেলায় তারা এতটা অবিবেচক হবে বলে মনে হয় না।

তবু সাবধানের মার নেই। অন্য কথা বাদ দিলেও এ-রাজ্যে তারা অনধিকার-প্রবেশকারী। কোন উপযুক্ত ছাড়পত্রও তাঁদের নেই। সেদিক থেকেই বা বিপদ আসতে কতক্ষণ!

আশঙ্কা মিথ্যে হল না। পঞ্চম দিনেই পেছনে লাগল একটি আফগান গোয়েন্দা-পুলিস। কে এই লোক দুটি? আজ ক'দিন ধরে ওরা এই সরাইখানায় কেন? কি মতলব ওদের? ঠিক হ্যায়, চলিয়ে থানামে।

—সেকি সিপাইজী! বোঝাতে চেষ্টা করলেন ভগৎরাম, আমরা কি চোর, না ডাকাত যে থানায় যাব! দেখতেই তো পাচ্ছ যে, নেহাত দেহাতী আদমী আমরা। অসুস্থ বোবা কালা চাচাজীকে এখানে নিয়ে এসেছি হাসপাতালে ভর্তি করব বলে।

কে কার কথা শোনে! সেই একই কথা সে পুনরাবৃত্তি করতে লাগল বার বার। চলিয়ে থানামে। অবশ্য না গেলেও চলে, যদি—

সুতরাং ছাড়তেই হল ভগৎরামকে দুটি টাকা। নাও, বিদেয় হও। আর যেন জ্বালাতে এসো না এখানে।

কথায় বলে পুলিস। একবার যখন পয়সার স্বাদ পেয়েছে, তখন এ সুযোগ সে ছাড়বে কেন? তাই পরদিনই আবার সে এসে হাজির। চলিয়ে থানামে। দারোগাবাবুর হুকুম।

—দুত্তরি তোর দারোগাবাবুর নিকুচি করেছি। কোনরকমেই নিরস্ত করতে না পেরে এবার রুষ্ট বাঘের মতো গর্জে উঠলেন ভগৎরাম, ঠিক হ্যায়, চল। তবে আমি একা যাব। অসুস্থ চাচাজীকে আমি কিছুতেই নিয়ে যেতে দেব না। জান কবুল।

—এ্যাই দেখ। নিমেষেই চেহারা পালটে গেল পুলিসটির, শুধু শুধু রাগ করছ কেন দোস্ত? আমি কি তাই বলেছি? নেহাত তোমরা গাঁওকা আদমী, তাই মাঝে মাঝে একটু আসি সুখ-দুঃখের কথা বলতে।

—না, তোমাকে দয়া করে আর আসতে হবে না। অপ্রসন্ন মুখে দশ টাকার একটা নোট এগিয়ে দিলেন ভগৎরাম, এই নাও, বিদেয় হও। ফের যদি কোনদিন এখানে দেখতে পাই তো ঠ্যাং ভেঙে দেব, তা মনে রেখ।

—ছিঃ! ছি! লজ্জায় জিভ কাটল আফগান পুলিসটি, হাজার হোক, তোমরা দোস্ত। তোমাদের কাছ থেকে কি এসব নিতে পারি! তবে যদি নেহাত দিতে চাও তো, এমন কিছু স্মৃতি-চিহ্ন দাও, যা দেখে চিরকাল আমি তোমাদের কথা মনে রাখতে পারি।

তীব্র জিজ্ঞাসায় ভ্রূদুটো কুঁচকে ওঠে ভগৎরামের। ওর হাসি ও কটাক্ষ ক্রমেই সর্বনাশের পথ ধরে এগিয়ে আসছে যেন। কি চায় ও!

—চাই তোমার হাতের ঘড়িটা।

ঘড়িটা! ভগৎরাম অসাড়, নিস্পন্দ। বলে কি! পিতৃস্মৃতি বিজড়িত এই সোনার ঘড়িটা যে আসলে সুভাষবাবুর। আর তারই দিকে নজর পড়েছে কিনা এই অর্থপিশাচ, লোভী জানোয়ারটার! এখন উপায়!

সুভাষ নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। কি বলবেন! বলার আছেই বা কি! তিনি যে মূক ও বধির দুই-ই। কিছু বলতে চাইলেই বা বলার সাধ্য তাঁর কোথায়!

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাত থেকে ঘড়িটা খুলে দিলেন ভগৎরাম। সারামুখে তাঁর অপরাধ বোধের গ্লানি। দোষ তাঁরই। সাবধানতা হিসেবে আগে থেকে ট্যাঁকে গুঁজে রাখলে সুভাষবাবুকে আজ এমন করে মূল্যবান ঘড়িটা হারাতে হত না। এ দুঃখ যে জীবনেও যাবার নয়।

রাশিয়ার আশা ত্যাগ করে পরদিনই আবার জার্মান দূতাবাসের দিকে পা বাড়ালেন সুভাষ।

সঙ্গে সেই ভগৎরাম। যা হোক, কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। এতদূর এগিয়ে এসে কোনমতেই পিছিয়ে গেলে চলবে না।

ভগৎরামকে রাস্তায় অপেক্ষা করতে বলে এবার সুভাষ নিজেই ভেতরে ঢুকে গেলেন গট গট করে। কোনদিক থেকেই কোনরকম বাধা এল না। চেষ্টাও করল না কেউ।

দেখা হল খোদ জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। কথাবার্তাও হল। প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গেল যথেষ্ট। তবে এই মুহূর্তে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। সর্বাগ্রে বার্লিন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে সিমেন্স কোম্পানির কাবুল রিপ্রেজেণ্টেটিভ হের টমাসের কাছে গিয়ে মাঝে মাঝে খোঁজ করলেই সব কিছু জানা যাবে।

বাইরে দাঁড়িয়ে অতন্দ্র প্রহরী ভগৎরাম। সহসা কি দেখে সন্দেহের একটা কালোছায়া দুলে উঠল তাঁর চোখের তারায়।

কে যেন একটা লোক তাঁকে লক্ষ্য করছে অদূরে দাঁড়িয়ে। দুচোখে তার হিংস্র হায়েনার দৃষ্টি। কি ব্যাপার!

একটা খণ্ডিত মুহূর্ত। তারপরই কি ভেবে সোজা বাজারের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলেন ভগৎরাম।

সুভাষবাবু ভেতরে রয়েছেন। এখুনি হয়তো বেরিয়ে এসে তিনি ওর মুখোমুখি পড়ে যাবেন। তার আগেই টোপ ফেলে ওকে এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

চালে ভুল হল না। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও এবার এগিয়ে গেল ভগৎরামকে অনুসরণ করে।

কিন্তু সব বৃথা। কোথায় ভগৎরাম! মাঝ-পথে তিনি হাওয়া।

এদিকে জার্মান দূতাবাস থেকে বেরিয়ে এসে সুভাষ অবাক। একি! ভগৎরাম কোথায়!

নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে। নইলে এখানেই তো তাঁর অপেক্ষা করবার কথা ছিল। সরাইখানায় ফিরে যাননি তো?

একটা চাপা উদ্বেগ বুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সরাইখানায় ফিরে এলেন সুভাষ। কিন্তু কোথায় ভগৎরাম!

না, এখানেও তিনি নেই। ঘর বাইরে থেকে তালাবন্ধ। চাবি ভগৎরামের কাছে। সুতরাং ভেতরে যাবারও কোন উপায় নেই।

অনুসরণকারী লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে এ-গলি ও-গলি ঘুরে ভগৎরাম ফিরে এলেন আরো কিছুক্ষণ বাদে, তবু এড়ানো গেল না। একজনকে এড়াতে না এড়াতেই এসে হাজির হল আর একজন: সেই আফগান পুলিস।

—আবার এসেছ কেন? দেখেই ফুঁসে উঠলেন ভগৎরাম, ঘড়িটা নিয়েও বুঝি তোমার ক্ষুধা মিটল না?

—ও তো দারোগাবাবু লে লিয়া। ক্ষোভে দুঃখে চোখে প্রায় জল এসে গেল পুলিসটির—সবই নসীব। নইলে এত কষ্ট করে আমি নিয়ে গেলাম, আর ও কিনা আমার হাত থেকে ওটা ছিনিয়ে নিলে! যাক, পাঁচটা টাকা ধার দাও দেখি দোস্ত। আমি কালই এসে ফেরত দিয়ে যাব।

লোকটাকে বিদায় করে দিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপচাপ বসে রইলেন ভগৎরাম। ভাবনার পর ভাবনা এসে জমতে লাগল মনের কোঠায়। অস্থির চঞ্চল সব ভাবনা।

ওকে আর এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। হাজার হোক পুলিস। পয়সার লোভে আবার ও আসবে। বার বার আসবে।

এদিকে রেডিও ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে সুভাষবাবুর অন্তর্ধানের কথা আজ আর এখানে কারোরই অজানা নেই।

এ অবস্থায় এসব লোককে কাছে ঘেঁষতে দেওয়া অনুচিত। একবার সন্দেহ হলে বিপদ ঘটতে কতক্ষণ !

না, এভাবে আর ঝুঁকি নেওয়াটা ঠিক হবে না। যে করে হোক, এ স্থান ত্যাগ করে অন্য একটা নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় ! কার কাছে !

একই ভাবনা ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকে সুভাষের মনে। এ জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়। কোথায় যাওয়া যায় এখন ! কার কাছে !

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটি পরিচিত মানুষের কথা মনে পড়ে গেল ভগৎরামের।

উত্তমচঁাদ। পেশোয়ারের উত্তমচাঁদ। এককালে তিনি নওজোয়ান সভার একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। জেল-টেলও খেটেছিলেন কিছুদিন। বর্তমানে তিনি কাবুলেই বসবাস করছেন স্থায়িভাবে। তঁার কাছে একবার গেলে কেমন হয় !

অবশ্য কাজটা শক্ত। দীর্ঘকাল দেখাশোনা নেই। কাবুল শহরে কোথায় তিনি রয়েছেন তাই বা কে জানে। তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি ! দেখাই যাক না !

১৩ই ফেব্রুয়ারি। সে কি বিশ্রী দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সেদিন সমগ্র কাবুল জুড়ে। শুধু বরফ আর বরফ। সকাল থেকে ঝুর ঝুর করে ঝরছে তো ঝরছেই। মুহূর্তও বুঝি বিরাম নেই তার।

সব কিছু উপেক্ষা করে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন ভগৎরাম। দৃষ্টি তাঁর দুপাশের দোকানগুলোর দিকে সীমাবদ্ধ।

উত্তমচঁাদকে খুঁজে বের করতে হবে। জানা গেছে শহরের কোথাও নাকি তাঁর রেডিওর দোকান অবস্থিত। পর পর দুদিন

খোঁজ করেও তাঁর কোন হদিস মেলেনি। আজ যে করে হোক, তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। সুভাষবাবুর নিরাপত্তার জন্য সর্বাগ্রে তাঁর সহযোগিতার প্রয়োজন।

বেলা তখন প্রায় দশটা। সহসা কি দেখে থমকে দাঁড়ালেন ভগৎরাম। ঐ তো একটা রেডিওর দোকান। উত্তমচাঁদের নয় তো?

হ্যাঁ, তাই তো। ঐ তো তাঁকে ভেতরে দেখা যাচ্ছে। কত যুগ পরে দেখা, তবু একনজরেই বেশ চেনা যায়।

কিন্তু উত্তমচাঁদ যদি তাঁকে চিনতে না পারেন? যদি আস্থা স্থাপন করতে না পারেন তাঁর কথায়? যদি সব কথা শুনে তাঁকে ফিরিয়ে দেন?

না, তা বলে পিছিয়ে গেলে চলবে না। দেখাই যাক না চেষ্টা করে!

—নমস্তে ভাই সাহেব। পায়ে পায়ে দোকানে ঢুকলেন ভগৎরাম।

—নমস্তে! মুখ তুলে তাকালেন উত্তমচাঁদ। চোখে-মুখে তাঁর সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা। কে এই আগন্তুক?

—আমার নাম ভগৎরাম।

—ভগৎরাম! সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলেন উত্তমচাঁদ। চেনা মুখ। খুবই চেনা। কিন্তু ঠিক যেন স্মরণ হচ্ছে না।

—শহীদ হরিকিষণকে আপনার মনে আছে কি?

—হরিকিষণ! নিমেষে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন উত্তমচাঁদ, পাঞ্জাবের গভর্ণর মোরেন্সিকে গুলি করার মামলায় যাঁর ফাঁসি হয়েছিল—

—হ্যাঁ, তাঁর কথাই বলছি। আমি তাঁর ছোট ভাই—ভগৎরাম।

—ভগৎরাম! সানন্দে অভ্যর্থনা জানালেন উত্তমচাঁদ, হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়ছে। কি আশ্চর্য! আগে বলতে হয় তো। তারপর কি খবর বলুন!

ভগৎরাম বিব্রত। দ্বিধা ও কুণ্ঠায় জড়সড়। সামনেই দাঁড়িয়ে একটি অপরিচিত লোক। তার সামনে এসব কথা বলা সম্ভব নয়।

—দু-কাপ চা নিয়ে এসো তো অমরনাথ। অবস্থাটা বুঝে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই দোকানের বয়টিকে অন্যত্র সরিয়ে দিলেন উত্তমচাঁদ,—নিন, এবার বলুন।

—সুভাষবাবুর অন্তর্ধানের কথা শুনেছেন কি?

—কেন শুনব না? কাবুলে এমন একজন ভারতীয়ও বোধকরি খুঁজে পাবেন না, যিনি এ খবর শোনেননি। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? কি ব্যাপার?

একে একে সব কথাই খুলে বললেন ভগৎরাম। সুভাষবাবু এখানেই রয়েছেন। তিনি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। যে করে হোক, তাঁর জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

উত্তমচাঁদ স্তম্ভিত। উত্তরের আশায় ভগৎরাম তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। কিন্তু কি উত্তর দেবেন তিনি! তার আগে চাই একটু আড়াল। চাই নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হিসেব-নিকেশ করার মতো একটু সময়।

শব্দহীন মন্থরতায় কেটে গেল মুহূর্তের পর মুহূর্ত।

দুজনেই নিঃশব্দ। দুজনেই চুপচাপ। শুধু দোকানের দেয়াল ঘড়িটা একটানা বেজে চলেছে টিক টিক করে।

—কি ঠিক করলেন উত্তমচাঁদজী? হঠাৎ এক সময়ে প্রশ্ন করলেন ভগৎরাম।

—আমাকে একটু সময় দিন ভাইসাহেব। যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন উত্তমচাঁদ, আপনি বিকেল ঠিক চারটের সময় একবার আসুন। আমি ততক্ষণ ভেবে দেখি কি করা যায়।

ভগৎরাম বিদায় নেবার পরে বহুক্ষণ পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন উত্তমচাঁদ। ভাবনার পর ভাবনা। ঢেউয়ের পর ঢেউ। কি করা যায় এখন!

ভাবতে ভাবতে একে একে অনেক প্রশ্নের জটলা এসে ভিড় করে দাঁড়াল উত্তমচাঁদের মনে।

গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যাঁর সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার অর্থই হল জেনে-শুনে মস্তবড় একটা বিপদের ঝুঁকি নেওয়া। তাই বলে নওজোয়ান সভার সদস্য হিসেবে একাজে তাঁকে পিছিয়ে গেলে চলবে না।

জীবিকার প্রয়োজনে ভারতের বাইরে বসবাস করলেও ভারতবাসী হিসেবে তাঁর স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে নিজেরও একটা দায়িত্ব রয়েছে বৈকি।

কিন্তু তাঁর বর্তমান বাসস্থান মহল্লা হিন্দু গুজর অঞ্চলটা পরিবেশের দিক থেকে মোটেই আশানুরূপ নয়। যেমন ঘিঞ্জি, তেমনি অস্বাস্থ্যকর। সুভাষবাবুর মতো লোককে সেখানে রাখা অসম্ভব।

বন্ধু হাজিসাহেবকে একবার বলে দেখলে কেমন হয়?

লোক হিসেবে বরাবরই তিনি ইংরেজ-বিদ্বেষী। তাছাড়া তাঁর বাড়িটাও বেশ বড় এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সেখানে অনায়াসেই তাঁকে রাখা যেতে পারে।

হাজিসাহেব কিন্তু রাজী হলেন না। গেঞ্জী ও মোজার ব্যবসায়ী হিসেবে কাবুলের সর্বত্র তিনি সুপরিচিত। কারখানা নিজের বাড়িতেই। বিস্তর লোকের সেখানে আনাগোনা।

এ অবস্থায় সুভাষবাবুর মতো লোককে তাঁর কাছে রাখা দস্তুরমত বিপজ্জনক। কখন কি ঘটে যাবে কে বলতে পারে!

তবে অন্যান্য ব্যাপারে সুভাষবাবুর জন্য যতটুকু করা সম্ভব, তা তিনি করবেন বৈকি! তিনিও যে ভারতবাসী।

আবার নতুন করে চিন্তার জালে ধরা দিলেন উত্তমচাঁদ। কি করা যায় এখন!

কোথায় রাখা যায় সুভাষবাবুকে! কার কাছে!

শীতের অপরাহ্ন। প্রচণ্ড তুষার-ঝঞ্ঝা চলেছে বাইরে। এমন কি নদীর জল পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে গেছে।

পথঘাট জনমানবশূন্য প্রায়। খুব একটা প্রয়োজন না থাকলে কে আর সখ করে এই দুর্যোগের মধ্যে বেরুতে চায়। যা তুষারপাত চলেছে বাইরে! সর্বাঙ্গে সূচের মতো বেঁধে যেন।

—নমস্তে উত্তমচাঁদজী। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় চারটের সময় দোকানে এসে পা দিলেন ভগৎরাম।

—একাই এসেছেন নাকি? মুখ তুলে তাকালেন উত্তমচাঁদ।

—না, সুভাষবাবুও এসেছেন। ঐ যে উনি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন।

কাছে গিয়ে উত্তমচাঁদ অবাক। একি! এ কোন্ সুভাষবাবু! মুখে একগাল দাড়ি। পরনে নোংরা শার্ট ও সালোয়ার। গলায় ততোধিক নোংরা একটা চাদর। বিশ্বাসই যেন হয় না।

অবশ্য ভগৎরামের মুখ থেকে ইতিপূর্বে সব কিছুই তিনি শুনেছিলেন, তবু দেশের মুক্তির জন্য সুভাষবাবুর এই ভয়াবহ কৃচ্ছ্রসাধনের কথা তাঁর স্বপ্নেরও বুঝি অগোচর ছিল।

—আমার পেছনে পেছনে আসুন। নিমেষে মনস্থির করে নিয়ে বললেন উত্তমচাঁদ, তবে একসঙ্গে নয়। একের পর এক আসুন। নইলে সন্দেহ হতে পারে।

কোনরকমে নিজের বক্তব্য শেষ করে সঙ্গে সঙ্গেই সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলেন উত্তমচাঁদ।

নিরাপদ দূরত্বের ব্যবধান রেখে এবার তাঁকে অনুসরণ করলেন ভগৎরাম। সবশেষে সুভাষ।

একটানা বহুক্ষণ বরফের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার ফলে ইতিমধ্যে কখন যে পা-দুটো অসাড় হয়ে গেছে, টেরই পাননি সুভাষ। টের

পেলেন সামনের পা বাড়াতে গিয়ে। ফলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ছিটকে পড়লেন শক্ত বরফের ওপর।

আবার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, আবার পড়ে গেলেন। এমনি করে বারবার।

হাত-পা ক্ষত-বিক্ষত। ক্ষত-স্থান দিয়ে রক্ত ঝরছে অজস্রধারায়। তবু চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। সঙ্গীরা সবাই এগিয়ে গেছেন। তাঁর পিছিয়ে পড়লে চলবে কেন!

এমনি করে উত্তমচাঁদের বাড়ি।

সুভাষ তখন রীতিমত টলছেন। চোখের সামনে চাপ চাপ অন্ধকার। পরিচিত জগৎটা কেমন যেন একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে, গুলিয়ে যাচ্ছে, মিলেমিশে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে।

ফিরে তাকিয়ে সুভাষের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে দুজনে তাঁকে ধরে নিয়ে গেলেন দোতলায়। ঠাণ্ডায় সর্বাঙ্গ জমে গেছে। গা থেকে ভেজা জামাকাপড় খুলে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ গরম জলের সেঁক দেওয়া দরকার।

উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষার ফলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন সুভাষ। এবার চাই পরিপূর্ণ একটু বিশ্রাম।

কিন্তু কোথায় বিশ্রাম!

হঠাৎ পরিস্থিতি জটিল হয়ে দেখা দিল ছোট্ট একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

রাত তখন প্রায় দশটা।

শিয়রের কাছে রেডিওটা বেজে চলেছে একটানা। বাংলা গান। কলকাতা স্টেশন থেকে কে যেন বাংলা গান গাইছে ভারি মিষ্টি গলায়।

শুনতে শুনতে অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে মনটা কানায় কানায় ভরে ওঠে সুভাষের। বাংলা গান! বাংলা ভাষা! সংসারে কোথাও বুঝি তার তুলনা নেই।

ঘটনাটা ঘটল তখনই।

হঠাৎ কি একটা কারণে একতলার ভাড়াটে রোশনলাল একেবারে বিনা নোটিশে ঘরের মধ্যে এসে হাজির। এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়ে সহসা কি দেখে সারা দেহ তার কেঁপে উঠল থরথর করে।

কে! কে! কে ওখানে বসে রয়েছে অমন করে! এ চেহারা তো কারো ভুল হবার কথা নয়!

একটা বিমূঢ়, নিশ্চল পরিস্থিতি। ঘরের প্রতিটি প্রাণী নির্বাক। সবার চোখে-মুখে নিবিড় সংশয়। এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাব যেন সবাইকে টেনে নিয়ে চলেছে ভয়াবহ এক নির্মম পরিণতির দিকে।

এখুনি একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। রোশনলালকে কিছু বলা দরকার। বোঝানো দরকার।

সব বৃথা। তার আগেই কাউকে কোনরকম প্রস্তুত হবার সুযোগ না দিয়ে রোশনলাল এক লাফে বেরিয়ে গিয়ে সোজা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল তরতর করে। আর ফিরে তাকাল না।

দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে উঠল উত্তমচাঁদের মুখ। রাত এখন অনেক, সুতরাং ভয়ের তেমন কোন কারণ নেই। তবে কাল ভোরে ঘুম থেকে উঠেই সর্বাগ্রে গিয়ে ধরতে হবে রোশনলালকে। যে করে হোক, ওর মুখ বন্ধ করা চাই-ই।

কোথায় রোশনলাল!

পরদিন ঘুম থেকে উঠে উত্তমচাঁদ অবাক। আশ্চর্য, রোশনলাল নেই। কাউকে কিছু না বলে রাতারাতি সে স্ত্রী-পুত্র সবাইকে নিয়ে কোথায় সরে পড়েছে।

বিপদের যেন সুস্পষ্ট পদধ্বনি শুনতে পেলেন উত্তমচাঁদ। না, আর দেরি নয়। বোসবাবুকে যত শীগ্‌গীর সম্ভব এখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। রোশনলালের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য বিপদ ঘটে যেতে কতক্ষণ?

ফলে পরদিনই আবার সুভাষকে পথে পা বাড়াতে হল দুর্দিনের সঙ্গী ভগৎরামকে সঙ্গে নিয়ে।

তবে এবার আর আগেকার সেই লাহোরী গেটের সরাইখানায় নয়, উত্তমচাঁদের পরিচিত অন্য একটা আস্তানায়।

কলকাতা থেকে পেশোয়ার। তারপর পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে কাবুল। এই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে কম ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করতে হয়নি সুভাষকে। কম মূল্য দিতে হয়নি। তবু সুভাষ সুভাষই। তাই সব কিছু উপেক্ষা করে দিনের পর দিন তিনি এগিয়ে গেছেন অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে।

এবার আর কিন্তু তা সম্ভব হল না। হাজার হোক, মানুষের দেহ! কত সহ্য হয়!

ফলে চারদিন যেতে না যেতেই আবার ভগৎরামকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে হল উত্তমচাঁদের কাছে। বোসবাবু অত্যন্ত অসুস্থ। জ্বর এবং আমাশয়, দুটোই চলেছে একসঙ্গে। কি করা যায় এখন!

অনেক ভেবেচিন্তে আবার সুভাষকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন উত্তমচাঁদ। রোশনলালের দিক থেকে ভয়ের তেমন কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। তাহলে এদ্দিনে হুলস্থুল কাণ্ড বেধে যেত এখানে।

তা যখন হয়নি, তখন বুঝতে হবে, ভয় পেয়েই হোক, বা যে কারণেই হোক, রোশনলাল এ সম্বন্ধে কাউকেই কিছু বলেনি।

তবু কোন স্থায়ী সুরাহা হল না। এবার বাদ সাধলেন উত্তমচাঁদ-গৃহিণী স্বয়ং।

কে এই লোক দুটি?

কেন ওরা এখানে রয়েছে?

কি মতলব ওদের?

—ওরা তেমন লোক নয়। সাফাই গাইতে চেষ্টা করলেন

উত্তমচাঁদ,—নেহাত দেহাতী লোক। কেনাকাটার জন্য শহরে এসেছে। দুদিন বাদেই আবার চলে যাবে।

—আমাকে কচি খুকি পেয়েছ নাকি! শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন উত্তমচাঁদ-গৃহিণী, তাই যদি হবে তবে রাত্‌দিন ওদের সঙ্গে অত ফিস্ ফিস্ গুজ গুজ কেন? তাছাড়া সবসময়ে ওদের ঘরের দরজায় বাইরে থেকে শেকল টানা থাকে কেন? নিশ্চয় ওরা কোন ফেরারী আসামী।

—চুপ! চুপ! কাকে কি বলছ? বেগতিক দেখে সব কথাই খুলে বললেন উত্তমচাঁদ, জানো উনি কে? সুভাষ বসুর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। উনিই সেই সুভাষ বসু।

সুভাষ বসু! উত্তম-জায়া অসাড়, নিস্পন্দ।

রাষ্ট্রপতি সুভাষ বসু। আজন্ম-বিপ্লবী সুভাষ বসু। ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক পুরুষসিংহ সুভাষ বসু কিনা আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের এই সামান্য পর্ণকুটিরে! এ আনন্দ, এ গৌরব তিনি রাখবেন কোথায়!

না, আর কোথাও তিনি যেতে দেবেন না সুভাষবাবুকে। যতদিন কাবুলে থাকবেন, ততদিন কষ্ট হলেও এখানেই তাঁকে থাকতে হবে। কিছুতেই তাঁর অন্যত্র যাওয়া চলবে না।

উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবা-যত্নের ফলে দেখতে দেখতেই সুভাষ আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন আগেকার মতো।

এ ব্যাপারে মাকেও বুঝি ছাপিয়ে গেল তাঁর শিশুকন্যাটি। ক্ষণে ক্ষণে সে কি তার সতর্ক শাসন! তোমাকে সবটা খেতে হবে। কিছু ফেলে রাখলে চলবে না।

—কিন্তু আর যে আমি পারছিনে মা-মণি! কাতরতা ঝরে পড়ে সুভাষের কথায়।

—ওমা! বলে কি গো! তোমাকে নিয়ে আর পারিনে বাপু। শীগ্‌গীর খেয়ে নাও বলছি। নইলে আমি কিন্তু ভীষণ রাগ করব।

বাধ্য হয়েই এই স্নেহের আবদারটুকু মেনে নিতে হয় সুভাষকে। উপায় কি! সংসারে মায়েদের চেহারা সর্বত্রই যে এক। এড়াতে চাইলেই কি এত সহজে তাঁদের এড়ানো যায়!

শীতের শেষ। কাবুল-উপত্যকায় বরফ গলতে শুরু করেছে একটু একটু করে।

সুভাষ চিন্তিত। ফেব্রুয়ারি শেষ হয়ে মার্চ এসে গেল, কিন্তু কোথায় কি! কোনদিক থেকেই যেন এতটুকু আশার আলো দেখা যাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে জার্মান রাষ্ট্রদূতের নির্দেশ-অনুযায়ী তাদের সেই চিহ্নিত ব্যক্তি সিমেন্স কোম্পানির হের টমাসের কাছে বারবার খোঁজ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু জবাব পাওয়া গেছে সেই একই। বার্লিন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এখনো পর্যন্ত কোন খবর আসেনি। অপেক্ষা করুন।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন অপেক্ষা করা যায়?

কবে নির্দেশ আসবে কে জানে! আদৌ আসবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে?

না, আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। এবার নিজে থেকেই যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কি করা যায়?

ভাবতে ভাবতে অবশেষে একটা স্থির সিদ্ধান্তের বিন্দুতে এসে দাঁড়ালেন সুভাষ।

অদূরে রুশ সীমান্ত। যে করে হোক, ঐ সীমান্ত অতিক্রম করে তাঁকে রুশ দেশে ঢুকে পড়তে হবে। তার জন্য প্রয়োজন এমন একজন লোক, যে তাঁকে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে সক্ষম।

লোকের সন্ধান দিলেন উত্তমচাঁদ। পেশোয়ারের ইয়াকুব খাঁ, একজন ফেরারী খুনী আসামী। অনেকদিন ধরেই সে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে কাবুলে।

এসব ব্যাপারে আরো বেশি গুণী লোক হল তার শ্যালক। সে শুধু খুনীই নয়, একাধারে খুনী ও ডাকাত দুই-ই। রুশ সীমান্তের ধারেই তার বাস। বোসবাবুর সম্মতি পেলে ঐ মানিকজোড়ের সঙ্গে তিনি একবার কথা বলে দেখতে পারেন।

সম্মতি দিলেন সুভাষ। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, কারো অবদানই তুচ্ছ নয়।

শহরের ডাকসাইটে সিঁদেল চোর গগনের সামান্য অবদানই কি একদিন চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার কাছে অসামান্য হয়ে দেখা দেয়নি? সুতরাং বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এ ক্ষেত্রেও সম্মতি না দেবার মতো কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

সঙ্গে সঙ্গেই ইয়াকুব খাঁ রাজী। সে-ই সুভাষ ও ভগৎরামকে নিয়ে যাবে রুশ সীমান্ত পর্যন্ত। পরের দায়িত্ব তার সেই গুণী শ্যালকের। পারিশ্রমিক মোট সাত শো আফগান মুদ্রা। তার মধ্যে চার শো দিতে হবে অগ্রিম। আর সেই সঙ্গে শ্যালকবাবুর জন্য লুঙ্গি, গেঞ্জি ইত্যাদি সামান্য দু-একটা উপহার সামগ্রী।

দিন ধার্য হল ২৪শে ফেব্রুয়ারি।

এবার যাত্রী-সংখ্যা মোট তিনজন। সুভাষ, ইয়াকুব খাঁ ও ভগৎ-রাম। খানাবাদ পর্যন্ত যেতে হবে বাসে। তারপরই পদযাত্রা।

আগের দিন সকাল থেকেই খাটা-খাটুনি শুরু হল ভগৎরামের। চুক্তিমত আজই ইয়াকুব খাঁকে চার শো টাকা বুঝিয়ে দিতে হবে। বাসের টিকেটও কেটে রাখতে হবে আগে থেকেই।

সবশেষে নিজেদের জন্যও কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র কেনা দরকার। সেই সঙ্গে ইয়াকুব খাঁর সেই গুণী শ্যালকের জন্য লুঙ্গি, গেঞ্জি ইত্যাদি উপহার সামগ্রী।

যাবতীয় কাজকর্ম শেষ করে ডেরায় ফেরার পথে সহসা কি ভেবে সেই হের টমাসের দোকানে ঢুকে পড়লেন ভগৎরাম। দেখা যাক কোন খবর-টবর আছে কিনা।

অবশ্য গিয়ে কোন লাভ নেই। রোজই তো সেই এক কথা, 'বার্লিন থেকে কোন খবর আসেনি।' তবু দেখাই যাক না!

কথাবার্তা শেষ করে একরকম ছুটতে ছুটতেই ডেরায় ফিরে এলেন ভগৎরাম।

খবর আ গিয়া বোসবাবু, খবর আ গিয়া! এক্ষুণি আপনাকে একবার ইতালীয়ান এ্যাম্ব্যাসীতে যেতে হবে। ওদের রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কোরানীর সঙ্গে অবিলম্বে আপনার দেখা হওয়া দরকার। রাত সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করবেন আপনার জন্য।

ভগৎরাম-সহ ইতালীয়ান এ্যাম্ব্যাসীতে যেতেই সাদর সম্ভাষণ জানালেন রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কোরানী। বার্লিন থেকে খবর এসেছে। সিনর বোসের ব্যাপারে তাঁরা সবরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

গোল বেধেছে রুশ সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে। সিনর বোসকে তাঁরা কোনরকম ভিসা দিতে রাজী নন। কারণ, এ নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোনরকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হোক, এটা তাঁদের কাম্য নয়।

অবশ্য এ ব্যাপারে রুশ সরকারের ওপর যথেষ্ট চাপ দেওয়া হচ্ছে। মনে হয় শীগ্‌গীরই এর একটা মীমাংসা হয়ে যাবে। সুতরাং সিনর বোসকে কষ্ট করে আরো কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। আর হ্যাঁ, এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব এখন থেকে ইতালীয়ান এ্যাম্ব্যাসীর, জার্মান এ্যাম্ব্যাসী বা অন্য কারোরই নয়।

কুটনৈতিক আলাপ-আলোচনার জন্য সে রাত্রিটা ওখানেই থাকতে হল সুভাষকে। ভগৎরাম ফিরে এলেন একা। ওদিকে উত্তমচাঁদ পথ চেয়ে আছেন। ফিরে গিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করা দরকার।

পরদিন ভোরেই আবার পড়ি কি মরি করে বেরিয়ে পড়লেন ভগৎরাম।

হাতে বিস্তর কাজ। প্রথমেই যেতে হবে ইয়াকুব খাঁর কাছে। আশ্বাস যখন পাওয়া গেছে, তখন আপাতত রুশ সীমান্ত অতিক্রম করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। টাকা গেছে যাক, তবু খবরটা ইয়াকুব খাঁকে জানিয়ে দেওয়া দরকার।

ওখান থেকে যেতে হবে শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে 'ডারুল আমন' বলে একটা জায়গায়।

ইতালীয়ান এ্যাম্ব্যাসীর সেকেণ্ড সেক্রেটারীর সঙ্গে বোসবাবু ওখানেই এসে অপেক্ষা করবেন বলে ঠিক হয়ে আছে। তাঁকে নিয়ে আসতে হবে।

ডারুল আমন থেকে পায়ে হেঁটে দুজনে যখন ফিরে এলেন, তখন বরফে বরফে গোটা শহরটাই বুঝি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তদুপরি কৃষ্ণ-পক্ষের অন্ধকার। দুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না। তবু আশা ও আনন্দে দুজনেরই মন সেদিন ভরপুর। এতদিন পরে এ ব্যাপারে একটু আশার আলো দেখা দিয়েছে। দেখা যাক, এবার কি হয়।

আবার শুরু হল সেই প্রতীক্ষা। সেই ক্লান্তিকর প্রহর গোনার দিন।

আর কতদিন? কবে খবর পাওয়া যাবে ইতালীয়ান এ্যাম্ব্যাসী থেকে? কবে?

খবর পাওয়া গেল ১২ই মার্চ দুপুরবেলায়।

হঠাৎ সেদিন ইতালীয়ান রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী মিসেস কোরানী উত্তম-চাঁদের দোকানে এসে হাজির। খবর শুভ। রুশ সরকারের অনুমতি মিলেছে। সিনর বোসকে দু-চারদিনের মধ্যেই পাসপোর্ট, ছবি ও পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করে নিতে হবে।

কঠিন সমস্যা। পোশাক-পরিচ্ছদ বলতে সামান্য যা দু-একটা আছে, সবই তো চাচা জিয়াউদ্দিনের গায়ের। এই অল্প সময়ের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করে নেওয়া সম্ভব হবে কি?

—নিশ্চয় সম্ভব। দায়িত্ব নিলেন উত্তমচাঁদের বন্ধু সেই গেঞ্জি ও মোজা-ব্যবসায়ী হাজিসাহেব ও তাঁর জার্মান স্ত্রী। হোক না সময় অল্প, তবু যে করে হোক, বোসবাবুর জন্য এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে হবে।

এবার ফটো তোলার পালা। কিন্তু এ চেহারা তো চলবে না। এ যে চাচা জিয়াউদ্দিন। সুভাষ বোস কোথায়? সুতরাং দীর্ঘদিন বাদে বাধ্য হয়েই আবার সুভাষকে আত্মপ্রকাশ করতে হল জিয়া-উদ্দিনের খোলস ত্যাগ করে।

দেখে দেখে আশা যেন আর মেটে না ভগৎরামের। হ্যাঁ, এই তো আসল সুভাষ বোস! বাঙ্গাল-কা শের সুভাষ বোস! এই না হলে কি বোসবাবুকে মানায়!

শুরু হল সাজ-সাজ রব। সবাই ব্যস্ত। সবাই চঞ্চল। আর দেরি নেই। সময় হয়ে এসেছে।

এই কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু সুভাষ চুপচাপ বসে নেই। এরই মধ্যেই তিনি ইংরেজীতে দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ ও একটি চিঠি লিখে ফেললেন ফরোয়ার্ড ব্লকের অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট পাঞ্জাবের সর্দার শার্দুল সিং কবি শের-এর উদ্দেশ্যে।

প্রবন্ধ দুটি হল 'Gandhism in the light of Hegelian Dialectic' ও 'A Message to my Countrymen.' প্রথমটা পেন্সিলের, পরেরটা কালিতে লেখা।

আর বাংলায় একটা চিঠি লিখলেন মেজদা শরৎবাবুর উদ্দেশ্যে। 'চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি ঠিক আছি।'

১৫ই মার্চ। সুভাষ ও ভগৎরাম সেদিন দুপুরে হাজিসাহেবের বাড়ি নিমন্ত্রিত।

হাজিসাহেব ও তাঁর জার্মান স্ত্রীর একান্ত অনুরোধ, বোসবাবুকে তাঁদের গরীবখানায় একবার পদধূলি দিতে হবে। তাছাড়া কয়েকজন পলাতক বিপ্লবী সেখানে সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন বোসবাবুর সঙ্গে পরিচিত হবেন বলে।

খাওয়া-দাওয়ার পরে শুরু হল আলোচনা-সভা।

শুনতে শুনতে সবাই চঞ্চল। সবাই উদ্দীপ্ত। আমরা আছি। বোসবাবুর এই মহৎ প্রচেষ্টার পেছনে সবাই আমরা আছি। কেউ পিছিয়ে থাকব না আসন্ন সেই মহাসংগ্রামের দিনে।

হঠাৎ সেখানে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলেন উত্তমচাঁদ।

আ গিয়া! আ গিয়া! ফাইনাল খবর আ গিয়া! কাল বোসবাবুর স্যুটকেসটা দোকানে নিয়ে রেখে দিতে হবে। বেলা ঠিক দুটোর সময় এ্যাম্‌ব্যাসী থেকে লোক এসে ওটা তুলে নিয়ে যাবে তাদের জিম্মায়।

পরশুদিন বিকেলে বোসবাবুকে যেতে হবে ইতালীয়ান বন্ধু ক্রেশিনির বাড়িতে। ওখান থেকে তাঁকে ভোর-রাত্রে পাড়ি দিতে হবে যুদ্ধরত ইয়োরোপের উদ্দেশ্যে।

উত্তেজনায় কেঁপে উঠলেন উপস্থিত প্রতিটি প্রাণী। সবার মনে একই কথার গুঞ্জন। বোসবাবুর এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সার্থক হোক! বোসবাবু জিন্দাবাদ!

১৭ই মার্চ। লগ্ন আসন্ন। এবার সুভাষকে বিদায় নিতে হবে উত্তমচাঁদের বাড়ি থেকে।

এক অকথিত ব্যথায় বাড়ির প্রতিটি প্রাণী সেদিন গম্ভীর, করুণ ও স্বল্পবাক্। বোসবাবু চলে যাচ্ছেন। মন সায় দেয় না, তবু তাঁকে যেতে দিতে হবে। মায়ের স্নেহাঞ্চল পর্যন্ত যাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি, তাঁকে ধরে রাখবার মতো সাধ্য তাঁদের কোথায়!

—আবার কবে ফিরে আসবে বল? চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে উত্তমচাঁদের সেই ছোট্ট মেয়েটির।

—কাজ শেষ হলেই ফিরে আসব মা-মণি। আদর করে তাকে কাছে টেনে নিলেন সুভাষ।

উত্তমচাঁদের বাড়ি থেকে হাজিসাহেবের বাড়ি। কাবুল-প্রবাসী এই ভারতীয়দের ঋণ যে কোনদিনই পরিশোধ করা সম্ভব নয়! আজ সবার কাছ থেকে তাঁর সকৃতজ্ঞ বিদায় নেওয়া প্রয়োজন।

সন্ধ্যায় ইতালীয়ান বন্ধু ক্রেশিনির বাড়ি। সঙ্গে সেই ভগৎরাম। নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উত্তমচাঁদ এসে হাজির হলেন কিছু-ক্ষণের মধ্যেই, তবে বেশিক্ষণ রইলেন না। আহারাদি সেরেই আবার তিনি ফিরে গেলেন নিজের আস্তানায়।

রইলেন শুধু ভগৎরাম। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে একটু পরেই আলোচনা-সভা বসবে ; সেখানে তাঁর উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।

শুরু হল আলোচনা-সভা। একথা সেকথার পরে এক এক করে অনেক কিছুই জানতে চাইলেন ইতালীয়ান বন্ধু ক্রেশিনি। সিনর বোস চলে যাবার পরে ইতালীয়ান এ্যাম্‌ব্যাসীর মাধ্যমে কে ভারতের পক্ষ হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন ?

কে এখানে থাকবেন তাঁর প্রতিনিধি রূপে ?

কার সঙ্গে ইতালীয়ান এ্যাম্‌ব্যাসী এ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলবেন ?

প্রশ্ন অনেক, কিন্তু উত্তর একটাই।

ভগৎরাম! ভগৎরাম! ভগৎরাম!

তাছাড়া আসন্ন সংগ্রামের জন্য দুর্ধর্ষ উপজাতীয় সর্দারদের সঙ্গেও এখন থেকে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন এই দুরন্ত দুঃসাহসী সৈনিক ভগৎরাম। ভগৎরাম একাই একশো।

ক্রেশিনির গেস্ট-হাউসেই সে রাত্রিতে শোবার ব্যবস্থা হল দুজনের।

দেখতে দেখতে সুভাষ এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লেন নিঝুম ঘুমের অতলান্তে। ঘুম নেই ভগৎরামের চোখে। রাত্রির বুক চিরে কোথা থেকে ভেসে আসছে একটা করুণ সুর। পাহাড়ের পর পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সেই সুর মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তের বুকে।

মনে পড়ে কত কথা। পেশোয়ার থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল ২৬শে জানুয়ারি ভোর-রাত্রিতে। তারপর একসঙ্গে কতদিন, কত মুহূর্ত, কত দুঃখ, কত আনন্দ-বেদনা, কত সীমাহীন রাত্রি তাঁদের কেটে গেছে একে অন্যকে আশ্রয় করে।

আজ সব কিছুর ইতি। সব কিছুর পরিসমাপ্তি। আবার কোনদিন তাঁরা এমনি করে একই ধারায় এসে মিলতে পারবেন কিনা কে জানে। একমাত্র অনাগত ভবিষ্যৎই তার জবাব দিতে সক্ষম।

তখনো ভাল করে সূর্য ওঠেনি। আলো-আঁধারীতে পথঘাট, গাছপালা, পাহাড়-নদী সব কিছুই রহস্যময়।

ঠিক তখনই ইতালীয়ান এ্যাম্ব্যাসী থেকে একটা গাড়ি এসে থামল ক্রেশিনির বাড়ির সামনে।

মোট চারজন যাত্রী গাড়িতে। ডাঃ ওয়েলগার, একজন জার্মান, একজন ইতালীয়ান ডাক-হরকরা ও ইয়োরোপীয়ান ড্রাইভার নিজে।

বাকি আর মাত্র একজন। সুভাষ নয়। জিয়াউদ্দিনও নয়। সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা। সুভাষের নতুন ইতালীয়ান নাম। পাসপোর্টেও তাই রয়েছে।

সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা-বেশী সুভাষ এবার গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন বড় বড় পা ফেলে। বিদায় বন্ধুগণ, বিদায়! আবার দেখা হবে। দেখা হবে স্বাধীন ভারতে।

শেষপর্যন্ত ভগৎরাম একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন দূরে অপস্রিয়মান গাড়িটার দিকে। বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। মুখে তারই প্রতিচ্ছায়া।

বোসবাবু চলে যাচ্ছেন। শূন্যতার ব্যথা নিয়ে পড়ে রইলেন তিনি একা। কেউ নেই তাঁকে সান্ত্বনা দেবার। কেউ নেই।

বুঝি এক লহমার ব্যাপার, তারপরই আবার নিজেকে শক্ত করে তুললেন ভগৎরাম।

না, কোন দুঃখ নয়। কিসের দুঃখ! এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। তুমি তো সাধারণ লোক নও! স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত তুচ্ছ হৃদয়বৃত্তির অবকাশ তোমার কোথায়!

তাই হোক। তাই হোক। তোমার স্বপ্ন সার্থক হোক। ভারত স্বাধীন হোক। হে স্বাধীনতার অগ্রদূত, তোমাকে শতকোটি নমস্কার।

১৯৪১ সাল। ১৮ই মার্চ।

সবেমাত্র ভোর হয়েছে। রাস্তায় লোক-চলাচল শুরু হয়েছে একটি-তুটি করে।

পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছেন ভগৎরাম। ধীর মন্থর গতি। নীড়-ভাঙা বিহঙ্গের মতো ছন্নছাড়া ভাব।

সব যেমন ছিল তেমনিই আছে। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। সব ঠিক থাকবে। সবই চলবে অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে। নেই শুধু সুভাষবাবু।

প্রায় দেড় মাসাধিক কাল কাবুলে কাটিয়ে একটু আগেই তিনি পাড়ি দিয়েছেন যুদ্ধরত ইয়োরোপের উদ্দেশ্যে। আবার কোনদিন দেখা হবে কিনা কে জানে। আদৌ হবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে!

উত্তমচাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরদিনই ভগৎরাম পা বাড়ালেন হিন্দুস্থানের দিকে।

সুভাষবাবু চলে গেছেন। আপাতত কিছুদিন তাঁর ছুটি। এই ফাঁকে তাঁর নির্দেশমত বাকি কাজগুলো সেরে ফেলা যাক।

প্রথমেই গেলেন লাহোর। ফরোয়ার্ড ব্লকের অ্যাক্‌টিং প্রেসিডেণ্ট সর্দার শার্দূল সিং কবি-শের এখন ওখানেই রয়েছেন। সুভাষবাবুর লেখা জরুরী চিঠিখানি তাঁকে পৌঁছে দেওয়া দরকার।

২৮শে মার্চ লাহোর থেকে কলকাতা। উদ্দেশ্য মেজদা শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করা। সুভাষবাবুর লেখা চিঠি ও মূল্যবান প্রবন্ধ তুটি তাঁকে পৌঁছে দিতে হবে।

তবে এবার আর একা নয়। সঙ্গে এলেন বন্ধু হরমহিন্দর সিং। সুভাষের অন্তর্ধান-পর্বের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক না থাকলেও কীর্তি কিষাণ পার্টির তিনি একজন বিশ্বস্ত কর্মী।

ভগৎরামের মুখ থেকে খুঁটিনাটি সমস্ত বিবরণ শুনতে শুনতে

আনন্দে, আবেগে, গর্বে বার বার চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে শরৎবাবুর।

অজ্ঞাতেই বুকের মধ্যে সেই ছোট্ট নামটি গুন্‌গুনিয়ে ওঠে মিষ্টি সঙ্গীতের মতো। সুবি! সুবি! সুবি!

তাঁর বড় আদরের, বড় গর্বের সুবি। অর্ধেক পৃথিবীর অধীশ্বর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তিকে পর্যুদস্ত করে সে তার আপন লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। এবার শুরু হবে তার আসল সংগ্রাম। দিন আগত ঐ।

—একটা কথা। কুণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করলেন শরৎবাবু, তোমার কি টাকা-পয়সার কিছু দরকার আছে ভাই?

—পেলে ভালই হত। হেসে জবাব দিলেন ভগৎরাম, দুদিন বাদেই তো বোসবাবুর নির্দেশমত আবার আমাকে ছুটতে হবে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে। আমার অবসর কোথায় বলুন?

—ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। হাসতে হাসতে বললেন শরৎবাবু, আশ্চর্য, কথাটা আমার মনেই হয়নি। ওর বৌদিই আমাকে মনে করিয়ে দিলেন। সুবির কথা আমার চাইতে ওর বৌদিই ভাল বোঝেন কিনা।

—আমি জানি। ভগৎরামের চোখে-মুখে মুগ্ধ সম্ভ্রমের বিহ্বলতা, কথায় কথায় বোসবাবু নিজেই একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, আমার যা কিছু আবদার, সবই বৌদির কাছে। তিনি আমার দ্বিতীয় জননী।

শরৎবাবুর নির্দেশে বন্ধু হরমহিন্দর সিংকে নিয়ে এবার ভগৎরাম দেখা করলেন সুভাষের অন্তর্ধান-পর্বের অন্যতম নায়ক বি. ভি.-র দায়িত্বশীল নেতা শ্রদ্ধেয় সত্য বক্সীর সঙ্গে।

সেখানেও সেই একই দৃশ্যের অবতারণা। সেই একই ব্যাকুলতা। সুভাষ ভাল আছে তো? পথে তার কোন কষ্ট হয়নি তো?

—কষ্ট! বড় দুঃখের এক মর্মরাঙা হাসি ফুটে উঠল ভগৎরামের

চোখে-মুখে,—হাঁটা-পথে পেশোয়ার থেকে কাবুলের রাস্তা যে কি দুর্গম, কি বিপদসঙ্কুল, তা আপনাকে বোঝাতে পারব না বক্সীবাবু। অবাক হয়ে ভাবি যে, কি করে এটা বোসবাবুর পক্ষে সম্ভব হল। নেহাত ভগবানের আশীর্বাদ না থাকলে অনভ্যস্ত মানুষের পক্ষে এ-পথ পাড়ি দেবার কথা চিন্তাও বুঝি করা যায় না। ঈশ্বরের অশেষ করুণা যে, কষ্ট হলেও বোসবাবু এ-পথ নির্বিঘ্নেই পেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

—পরবর্তী প্রোগ্রাম কি? জানতে চাইলেন সত্যবাবু।

—কাবুল ফিরে যাওয়া। বার্লিন থেকে বোসবাবুর কোন মেসেজ এলে তা রিসিভ করতে হবে। আর আপনাকে একজন বিশ্বস্ত লোক দিতে হবে আমার সঙ্গে। তার কাজ হবে কাবুল গিয়ে আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে ইতালিয়ান লীগেশন থেকে ধ্বংসাত্মক কার্য-কলাপ পরিচালনা করার মতো উপযুক্ত ট্রেনিং নেওয়া। বোসবাবুর নির্দেশ তাই।

—কবে নাগাত ফিরে যেতে চাও সেখানে?

—খুব শীগ্‌গীরই।

—ঠিক আছে, তুমি ফিরে যাও। আমি শীগ্‌গীরই লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। পেশোয়ারে তোমার সঙ্গে সে মিট্ করবে।

সে সময়ে বি. ভি.-র গোপন কার্যাবলী পরিচালনার ভার ছিল শ্রদ্ধেয় যতীশ গুহর ওপর।

অনতিবিলম্বে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে সুভাষের পরিকল্পনার কথা বুঝিয়ে বললেন সত্যবাবু। কাবুল যাবার জন্য একজন বিশ্বস্ত ছেলে চাই। কাকে পাঠানো যায়।

সহকর্মী কামাখ্যা রায়, বিনয় সেনগুপ্ত, চন্দ্রশেখর সেন, কমেট দাশগুপ্ত প্রমুখ সবাইকে নিয়ে শুরু হল মন্ত্রণা-সভা।

কাকে পাঠানো যায় এ কাজের ভার দিয়ে? অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। বেশ মজবুত ছেলে চাই।

—শান্তিময় গাঙ্গুলীকে পাঠালে কেমন হয়?

—শান্তিময় গাঙ্গুলী! তার মানে—আমাদের চঞ্চল? গুড সিলেকশন। যেমন কর্মঠ, তেমনি বুদ্ধিমান ছেলে। হ্যাঁ, এ কাজের জন্য অনায়াসেই ওর ওপর নির্ভর করা চলে। তাহলে ওকেই পাঠানো যাক।

৪ঠা এপ্রিল তারিখে ভগৎরাম লাহোর ফিরে গেলেন বন্ধু সোদী হরমহিন্দর সিংকে সঙ্গে নিয়ে। সেখান থেকে একাই চলে গেলেন পেশোয়ার।

আগে থেকে একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থানের ব্যবস্থা রাখা দরকার। নইলে সঙ্গীরা গিয়ে আশ্রয় নেবেন কোথায়?

আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন সীমান্ত প্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা সেই আকবর শা,—যিনি সুভাষের এই অন্তর্ধান-পর্বের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। সেখানেই আপাতত আশ্রয় নিলেন ভগৎরাম। এবার সঙ্গীরা এসে গেলে হয়।

খুব একটা দেরি করতে হল না সঙ্গীদের জন্য। ১৭ই এপ্রিল তারিখে লাহোর থেকে এসে গেলেন বন্ধু সোদী হরমহিন্দর সিং। ঠিক তার পরদিনই শান্তিময় গাঙ্গুলী গিয়ে হাজির হলেন পেশোয়ারের সেই গোপন আস্তানায়।

যাত্রা শুরু হল ২১শে এপ্রিল, উষালগ্নে।

এবার আর আগেকার পথ ধরে নয়। যেতে হবে 'মালাকান্দ পাস্'-এর মধ্য দিয়ে অনেকটা পথ ঘুরে। সুভাষের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে এখন থেকেই উপজাতীয় সর্দারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার।

বর্ডার পর্যন্ত যেতে হল টাঙ্গায়।

এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশি সহযোগিতা পাওয়া গেল সীমান্ত-

গান্ধী আব্দুল গফুর খান সাহেবের বন্ধু সমুন্দর খাঁ ও তাঁর ভাইপো জিয়ারতগুলের কাছ থেকে।

জিয়ারতগুল সাহেব নিজেই তাঁদের বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন টাঙ্গাওয়ালার ছদ্মবেশে।

যাত্রী-সংখ্যা মোট চারজন। সমুন্দর খাঁর দেওয়া বিশ্বস্ত গাইড, শান্তিময় গাঙ্গুলী, সোদী হরমহিন্দর সিং ও ভগৎরাম স্বয়ং।

পোশাক-পরিচ্ছদের দিক থেকে সবাই খাঁটি পাঠান। শান্তিবাবুও তাই। কিন্তু দেখে কে বলবে যে, ঐ পোশাক-পরিচ্ছদের আড়ালে যিনি আত্মগোপন করে রয়েছেন, আসলে তিনি একজন আদি ও অকৃত্রিম বাঙালী ছাড়া আর কেউ নন।

বেলা একটা নাগাদ এল 'ডির-চিত্রল' নদী। দড়ির ঝোলায় নদী পার হয়ে আবার শুরু হল দুর্গম পাহাড়ী পথে এগিয়ে চলার পালা। শুধু পথ আর পথ। চড়াই আর উৎরাই।

একটা পাহাড়ী গাঁয়ে রাত কাটিয়ে আবার যাত্রা শুরু হল পরদিন ভোরে। সারাদিন চলার পরে অবশেষে এল 'বারঙ' নামে একটা পাহাড়ী গাঁ।

এ গাঁয়ের আফেন্দি সাহেব হিন্দুস্থানের লোক, তদুপরি ভগৎ-রামের পূর্ব-পরিচিত বন্ধু। সুতরাং আশ্রয়ের জন্য ভাবনা নেই।

পরদিন 'চিনগাই'। সঙ্গে এলেন গত রাত্রির আশ্রয়দাতা ভগৎ-রামের বন্ধু সেই আফেন্দি সাহেব।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে একজন ভারতবাসী হিসেবে তাঁকে পিছিয়ে থাকলে চলবে কেন? সুতরাং আমিও আছি তোমাদের সঙ্গে। চল, কিছুদূর এগিয়ে দিই তোমাদের।

পেশোয়ার থেকে আনা গাইডকে এখান থেকেই বিদায় দেওয়া হল। এবার তুমি ফিরে যাও ভাই। সমুন্দর খাঁকে আমাদের সেলাম জানিও। অনেক ধন্যবাদ তাঁকে।

আশ্রয় নেওয়া হল সোনাবর হোসেনের আস্তানা 'সোয়ান কিল্লায়'।

সোনাবর সাহেব এ অঞ্চলের মুকুটহীন সম্রাট। ইচ্ছা করলে হাজার হাজার দুর্ধর্ষ পাঠান তরুণকে তিনি দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন চোখের নিমেষে।

সুভাষের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে সোনাবর সাহেবের মতো উপজাতীয় সর্দারের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন।

শুনেই লাফিয়ে উঠলেন সোনাবর সাহেব।

ইয়া! ইয়া! এই তো মরদকী বাচ্চার মতো কথা। হ্যাঁ, আমি তৈয়ার। জবান দিচ্ছি, হুকুম পেলে সঙ্গে সঙ্গে আমি দুশমন ব্রিটিশের খুনে পাহাড়ী মাটি লাল করে দেব। জান্ কাবুল!

দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পর অবশেষে ২৬শে তারিখে সবাই গিয়ে হাজির হলেন 'সফী ট্রাইবেল' অঞ্চলে। আশ্রয় নিলেন সোনাবর সাহেবের বন্ধু মহম্মদ কামিল সাহেবের আস্তানায়।

২৭শে তারিখে 'লোহারদের গাঁ'। এখানকার অধিবাসীরা যেমন দুর্ধর্ষ, তেমনি স্বাধীনতা-প্রিয়। বিশেষ করে রাইফেল তৈরি করতে এদের জুড়ি নেই বললেই চলে। লক্ষ্যভেদ করতেও এমন অসাধারণ দক্ষতা সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। এ ব্যাপারে এদের কি ছোট, কি বড়, সবাই প্রায় সমান।

হ্যাঁ, আমরাও আছি। এগিয়ে এলেন ওখানকার প্রতিষ্ঠাবান তরুণ আব্দুল রেজাক সাহেব। কেউ সেদিন পিছিয়ে থাকব না। চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি কিছুদূর পর্যন্ত।

পরদিন 'কুদাখিলা।' এখানকার মিরজান সাহেব অত্যন্ত প্রতাপশালী উপজাতীয় সর্দার। বংশ-পরম্পরায় তিনি ব্রিটিশদ্রোহী। পাহাড়ী এলাকায় কিছু করতে হলে তাঁর মতো লোকের সহযোগিতা অপরিহার্য। তাঁকে চাই-ই।

একই কথা শোনা গেল মিরজান সাহেবের মুখ থেকে। হ্যাঁ, আমি তৈয়ার। শুধু হুকুমের অপেক্ষা মাত্র। হুকুম পেলে সঙ্গে সঙ্গেই—ব্যস্।

এখান থেকেই ফিরে গেলেন ভগৎরামের বন্ধু সেই আফেন্দি সাহেব ও লোহারদের গাঁয়ের তরুণ সর্দার আব্দুল রেজাক সাহেব।

বাকি রইলেন মোট চারজন। ভগৎরাম, সোদী হরমহিন্দর সিং, শান্তিময় গাঙ্গুলী আর আফেন্দি সাহেবের দেওয়া একজন নতুন গাইড।

পথে নানা জায়গায় যোগাযোগ স্থাপন করে অবশেষে একদিন হাজির হলেন আফগান সীমান্ত-বরাবর একটা গাঁয়ে।

এবার বিপদ হল শান্তিবাবুর দিক থেকে। এতদিন তারুণ্যের শক্তিতে সব কিছু অগ্রাহ্য করে এলেও এবার আর তিনি কিছুতেই পারলেন না তার অনিবার্য পরিণামকে ফাঁকি দিতে।

দেখা গেল, দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার ফলে ইতিমধ্যেই তাঁর পা দুটো বিষাক্ত-ক্ষতে একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় পথ-চলা তো দূরের কথা, উঠে দাঁড়ানো পর্যন্ত কষ্টকর।

বাধ্য হয়েই একটি খচ্চর ভাড়া করতে হল শান্তিবাবুকে বহন করার জন্য। তাছাড়া উপায় কি! কাজ তো আর ফেলে রাখলে চলবে না! যে করে হোক, যেতেই যে হবে।

বেলা তিনটে নাগাদ এল কাবুল সড়ক।

নতুন গাইডটিকে এখান থেকেই বিদায় দেওয়া হল। আশ্রয় নেওয়া হল একটা কালভার্টের নিচে, ধূলিশয্যায়। কোন দুঃখ নেই। অত ভাল-মন্দ দেখার মতো অবকাশ তখন কোথায়? যেখানে হোক, আশ্রয় হলেই হল।

পরদিন সকাল আটটায় জালালাবাদ। আর ভয় নেই। দুর্গম পাহাড়ী পথের এখানেই শেষ। এবার কাবুলগামী একটা বাস বা ট্রাক ধরতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

—এই সেই জালালাবাদ। বললেন ভগৎরাম, এখানেই বোসবাবু রাত কাটিয়েছিলেন। এই বাড়িতে।

—এই বাড়িতে। মুগ্ধ অপলক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন

শান্তিবাবু। মহান বিপ্লবীর পদস্পর্শে ধন্য এ বাড়ি যে তাঁর কাছে তীর্থভূমি। এর ধূলিকণাটুকুও যে তাঁর কাছে পবিত্র।

জালালাবাদ থেকে টাঙ্গায় সুলতানপুর। সেখান থেকে ট্রাক ধরে ১লা মে তারিখে সোজা কাবুল।

'সরাই জাজিয়ান'-এর একটা আস্তানায় অসুস্থ শান্তিবাবু ও সোদী হরমহিন্দর সিংকে রেখে সঙ্গে সঙ্গে ভগৎরাম পা বাড়ালেন উত্তমচাঁদের বাড়ির দিকে।

অনেকদিন দেখা নেই। সর্বাগ্রে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এখানকার বর্তমান পরিস্থিতিটা একটু যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন।

—আসুন। আসুন। ভগৎরামকে দেখেই সানন্দে অভ্যর্থনা জানালেন উত্তমচাঁদ, কবে ফিরলেন হিন্দুস্থান থেকে?

—আজই, একটু আগে। আসন গ্রহণ করে বললেন ভগৎরাম, তারপর, এখানকার খবরাখবর কি বলুন?

—খবর ভালই। ২৮শে মার্চ তারিখে বোসবাবু নির্বিঘ্নে বার্লিন পৌঁছে গেছেন। ওখান থেকে যে সব ম্যাগাজিন এসেছে তাতেই এ খবর বেরিয়েছে। ছবিও ছেপেছে। তাছাড়া হাজিসাহেবের বাড়ির ঠিকানায় তাঁর চিঠিও এসেছে। সুতরাং সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত। ভাবনার কারণ ঘটেছে অন্যদিক থেকে।

—কি রকম? অলস দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ভগৎরামের।

—ক'দিন আগে একজন উচ্চপদস্থ আফগান গোয়েন্দা কর্মচারী এসেছিলেন আমার কাছে খোঁজ-খবর নিতে। তাঁর ধারণা, আমাদের এই মহল্লায় নাকি হিন্দুস্থানের একজন নামকরা বিপ্লবী-নেতা ও তাঁর একজন সঙ্গী কিছুদিন আগে পর্যন্ত আত্মগোপন করে ছিলেন। কোথায়, কোন্ বাড়িতে, কার কাছে—এইসব নানারকম জেরা আর কি!

—আপনি কি বললেন? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ভগৎরাম।

—স্রেফ অস্বীকার করলাম। কিন্তু কে কার কথা শোনে!

ঘুরে ফিরে সেই একই কথা। একই প্রশ্ন। পরেও কয়েকবার এসেছিলেন সন্ধান নিতে। তবে সন্দেহ হলেও এখনো পর্যন্ত সঠিক কিছু আঁচ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

—পলাতক বিপ্লবীটির নাম-ধাম বলেছেন কিছু?

—না, তা বলেননি। ইচ্ছা করেই তাঁর নাম তিনি চেপে গেছেন। তবে সঙ্গীটির নাম বলেছেন।

—কি নাম বলেছেন?

—ভগৎরাম।

—জেনে গেছে তাহলে। সশব্দে হেসে উঠলেন ভগৎরাম, কোই বাত নেহি। যানে দিজিয়ে।

—হাসির কথা নয় ভাইসাহেব। সংশয়ভরে বললেন উত্তমচাঁদ, জানাজানি যখন হয়ে গেছে, তখন একটু হুঁশিয়ার থাকবেন।

—বেশ, তাই থাকব। হাসতে হাসতে জবাব দিলেন ভগৎরাম, তবে নিশ্চিন্ত থাকুন যে, ভগৎরামকে গ্রেপ্তার করার মতো গোয়েন্দা তামাম দুনিয়াতে আজও কেউ জন্মায়নি। কাজেই তার প্রমাণ পাবেন। যাক, আমি এবার চলি ভাইসাহেব। নমস্তে।

এবার ভগৎরাম গিয়ে দেখা করলেন ইতালীয়ান বন্ধু সেই মিঃ ক্রেশিনির সঙ্গে। বোসবাবুর নির্দেশমত কলকাতা থেকে লোক এসে গেছে। পরবর্তী প্রোগ্রাম কি বলুন।

ইতালীয়ান এ্যাম্ব্যাসীর মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে সে খবর পৌঁছে গেল বার্লিনে অবস্থিত সুভাষের কাছে।

'হ্যালো সিনর বোস…আমি কাবুলের ইতালীয়ান এ্যাম্ব্যাসী থেকে কথা বলছি।…কলকাতা থেকে লোক এসেছে। পরবর্তী নির্দেশ চাই।'

যথাসময়ে বার্লিন থেকে ইথার-তরঙ্গে ভেসে এল সেই তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর: 'আমি সুভাষ বলছি।'

সিনর বোস! সিনর বোস! সাড়া পড়ে গেল ইতালীয়ান

দূতাবাসের সর্বত্র। সিনর বোস কথা বলছেন। কথা বলছেন সুদূর বার্লিন থেকে।

'কলকাতা থেকে যিনি এসেছেন, তাঁর নাম কি? সত্য বক্সী জেলের বাইরে আছেন তো? সত্যবাবুর বন্ধুদের মধ্যে কেউ গ্রেপ্তার হয়েছেন কি? হয়ে থাকলে তাঁদের নাম কি?'

শান্তিবাবুর পায়ের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়, তাই তাঁর পক্ষে ইতালীয়ান এ্যাম্‌ব্যাসীতে গিয়ে জবাব দেওয়া সম্ভব হল না। জবাব দিলেন তাঁর লিখিত বক্তব্য অনুযায়ী রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কোরানী স্বয়ং।

'সত্য বক্সী এখনো ধরা পড়েননি। তাঁর বন্ধুরাও কেউ গ্রেপ্তার হননি। অস্ত্রশস্ত্র…অন্যান্য সাজসরঞ্জাম…এবং কর্মনির্দেশ চাই। পার্বত্য এলাকায় কর্মী ও সর্দারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে… সবাই আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে।'

উত্তরে আবার ভেসে এল সুভাষের সেই পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠ:

'অক্ষশক্তির সঙ্গে এখনো আমার কোন রাজনৈতিক বোঝাপড়া হয়নি। অবশ্য কোনরকম বোঝাপড়া না করেই তারা আমাকে সব রকম সাহায্য দিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমি তা মেনে নিতে রাজী নই। স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধিরূপে আমাকে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই একটু অপেক্ষা করতে হবে। তবে বার্লিন রেডিও থেকে শীগ্‌গীরই হয়তো আমি দেশবাসীকে আমার বক্তব্য শোনাতে পারি।'

মহা গুরুত্বপূর্ণ সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের জবাবে শান্তিবাবুর নির্দেশমত রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কোরানী জানালেন:

'আমরা অপেক্ষা করব।…আফগান পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্রোহের জমি খুব উর্বর হয়ে আছে। আপনার সফল অন্তর্ধানে প্রচুর আশা ও সম্ভাবনায় উৎফুল্ল ভারতের জনসাধারণ বিপ্লবান্মুগ হয়ে উঠেছে।'

শান্তিবাবু একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই ইতালীয়ান লীগেশনের তরফ

থেকে একটা গোপন বৈঠক ডাকা হল কাবুল থেকে পঁচিশ মাইল দূরবর্তী 'পাঘমন'-এর একটি পার্বত্য স্বাস্থ্য-নিবাসে। রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কোরানী, মিসেস কোরানী, আনজোলোটি, শান্তিবাবু, ভগৎরাম প্রমুখ সবাই গিয়ে সেখানে হাজির হলেন একে একে। কেউ বাদ নেই।

পরিচয় করিয়ে দিলেন ভগৎরাম। ইনি শান্তিময় গাঙ্গুলী। বোসবাবুর নির্দেশমত ইনিই সম্প্রতি কাবুলে এসেছেন কলকাতা থেকে।

সবাই খুশি হলেন শান্তিবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে। স্বাস্থ্য ও বুদ্ধির দীপ্তিতে উচ্ছল প্রাণবন্ত যুবক। মনে হয়, ট্রেনিংয়ের কাজটা খুব অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আয়ত্ত করে নিতে পারবেন।

আরো কয়েকবার বৈঠক ডাকা হল এমনি করে। কিন্তু কোথায় ট্রেনিং! কোথায় কি! সবাই চুপচাপ। সবার চোখে-মুখেই কেমন যেন একটা সন্ত্রস্ত ভাব।

বেশ বোঝা যায় যে, গুরুতর রকম কিছু একটা ঘটেছে। বাইরে কোন প্রকাশ না থাকলেও তার ভেতরের উত্তাপটা যেন সহজেই অনুমান করা যায়।

কেটে গেল দীর্ঘ একমাস, কিন্তু অবস্থার এতটুকুও পরিবর্তন দেখা গেল না। বরং যুদ্ধ-পরিস্থিতির চাপে কাবুলের ইতালী ও জার্মান এ্যাম্ব্যাসী কেমন যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল ইয়োরোপ থেকে। সবাই নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। এমনকি সুভাষের দিক থেকেও নতুন আর কোন খবরাখবর নেই। নেই কোন পথ-নির্দেশের ইঙ্গিত।

কোনদিক থেকে কোনরকম সাড়া-শব্দ না পেয়ে অবশেষে তিনজনেই আবার পাড়ি জমালেন হিন্দুস্থানের দিকে।

ঠিক হল, আপাতত একা উত্তমচাঁদই যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন ইতালীয়ান এ্যাম্ব্যাসীর সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গেই সবাই আবার পা বাড়াবেন কাবুল উপত্যকার দিকে।

নইলে তিনটি ভিন্‌ দেশীয় তরুণের পক্ষে দিনের পর দিন কাবুলে অবস্থান করাটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

যুদ্ধ-পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। তদুপরি কাবুলে বসবাস করার মতো উপযুক্ত ছাড়পত্র বা ভিসাও তাঁদের নেই। এ অবস্থায় কখন যে কোন্‌দিক থেকে বিপদ আসবে, তা কে বলতে পারে!

কেটে গেল আরো কয়েক মাস।

ইতিমধ্যে দু-তিনবার লাহোর গিয়ে ভগৎরামের সঙ্গে দেখা করলেন শান্তিবাবু, কিন্তু ফল দাঁড়াল সেই একই। কোন খবর নেই। কাবুল থেকেও কোন খবর আসেনি।

সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলেন সত্য বক্সী প্রমুখ বি. ভি.-র কর্মকর্তাগণ।

কি ব্যাপার! মনে হয়, কোথায় যেন একটা জটিল অঙ্কের প্রশ্ন-উত্তর সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। নইলে এমন তো হবার কথা নয়!

অবশেষে বিয়াল্লিশ সালের জানুয়ারি মাসে আবার শান্তিবাবুকে পাঠান হল খবর সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে।

নিশ্চয় কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। নইলে এই বেমানান নিঃশব্দতার কারণ কি? পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টিই বা এমন নীরব কেন?

রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হল লাহোরে গিয়ে। কীর্তি কিষাণ পার্টির নেতৃবৃন্দ এবার খোলাখুলিভাবেই ব্যক্ত করলেন তাঁদের মনের কথা।

জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করেছে, সুতরাং ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির মতে এ যুদ্ধ এখন জনযুদ্ধ। কীর্তি কিষাণ পার্টিও সেই নীতিতে বিশ্বাসী।

এ অবস্থায় ইংরেজের সঙ্গে আর বিরোধ নয়। বরং তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কি করে সেই ফ্যাসিস্টবাদকে উৎখাত করা যায়, এখন থেকে তাই হবে তাদের প্রধান কাজ। কাজেই, সুভাষ বোস বা তাঁর

কার্যাবলীর সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখা এখন থেকে আর তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন শান্তিবাবু।

যে কীর্তি কিষাণ পার্টি প্রথম থেকেই সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের ব্যাপারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, আজ তাদের এ কি বিচিত্র মনোভাব!

মানলাম যে, জার্মানরা রাশিয়া আক্রমণ করেছে, তা বলে মাত্র গতকালও যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ছিল আমাদের সবচাইতে ঘৃণ্য শত্রু, আজ রাতারাতি সে আমাদের মিত্র হয়ে গেল কোন্ যুক্তিতে? ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলানোর অর্থ কি সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করা নয়?

—আপনার কি অভিমত ভাইসাহেব? ভগৎরামকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন শান্তিবাবু।

—আমাকে মাপ করবেন ভাইসাহেব। একটা প্রচ্ছন্ন মর্মবেদনা ফুটে উঠল ভগৎরামের কণ্ঠে, পার্টির নির্দেশ আমাকে মানতেই হবে। তবে ব্যক্তিগতভাবে এসব ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে আমি জড়াতে অনিচ্ছুক। যারা আমার ভাইকে ফাঁসি দিয়েছে, তাদের সঙ্গে কিছুতেই আমি হাত মেলাতে পারব না। কোনমতেই না। আমি তাদের দুশমন। দুশমনই থাকব চিরদিন।

সঙ্গে সঙ্গে লাহোর ত্যাগ করে কলকাতার দিকে পাড়ি দিলেন শান্তিবাবু। আর দেরি নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতা ফিরে গিয়ে পার্টিকে খবরটা জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

তবু কিছুতেই কিছু হল না। কীর্তি কিষাণ পার্টির অসহযোগিতার জন্য হোক, বা যে কারণেই হোক, অনিবার্য দুর্যোগকে এবার আর কিছুতেই এড়ানো গেল না।

ফলে, এতদিন হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও পুলিস যে রহস্যের কিনারা করতে পারেনি, এবার আর তাদের কাছে কোন কিছুই অজানা রইল না।

স্পষ্ট তাদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল বি. ভি.-র অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত তরুণদের সেই উন্নত, বেপরোয়া, আগুন-ঝরানো মুখগুলি।

সত্য বক্সী, যতীশ গুহ, কামাখ্যা রায়, সত্যব্রত মজুমদার, বিনয় সেনগুপ্ত, শান্তিময় গাঙ্গুলী, ধীরেন সাহারায়, সুবোধ চক্রবর্তী, রাতুল রায়চৌধুরী, জগদীশ সেন, জিতেন সরকার, নীরেন রায়, সুধীর বক্সী প্রমুখ কেউ সেই তালিকা থেকে বাদ গেলেন না। একটি প্রাণীও না।

বাদ গেলেন না কাবুলের উত্তমচাঁদ, ভগৎরাম, বি. ভি.-র শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রবীণ নেতা চট্টগ্রামের মনিরজ্জুমান ইসলামা বাদি সাহেবের মতো পরিচিত নামগুলিও।

শুধু তাই নয়। উপজাতীয় এলাকায় প্রস্তুতির কথাও এবার তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল দিবালোকের মতো। ফলে, এতদিনের এত প্রচেষ্টা, এত পরিশ্রম, সব কিছুই গেল বিপর্যস্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আকস্মিক আক্রমণে।

প্রথমেই আটক করা হল বি. ভি.-র দায়িত্বশীল নেতা সত্য বক্সী ও যতীশ গুহকে।

ওদিকে ধরা পড়লেন কাবুলের উত্তমচাঁদ। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হল কাবুল থেকে।

রেডিওর ব্যবসাও সেইখানেই শেষ। প্রায় লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র জলের দামে বিক্রি করে দেওয়া হল নিলাম ডেকে। সর্বস্ব খুইয়ে শেষপর্যন্ত বন্দিনিবাসে।

একদিন দুদিন নয়, জীবনের অনেকগুলো বছরই তাঁকে কাটাতে হল নির্জন সেই লৌহকপাটের অন্তরালে।

একমাত্র ব্যতিক্রম ভগৎরাম। আশ্চর্য, কোথায় যে তিনি ডুব দিলেন, হাজার চেষ্টা করেও কেউ তাঁর কোন হদিস পেল না। যেন হাওয়ায় মিশে গেলেন মানুষটা।

সত্য বক্সী ও যতীশ গুহর কথা আগেই বলেছি। এবার এগিয়ে এল মিলিটারী বাহিনী। দাবি তাদের খুবই সামান্য। কি করে মানুষকে শায়েস্তা করে পেটের কথা বের করতে হয় সে-সব কায়দা-কানুন পুলিশের চাইতে আমরাই ভাল করে জানি। সুতরাং বন্দীদের আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক!

তথাস্তু! সঙ্গে সঙ্গেই দুজনকে দিল্লীর লালকেল্লায় ঠেলে দেওয়া হল হিংস্র দানবের উদ্যত থাবার সামনে। তারপর যা হল তা সহজেই অনুমেয়।

অহঙ্কার ওদের মিথ্যে নয়। কায়দা-কানুন সত্যিই ওদের অসাধারণ। এমন নির্মম, অমানুষিক নির্যাতন একমাত্র ওদের পক্ষেই বুঝি সম্ভব। কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে তা কল্পনা করাও কঠিন।

—চুপ করে রইলে কেন? ভাল চাও তো এখনো বল! বল সুভাষ বোসকে তোমরা কোথায় পাঠিয়েছ? বলবে না? সিপাই, চালাও!

নির্যাতনের যত রকম পন্থা আছে কিছুই তার বাদ গেল না।

ডাণ্ডা পেটাই, কম্বল ধোলাই, আঙুলে পিন ফোটানো, মলদ্বারে রুল ঢোকানো, সবই প্রয়োগ করা হল একে একে।

তাতেও রেহাই নেই। শুধু চালাও আর চালাও। যত পার চালাও। নতুন করে চালাও। হাত ব্যথা হলে অন্যকে দাও। তবু থামলে চলবে না।

জ্ঞান হারিয়ে ফেললেও রেহাই নেই। কতক্ষণ আর থাকবে এভাবে? এক সময়ে না এক সময়ে জ্ঞান ফিরে আসবেই। তারপর আবার চালাও। জোরসে চালাও। আউর জোরসে!

দাঁত কামড়ে নিঃশব্দে পড়ে রইলেন সত্যবাবু। সুভাষ শুধু তাঁর বিপ্লবী সতীর্থই নয়, সুভাষ তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সুভাষ তাঁর গর্ব। সুতরাং এমন একটি কথাও নয়, যার ফলে স্বাধীনতা-অর্জনের জন্য সুভাষের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা এতটুকু ব্যাহত হতে পারে। প্রাণ যায় যাক, তবু কোন কথা নয়। একটি কথাও নয়।

অসুস্থ সত্যবাবুর পক্ষে কি করে যে সেদিন এই অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করা সম্ভব হয়েছিল, তা ভাবতেও অবাক লাগে। তাও একদিন দুদিন নয়, দিনের পর দিন। মাসের পর মাস।

সহ্য করতে পারলেন না যতীশবাবু। দিনের পর দিন সেই পৈশাচিক নির্যাতনের ফলে হঠাৎ একদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন গুরুতরভাবে।

সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়ল পররাজ্যগ্রাসী শাসক প্রভুদের। তাই তো! কাজটা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে! এখন উপায়! ভাল-মন্দ কিছু হলে শেষে বদনাম কুড়োতে হবে যে! সুতরাং দাও খালাস।

দিলে কি হবে! কোথায় সেই অফুরন্ত প্রাণ-সম্পদে ভরপুর যতীশবাবু! মাত্র কিছুদিন বাদেই বি. ভি.-র এই সার্থক নায়ক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা সৃষ্টি করে।

বাকি রইলেন কামাখ্যা রায়, সত্যব্রত মজুমদার, ধীরেন সাহারায়, শান্তিময় গাঙ্গুলী, বিনয় সেনগুপ্ত প্রমুখ বি. ভি.-র একনিষ্ঠ সহকর্মীর দল।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা গা-ঢাকা দিলেন পরিস্থিতির গুরুত্ব লক্ষ্য করে। কণ্ঠে তাঁদের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর। আমরা এখনো মরিনি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এ পর্যন্ত অনেক মূল্যই দিতে হয়েছে বি. ভি.-কে। দিতে হয়েছে স্বাস্থ্য ও প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর অসংখ্য তাজা প্রাণ।

প্রয়োজন হলে আমরাও দেব। তবু স্বাধীনতা-অর্জনের জন্য এবারের এই মরণপণ সংগ্রামকে দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে কোন-রকমেই আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। বিপ্লবী নায়ক সুভাষচন্দ্র বসু জিন্দাবাদ! বৈপ্লবিক সংস্থা বি. ভি. জিন্দাবাদ! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

কে এই বি. ভি. ? বি. ভি.-র সংজ্ঞা কি ?

কেন সুদূর বার্লিন থেকে বি. ভি.-র খবরের জন্য সুভাষের এই উৎকণ্ঠিত ব্যাকুলতা ?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের অনেকগুলো দিন পিছিয়ে যেতে হবে মল্লিকা। ফিরে যেতে হবে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত ইতিহাসের এক অতীত অধ্যায়ে।

[ভগৎরাম ও শান্তিময় গাঙ্গুলী প্রদত্ত রিপোর্ট অবলম্বনে লিখিত। ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের সৌজন্যে তাঁর 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগৃহীত।]

ফল ইন্ ভলান্টিয়ার্স। লেফট্ রাইট্-লেফট্ রাইট্-লেফট্……

তালে তালে এগিয়ে চলেছে হাজার হাজার তরুণ যুবক। এগিয়ে চলেছে সুসজ্জিত নারী বাহিনী। এগিয়ে চলেছে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি—'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'।

১৯২৮ সাল। কলকাতা কংগ্রেস। সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। আর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (G. O. C.) হলেন সুভাষ। তারই প্রস্তুতি চলেছে আজ ক'দিন ধরে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে।

সত্যিই ঐতিহাসিক অধিবেশন। কারণ, শুধু কংগ্রেস নয়, বাংলার বিপ্লবীদের পক্ষেও ১৯২৮ সালের এই কংগ্রেস অধিবেশন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কংগ্রেস অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী। অহিংসাই তাদের মূলমন্ত্র। অহিংসাই তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র হাতিয়ার।

ঠিক তার বিপরীত হল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবী তরুণদল। ওসব আবেদন-নিবেদন বা দর কষাকষির ব্যাপারে তাদের এতটুকুও আস্থা নেই।

তাদের সাফ কথা,—স্বাধীনতা চাই-ই। নিজের শক্তি দিয়েই আমরা তা অর্জন করব। তার জন্য এক ঘা দেবে তো পাল্টা দশ ঘা ফিরিয়ে দেব।

দুটি বিপরীতধর্মী স্রোতের মাঝে সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

এবার এগিয়ে এলেন সুভাষ। গুরুর আদর্শ অনুসরণ করে তিনিও এবার G. O. C. রূপে সর্বাগ্রে হাত বাড়িয়ে দিলেন বাংলার এই বৈপ্লবিক সংস্থাগুলির দিকে। তোমরাও এসো ভাই। সব পথই

স্বাধীনতার পথ। সুতরাং তোমরাও এই অধিবেশনে যোগ দাও। হাতে হাত মেলাও।

সবাই এসে হাত মেলাল সুভাষের সঙ্গে। অনুশীলন, যুগান্তর, পূর্ণ দাসের দল, হেমচন্দ্র ঘোষের 'মুক্তিসংঘ', মাস্টারদা সূর্য সেনের দল, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শাখা,—কেউ বাদ গেল না। হ্যাঁ, আমরাও আছি তোমার সঙ্গে। সবার মিলিত প্রচেষ্টায় কলকাতার এই অধিবেশন স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন পথের সন্ধান দিক।

নিশ্চয়ই তুমি কিছুটা অবাক হয়েছ, মল্লিকা। ভাবছ যে, কি করে এটা সম্ভব হল? নীতিগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও কেন সেদিন বৈপ্লবিক সংস্থাগুলি কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাল?

কংগ্রেসই বা তাদের এভাবে মেনে নিতে গেল কেন? কি এর কারণ?

কারণ আর কিছুই নয়, আসলে এটা হল উভয় তরফেরই একটা কুটনৈতিক চাল।

গান্ধীজী একথা ভাল করেই জানতেন যে, বাঙালীর 'ইমোশন' ব্যতীত কোন আন্দোলনই সফল হতে পারে না। আরো জানতেন যে, বাংলা, তথা ভারতের বিপ্লবীদের তাঁর কর্মপথে না পেলে শ্রেষ্ঠ যুবশক্তির অবদান থেকে তিনি বঞ্চিত থাকবেন। তাছাড়া বাংলার বিপ্লবীদের বাতিল করে কিছুতেই তিনি বাংলার মন জয় করতে সক্ষম হবেন না। সুতরাং যে করে হোক, বাংলার এই বেপরোয়া যুবশক্তিকে তাঁর চাই-ই।

অপরপক্ষে বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল, এই সুযোগে কংগ্রেসে ঢুকে পড়ে নিজেদের ভাবধারার প্রতি তরুণ সমাজকে আরো ব্যাপকভাবে আস্থাবান করে তোলা।

কংগ্রেস সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। তদুপরি অহিংস নীতিতে আস্থাবান। এ অবস্থায় কংগ্রেসের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে ভারতের লক্ষ লক্ষ জনগণকে বিপ্লবের উপযোগী করে গড়ে তোলা যত সহজ, কোন

গুপ্ত সংস্থার পক্ষে তা সম্ভব নয়। সুতরাং ঢুকে যাও সবাই কংগ্রেসে। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে যাও আপন লক্ষ্যের দিকে।

বলা বাহুল্য যে, বিপ্লবীদের এই কূটনৈতিক চাল ব্যর্থ হয়নি।• ফলে, সেবারের সেই অধিবেশনে তাঁদেরই সবচাইতে পুরোভাগে দেখা গেল, যাঁরা কংগ্রেসের অহিংস নীতিতে কোনদিনই আস্থাবান নন। এককথায় বাংলার কংগ্রেস তখন তাঁদেরই হাতের মুঠিতে।

বলা বাহুল্য যে, কংগ্রেসের তাতে লাভ বই লোকসান হয়নি। সংগঠনের কাজে বিপ্লবীদের এই অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলে কংগ্রেস যে তখন সবদিক থেকেই অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, ইতিহাসই তার সবচাইতে বড় সাক্ষী।

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা শ্রদ্ধেয় প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর 'পাক-ভারতের রূপরেখা' নিবন্ধ থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি।

'বিপ্লবী যুগের কর্মীরাই বাংলাদেশে অন্ততঃ কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে গড়ার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করেন। চট্টগ্রামে শ্রীসূর্য সেন, শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখরা, মৈমনসিংহে শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও তাঁর দলবল এবং শ্রীজ্ঞান মজুমদার ও তাঁদের দল, ঢাকার শ্রীমদন-মোহন ভৌমিক ও তাঁদের দলের বহু কর্মী, কলকাতায় শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীঅরুণ গুহ, শ্রীভূপেন দত্ত এবং আরও অনেকে, বরিশালের শ্রীসতীন সেন, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ও তাঁদের দলের আরও অনেকে এবং রাজসাহীতে শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী ও তাঁর অতীতের সহকর্মী বিপ্লবী-দলের বন্ধুরাই সংগ্রামী কংগ্রেসে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের জেলায় জেলায় খোঁজ করলে এই একই ইতিহাস পাওয়া যাবে।'

যাক, আগের কথায় ফিরে যাই।

ডাক শুনে সেদিন সবাই এসে জড় হল সুভাষের পাশে।

এবার শুরু হল সংগঠনের কাজ। একটি সুদক্ষ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী চাই। কারো হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা, কারো গায়ে

হাফ-শার্ট বা পাঞ্জাবী, আবার কারো অঙ্গে শুধু একখানি ময়লা খদ্দরের চাদর, এসব পুরনো নিয়ম আর চলবে না। স্বেচ্ছাসেবকদের সামরিক শিক্ষা থাকা চাই। উপযুক্ত ইউনিফর্ম চাই। চাই যথা-যোগ্য শৃঙ্খলা-বোধ। এটা না হলেই চলবে না। যে.করে হোক, এটা চাই-ই।

কঠিন সমস্যা। সামরিক রীতিনীতি সম্বন্ধে যাদের সামান্যতম ধারণা পর্যন্ত নেই, এই অল্প সময়ের মধ্যে তাদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা সহজ কথা নয়।

বাংলাদেশে কে এমন শক্তিধর পুরুষ আছেন, যাঁর পক্ষে এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে কার্যকরী করে তোলা সম্ভব ?

আমি আছি। বীরদর্পে এগিয়ে এলেন ভলান্টিয়ার্স মুভমেণ্টের মুকুটহীন সেনাপতি বিপ্লবী নায়ক মেজর সত্য গুপ্ত। ফল ইন্ ভলান্টিয়ার্স ! লেফট্-রাইট্, লেফট্-রাইট্, লেফট্···

সত্যই অসাধ্য সাধন করলেন দক্ষিণ কলকাতা শাখার এই দুর্ধর্ষ নায়ক মেজর সত্য গুপ্ত।

শুধু মুখে নয়, চলনে বলনে, ভাবনা চিন্তায় যাকে বলে একেবারে খাঁটি মেজর। কি নবীন, কি প্রবীণ, কারোরই রেহাই নেই তাঁর হাত থেকে। সকাল থেকে সন্ধ্যে একটানা শোনা যেতে লাগল তাঁর সেই বজ্রহুঙ্কার, লেফট্-রাইট্, লেফট্-রাইট্, লেফট্···

মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। কর্ণেল লতিকা বসুর নেতৃত্বে সবাই এসে জড় হলেন একে একে। সেখানেও ক্ষণে ক্ষণে সেই বজ্রহুঙ্কার ! শুধু লেফট্-রাইট্, লেফট্······

মল্লিকা, আজ দিন-কাল পালটেছে। বদলেছে কর্মব্যস্ত জীবনের ধারা ও রূপ। কিন্তু সেদিন !

মেয়েদের পক্ষে প্রচলিত বিধি-নিষেধের বাইরে পা বাড়ানো সেদিন কিন্তু খুব একটা সহজ ছিল না। তবু কেউ সেদিন পারেননি সুভাষের সেই উদাত্ত আহ্বানকে উপেক্ষা করে দূরে সরে থাকতে।

কেউ রেহাই পাননি কষ্টসাধ্য সামরিক কুচকাওয়াজ আর ক্ষণে ক্ষণে মেজর গুপ্তের সেই বজ্রহুঙ্কারের হাত থেকে।

কিন্তু শুধু পদাতিক বাহিনী হলেই চলবে না। সঙ্গে অশ্বারোহী বাহিনীও চাই। কোথায় পাওয়া যাবে এত অশ্ব! বাধ্য হয়েই সুভাষ তখন জনসাধারণের কাছে এক আবেদন জানালেন সংবাদপত্রের মাধ্যমে।

'কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জন্য যাঁহারা অশ্বারোহী স্বেচ্ছা-সেবক হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, ১৪ই তারিখের পরে আর কাহাকেও স্বেচ্ছাসেবক দলে ভর্তি করা হইবে না।

বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক অশ্বারোহী দলে ভর্তি হইয়াছেন এবং অশ্বারোহণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহাদের অনেকেরই অশ্ব নাই। যাঁহাদের অশ্ব আছে, তাঁহাদিগকে আমাদের অশ্বারোহী দলের জন্য ৫০টি অশ্ব ধার দিতে আমি নিবেদন জানাইতেছি।

১১ই তারিখ হইতে অশ্বারোহী দলের রীতিমত শিক্ষাদান চলিতে থাকিবে। প্রেসিডেন্টের পৌঁছিবার দিবস যে শোভাযাত্রা বাহির হইবে, তাঁহারা সেই শোভাযাত্রায় যোগদান করিবেন। ইহা ছাড়া ২০শে তারিখ হইতে পাহারা এবং যানবাহন, লোকজনের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করিবার কার্যেও তাঁহারা নিযুক্ত থাকিবেন।

অশ্বগুলি প্রত্যহ পার্ক সার্কাসে প্রেরিত হইতে পারে। দৈনন্দিন কার্যের পর সেগুলি আস্তাবলে পাঠান যাইতে পারে, অথবা তিন সপ্তাহের জন্য কংগ্রেস ময়দানস্থ আস্তাবলে সেগুলি রক্ষিত হইতে পারে। অশ্বগুলির বিশেষ যত্ন লওয়া হইবে। আমি আশাকরি,

যাঁহাদের অশ্ব আছে, তাঁহারা আমাদের এই কার্যে সাহায্য করিবেন।'

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং
[আনন্দবাজার, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯২৮]

সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত সুভাষের সেই ঐতিহাসিক বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বাহিনী যে সেদিন সারা দেশের মধ্যে কি প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল, সংবাদপত্র থেকেই তার কিছু কিছু বিবরণ আমি এখানে তুলে দিচ্ছি মল্লিকা।

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী : শহরের ভিতর দিয়া
রুট্ মার্চ : অভুতপূর্ব দৃশ্য।

'সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এ বৎসরের কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির একটি প্রধান কৃতিত্বের বিষয় হইবে।

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর আহ্বানে প্রায় দুই হাজার যুবক এ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হইয়াছে। সেনা বিভাগের ভূতপূর্ব সেনানীদের অধীনে বিভিন্ন পার্কে সকালে এবং বিকালে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে।

গতকল্য বুধবার অপরাহ্ণকালে এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দুইদল, —একদল শ্রদ্ধানন্দ পার্ক হইতে এবং অপরটি হাজরা পার্ক হইতে বাহির হইয়া বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে শহরের রাজপথ দিয়া কুচ-কাওয়াজ করে। উভয় দল কলেজ স্কোয়ারে মিলিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মার্চ করিতে করিতে বিডন স্কোয়ারে গমন করে। বিডন স্কোয়ার ঘুরিয়া তাহারা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রত্যাবর্তন করে।

রাজপথ সমূহের উভয় পার্শ্বে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করে।' [আনন্দবাজার, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯২৮]

পার্ক সার্কাস ময়দানের নাম হয়েছে তখন দেশবন্ধুনগর। চেনাই

যায় না তখন এতকালের দেখা সেই পার্ক সার্কাস ময়দানকে। সংবাদ-পত্রের ভাষায়ঃ

দেশবন্ধুনগরের সজ্জাঃ শিবিরসমূহের সামরিক দৃশ্য

'আলাদীনের ঐন্দ্রজালিক প্রদীপের শক্তিতেই যেন চক্ষের নিমেষের মধ্যে দেশবন্ধুনগরের মত একটি সুন্দর স্থান অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছে। বাস্তবিকই দেশবন্ধুনগরের বিরাট ও মনোমুগ্ধকর ব্যবস্থা দেখিয়া এই কথাই মনে হয় যে, নগর পরিকল্পনাকারিগণ এত অল্প সময়ের মধ্যে ঐরূপ একটি সুন্দর স্থানের সৃষ্টি কি প্রকারে সম্ভব করিয়াছেন?

নগরের নির্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল এবং প্রত্যেক ঘণ্টায়ই দৃশ্যের পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। কংগ্রেস মণ্ডপ নির্মাণ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির চার হাজার সদস্য ও বিশিষ্ট দর্শকবৃন্দের জন্য বিরাট মঞ্চ নির্মাণ শেষ হইয়া গিয়াছে এবং এক্ষণে খদ্দর দিয়া আচ্ছাদনের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। ভারতীয় শিল্পকলা অনুসারে নগর সজ্জার কার্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

নগরীটি এক্ষণে সামরিক শিবিরের আকার ধারণ করিয়াছে এবং উহার প্রতি প্রবেশদ্বারে স্বেচ্ছাসেবকগণ রীতিমত কড়া সামরিক কায়দায় পাহারা দিতেছে।

প্রত্যেক আগন্তুক, তিনি যতই খ্যাতনামা হউন না কেন প্রবেশদ্বারে পরিচয়-পত্র না দিয়া এবং অনুমতি না লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন না—এমন কি, অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ জে. এম. সেনগুপ্ত এবং জেনারেল সেক্রেটারী ডাঃ বি. সি. রায়কে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছিল এবং প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করা হইয়াছিল।

স্বেচ্ছাসেবকদিগের নিয়মানুবর্তিতা প্রশংসনীয়। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে জাতির সেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন, এইজন্য শ্রীযুত বসু ধন্যবাদার্হ।

সায়াহ্নের সঙ্গে সঙ্গে কুচকাওয়াজের মাঠে ঢাক এবং বিউগিল বাজিয়া উঠে; ইহাতে আসন্ন যুদ্ধের একটা উৎসাহজনক ভাব লোকের মনে জাগিয়া উঠে।' [আনন্দবাজার, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৮]

উপরোক্ত বিবরণ ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের। এবার শোন তার পরের দিনের কথা।

'...প্রত্যহ হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক মার্চ করিতেছে, এবং অশ্বারোহীদলকে শিক্ষিত করা হইতেছে। মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাগণ জয়ঢাক ও বিউগিল বাজাইয়া প্যারেড করিতেছে। দেশবন্ধুনগরের দিকে অবিরাম জনস্রোত বহিতেছে। সেখানে রীতিমত উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।'

মফঃস্বল হইতে পাঁচ শত স্বেচ্ছাসেবক

'গতকল্য কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চল এবং মফঃস্বল হইতে প্রায় পাঁচ শত স্বেচ্ছাসেবক তাহাদের পোশাক এবং কাপড়-চোপড়সহ দেশবন্ধুনগরে পৌঁছে। তাহাদের সামরিক কেতায় চলাফেরা এবং নিয়মানুবর্তিতা হইতেই পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাহারা সুন্দররূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে।'

বালিকা স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী

'গতকল্য সন্ধ্যাবেলা প্রায় একশত বালিকা কংগ্রেস ময়দানে ড্রিল করে। এই বালিকারা যখন তাহাদের নেত্রীর অধীনে মার্চ করিতেছিল, তখন তাহাদিগকে দেখিয়া বৈদিকযুগের শক্তিকাদের কথাই স্মৃতিতে উদয় হইতেছিল। ভারতের পুত্রগণই শুধু নহে, কন্যাগণও স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিবেন, সেদিন অধিক দূরে নহে।' [আনন্দবাজার, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৮]

এবার সভাপতি বরণ। হাওড়া স্টেশন থেকে ময়দান পর্যন্ত সে কি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা! সবার পুরোভাগে—বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স।

ক্ষণে ক্ষণে সব কিছু ছাপিয়ে শোনা যায় সেই বজ্রহুঙ্কার,—লেফট্-রাইট্, লেফট্-রাইট্, লেফট্……

দেখে বিস্ময়ে মূক হয়ে গেল গোটা মহানগরী। একি অভূতপূর্ব দৃশ্য! পদাতিক বাহিনী, নারী বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী, মোটর সাইকেল বাহিনী, মেডিকেল কোর বাহিনী,—সর্বোপরি জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং রূপে সুভাষের ঐ তেজোদীপ্ত মূর্তি,—এ যে বার বার দেখেও আশা মেটে না!

তা ছাড়া কি বিরাট আয়োজন! কি ব্যাপক প্রস্তুতি! কি অদ্ভুত নিয়ম-শৃঙ্খলা!

কেউ মেজর, কেউ কর্ণেল, কেউ বা স্টাফ অফিসার—ঠিক যেন একটি সুশিক্ষিত সামরিক বাহিনী কুচকাওয়াজ করে চলেছে মহা-নগরীর বুক বেয়ে বেয়ে।

কোথায় ছিল এতদিন বাঙালী তরুণ-তরুণীদের প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা এই বাস্তব রূপ?

কিসের প্রেরণায় ওরা আজ নিজেদের হারানো সত্তাকে ফিরে পেল এমনি করে? কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে?

সেদিনের সেই ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে কিছুটা অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে কলিকাতায়
অভূতপূর্ব সংবর্ধনা

'৩৪ অশ্ববাহিত যানে পণ্ডিত মতিলাল: সামরিক কেতায় স্বেচ্ছা-সেবক দলের মিছিল: শহরের রাজপথে নরনারীর অপূর্ব উৎসাহ প্রবাহ: পুরনারীগণের শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবর্ষণ:

রাষ্ট্রনেতাকে অভ্যর্থনায় শহরের উল্লাস-সজ্জা

৪৩-তম ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে গতকল্য সকালে কলিকাতাবাসিগণ রাজ-সমারোহে

অভ্যর্থনা করিয়াছিল। জাতির শ্রদ্ধাভাজন নেতা জাতির হৃদয় কতটা অধিকার করিয়াছেন, তাহা গতকল্যকার মহানগরীর উৎসব অনুষ্ঠান হইতে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এরূপ উৎসব, লোক-সমূহের এরূপ শৃঙ্খলা সত্যই অপূর্ব।

বাস্তবিক কংগ্রেসের ইতিহাসে সভাপতিকে এরূপ বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করিবার দৃশ্য আর দেখা যায় নাই। এ যেন দেশের বীর সেনানী দিগ্বিজয় শেষে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন,—দেশবাসীরা তাঁহাকে বরিয়া লইল, পুরবাসীরা তাঁহাকে অর্ঘ্য দিল এবং নাগরিকেরা তাঁহাকে আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্যে সংবর্ধিত করিল।

সহস্র সহস্র নরনারীর আনন্দদীপ্ত ললাটে প্রভাতের সূর্যকিরণ পড়িয়া যেন মহা ভবিষ্যতের এক হাস্যোজ্জ্বল চিত্রলেখার সৃষ্টি করিয়াছিল। অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবকদিগের অগ্রগতির পদধ্বনি, পদাতিকদিগের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও বীরোচিত পদক্ষেপ, মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদের প্রভাতী সূর্যকরদীপ্ত গতি-ভঙ্গিমা, পণ্ডিত মতিলালের সুসজ্জিত অশ্বরথ, রণবাদ্যের ধ্বনি এবং সহস্র সহস্র শোভাযাত্রীর প্রবল উৎসাহ যুগপৎ নাগরিকদের মনে আনন্দ, উত্তেজনা এবং স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা দিয়াছিল।

প্রায় ৮টার সময় পণ্ডিত মতিলালের হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিবার কথা ছিল। কিন্তু রাজপথের দীপাবলী ভাল করিয়া নির্বাপিত হইবার পূর্বেই সহস্র সহস্র লোক হাওড়া স্টেশনের দিকে ছুটিতে থাকে। তাহারা জানিত যে, স্টেশনের মধ্যে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই, তথাপি তাহাদের শ্রদ্ধাভাজন নেতাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য তাহারা দলে দলে স্টেশনের সম্মুখে সমবেত হইয়াছিল।

নিদারুণ পৌষের ঠাণ্ডা, অতি প্রত্যুষে যানবাহনে দূর হইতে আসিবার কষ্ট কিন্তু তাহারা ভ্রূক্ষেপ করে নাই। বয়স্কা ও বৃদ্ধা মহিলা পর্যন্ত এই অভিনন্দন উৎসবে অপরিসীম অসুবিধা সহ্য করিয়া যোগদান করিয়াছিলেন।

মাঝে মাঝে নগরের সুসজ্জিত তোরণদ্বারে এইরূপ লেখা ছিল : 'হে যুবক, দেশের বেদনা কি তুমি সত্য সত্যই উপলব্ধি কর? এই বেদনায় কি তোমার ক্ষুধা নষ্ট হইয়া গিয়াছে? তোমার নিদ্রা দূর হইয়াছে? তোমার স্বপ্ন দুর্ভাবনায় পূর্ণ হইয়াছে?'

'স্বাধীনতা চাই, স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার।'

এই প্রকারের শোভাযাত্রা এবং কলিকাতাবাসিদের অভিনন্দনে সর্ববিষয়ে একটি জাতীয় ভাবের সমাবেশ হইয়াছিল। সর্বোপরি শোভাযাত্রার সামরিক আবহাওয়ার মধ্য দিয়া যে স্বদেশপ্রেম, সৌন্দর্যজ্ঞান ও শৃঙ্খলা-শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎকে আশায় ও আনন্দে ভরিয়া তুলিয়াছে।

সভাপতির উপস্থিতি

যথাসময়ে স্পেশাল গাড়িখানি তুমুল বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। স্টেশনে অভ্যর্থনা সমিতি যদিও ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নাই, তথাপি স্পেশাল আসিয়া পৌঁছান মাত্র জনতা প্রেসিডেণ্টকে দর্শন করিবার জন্য বিষম ভিড় করিয়া যখন অগ্রসর হইল, তখন তাহাদিগকে সংযত রাখা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল,—সভাপতির গাড়ি আসিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে বহু তোপধ্বনি করা হয় এবং স্টেশনে সমুপস্থিত মহিলাবৃন্দ শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠেন।...

মিছিলের গঠন

সভাপতির এই মিছিল বাস্তবিকই অভূতপূর্ব হইয়াছিল। দুই হাজার সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক, পাঁচ শত মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা, অশ্বারোহী দল, পদাতিক দল লইয়া এই মিছিল গঠিত হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সামরিক পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া—প্রেসিডেণ্টের গাড়ি ঐস্থানে পৌঁছিবামাত্র তাঁহাকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করেন।

অতঃপর মিছিল চলিতে আরম্ভ করে। প্রথমে খাকি পোশাক পরিহিত মোটর সাইকেলারোহী স্বেচ্ছাসেবক দল যায়। তাহাদের পিছনে ছিল সাইকেলারোহী দল, তৎপরে পতাকাবাহী পথ-প্রদর্শক সওয়ারগণ ও বিউগেলারগণ যাইতে থাকে।

ইহাদের পশ্চাতে একখানা মোটরগাড়িতে জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং-এর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার হাতে একখানা চামড়া-বাঁধন ছড়ি ছিল। তিনি সতর্ক দৃষ্টি সহকারে মিছিলের গতির উপর লক্ষ্য রাখিতেছিলেন।

তাঁহার পশ্চাতে পতাকাবাহী স্বেচ্ছাসেবকগণ, তৎপশ্চাতে ড্রামারগণ, ড্রামারের পিছনে ব্যাণ্ড, ব্যাণ্ডের পিছনে পদাতিক দল, তৎপর অশ্বারোহী দল চলে।

অশ্বারোহী দলের পশ্চাতে প্রেসিডেণ্টের যান আসিতে থাকে। প্রেসিডেণ্টের অশ্বচালিত যানের পিছনে একখানা মোটরগাড়িতে মিসেস নেহেরু এবং শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পত্নী ছিলেন।

ইহার পর আবার অশ্বারোহী দল, পদাতিক দল সুনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে চলিতেছিল। তাহাদের পশ্চাতে ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ, তৎপর পতাকাবাহিগণ এবং সর্বশেষে সাধারণের মোটরগাড়ি সকল চলিতে থাকে। একজন সাইকেলারোহী স্বেচ্ছাসেবক শোভাযাত্রার সর্বাগ্রে গমন করিয়াছিল।···

শোভাযাত্রা যাত্রা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত প্রকার যানবাহনাদির চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে তখন হাওড়া সেতুর দিকে অগ্রসর হয়। সেতুর দুই ধার দিয়া অসংখ্য লোক শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হয়। বহু শ্বেতাঙ্গ ভদ্রমহোদয় ও মহিলা তাঁহাদের বাঙ্গলার ছাদে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন।

হ্যারিসন রোড ও ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে এক বিরাট জনতা সংক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় উৎসুক নেত্রে প্রতীক্ষা করিতেছিল। আশেপাশে

বাড়ির ছাদে, বারান্দায়, গাছে, স্তম্ভে, প্রাচীরে, যেদিকে তাকাও—অসংখ্য নরমুণ্ড ব্যতীত আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই স্থানে এক সুদৃশ্য বিজয়তোরণ নির্মিত হইয়াছিল। তোরণ স্তম্ভগায়ে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ নেতৃবৃন্দের জ্বালাময়ী বাণীসমূহ শোভা পাইতেছিল—হ্যারিসন রোডের উভয় পার্শ্বস্থ দোকান, বাড়ি ও অট্টালিকাসমূহ পত্র পুষ্প মাল্য পতাকায় ও পূর্ণ কদলী বৃক্ষে শোভিত হইয়া অপূর্ব উৎসব বেশ ধারণ করিয়াছিল।

উভয় পার্শ্বের গৃহছাদ ও বারান্দাসমূহে সমবেত নরনারী, বালক-বালিকার বিপুল জনতা শোভাযাত্রীদের উপর অবিরত গোলাপ জল ও পুষ্পবর্ষণ করিতে থাকে এবং মুহুর্মুহুঃ বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত করিতে থাকে।'......

এবার দেশবন্ধুনগর। প্রথমে ভাষণ দিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। উত্তর দিলেন নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। তিনি বললেন:

'অদ্যকার যে অপূর্ব শোভাযাত্রার কথা আপনারা শ্রীযুত সেনগুপ্তের মুখে শ্রবণ করিলেন, তাহাতে বঙ্গে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিশেষত্ব এবং বঙ্গের নরনারীর দেশপ্রেম অভিব্যক্ত হইয়াছে।

আমাদের পরলোকগত নেতা দেশবন্ধু দাশের এই শহরে বাস-ভূমি ছিল। হাওড়ার সেতু হইতে এই চন্দ্রাতপ পর্যন্ত আমি সর্বত্র তাঁহার প্রগাঢ় সেই স্বদেশপ্রেমেরই পরিচয় অদ্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

স্বেচ্ছাসেবক দলের অপূর্ব বিধিব্যবস্থা, অশ্বারোহী ও পদাতিক দলের শৃঙ্খলা ও গঠনের নৈপুণ্য, সর্বোপরি সর্বত্র অধিবাসীদের স্বদেশ-প্রেমের যে উদ্বেল লহরীনর্তন লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে স্বরাজের স্বপ্নই আমার মনে উদিত হইয়াছে।

আমি দেখিলাম, এখানকার প্রত্যেকেই এই অনুষ্ঠানটি সফল করিবার জন্য সাহায্য করিতেছেন। আজ মনে হইতেছে আমরা সত্যই বুঝি স্বাধীন, ভারতভূমি সত্যই বুঝি সুখ ও সম্পদশালিনী হইয়াছেন। আপনারা আজ প্রমাণ করিয়াছেন যে, আপনারা সত্যই দেশবন্ধু দাশের সম্পদের যোগ্য উত্তরাধিকারী—সেই উত্তরাধিকার বলে স্বরাজ নিশ্চয়ই আপনাদের করতলগত হইবে।'
['আনন্দবাজার, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯২৮]

সর্বত্র জয়ধ্বনি উঠল সুভাষের নামে। পত্র-পত্রিকাগুলিও বাদ গেল না। ফরোয়ার্ড লিখল: 'তিনি তুরী ভেরীর সঙ্গে জাতির তামসিকতা দূর করেছেন।'

আনন্দবাজারের অভিমত: 'শোভাযাত্রার সামরিক আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে যে স্বদেশপ্রেম, সৌন্দর্য-জ্ঞান ও শৃঙ্খলাশক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে, তা দেখে বাঙালী জাতির আশাপ্রদ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসী হয়ে উঠল, স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল অনুভব করলেন—'ভারত যেন সত্যই স্বাধীন'।'

বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেসী নেতৃবর্গও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হ্যাঁ, এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। এমনি নিয়ম-শৃঙ্খলাই তো আজ সবচাইতে বেশি প্রয়োজন। সুভাষ দেখালে বটে!

শুধু খুশি হতে পারলেন না একজন। তিনি হলেন অহিংস মন্ত্রের উপাসক স্বয়ং গান্ধীজী। কেন জানি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স ও সর্বাধিনায়কের বেশে সুভাষের ঐ তেজোদীপ্ত চেহারাটাকে এতটুকুও প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখতে পারলেন না তিনি। তাই প্রকাশ্য ভাষণে খোলাখুলিভাবেই তিনি রসিকতা করে বললেন—'এ হল পার্ক সার্কাসের সার্কাস।'

আর যায় কোথায়! কথায় বলে—'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শত গুণ।'

এখানেও তাই হল। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলো পোঁ

থরল—সার্কাস! সার্কাস! পার্ক সার্কাসের সার্কাস! ফিলিপ্স্ সার্কাস!

কেউ কেউ আবার আরো এক কাঠি উপরে গেল। সুভাষের জেনারেল কম্যাণ্ডিং অফিসার (G. O. C.) পদবীকে তারা ব্যঙ্গ করে লিখল—'গক্ সুভাষ'। কেউ বা উৎসাহের আতিশয্যে লিখল—'খোকা ভগবান'।

বিপ্লবী নেতৃবর্গ অবাক। কেন সুভাষের প্রতি অহিংস মন্ত্রের ঋষি গান্ধীজীর এই অহেতুক উষ্মা?

তবে কি স্বেচ্ছাসৈনিক জীবনে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলাবোধের কোন প্রয়োজন নেই? বিশৃঙ্খলাই কি হবে তাদের একমাত্র মূলধন?

সুভাষ নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। বুঝি সেই মুহূর্তেই তাঁর মনের অতলে জন্ম নিল বিচিত্র এক অনুভূতি। এক নতুন চেতনা। চোখের তারায় ঘনিয়ে এল অনাগত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি।

লেফট্-রাইট্, লেফট্-রাইট্, লেফট্!

তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে জাতীয় বাহিনীর লক্ষ লক্ষ মরণজয়ী সৈনিক। চলেছে নারীবাহিনী। তাদের সবার কণ্ঠে একই সুর। একই সঙ্গীত। জয় হিন্দ! দিল্লী চল! দিল্লী চল! দিল্লী চল!

কবে আসবে সেই শুভলগ্ন! কবে!

খুব একটা দেরি হয়েছিল কি মল্লিকা!

১৯২৮ থেকে ১৯৪১। মাঝে ক'বছরই বা। সেদিন এই 'খোকা ভগবানটি'র রণহুঙ্কারে সারা পৃথিবী যখন থরথর করে কেঁপে উঠেছিল, তখন সেই তথাকথিত সমালোচকদের মুখের রেখাগুলি যে বিস্ময়ে ও আতঙ্কে কতখানি ঝুলে পড়েছিল, তা আমার ঠিক জানা নেই।

বস্তুত পার্ক সার্কাস ময়দানে নিজের হাতে গড়া এই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সই হল সুভাষের চিরকালের দেখা স্বপ্নের প্রাথমিক পর্যায়,—যা পরবর্তীকালে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল আজাদ হিন্দ

বাহিনীর মধ্য দিয়ে। প্রবীণ বিপ্লবী নেতা শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের ভাষায় :

'কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশন বিপ্লবী ভারতের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কংগ্রেসের এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীই হল ১৯২৯ সাল থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের পূর্বকাল পর্যন্ত বিপ্লব-কাণ্ডের মূলাধার। সুভাষচন্দ্রের পার্ক সার্কাস ময়দানের কর্ণেল লতিকা বসু পরিচালিত নারী বাহিনীই আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ণেল লক্ষ্মী পরিচালিত 'ঝাঁসি রাণী বাহিনী'র অঙ্কুর। সুভাষচন্দ্রের কলিকাতা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীরূপ বীজেরই রূপান্তর নেতাজীর দুর্জয় 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' রূপ মহা-মহীরুহ।'

ঐতিহাসিক কলকাতা কংগ্রেস। সত্যিই ঐতিহাসিক। কারণ, এই কলকাতা অধিবেশনেই নীতিগত দিক থেকে গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষের যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফল হয়েছিল অত্যন্ত সুদূর-প্রসারী। সেকথা পরে আসছে।

অধিবেশন শেষ হল। তা বলে ভলান্টিয়ার্স বাহিনী কিন্তু সুভাষ ভেঙে দিলেন না। গান্ধীজীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সত্ত্বেও না। এবং এতদিন যা ছিল শুধু কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এবার তিনি তা ছড়িয়ে দিলেন বাংলা দেশের এখানে-ওখানে সর্বত্র।

ফলে, শহরের সীমানা ছাড়িয়ে এবার সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত দেখা যেতে লাগল সেই একই দৃশ্য। সেই লেফট্-রাইট্, লেফট্-রাইট্, লেফট্!

সেখানেও সবার পুরোভাগে সেই মেজর সত্য গুপ্ত। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তিনি ছুটে বেড়াতে লাগলেন অশান্ত ঘূর্ণীর মতো। বাংলা দেশের প্রতিটি অঞ্চলে শোনা যেতে লাগল তাঁর সেই বজ্রহুঙ্কার—লেফট্-রাইট্, লেফট্-রাইট্, লেফট্···

সত্য গুপ্ত ছাড়া যতীন দাস, পঞ্চানন চক্রবর্তী, প্রতুল ভট্টাচার্য, জগদীশ চ্যাটার্জী, বিনোদ চক্রবর্তী, জ্যোতিষ জোয়ারদার, বিনয় বসু,

দীনেশ গুপ্ত, ননী চৌধুরী, সৌরভ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রমুখ বিপ্লবীদের নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভলান্টিয়ার্স বাহিনী গঠনে এঁদের কারো অবদানই কম নয়।

কূটনীতি হিসেবে কংগ্রেসে যোগ দিলেও আসল ব্যাপারে কিন্তু বৈপ্লবিক সংস্থাগুলি চুপচাপ বসে ছিল না। ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতির কাজ চলছিল অপ্রতিহত গতিতেই।

শক্ত আঘাত হানতে হবে। আঘাতে আঘাতে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের আগ্রাসী ক্ষুধাটাকে এবার চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে হবে।

প্রবীণ বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের মুক্তিসংঘেও তৎপরতা কম ছিল না।

বিভিন্ন বিপ্লবী দল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স মুভমেণ্টকে গ্রহণ করেছিল বিপ্লবের অস্ত্ররূপে। মুক্তিসংঘ এ আন্দোলনকে গ্রহণ করল শুধু অস্ত্ররূপে নয়, বিপ্লবের প্রাণরূপেও।

পরবর্তীকালে এই মুক্তিসংঘই যে কি করে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সংক্ষিপ্ত নাম বি. ভি.-তে রূপান্তরিত হল, তা বোঝানোর উদ্দেশ্যে ভূপেনবাবুর লেখা থেকে কয়েকটি লাইন এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি।

'সুভাষচন্দ্র পরিচালিত বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স নামক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এ বাহিনী বাংলার বিপ্লবীদের কল্পনায় সমুজ্জ্বলময় এক দুর্জয় কর্মপথের সন্ধান দিল। হেমবাবু ও তাঁর বন্ধুগণ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স মুভমেণ্টকে শুধু মুভমেণ্টের ভূমিকায় রাখলেন না। তাঁরা গভীর নিষ্ঠায় উহাকে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করলেন। এ সম্ভব হয়েছিল সত্য গুপ্তের দক্ষ নেতৃত্বে। তাঁর চমৎকার মিলিটারী মন, মেজাজ ও শিক্ষা ছিল। তাঁর রক্তে ছিল একটি ভয়হীন সেনানীর অস্তিত্ব। তাঁর প্রত্যয় ছিল সুসংযত সেনাধ্যক্ষের।

হেমচন্দ্রের মুক্তিসংঘ আর বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স মুভমেণ্ট সংস্থা কার্যত ভিতরে-বাইরে মিলেমিশে গিয়েছিল কর্মীদেরই ইচ্ছায়। পুলিস এই সূত্রে হেমবাবুর বিপ্লবী সংস্থার নাম দিল, 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'—সংক্ষেপে বি. ভি.।'

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, বি. ভি. নামের আসল রহস্য কোথায়! প্রকৃতপক্ষে বি. ভি. ও হেমবাবুর মুক্তিসংঘ এক ও অভিন্ন। এখন থেকে আমিও তাকে বি. ভি. নামেই উল্লেখ করব।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসেবে হেমবাবু তখন সর্বত্র সুপরিচিত।

কিন্তু আসল মানুষটাকে চিনতে পেরেছিলেন ক'জন! বাইরে কংগ্রেস-কর্মী হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন মুক্তিসংঘ বা বাংলার বৈপ্লবিক সংস্থা বি. ভি.-র সর্বাধিনায়ক মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ। একান্ত ঘনিষ্ঠ দু-একজন ছাড়া সে খবর আর কারোরই জানবার অবকাশ ছিল না।

সবার অলক্ষ্যে আরো একটি মানুষ যে সেদিন নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছিলেন, সে খবরও কিন্তু কারো জানবার অবকাশ ছিল না মল্লিকা। তিনি হলেন চট্টগ্রামের ছোট-বড় সবার অতি আপন জন—মাস্টারদা, সূর্য সেন।

অঙ্কের মাস্টার, তাই হিসেবে তাঁর এতটুকুও ভুল হয়নি।

হয়নি বলেই কলকাতা কংগ্রেস থেকে ফিরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কাজে নেমে পড়েছেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, লোকনাথ বল প্রমুখ সুযোগ্য সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে।

সুদক্ষ ভলান্টিয়ার্স বাহিনী চাই। চাই ইস্পাতে গড়া মৃত্যুভয়হীন এমন একদল তরুণ,—যারা ঝড়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনমতেই ভেঙে পড়বে না। আর দেরি নয়। এগিয়ে চল সবাই।

উৎসাহ আরো শতগুণ বৃদ্ধি পেল সুভাষকে কাছে পেয়ে।

১৯২৯ সাল। ১১ই মে। চট্টলের যুব-সমাজ সেদিন অধীর, চঞ্চল। জেলা কংগ্রেস ও যুব-সম্মিলনী উপলক্ষে সুভাষ এসেছেন তাঁদের কাছে। তারুণ্যের মূর্ত প্রতীক সুভাষ।

প্রকাশ্য অধিবেশন শেষ। এবার মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের একটা গোপন কক্ষে শুরু হল অ-প্রকাশ্য অধিবেশন।

একদিকে চট্টগ্রাম ভলান্টিয়ার্স বাহিনীর সর্বাধিনায়ক গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, ত্রিপুরা সেন প্রমুখ বীর বিপ্লবীবৃন্দ, অন্যদিকে সুভাষ। দুচোখে তাঁর অনন্ত প্রত্যাশা।

অগ্নিযুগের ইতিহাসে চট্টগ্রাম কি আজ গোটা বাংলাকে পথ দেখাবে না? ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়বে না? চট্টগ্রাম সম্বন্ধে যে তাঁর অনেক আশা।

দুর্ধর্ষ বিপ্লবী অনন্ত সিংহের লেখা থেকেই সেদিনের সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি।

'...দুপুর বেলা মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের গোপন কক্ষে তিনি, গণেশ, ত্রিপুরা সেন ও আমার সঙ্গে অন্যের সম্পূর্ণ অসাক্ষাতে মিলিত হয়ে ভলান্টিয়ার সংগঠন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। যত দূর সম্ভব খোলাখুলি তাঁর সঙ্গে আমরা আলাপ করলাম। তাঁকে খুব ভালভাবে বুঝতে দিয়েছিলাম যে, আমরা মিলিটারী পোশাকে সজ্জিত হয়ে কংগ্রেসের নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ভলান্টিয়ার হয়েই কংগ্রেসের শোভাবর্ধন করব না। সুভাষবাবুকে আমাদের মত জানালাম যে, কংগ্রেসের নন্‌ভায়োলেন্স নীতি আমরা কখনই অন্তর দিয়ে সমর্থন করি না। আমরা মাত্র কৌশল হিসেবে নন্‌ভায়োলেন্স নীতি সাময়িকভাবে মেনে চলি—এবং এই নন্‌ভায়োলেন্স নীতির অন্তরালে সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হতে চাই। বলা বাহুল্য সুভাষবাবু আমাদের দৃঢ় মনোভাবের আভাস বুঝে আমাদের যুব-বিদ্রোহের পরিকল্পনাকে তাঁর নৈতিক সমর্থন জানান।' [অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়: সাপ্তাহিক বসুমতী, ১৪ই জুলাই, ১৯৬৬]

ঠিক তখনই একদিন বাংলার রাজনৈতিক আকাশ মেঘে মেঘে কালো হয়ে উঠল সুভাষ ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে।

কে হবে বাংলা কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক ?

কে দেবে বাঙালীর পথ চলার নির্দেশ ?

কার ইঙ্গিতে মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ-তরুণীর দল এগিয়ে যাবে আপন লক্ষ্যের দিকে ?

সুভাষ, না সেনগুপ্ত ?

তরুণ সমাজের কাছে সুভাষ তখন হিরো। সুভাষ ছাড়া আর কারো নেতৃত্বই তারা মানতে রাজী নয়। অথচ কংগ্রেসের প্রবীণ দলের ইচ্ছা অন্যরূপ। তাঁরা চান সেনগুপ্তকে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরোধ। বিরোধ থেকে সংঘর্ষ। বৈপ্লবিক সংস্থাগুলোও তার ব্যতিক্রম নয়।

তাঁদের মধ্যেও সেই বিরোধ। সেই দলাদলি। কেউ সুভাষের সমর্থক। কেউ বা চান সেনগুপ্তকে।

বিরোধ চরমে উঠল চট্টগ্রামে। সেখানেও সেই একই অবস্থা। মাস্টারদা ও তাঁর সহকর্মিগণ সবাই চান সুভাষকে। অপরপক্ষে অনুশীলন সমিতি হল সেনগুপ্তের সমর্থক।

যদিও জয় হল সুভাষেরই, তবু অবাঞ্ছিত সঙ্কটকে শেষপর্যন্ত আর কোনরকমেই এড়ানো গেল না। ফলে, চরম মূল্য দিতে হল মাস্টারদার দলেরই একজন তরুণ কর্মী, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীসুখেন্দু দত্তকে।

শুধু তাই নয়, বিপ্লবী নেতা নির্মল সেন, এমনকি স্বয়ং মাস্টারদা পর্যন্ত সেদিন রেহাই পেলেন না অবাঞ্ছিত সেই রক্তপাতের হাত থেকে।

এবার গর্জে উঠল চট্টগ্রামের তরুণদল। প্রতিশোধ চাই। চাই রক্তের বদলে রক্ত! এর জবাব আমরা দেবই!

বাধা দিলেন মাস্টারদা। হ্যাঁ, জবাব আমরা দেব। তবে এখানে নয়। দেব আসল জায়গায়। আত্মকলহে শক্তিক্ষয় না করে তার জন্য প্রস্তুত হও।

এদিকে গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, নির্মল সেন প্রমুখ বিপ্লবীগণ আহত সুখেন্দুকে কলকাতা নিয়ে এসে ভর্তি করে দিলেন কারমাইকেল কলেজ হাসপাতালে। আশা খুবই কম, তবু শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে।

সুখেন্দুর মতো কর্মীকে হারানো যে দলের পক্ষে একটা প্রচণ্ড ক্ষতি।

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ ছুটে গেলেন মৃত্যু-পথযাত্রী সুখেন্দুর শয্যাপাশে। শুধু একদিন নয়, দিনের পর দিন। তাঁকে জয়যুক্ত করতে গিয়েই সুখেন্দু আজ এমনি করে অকালে প্রাণ দিতে বসেছে। এ দুঃখ যে কোনদিনই যাবার নয়।

কিছুতেই কিছু হল না। হাজার চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত বাঁচানো গেল না সুখেন্দুকে। দেখতে দেখতে একদিন তার চোখদুটি বুজে এল অনন্ত নির্ভরতায়। নিশ্চিন্ত আরামে। সে ঘুম আর কোনদিনই ভাঙল না।

শুরু হল শবযাত্রা। সবার পুরোভাগে নগ্নপদে সুভাষ। বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। মুখে তারই প্রতিচ্ছায়া। সুখেন্দু হারিয়ে গেল। ওর অভাব যে কোনদিনও পূর্ণ হবার নয়।

এদিকে বি. ভি. চুপচাপ বসে নেই। ভেতরে ভেতরে তার প্রস্তুতি-পর্ব এগিয়ে চলেছে অবিশ্বাস্য গতিতে। আর সময় নেই। প্রস্তুত হও।

সর্বাধিনায়ক হেমবাবু বহুদর্শী লোক। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, মহানায়ক রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন প্রমুখ সবার সান্নিধ্যই তিনি লাভ করেছেন নিজের ব্যক্তিগত জীবনে। তাঁদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ও তার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে অনেক

অভিজ্ঞতাই সঞ্চিত হয়ে আছে তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডারে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, সংগ্রাম চালাতে হলে চাই উপযুক্ত প্রস্তুতি।

অতীতে সব ক'টি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে এই উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে। বি. ভি.-র ক্ষেত্রে কোনরকমেই তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দিতে তিনি রাজী নন।

প্রথমেই ব্যবস্থা করা হয়েছে কতকগুলি সেণ্টার বা গোপন আস্তানার। পুলিস হয়তো কাউকেই সেদিন রেহাই দেবে না। তাই পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় নেবার জন্য কতগুলি সেণ্টার থাকা চাই।

নিজস্ব চিকিৎসা বিভাগও প্রস্তুত। আঘাত করতে গেলে পাণ্টা আঘাত আসবেই। কিছু সংখ্যক হতাহত হওয়াও বিচিত্র নয়। সে অবস্থায় হাসপাতালে বা বাইরের কোন চিকিৎসকের কাছে যাওয়া মোটেই নিরাপদ হবে না। সুতরাং নিজস্ব কিছু চিকিৎসক চাই, যাঁদের ওপর পুরোপুরিভাবে নির্ভর করা চলে।

সেদিক থেকেও নিশ্চিন্ত। সত্যেন্দ্রকুমার দত্ত, দুর্গাদাস ব্যানার্জী, সুরেন বর্ধন, প্রভাস ঘোষ, প্রকাশ দত্ত, অরুণ নন্দী, অনিমেষ রায়, জিতেন সেন প্রমুখ অভিজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এসেছেন পরম শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর মতো। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার দলীয় সদস্য। সুতরাং সততা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কয়েকজন সুদক্ষ আইনজীবীও চাই। মামলা চালাবার মতো অত সামর্থ্য বিপ্লবীদের কোথায়! কোথায় পাবেন তাঁরা অত টাকা! সুতরাং এমন কয়েকজন আইনজীবীর সহযোগিতা প্রয়োজন, যাঁদের কাছে অর্থের প্রশ্নটাই সবচাইতে বড় নয়।

সেদিক থেকেও অসুবিধার কোন প্রশ্ন নেই। বন্ধুর মতোই হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন খগেন কর, চিন্তাহরণ রায়, বিনয় সেন, পরেশ সাহা প্রমুখ বিচক্ষণ আইনজীবিগণ। তোমরা দেশের জন্য প্রাণ দেবে, আর

আমরা কি শুধু নির্বাক দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থাকব। তা কি হয় কখনো!

দিন-মাস-প্রহরের মালা গাঁথা ছন্দে কেটে গেল আরো এক বছর। এল ১৯৩০ সাল।

বাংলার দিকে দিকে তখন নবজীবনের সাড়া। নতুন দিনের সঙ্কেত। সর্বত্র এক রব—এগিয়ে চল! এগিয়ে চল! এতকাল আমরা এক-তরফাই মার খেয়েছি। এবার পাল্টা মার দেবার পালা।

বি. ভি.-র সদস্যদের মধ্যেও সেই একই চঞ্চলতা। আর সময় নেই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে আর অবকাশ দেওয়া চলবে না। এবার আঘাত হানতে হবে। চারদিক থেকে আঘাত হেনে জাঁতি-কলে ওদের পিষে মারতে হবে।

পেছনে তাকাবার সময় নেই। হিসেব-নিকেশেরও ফুরসৎ নেই। এ হল বাঁচার সংগ্রাম। এ সংগ্রামে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে।

জানি, তার জন্য মূল্য দিতে হবে। দিতে হবে অনেক তাজা প্রাণ। কোন দুঃখ নেই। প্রয়োজন হলে তাও আমরা দেব। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই মূল্য দেবার পালা আমাদের কোনদিনই শেষ হবে না।

অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত। অ্যাকশন স্কোয়াডও প্রস্তুত। প্রস্তুত বি. ভি.-র মৃত্যুপাগল তরুণবৃন্দ। সঙ্কেত পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়বেন দুঃসাহসের পাখায় ভর করে। শুধু অপেক্ষা মাত্র।

বিস্ফোরণ ঘটল তার আগেই। মারাত্মক খবর এল বাংলার এক প্রান্তে অবস্থিত সেই চট্টল ভূমি থেকে।

সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীরা এক অভাবনীয় ইতিহাসের সৃষ্টি করেছেন।

চট্টগ্রাম স্বাধীন, মুক্ত। ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে সেখানে এখন পৎ পৎ করে উড়ছে ভারতের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা।

খবর শুনে সারা দেশ স্তম্ভিত। তারপর বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে শোনা গেল বিপুল জয়ধ্বনি।

ধন্য চট্টগ্রাম! ধন্য তার সুসন্তান মাস্টারদা সূর্য সেন!

ধন্য গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন প্রমুখ তাঁর সুযোগ্য সহকর্মিবৃন্দ!

ধন্য তাঁর প্রতিটি সুশিক্ষিত মুক্তিকামী সৈনিক! পরাধীন জাতির ইতিহাসে তোমরা যে নজির রেখেছ, কোথাও বুঝি তার তুলনা নেই। তোমাদের নমস্কার!

'ওরা দুপায়ে দলে মরণ শঙ্কারে
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে।'

চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লব।

সেই কবেকার কথা। আজও আবছা আবছা মনে পড়ে। মনের খাতা ওলটাতে গিয়ে আজও ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে আসে বিস্মৃতপ্রায় অতীতের সেই ধূসর পাণ্ডুলিপি। অস্পষ্ট, কিন্তু অবিস্মরণীয়।

বিরাট পটভূমিকা। বিরাট প্রস্তুতি। এত বিরাট যে, সামান্য দু-চার কথায় তার গুরুত্ব বোঝানো কোনরকমেই সম্ভব নয়। তাই সে চেষ্টা না করে আমি শুধু তার প্রধান প্রধান ঘটনাগুলোই আজ তোমাকে শোনাব মল্লিকা।

বিপ্লবী সুভাষকে জানতে হলে তাঁর সমসাময়িক কালের বৈপ্লবিক কর্মধারা সম্বন্ধে তোমার কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। এ অধ্যায়ের অবতারণা শুধু তারই প্রয়োজনে।

তবে শুরুতেই বলে রাখছি যে, এর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আমার জানা নেই। আমার কেন, কারোরই নেই। কারণ, এ ইতিহাসের নায়কদের সেদিন সবচাইতে বড় কথাই ছিল—'মন্ত্রগুপ্তি'। অর্থাৎ, কোন কথা নয়। কোন প্রশ্ন নয়। শুধু নিঃশব্দ সৈনিকের মতো এগিয়ে যাও। সাবধান, মানুষ তো দূরের কথা, কাক-পক্ষীও যেন কোন কিছু টের না পায়।

বি. ভি.-র সর্বাধিনায়ক শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষের ভাষায় :

'যাঁহারা প্রচণ্ড ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন যথার্থ স্বাধীনতা কাড়িয়া লইবার বীর্যে,—তাঁহাদের অমর কর্মকাণ্ডের অধিক অংশ সকলের অবজ্ঞাতে আচরিত হইয়াছে। সভা-সমিতি ডাকিয়া জ্বালাময়ী প্রস্তাব গাঁথিয়া কোন কার্য সাধিত হয় নাই। প্রস্তরফলকে বা তাম্র-রৌপ্যমুদ্রায় কোন কীর্তিকাহিনী

কেহ লিখিয়া রাখিয়া যান নাই। অথবা, কোন সাক্ষীসাবুদ ডাকিয়াও কোন গুপ্ত সমিতির লোকেরা তাঁহাদের কার্যকলাপ সংঘটিত করেন নাই। কাজেই তাঁহাদের কর্ম ইতিহাস দুর্লভ।'

সত্যিই দুর্লভ। দুর্লভ বলেই সেদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে কোথায় যে কার, কতখানি রক্ত ঝরেছিল তার সঠিক ইতিহাস জানানো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। জানাতে গেলেও সে ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, কিছু দেখা বা শোনা, আবার কিছুটা অনুমানের পাখায় ভর করে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

সে হিসেবে এ কাহিনীকে তুমি ইতিহাস না বলে বরং ইতিহাসের ভগ্নাংশ বলে ধরে নিতে পার।

১৯৩০ সাল। ১৮ই এপ্রিল। আইরিশ বিপ্লবের স্মৃতি-বিজড়িত ঐতিহাসিক ১৮ই এপ্রিল।

রাত তখন দশটা।

পরিকল্পনা মতো সবার আগে এগিয়ে গেলেন যুব-বিদ্রোহের দুই দুর্ধর্ষ জেনারেল অনন্ত সিংহ আর গণেশ ঘোষ।

পেছনে আরো চারজন। বিধু ভট্টাচার্য, হরিপদ মহাজন, হিমাংশু সেন আর সরোজ গুহ।

সবার গায়ে সামরিক পোশাক। সবাই সশস্ত্র। সবার মনে একই সঙ্কল্প।

সামনেই পুলিস লাইন। যে করে হোক, জেলার শক্তিকেন্দ্র এই পুলিস লাইনের অস্ত্রাগারটি দখল করতে হবে।

তারপর একে একে দখল করতে হবে জেলখানা, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, থানা, কোর্ট-কাছারী ইত্যাদি সব কিছু।

দখল করতে হবে গোটা শহরটাকেই।

অবশ্য শহর দখল করা মানেই বিদেশীর হাত থেকে ভারতভূমি অধিকার-মুক্ত করা নয়। বিরাট এই ভারতবর্ষের মধ্যে চট্টগ্রাম আর কতটুকু!

তবু তারও কিছুটা প্রয়োজন আছে। এক-তরফা মার খেয়ে খেয়ে জাতির মেরুদণ্ড আজ ভেঙে পড়েছে।

আজ পাল্টা মার দিয়ে শতাব্দীর ঘুম থেকে তাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ইংরেজ অপরাজেয় নয়। সংঘবদ্ধভাবে আঘাত করতে পারলে তাদের ঐ শক্তির দম্ভকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়াটা এমন কিছু কষ্টসাধ্য কাজ নয়।

প্রমাণ চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামে যা সম্ভব, অন্যত্র তা সম্ভব হবে না কেন? নিশ্চয়ই সম্ভব। সুতরাং প্রস্তুত হও। সবাই মিলে রুখে দাঁড়াও।

ওদিকে টিলার ওপর দণ্ডায়মান রাইফেলধারী প্রহরী অবাক।

কে ওরা?

কেন ওরা এদিকে এগিয়ে আসছে একটু একটু করে?

কি মতলব ওদের? সামরিক বিভাগের কেউ নয় তো?

প্রশ্ন করার মতো কোন অবকাশই পেল না সশস্ত্র প্রহরীটি।

তার আগেই দুই জেনারেলের হাতের রিভলবার আগুন ছড়াল—দ্রাম! দ্রাম!

তারপরই একসঙ্গে সবাই জয়ধ্বনি দিল—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে অগণিত কণ্ঠে জয়ধ্বনি ভেসে এল—বন্দে মাতরম্! ইনক্লাব জিন্দাবাদ! সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!

কি নিখুঁত পরিকল্পনা! যেন চারিদিক থেকে শত সহস্র আক্রমণকারী এগিয়ে আসছে আর কি!

অথচ আসলে কিন্তু ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনের বেশি হবে না।

তাইতেই কাজ হল। আচমকা রিভলবার গর্জন, আর সেই সঙ্গে এই জয়ধ্বনি শুনে শত শত পুলিস প্রহরীর দল যে নিমেষে কোথায় ছুটে পালাল, তার আর কোন হদিশই পাওয়া গেল না।

মাস্টারদা সহ ছোট ছোট দলগুলির সবাই এসে এবার জড় হলেন একে একে।

সঙ্গে সঙ্গে একদল গার্ড নিলেন পুলিস লাইনের চারপাশে। অন্য একদল ছুটে গেলেন ম্যাগাজিন কক্ষের উদ্দেশ্যে। অস্ত্রশস্ত্র চাই। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র!

বড় বড় হাতুড়ীর ঘায়ে দেখতে দেখতেই ম্যাগাজিন কক্ষের শক্ত তালা ভেঙে পড়ল ঝনঝন করে। তারপর সে কি সবার আনন্দ-উল্লাস!

রাইফেল! রাইফেল! রাইফেল! একটি দুটি নয়, শত শত পুলিস মাস্কেট্রি রাইফেল। সেই সঙ্গে অসংখ্য রিভলবার আর কার্তুজ।

সহসা জেনারেল গণেশ ঘোষের হাঁক শোনা গেল—কম্পানি ফল ইন্!

সঙ্গে সঙ্গে সবাই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন সামরিক কায়দায়। কি করে মাস্কেট্রি রাইফেল ব্যবহার করতে হয়, তা হাতে-কলমে বুঝিয়ে দিয়ে এবার জেনারেল ঘোষ হাঁক দিলেন—Load!

সবাই টোটা ভরে নিলেন নিজ নিজ মাস্কেট্রি রাইফেলে।

পরবর্তী আদেশ—Aim!

সবাই লক্ষ্য স্থির করলেন আকাশের দিকে।

এবার শেষ আদেশ—Fire!

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে গোটা শহরটাই বুঝি কেঁপে উঠল থরথর করে। এমনি করে তিনবার।

একই দিনে, একই সময়ে জেনারেল লোকনাথ বল ও যুব-বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক নির্মল সেনের নেতৃত্বে ওদিকে আর এক অধ্যায় তখন শুরু হয়ে গেছে অক্সিলিয়ারী ফোর্স আর্মারীতে।

সেখানেও সেই একই ব্যাপার। রাইফেলধারী প্রহরী প্রথমেই জেনারেল বলকে দেখে স্যালুট জানাল উঁচুদরের কোন মিলিটারী অফিসার মনে করে।

সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিবর্ষণ—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! সেই সঙ্গে সমবেত কণ্ঠের বজ্রহুঙ্কার—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে অপ্রস্তুত পাঠান প্রহরীর দল ভোঁ দৌড়। সাধ করে কে আর প্রাণ দিতে চায়! আগে তো প্রাণ বাঁচুক, তারপর অন্যকথা।

তবে পুলিস লাইনের মতো কাজটা কিন্তু এখানে খুব সহজ হল না মল্লিকা। হতাহতের সংখ্যাও অনেক বেশি। নিহত মোট ছ-জন। সবটাই বিপক্ষের।

প্রথমেই ভারপ্রাপ্ত অফিসার সার্জেন্ট মেজর ফেরেল ছুটে এলেন উদ্যত রিভলবার হাতে নিয়ে। কৌন হ্যায়! ক্যায়া মাংতা!

জবাব গেল আগ্নেয়াস্ত্রের মুখ দিয়ে—দ্রাম্! দ্রাম্! দ্রাম!

সঙ্গে সঙ্গেই মেজর ফেরেল লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। তারপর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন—'ডার্লিং, রিং আপ দি পুলিস স্টেশন।'

কোথায় ফোন, কোথায় কি! পরিকল্পনা মতো পাঁচ মিনিট আগেই শহরের যাবতীয় টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে অভিজ্ঞ নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে। টেলিফোন ভবনের কোন চিহ্নও নেই সেখানে। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

যোগাযোগ-ব্যবস্থা বলতেও কিছু নেই। দুদিন আগেই লালমোহন সেন, সুকুমার ভৌমিক, হারান চৌধুরী, সুবোধ মিত্র, উপেন ভট্টাচার্য, শঙ্কর, সুশীল দে, বিজয় আইচ প্রমুখ মুক্তি-সৈনিকগণ যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন শহর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে গিয়ে।

এক জায়গায় মালগাড়ি লাইনচ্যুত করে, অন্য জায়গায় টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়ে তাঁদের কর্তব্য তাঁরা পালন করেছেন যথাযথভাবেই।

মেজর ফেরেল শেষ। এবার আর্মারীর দরজা ভাঙার পালা।

পরস্পর দুটো শক্ত মজবুত লোহার দরজা। ভেতরে রয়েছে

'৩০৩ বোরের দশসট্‌ওয়ালা আর্মি ম্যাগাজিন রাইফেল আর লুইস গান।

পুলিস লাইনে পাওয়া মাস্কেট্রি রাইফেলে প্রতিবার মাত্র একটি করে গুলী ছোঁড়া যায়। তার পাল্লাও দুশো গজের বেশি নয়।

সেদিক থেকে আর্মি ম্যাগাজিন রাইফেলের গুরুত্ব অনেক বেশি। এগুলো দিয়ে অনায়াসেই এক সঙ্গে দশটা করে গুলী ছোঁড়া চলে। সুতরাং এগুলো চাই-ই। যে করে হোক, এগুলো পেতেই হবে। তাছাড়া লুইস গান তো আছেই।

কোন বাধাই আর বাধা রইল না শেষ পর্যন্ত। প্রথমেই জাহাজ বাঁধা মজবুত দড়ি দিয়ে দরজার হাতল দুটোকে মোটরের সঙ্গে বাঁধা হল শক্ত করে। তারপর ফুলস্পীডে গাড়ি চালিয়ে দিতেই, ব্যস্! সঙ্গে সঙ্গে সব খোলা মাঠ।

তারপর সেই একই দৃশ্য। শুধু রাইফেল আর রাইফেল! রিভলবার আর লুইস গান!

কিন্তু কার্তুজ! দশসট্‌ওয়ালা ম্যাগাজিন রাইফেলের উপযুক্ত কার্তুজ কোথায়?

আশ্চর্য, কোথাও নেই। তন্নতন্ন করে সর্বত্র খোঁজ করা হল, তবু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

এখন উপায়! এত আর্মি রাইফেল, এত স্বয়ংক্রিয় লুইস গান, সবই যে অকেজো হয়ে পড়বে '৩০৩ বোরের কার্তুজের অভাবে!

একটার পর একটা বাধা। হঠাৎ সার্জেণ্ট ব্লেকবার্ন, মিঃ কলেন ও জাহাজ কোম্পানির জনৈক শ্বেতাঙ্গ অফিসার এসে হাজির। চোখে তাদের অনন্ত বিস্ময়। কে ওরা? কি মতলব ওদের?

জবাব গেল গুলীর মুখে—দ্রাম। দ্রাম! কলেন সেখানেই পড়ে রইলেন আহত হয়ে। বাদবাকি সবাই দে ছুট।

এবার সবাইকে ফিরে যেতে হবে হেড কোয়ার্টার্স সেই পুলিস লাইনে।

অস্ত্রশস্ত্র যথাসম্ভব সঙ্গে নেওয়া হল। বাদবাকি সবই ধ্বংস করে ফেলা হল শক্ত হাতুড়ীর ঘায়ে। তারপরই শোনা গেল জেনারেল বলের নতুন আদেশ– 'সেট দি আর্মারী অন ফায়ার!'

দেখতে দেখতে গোটা আর্মারীটা জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। সেই সঙ্গে সমবেত জয়ধ্বনি—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক!

আবার সেই বাধা। এবার এলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উইলকিনসন স্বয়ং।

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে ঢালাও হুকুম—ফায়ার!

মারা পড়ল সঙ্গের আর্দালীটি। ড্রাইভার বীরমন থাপাও রেহাই পেল না। তাকেও লুটিয়ে পড়তে হল শক্ত মাটির বুকে।

একমাত্র রেহাই পেলেন উইলকিনসন। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হাওয়া।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জেনারেল বল হেড কোয়ার্টার্সে পৌঁছে গেলেন সবাইকে নিয়ে।

ইতিমধ্যে অম্বিকা চক্রবর্তীও তাঁর দলবল নিয়ে এসে গেছেন টেলিফোন-ভবন ধ্বংস করে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, অমরেন্দ্র নন্দী, বীরেন দে, মনোরঞ্জন সেন প্রমুখ দলের সবচাইতে দুঃসাহসী তরুণদের পাঠানো হয়েছিল পাহাড়তলী ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু গুড-ফ্রাইডে উপলক্ষে ক্লাব বন্ধ থাকার দরুন সে পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি।

ইতিমধ্যে তাঁরাও এসে যোগ দিয়েছেন মূল বাহিনীর সঙ্গে। কেউ আর বাদ নেই। একটি প্রাণীও না।

এবার জাতীয় পতাকা উত্তোলন। বিউগল ধ্বনির মধ্যে পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই কমাণ্ড হল—লোড! এম! ফায়ার!

সঙ্গে সঙ্গে পর পর তিনবার প্রায় পঞ্চাশটি মাস্কেট্রি রাইফেল গর্জে উঠল আকাশের দিকে মুখ করে।

অবশেষে অস্থায়ী সামরিক সরকার গঠন ও সর্বাধিনায়ক রূপে মাস্টারদাকে গার্ড অফ অনার প্রদর্শন।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই রাইফেল গর্জন। সেই সমবেত জয়ধ্বনি —ইনক্লাব জিন্দাবাদ! চট্টগ্রাম রিপাবলিক আর্মি জিন্দাবাদ! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

সবাই খুশিতে ভরপুর। তাঁদের এতদিনের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। প্রধান প্রধান সমস্ত ঘাঁটি এখন তাঁদের দখলে। অক্সিলিয়ারী ফোর্স, টেলিফোন-ভবন বিধ্বস্ত। টেলিগ্রাফ লাইন বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। রেলপথও তাই।

এবার জেলখানা, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, বিভিন্ন পুলিস থানা ইত্যাদি দখল করতেই যা দেরি।

হঠাৎ একি! রাত্রির অন্ধকারে কোথা থেকে ভেসে আসছে লুইস গান থেকে অবিশ্রান্ত গুলীবর্ষণের শব্দ—ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা—

সঙ্গে সঙ্গে লায়িং পোজিশন নিয়ে সব ক'টি মাস্কেট্রি রাইফেল প্রত্যুত্তর দিল সামনের ওয়াটার ওয়ার্কস লক্ষ্য করে। শত্রুপক্ষ ওখানেই রয়েছে। সুতরাং চালিয়ে যাও।

ডবল মুড়িং জেটিতে যে একটা লুইস গান রয়েছে সে খবর তাঁদের অজানা ছিল না। ওটা দখল করার জন্য প্রস্তাবও করা হয়েছিল কয়েকবার। কিন্তু লোকাভাবের দরুন তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ঐ একটা মাত্র লুইস গান নিয়েই যে শত্রুপক্ষ এত শীগ্‌গীর তৎপর হয়ে উঠবে তা কে জানত!

মাত্র কিছুক্ষণ, তার পরই সব চুপচাপ।

এবার একটা কঠিন প্রশ্ন দেখা দিল বিপ্লবী সমর-নায়কদের মনে। স্বয়ংক্রিয় লুইস গানের বিরুদ্ধে মাস্কেট্রি রাইফেল আর কতটুকু! এ অবস্থায় খুব বেশিক্ষণ লড়াই চালানো সম্ভব হবে কি?

হুকুম হল—যত পার অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নাও, বাদবাকি সব ধ্বংস কর। তারপর পেট্রোল ঢেলে গোটা পুলিস লাইনটা জ্বালিয়ে দাও।

তাই করা হল। এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব ছিল হিমাংশু সেনের ওপর। তিনিই সর্বাগ্রে এগিয়ে গেলেন পেট্রোলের টিন হাতে করে।

বিপর্যয় ঘটে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। কখন যে তাঁর জামা-কাপড়ে বেশ কিছুটা পেট্রোল পড়ে গেছে তা টেরও পাননি তিনি। টের পেলেন আগুন ধরাতে গিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। সে এক বীভৎস অবস্থা। চোখে পর্যন্ত দেখা যায় না।

কোনরকম পরামর্শের অপেক্ষা না করে সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ তাঁকে মোটরে তুলে নিয়ে ছুটে গেলেন শহরের কোন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

সঙ্গে গেলেন আরো তুজন। আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল।

ফল হল সুদূরপ্রসারী। সেই যে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, তারপর হাজার চেষ্টা করেও মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা আর তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না।

এদিকে অপেক্ষা করে করে কেটে গেল তুঘণ্টা, কিন্তু কোথায় জেনারেল সিংহ? কোথায় গণেশ ঘোষ?

আনন্দ গুপ্ত বা জীবন ঘোষালই বা কোথায়?

তবে কি পুলিস এর মধ্যেই কোন রি-ইনফোর্সমেন্টের ব্যবস্থা করেছে?

নিশ্চয়ই তাই। নইলে এখনো ওঁরা ফিরে আসছেন না কেন? হয়তো ওঁরা চারজনই ধরা পড়ে গেছেন পুলিসের হাতে। হয়তো তাঁদেরও এবার চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলবে সামরিক বাহিনীর সাহায্যে।

না, এ পরিস্থিতিতে শহরের দিকে যাওয়া ঠিক নয়। এখানে থাকাটাও মোটেই নিরাপদ নয়। শত্রুপক্ষ যত বেশি সময় পাবে, তত বেশি সুযোগ নেবে। সুতরাং চল সবাই পাহাড়ের দিকে।

দুর্ভাগ্য! সত্যিই দুর্ভাগ্য মল্লিকা। কারণ, আসল ঘটনা ছিল ঠিক তার বিপরীত।

প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক একটি মাত্র লুইস গান দিয়ে সামান্য বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল মাত্র। তাও তারা স্থির করতে পারেনি যে, পালাবে, না আত্মসমর্পণ করবে!

তাছাড়া শহর ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। এমন কি, ভীত আতঙ্কিত শ্বেতাঙ্গ সমাজের অধিকাংশই সেদিন শহর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল কর্ণফুলী নদীতে অবস্থিত জাহাজের অভ্যন্তরে। সৈন্য-সমাগম শুরু হয়েছিল তারও তিন দিন পরে।

বিপ্লবীদের সে খবর জানা ছিল না। আসলে দুই প্রধান সেনা-নায়কের অনুপস্থিতির ফলেই সেদিন তাঁদের মনে এমনি একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যের এখানেই শেষ নয়। সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য এই যে, সেই রাত্রেই জেনারেল অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ আবার পুলিস লাইনে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু তখন সব ফাঁকা।

আরো দুর্ভাগ্য এই যে, দূর থেকে তাঁদের গাড়ির হেড লাইটের আলো আত্মগোপনকারী মূল বাহিনীর নজর এড়ায়নি। তবু কেউ কোনরকম সাড়া দেননি। ভেবেছিলেন, কোন পুলিসের গাড়ি হবে হয়তো।

১৯শে এপ্রিল সারাদিন কাটল সুলুকবহর পাহাড়ে। তারপরই আবার শুরু হল পথ-পরিক্রমা। শুধু পথ আর পথ। দীর্ঘ-বিসর্পিত বন্ধুর পথ। কোথায় তার শেষ কে জানে।

অবশেষে ফতেয়াবাদ। আহার নেই। নিদ্রা নেই। এমন কি তৃষ্ণার জলটুকু পর্যন্ত নেই। তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে লুব্রিকেটিং অয়েল পর্যন্ত খেতে দ্বিধা করেননি কেউ কেউ। তদুপরি তিন দিনের কঠোর পরিশ্রম ও দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার ফলে সবাই ক্লান্ত, অবসন্ন।

তবু প্রতিটি তরুণ উৎসাহে ভরপুর। আমরা হার মানব না। সঙ্গে অস্ত্র রয়েছে। সুতরাং ভয় কি! তা বলে দিনের পর দিন এই অনিশ্চিত অবস্থা আমরা মেনে নিতে রাজী নই। আমরা বাস্তবের সম্মুখীন হতে চাই। আগেকার প্ল্যান অনুযায়ী শহর দখল করতে চাই। চাই মুখোমুখি সংগ্রাম।

তাই হোক। তরুণদলের স্বতঃস্ফূর্ত দাবীকে সানন্দে মেনে নিলেন সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা। চল, সবাই ফিরে যাই শহরের দিকে।

রাতের অন্ধকারে আবার শুরু হল পথ চলার পালা। এগিয়ে চল। চড়াই-উৎরাই ভেঙে এগিয়ে চল। ভোর হতে আর দেরি নেই। তার আগেই আমাদের পৌঁছে যেতে হবে শহরের সীমানায়।

সব বৃথা। শহরে পা দেবার আগেই পুব আকাশটা ফর্সা হয়ে এল একটু একটু করে। এতদিনে নিশ্চয়ই সব জানাজানি হয়ে গেছে। এ অবস্থায় দিনের আলোতে একসঙ্গে এতগুলো সামরিক পোশাক-পরা সশস্ত্র তরুণের পথ চলা মোটেই নিরাপদ নয়। সামনেই জালালাবাদ পাহাড়। উঠে যাও সবাই ওখানে এক এক করে।

২২শে এপ্রিল। বিকেল তখন প্রায় পাঁচটা। পশ্চিম আকাশে বিদায়ী সূর্যের অস্তরাগ। মনে হয় কে যেন প্রকৃতির বুকে আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে মুঠি মুঠি।

ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সবাই তখন বিশ্রাম করছেন পাহাড়ের বুকে গা এলিয়ে দিয়ে।

সবার মনে একই প্রশ্ন। কখন আমরা শহর দখল করব! কখন দখল করব ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, জেলখানা, কোর্ট-কাছারী ইত্যাদি সব কিছু!

নাই বা রইল আমাদের ·৩০৩ বোরের আর্মি রাইফেল বা লুইস গান, তা বলে সাহসে বা শৌর্যে আমরা কারো চাইতে ছোট নই। যা আছে তাই দিয়ে আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। কিছুতেই হার মানব না। কোনমতেই না।

এক দলে গোল হয়ে বসেছেন সুরেশ দেব, বিনোদ চৌধুরী, জিতেন্দ্র দাশগুপ্ত আর শম্ভু দস্তিদার।

অন্য দলে রয়েছেন কৃষ্ণ চৌধুরী, বিনোদ দত্ত, সরোজ গুহ, কালী দে, মধুসূদন দত্ত, ননী দেব আর মলিন ঘোষ।

একটু দূরে ক্ষীরোদ ব্যানার্জী, হেমেন্দু দস্তিদার, কালী চক্রবর্তী, অর্ধেন্দু দস্তিদার আর রণধীর দাশগুপ্ত।

খানিকটা নিচে সহায়রাম দাস, মতি কানুনগো, বিধু ভট্টাচার্য, নারায়ণ সেন আর পুলিন বিকাশ ঘোষ।

বেশ খানিকটা দূরে বসেছেন মহেন্দ্র চৌধুরী, নির্মল লালা, বীরেন্দ্র দে, বিজয় সেন আর নিতাইপদ ঘোষ।

অন্য এক জায়গায় অশ্বিনী চৌধুরী, বনবিহারী দত্ত, শশাঙ্ক দত্ত আর সুবোধ বল।

আর রয়েছেন ফণীন্দ্র নন্দী, হরিপদ মহাজন, ভবতোষ ভট্টাচার্য, সুধাংশু বোস আর সুবোধ চৌধুরী।

রয়েছেন বিগ্রেডিয়ার ত্রিপুরা সেন, মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, হরি বল (টেগরা), রজত সেন আর স্বদেশ রায়।

সেই স্বদেশ রায়, যিনি দলীয় সদস্য না হয়েও পুলিস লাইন আক্রমণ কালে অযাচিতভাবে এসে যোগ দিয়েছিলেন সবার সঙ্গে।

সর্বোপরি রয়েছেন সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন আর জেনারেল লোকনাথ বল।

তাঁদের মনেও গুঞ্জন করে চলেছে সেই একই প্রশ্ন। শহরের বর্তমান পরিস্থিতি কি?

খবর নেবার জন্য ইতিমধ্যে ফকির সেন, দীপ্তিমেধা ঘোষ, অমরেন্দ্র নন্দী প্রমুখ কয়েকজনকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত তাদের মধ্যে একজনও ফিরে আসেনি।

অনন্ত সিংহ বা গণেশ ঘোষেরই বা খবর কি! কোথায় গেলেন তাঁরা!

হঠাৎ কি দেখে অলস দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ভারপ্রাপ্ত প্রহরী প্রভাস বলের।

নিচে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এঁকে-বেঁকে রেললাইন চলে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। যেতে যেতে হঠাৎ ওখানে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল কেন?

ওটা তো কোন স্টেশন নয়! তবে!

একি! ট্রেন থেকে মিলিটারী নামছে যে! অসংখ্য মিলিটারী!

দেখতে দেখতে একটা চাপা চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ল এখানে-ওখানে সর্বত্র।

মিলিটারী! মিলিটারী! মিলিটারী!

ঐ যে গাড়ি থেকে নেমে এদিকেই সব এগিয়ে আসছে একটু একটু করে।

প্রস্তুত হও! সংগ্রাম আসন্ন! সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে দুর্জয় বিপ্লবী শক্তির। দেখা যাক, আজকের এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে কে হারে, কে-ই বা জেতে!

—শোন লোকনাথ, আদেশ দিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন, সংগ্রাম আসন্ন। এ সংগ্রামে তোমাকেই আমি আজ সর্বাধিনায়কের পদে বরণ করলাম। তুমিই আজ সবাইকে নির্দেশ দাও।

—তাই হবে। সসম্ভ্রমে জবাব দিলেন জেনারেল বল, আশীর্বাদ করুন, আমি যেন আপনার দেওয়া এ সম্মানের যোগ্য হতে পারি।

গেট্ রেডি! সব নিজ নিজ সেক্সনে গিয়ে লায়িং পোজিশন নাও। মনে রেখো, জয় আমাদের অনিবার্য। আমরা বিপ্লবী। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে আমরা কোনদিনও মাথা নোয়াইনি, আজও নোয়াব না। যে কোন মূল্যে হোক, জয়ী আমরা হবই।

সবাই পোজিশন নিল নিজ নিজ সেক্সনে ফিরে গিয়ে।

গুরু নির্মল সেন, প্রথম শ্রেণীর নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী, এমন কি রিপাবলিকান আর্মির সর্বাধিনায়ক স্বয়ং মাস্টারদা পর্যন্ত তার ব্যতিক্রম নন।

সংগ্রাম আসন্ন। লোকনাথই সেই সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক। তাঁর আদেশ এখন তিনি মেনে নিতে বাধ্য। এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। এরই জন্যই তিনি চট্টগ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বড় আপনজন—'মাস্টারদা'।

সংগ্রামী তরুণদল প্রস্তুত।

সবার হাতে গুলী-ভর্তি মাস্কেট্রি রাইফেল। সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছেন আদেশের প্রতীক্ষায়।

ঐ যে ওরা সঙ্গীন উঁচিয়ে ক্রমশই উপরে উঠে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে।

ঐ যে ওরা এসে পড়েছে ধানক্ষেত-সংলগ্ন খোলা জমিটার মাঝ-খানে। আর ওদের এগুতে দেওয়া উচিত নয়। এই সুযোগ। কখন জেনারেল বল আদেশ দেবেন! কখন!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জেনারেল বলের বজ্রহুঙ্কার শোনা গেল—হল্ট!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় সেনাবাহিনী কিছু বুঝে উঠবার আগেই শোনা গেল সেই বহু-আকাঙ্খিত কমাণ্ড—ফায়ার। ভলি ফায়ার!

একসঙ্গে সব ক'টি মাস্কেট্রি রাইফেল গর্জে উঠল—ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

দৌড়! দৌড়! দৌড়! যাকে বলে পড়ি কি মরি দৌড়!

কেউ পালাতে সক্ষম হল, আবার কারো কারো দেহ সঙ্গে সঙ্গে নিচে গড়িয়ে পড়ল ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে।

সে কি জয়োল্লাস তখন জালালাবাদ পাহাড় জুড়ে! ইনক্লাব জিন্দাবাদ! সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক! যুদ্ধ না করে পালাচ্ছিস কেন ভীরুর দল? সাহস থাকে তো এগিয়ে আয় না!

ভাবনায় পড়লেন ক্যাপ্টেন টেট্, কর্নেল ডালাস স্মিথ, ডি. আই. জি. ফারমার প্রমুখ শ্বেতাঙ্গ সমরবিদগণ। ছত্রভঙ্গ ব্রিটিশ বাহিনীকে পাহাড়ের একটা খাদের আড়ালে জড় করে নিয়ে শুরু হল তাঁদের মন্ত্রণাসভা।

এই খোলা ধানক্ষেতটা অতিক্রম না করা পর্যন্ত কোনমতেই ওদের সামনে এগুনোর উপায় নেই। অথচ সে সুযোগ দিতে ওরা একেবারেই নারাজ। কি করা যায় এখন!

কিছুক্ষণের মধ্যেই সামরিক বাহিনী আবার উঠে দাঁড়াল নতুন পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল তাদের ড্রাম আর বিউগল ধ্বনি।

দৌড়ে গিয়ে বেয়নেট চার্জ করতে হবে। সব ক'টাকে এক এক করে গেঁথে ফেলতে হবে। কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না।

সব বৃথা। সঙ্গীন উঁচিয়ে দু'পা এগুতে না এগুতেই আবার শোনা গেল সেই রণহুঙ্কার—ফ্রেণ্ডস্! ভলি ফায়ার! লোড! ফায়ার! ফায়ার! ফায়ার!

আবার পলায়ন। আবার সেই খাদের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন।

তবে বেশিক্ষণ নয়। একটু বাদেই হঠাৎ দক্ষিণ-পুব কোণের একটা উঁচু পাহাড় থেকে ভেসে এল ভাইকার মেশিনগানের শব্দ—ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা—

সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল বল পাহাড়ের ডানদিকে অবস্থিত তরুণ-দলকে নির্দেশ দিলেন—ফ্রেণ্ডস্, এনিমি অন দি সাউথ-ইস্ট হিল—এইম্—টেন রাউণ্ডস্ র‍্যাপিড ফায়ার!

সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পুব কোণের পাহাড় লক্ষ্য করে মাস্কেট্রি রাইফেল আগুন ছড়াল—ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা—, মুহূর্ত বাদেই আর একটি মেশিনগান বৃষ্টি-ধারার মতো গুলীবর্ষণ করতে লাগল উত্তর-পুব কোণের একটা পাহাড়-চূড়া থেকে। গোটা জালালাবাদ পাহাড়টাকে যদি উড়িয়ে দিতে হয় তো সে ভি আচ্ছা, তবু ঐ দুরন্ত ছেলেগুলোকে নিশ্চিহ্ন করা চাই-ই।

ইতিমধ্যে ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। সন্ধ্যা নেমে আসছে পাহাড়ের ঢাল গড়িয়ে।

তবু মেশিনগানের গুলীবর্ষণের এতটুকু বিরাম নেই। ধুলোয় ধুলোয় চারদিক অন্ধকার। গাছপালা সব ভেঙে পড়ছে একে একে। তবু বিভিন্ন দিক থেকে একটানা তার গর্জন চলছে—ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা—

একদিকে স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান, অন্যদিকে মাস্কেট্রি রাইফেল। ·৩০৩ বোরের আর্মি রাইফেল হলে তবু বরং কথা ছিল। তাতে আর কিছু না হোক, একসঙ্গে দশটা করে গুলী ছোঁড়া যেত। কিন্তু মাস্কেট্রি রাইফেলের ক্ষমতা আর কতটুকু!

তবু তাঁরা মৃত্যু-ভয়ে ভীত নন। মৃত্যু জীবনে একবারই আসে। সবার জীবনেই আসে। কেউ তাকে এড়াতে পারে না। তাহলে কি লাভ ভীরুর মতো মৃত্যুবরণ করে!

না, সে মৃত্যু তাঁদের কাম্য নয়। তাঁদের একমাত্র কাম্য—বীরের মৃত্যু।

কেটে গেল আরো কিছুক্ষণ।

সাঁই-সাঁই করে গুলী ছুটছে অবিরাম। কেউ কাউকে ছাড়তে রাজী নয়। কেউ হার মানতে রাজী নয়।

হঠাৎ একটা কঠিন সমস্যা দেখা দিল বিপ্লবী তরুণদলের সামনে। ক্রমাগত গুলীবর্ষণের ফলে রাইফেলের ব্যারেলগুলো অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এমন কি রুমাল দিয়ে পর্যন্ত চেপে ধরা যাচ্ছে না।

তাছাড়া কার্তুজগুলোও চেম্বারে ঠিকমত ঢোকানো যাচ্ছে না। কি ব্যাপার? কেন এমন হল?

সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিলেন স্বয়ং মাস্টারদা ও তাঁর সর্বচিন্তার সঙ্গী নির্মল সেন।

সমানে মেশিনগান চলছে। লায়িং পোজিশন থেকে মাথা তোলার উপায় নেই। তাই হামাগুড়ি দিয়ে বুকে হেঁটে এক এক করে তাঁরা সব ক'টি ফ্রন্টে গিয়ে তাঁদের রাইফেলের ব্যারেলগুলোকে পরিষ্কার করে দিতে লাগলেন লুব্রিকেটিং অয়েল দিয়ে।

নাও, এবার চালাও। মনে রেখ—'কাওয়ার্ডস্ ডাই মেনি টাইমস্ বিফোর দেয়ার ডেথস্। দি ভ্যালিয়াণ্ট নেভার টেস্ট অফ ডেথ বাট ওয়ান্স্।'

সত্যিই তাই। প্রথমেই তার প্রমাণ দিলেন জেনারেল বলের ছোটভাই, ১৪ বছরের কিশোর—টেগরা।

দুরন্ত ছেলে। ভয়-ডর কাকে বলে জানেন না। মাঝে মাঝেই তিনি লায়িং পোজিশন থেকে লাফিয়ে উঠে গুলী চালাতে লাগলেন মেশিনগানের অবস্থিতি লক্ষ্য করে।

শেষপর্যন্ত কিন্তু কিছুতেই আর তিনি পারলেন না তাঁর অনিবার্য পরিণামকে ফাঁকি দিতে।

হঠাৎ একঝাঁক গুলী এসে নিমেষেই তাঁর গোটা দেহটাকে দিল ঝাঁঝরা করে।

যাবার আগে শুধু একটিমাত্র কথাই তিনি বলে গেলেন শেষবারের মতো—'সোনাভাই (জেনারেল বল), আমি চললাম। তোমরা কিন্তু থেমো না! চালিয়ে যাও।'

বিপ্লবী জীবন অতি কঠোর। তুচ্ছ হৃদয়বৃত্তির সেখানে কোন স্থান নেই। প্রমাণ, জেনারেল বলের সেদিনের সেই ঐতিহাসিক উক্তি।

মৃত্যুপথযাত্রী ছোটভাইয়ের শেষ-কথার জবাবে সেদিন তিনি কি বলেছিলেন জান, মল্লিকা?

বলেছিলেন—'কে সোনাভাই? যুদ্ধক্ষেত্রে সোনাভাই বলে কেউ নেই। আমরা সৈনিক। আমাদের একমাত্র কর্তব্য—'ডু অর ডাই।'

ডু অর ডাই! নতুন করে শপথ নিলেন প্রতিটি বিপ্লবী তরুণ। জালালাবাদ যুদ্ধের প্রথম শহীদ টেগরাকে আমরা ভুলব না। তাঁর এই মৃত্যুর প্রতিশোধ আমরা নেবই। ডু অর ডাই!

ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা—সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পুব কোণের পাহাড়-চূড়া থেকে আরো একটা ভাইকার মেশিনগান গর্জে উঠল নতুন করে।

এবার ঢলে পড়লেন ব্রিগেডিয়ার ত্রিপুরা সেন। একটু পরেই দলের সর্বকনিষ্ঠ সৈনিক নির্মল লালা। তারপরেই বিধু ভট্টাচার্য।

হাস্যরসিক বিধু ভট্টাচার্য। সারাজীবন তিনি সবাইকে হাসিয়ে গেছেন। যাবার সময়ও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। হাসতে হাসতেই তিনি তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু নরেশ রায়কে লক্ষ্য করে বলে গেলেন—'এবার তুই আয়। আমি তোকে রিসিভ করব।'

বন্ধু-বিচ্ছেদ বেশিক্ষণ আর সহ্য করতে হল না নরেশ রায়কে। দেখতে দেখতে তিনিও এক সময়ে বিদায় নিলেন নিজের কর্তব্য শেষ করে।

এবার পড়ে গেলেন বিনোদ দত্ত। তবু বিশ্রাম নেই। তবু ক্লান্তি নেই। গুরুতরভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি মাস্কেট্রি থেকে সমানে ফায়ার করতে লাগলেন—গ্রাম! গ্রাম! গ্রাম! সংগ্রামই সৈনিকের ধর্ম। সেখানে বিশ্রামের অবকাশ কোথায়?

পরবর্তী পালা অর্ধেন্দু দস্তিদারের।

দুরন্ত বেপরোয়া যুবক। মাত্র কিছুদিন আগে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন নিজের তৈরি বোমা বিস্ফোরণের ফলে। ভাল করে ঘা পর্যন্ত শুকোয়নি।

তবু সারা গায়ে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে তিনি চলে এসেছেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে নিজের ভূমিকা পালন করতে।

তোমরা যেখানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে চলেছ, সেখানে আমি কি করে পিছিয়ে থাকব বল? না, তা হয় না। আমিও থাকব তোমাদের সঙ্গে।

তারপর একে একে গেলেন শশাঙ্ক দত্ত ও মধুসূদন দত্ত। এমনভাবে তাঁদের দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যে, দেখে আর চেনার কোন উপায় রইল না।

পরবর্তী পালা যুব-বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নায়ক অম্বিকা চক্রবর্তীর। দেখতে দেখতে রক্তে রক্তে ঢেকে গেল তাঁর নাক-মুখ-চোখ-কান সব কিছু। শুধু রক্ত আর রক্ত!

সব শেষে গেলেন মতি কানুনগো, পুলিন বিকাশ ঘোষ, জিতেন দাশগুপ্ত আর প্রভাস বল। সহকর্মী বন্ধুরা সবাই চলে গেছেন একে একে। তাঁরাই বা পিছিয়ে থাকেন কি করে!

হঠাৎ পরিস্থিতি জটিল হয়ে দেখা দিল একনিষ্ঠ সৈনিক বনবিহারী দত্তের সামনে। রাইফেলটা অত্যন্ত গরম হয়ে উঠেছে। এমন কি, রুমাল দিয়েও আর চেপে ধরা যাচ্ছে না। তাছাড়া চেম্বার জ্যাম। কিছুতেই কার্তুজ ঢোকানো যাচ্ছে না চেম্বারে।

দূর থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে নিহত প্রভাস বলের পরিত্যক্ত রাইফেলটা নিয়ে বুকে হেঁটে এগিয়ে এলেন স্বয়ং মাস্টারদা। এই নাও। চালাও এবার।

অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল বনবিহারীর। মাস্টারদা! মাস্টারদা! মাস্টারদা! যুব-বিদ্রোহের সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা! নিজের হাতে তিনি রাইফেল তুলে দিয়েছেন তাঁর হাতে। এতবড় গৌরব তিনি রাখবেন কোথায়?

কিন্তু না, হল না। এটারও সেই একই অবস্থা। চেম্বার জ্যাম। কিছুতেই কার্তুজ ঢোকানো যাচ্ছে না চেম্বারে। একটু লুব্রিকেটিং অয়েল না হলেই নয়।

হঠাৎ কি দেখে চোখদুটো ধক ধক করে জ্বলে উঠল বনবিহারীর।

না, দরকার নেই। এই তো প্রভাস বলের তাজা রক্ত মাখামাখি হয়ে আছে রাইফেলটার গায়ে। শহীদের এই রক্ত দিয়েই লুব্রিকেটিং অয়েলের কাজটা চালানো যাবে কিছুক্ষণের জন্য।

কাজেও তাই করলেন বনবিহারী। রক্ত দিয়ে চেম্বার পরিষ্কার করে নিয়ে পরক্ষণেই আবার তিনি আগুন ছড়াতে শুরু করলেন নতুন উৎসাহে—ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

এবার রুষ্ট বাঘের মতো গর্জে উঠলেন জেনারেল লোকনাথ বল—'ফায়ার আনটিল দি এনিমি মেশিনগান ইজ্ কমপ্লিটলি সাইলেন্সড্'! ঐ মেশিনগানকে স্তব্ধ করতেই হবে। একটানা চালিয়ে যাও। কেউ থেমো না। ডু অর ডাই!

শুরু হল তীব্র পাল্টা আক্রমণ। শুধু ড্রাম-ড্রাম-ড্রাম—কটাক—ড্রাম! যে করে হোক, যে কোন মূল্য দিয়ে হোক, ঐ মেশিনগানকে স্তব্ধ করতেই হবে। আমরা মরব, তবু ঐ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে মাথা নোয়াব না। কিছুতেই না।

সত্যিই তাই হল। শেষপর্যন্ত মেশিনগানকেই সেদিন হার মানতে হল তুচ্ছ মাস্কেট্রি রাইফেলের প্রচণ্ডতার কাছে।

মানতে বাধ্য। কারণ, ভাড়াটে সৈনিক আর সংগ্রামী তরুণ-দলের মনোবল এক নয়। কোনদিনও তা হতে পারে না।

ওরা দুর্বার, দুর্জয়, মৃত্যুঞ্জয়ী। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এই সুযোগে মৃত্যু-ভয়হীন বেপরোয়া ছেলেগুলো যে কখন মরীয়া হয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কে জানে। তার চাইতে মানে মানে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করাই সব দিক থেকে নিরাপদ।

অন্ধকার। দেখতে দেখতে রাত্রির ঘন অন্ধকার নেমে এল জালালাবাদ পাহাড়ের বুকে।

সবাই ক্লান্ত। সবাই অবসন্ন। যুদ্ধে তাঁদের জয় হয়েছে, তবু সবার মনে বয়ে চলেছে একটা চাপা বিষাদের সুর।

সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই বিদায় নিয়েছেন একে একে। আর কোনদিনও তাঁরা ফিরে আসবেন না। কোনদিনও তাঁদের সাড়া মিলবে না। তা বলে থেমে গেলে চলবে না। সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। বিপ্লব কোনদিনও থামতে জানে না। এগিয়ে চলাই তার সহজাত ধর্ম।

কিন্তু আর জালালাবাদ নয়। আজ শত্রুপক্ষ ফিরে গেলেও কাল যে আবার অধিকতর শক্তি নিয়ে ফিরে আসবে, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এখানে থাকা আর কোনমতেই উচিত হবে না।

শুরু হল নিহত বীর সেনানীদের গার্ড অফ অনার দেবার পালা। সব ক'টি দেহকে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে হঠাৎ এক সময়ে জেনারেল বল হাঁক দিলেন—

'Comrades, in close column of groups, in single rank, fall in !'

খট্-খট্-খট্-খট্···

সঙ্গে সঙ্গে সবাই শ্রেণীবদ্ধভাবে পোজিশন নিলেন রাইফেলের নল নিচু করে। তারপরই একসঙ্গে সবাই মৃত সহকর্মীদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানালেন গোটা জালালাবাদ পাহাড় কাঁপিয়ে।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ জিন্দাবাদ ! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক ! বিদায় বন্ধুগণ, বিদায় ! তোমাদের কথা আমরা কোনদিনও ভুলব না। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তোমাদের এই নিঃশেষ আত্ম-বিসর্জনের কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল।

শুরু হল পথ-পরিক্রমা। শুরু হল চড়াই-উৎরাই ভেঙে এগিয়ে যাবার পালা।

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না। এই অন্ধকারে পথ চলতে গিয়ে কখন যে জেনারেল বল

কয়েকজন সঙ্গীসহ মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, তা টেরও পাওয়া গেল না।

এই প্রসঙ্গে প্রবীণ বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় চারুবিকাশ দত্তের লেখা থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে ধরছি।

'আবার নিরুদ্দেশ-যাত্রা শুরু হইল। পশ্চাতে পরমপ্রিয়গণের শবদেহ, সম্মুখে অন্ধকার গহন পথ, হৃদয় টানে পিছনে, কর্তব্যের আহ্বান টানে সম্মুখে।

তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। রণক্লান্ত দেহটিকে যেন প্রত্যেকে অতি কষ্টে টানিয়া নামাইয়া লইতেছে। ভারী যুদ্ধ উপকরণ-সমূহ দেহের আর পাঁচটা অংশের মতোই অপরিহার্য। ইহার উপর রহিয়াছে বিনোদ চৌধুরী ও বিনোদ দত্তের আহত দেহ স্কন্ধে তুলিয়া অবতরণ করিবার আর এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

পাহাড়ের উচ্চাংশ হইতে খানিকটা অবতরণ করিয়াই আর পথ নাই। তাহার পরেই খাড়া পাহাড়। আবার সমতল।

আর ফিরিবার উপায় নাই। নূতন পথ অনুসন্ধানের সময় নাই, চক্ষু বুজিয়া লম্ফ-প্রদান করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

অনুচ্চ কণ্ঠে পশ্চাৎ হইতে লোকনাথ বলিল—ভয় নাই, লাফিয়ে পড়।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোলের কাছের মানুষটিকেও চেনা যায় না। অগত্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের চার-পাঁচজন একসঙ্গে লাফ দিয়া নিচে পড়িতে লাগিল।

ইহারা সকলেই তখন মিনিট কয়েক দাঁড়াইল, কোন্‌দিকে যাইবে ইহাই এখন আশু প্রশ্ন।

কথাবার্তা ফিস ফিস করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াও বলা হয় না। কণ্ঠনালী যেন শুষ্ক ও রুদ্ধ। কয়েক ঘণ্টার গোলাগুলীর আওয়াজে কানেও তালা লাগিয়াছে।

পাঁচ-সাত মিনিটের ব্যবধান। অগ্রগামী লোকনাথ বল ও তাঁহার

সঙ্গীরা অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পরবর্তী দলে সূর্য সেন সহ আরও কতিপয় সমতলের পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

এই সময় মাস্টারদা প্রশ্ন করিলেন—লোকনাথেরা কোন্ পথে গেল? লোকনাথদের কোন সন্ধান মিলিল না।

আবার পথ চলা শুরু হইল। দুর্গম হইতে দুর্গমে আবার যাত্রা শুরু হইল।

ঠিক পশ্চাতেই নেতা সূর্য সেন ও অন্যতম প্রধান নায়ক নির্মল সেন হাত-ধরাধরি করিয়া চলিয়াছেন।

নিজের বলিষ্ঠ দেহের উপর অপেক্ষাকৃত কৃশ ও শীর্ণ মাস্টারদার লঘুভার লইয়া পথ চলাই নির্মলের উদ্দেশ্য।

দলের প্রতিটি ব্যক্তির সুখ-সুবিধা, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও অনুভূতির সঙ্গে এক গভীর আত্মিক যোগ এই মানুষটিরই ছিল।

সবার অগোচরে, সবার মনের চাওয়ার মতো প্রিয় কাজ করিবার প্রেরণাই যেন নির্মলচন্দ্রের জীবনধর্ম—এই জন্যই দলের মধ্যে সর্বাধিক স্নেহময়, প্রেমময়, সবারই আপন—এই আপনভোলা নির্মলদা। এই প্রাণময় মানুষটি মাস্টারদার ক্লান্ত দেহটিকেও কৌশলে বহিয়া চলিয়াছেন।

সারারাত্রি ধরিয়া পথ চলিয়া রাত্রি ভোর হইল, পথ শেষ হইল না। দুর্গম পাহাড়ের অপথে-বিপথে ঘুরিয়া ফিরিয়া মাত্র অর্ধমাইল দূরের এক পাহাড়ে তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

এই পাহাড়েরই একটি গুহার মধ্যে আশ্রয় মিলিল। দুইজনকে পাহারায় নিযুক্ত করিয়া ক্লান্ত দেহগুলি গুহার গায়ে এলাইয়া পড়িল।

ঐ অদূরে জালালাবাদ—মাস্টারদা অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন নিষ্ঠুর ঐ বধ্যভূমির দিকে। রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো বিগত দিনের স্মৃতি তাঁহার দেহের ক্লান্তিকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

এক এক সময় চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিকভাবে জ্বলিয়া উঠিতেছে। মনের কূলে ভিড় করিয়াছে পরিত্যক্ত শহীদবৃন্দের সহস্র স্মৃতি, যাহা তাঁহার জীবন-ইতিহাসের পাতায় পাতায় সহস্র গাঁথা রাখিয়া গিয়াছে। অম্বিকা চক্রবর্তী হইতে টেগরা পর্যন্ত প্রত্যেকের মুখচ্ছবি তাঁহার মানসপটে একটির পর একটি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল।'

সবাই মৃত বলে ধরে নিলেও অম্বিকা চক্রবর্তী কিন্তু তখনো বেঁচে ছিলেন, মল্লিকা। হঠাৎ তাঁর জ্ঞান ফিরে এল শেষরাত্রির দিকে।

কিন্তু কোথায় মাস্টারদা ?

কোথায় আপনভোলা নির্মল সেন ?

কোথায় লোকনাথ বল প্রমুখ সহকর্মিবৃন্দ ? কেউ নেই তাঁর পাশে। কেউ নেই।

দেহ অবশ। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর মতো শক্তিটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। তবু তিনি পাহাড় থেকে একটু একটু করে নামতে লাগলেন হামাগুড়ি দিয়ে।

ভোর হবার আগেই সেনাবাহিনী ফিরে এসে চারদিক ছেয়ে ফেলবে। তার আগেই এখান থেকে সরে পড়তে হবে। যে করে হোক, মাস্টারদাকে খুঁজে বের করতে হবে।

অনুমান মিথ্যে হল না। পরদিন ভোর হতে না হতেই সেনাবাহিনী জালালাবাদ পাহাড়কে ঘিরে ফেলল চারদিক থেকে।

এবার সংখ্যায় অনেক বেশি। অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর। যে করে হোক, বিপ্লবীদের ধরা চাই। ধরা চাই তাঁদের সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনকে।

কোথায় সূর্য সেন ? কোথায় তাঁর একান্ত অনুগত বিপ্লবী তরুণ-দল ?

কেউ নেই। শুধু এগারোটি কিশোর প্রাণ চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে সারিবদ্ধভাবে। আর আছে হাজার হাজার ব্যবহৃত কার্তুজের খোল। তাছাড়া আর কিছুই নেই।

মতি কানুনগো ও অর্ধেন্দু দস্তিদারের দেহে তখনো কিছুটা প্রাণের সাড়া ছিল।

তবে আর বেশিক্ষণ নয়। একটু বাদেই মতি কানুনগো চোখ বুজলেন তাঁর বিপ্লবী সতীর্থদের পথ অনুসরণ করে।

অর্ধেন্দুকে পাঠানো হল হাসপাতালে। সেখানেই তিনি দেহরক্ষা করলেন নিজের কর্তব্য সুসম্পন্ন করে।

শাসকদের মাথায় তখন দুশ্চিন্তার বোঝা। কি করা যায় এখন এই দেহগুলোকে নিয়ে?

শহরে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। যুব-শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখা তখন কষ্টকর হবে। তার চাইতে এখানেই ব্যবস্থা করা যাক।

তাই করা হল। শেষপর্যন্ত সব ক'টি দেহই জ্বালিয়ে দেওয়া হল সারা গায়ে পেট্রোল ঢেলে। জালালাবাদ ধন্য হল।

এই প্রসঙ্গে যুব-বিদ্রোহের অন্যতম সেনানায়ক বিপ্লবী অনন্ত সিংহের লেখা থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি:

'আগুন দেওয়া হল। দেখতে দেখতে এগারোটি চিতা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল—আকাশ লাল হয়ে গেল। গুর্খা সৈন্য অ্যাটেনশন হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ইংরেজ সমর-অধিনায়কেরা তাদের টুপি খুলে হাতে নিল। ভারতীয় অফিসারেরা নতমস্তকে বিপ্লবীদের অভিনন্দন জানাল। কারও চোখ জলে ভরে গেল। দেখতে দেখতে আগুনের তীব্র শিখা তাঁদের নশ্বর দেহ পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

জালালাবাদ যুদ্ধ ইংরেজের বিরুদ্ধে এক গৌরবময় যুদ্ধ। ভারতবাসী কোনদিনও তা ভুলবে না। অন্তিমবার্তা সন্ধ্যার সময় শহরে ছড়িয়ে পড়ল। চট্টগ্রামবাসী শোকাচ্ছন্ন। কত জননী পুত্র হারালেন, কত ভগ্নী ভাই হারিয়েছেন। ঘরে ঘরে দুঃখের ছায়া, আবার গৌরবের

চিহ্ন। প্রিয়জনকে হারাবার শোক, আবার জয়ের গর্ব। চট্টগ্রামের বহু ঘরে সেদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলেনি। রান্নাঘর অন্ধকার—উনোনও ধরানো হয়নি।

২২শে এপ্রিল, ১৯৩০ সাল, শহীদদের চিতার অগ্নিশিখা চট্টগ্রামের আকাশে লাল অক্ষরে লিখে দিল—'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!'

১৯৩০ সাল। ২২শে এপ্রিল। জালালাবাদ যুদ্ধ শেষ হল। এগারোটি শহীদের চিতার আগুন চট্টগ্রামের আকাশে রক্তের অক্ষরে লিখে দিল—চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ জিন্দাবাদ! সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!

কিন্তু যুব-বিদ্রোহের অন্যতম সেনানায়ক অনন্ত সিংহ তখন কোথায়?

কোথায় জেনারেল গণেশ ঘোষ?

আনন্দ গুপ্ত বা জীবন ঘোষালই বা কোথায়?

অগ্নিদগ্ধ হিমাংশু সেনকে নিয়ে ১৮ই এপ্রিল তারিখে সেই যে তাঁরা মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তারপর এ পর্যন্ত তাঁদের আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি। কোথায় গেলেন তাঁরা?

খবর পাওয়া গেল সেদিনই রাত আটটায়, চট্টগ্রাম থেকে আট মাইল দূরবর্তী পুটিয়ারী রেল স্টেশনে।

হঠাৎ কি দেখে লোভী মনটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল স্টেশন-মাস্টার অশ্বিনী ঘোষের।

কাউন্টারে দাঁড়িয়ে একটি সুদর্শন কিশোর। অদূরে আরো তিন-জন। দেখে মনে হয় নিরীহ গ্রাম্য লোক।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

চাটগাঁয়ে জোর লড়াইয়ের খবর পাওয়া গেছে। তাদের কেউ নয় তো ?

নিশ্চয়ই তাই।

না, এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না। ধরিয়ে দিতে পারলে সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে নিশ্চয়ই একটা মোটা টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে। এমন কি, সঙ্গে একটা খেতাব জুটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। চাকুরি-জীবনে এ যে আশাতীত সৌভাগ্য !

গাড়ি ইন করতেই গার্ড ফেরেরার কাছে নিজের সন্দেহের কথাটা জানিয়ে দিলেন অশ্বিনী ঘোষ।

শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সীতাকুণ্ড, ফেণী, কুমিল্লা, লাকসাম প্রভৃতি স্টেশনে টেলিগ্রাম করে দিলেন অতি তৎপরতার সঙ্গে। এই নম্বরের টিকেটের যাত্রীদের উপর নজর রাখুন। ওদের হাবভাব দস্তুরমত সন্দেহজনক।

হু হু করে ট্রেন ছুটে চলেছে ব্যাকুল মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

ভেতরে সেই চারজন নিরীহ গ্রাম্য যাত্রী। লক্ষ্য—কলকাতা।

অনেক চেষ্টা করেও মাস্টারদা বা মূলবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। সে আশাও সুদূরপরাহত।

এদিকে ঢাকা এবং কলকাতা থেকে অসংখ্য সৈন্য এসে পড়েছে।

কি লাভ এখানে থেকে শুধু শুধু ধরা দিয়ে ! সুতরাং চল এবার বৃহত্তম কর্মক্ষেত্র কলকাতায়।

রাত দুটোয় ফেণী। স্টেশনে গাড়ি ইন করতেই সঙ্গে সঙ্গে কামরায় ঢুকল বিরাট এক পুলিস বাহিনী।

দেখি সবার টিকেট। হ্যাঁ, এই যে সেই চারজন। এরাই পুটিয়ারী থেকে গাড়িতে উঠেছে। চল এবার মাস্টারবাবুর ঘরে।

অনন্ত সিংহ তখন রূপকথার নায়ক। কত গল্প, কত কাহিনীই না

সেদিন প্রচলিত ছিল তাঁকে কেন্দ্র করে। তিনি নাকি শুধু হাত দিয়ে নয়, দরকার হলে হাত পা, চোখ কান, সব কিছু দিয়ে রিভলবার চালাতে পারেন, এমনি অনেক জনশ্রুতি।

কথাটা যে একেবারে অত্যুক্তি নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল একটু বাদেই। জিনিসপত্র সব কিছুই তল্লাশী করে দেখা হয়েছে। এবার শরীর তল্লাশী করার পালা।

প্রথমেই ডাকা হল জীবন ঘোষালকে। দেখি তোমার কোমরে কি আছে!

ব্যস্, আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত সিংহের রিভলবার গর্জে উঠল—ড্রাম! ড্রাম!

ইঙ্গিত পেয়ে জীবন ঘোষাল আর আনন্দ গুপ্তও আগুন ছড়ালেন —ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

প্রাকৃতিক কারণে একটু আগেই দুজন প্রহরীসহ গণেশ ঘোষ গিয়েছিলেন বাইরে। সিগন্যাল পেয়ে তিনিও সাড়া দিলেন— ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

শুরু হল চিৎকার চেঁচামেচি আর হৈ-হল্লা। আরে বাস্‌রে বাস! দিয়েছে কোমরটা একেবারে শেষ করে। ঐ যে পালাচ্ছে! ধর ওদের!

সব বৃথা। কাকে ধরবে! কেউ কোথাও নেই। নিমেষে সব হাওয়া।

বিপদ এল অন্যদিক থেকে। রাত্রির অন্ধকারে ছুটে পালাতে গিয়ে প্রথমেই দলছাড়া হয়ে পড়লেন অনন্ত সিংহ। তারপরে গণেশ ঘোষ।

অবশ্য কিছুক্ষণ পরেই আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষালের সঙ্গে গণেশ ঘোষের আবার যোগাযোগ হয়েছিল, কিন্তু অনন্ত সিংহ সেই যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, তারপর আর কিছুতেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়ে উঠল না।

যোগাযোগ হল কলকাতায়। অনেক পথ ঘুরে ঘুরে চারজনই আবার এখানে এসে মিলিত হলেন একে একে। আশ্রয়ের ব্যবস্থা হল চন্দননগরে।

এ ব্যাপারে যুগান্তর দলের অন্যতম নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, কিরণ মুখার্জী, কালীচরণ ঘোষ, সুভাষের মেজদা শরৎ বোস ও বি. ভি.-র অন্যতম নায়ক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ ব্যাপারে আরো একজন লোক জড়িত ছিলেন বিশেষভাবে। তিনি হলেন চন্দননগরের গোন্দলপাড়ার বিশিষ্ট বিপ্লবী বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। চন্দননগরে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার ব্যাপারে তাঁর অবদান ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য।

২৪শে এপ্রিল তারিখে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন অমরেন্দ্র নন্দী।

অমরেন্দ্র নন্দীর কথা তোমাকে আগেই বলেছি। মাস্টারদার নির্দেশ—শহরে গিয়ে কাউকে ওখানকার পরিস্থিতি জেনে আসতে হবে। কাকে পাঠানো যায় এ কাজের ভার দিয়ে? হ্যাঁ, তুমিই যাও অমরেন্দ্র। ফিরে এসে সব কিছু আমার কাছে রিপোর্ট কর।

কিন্তু ফিরে আসা আর হল না মল্লিকা। তার আগেই তিনি চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন পুলিস ও মিলিটারীর বেষ্টনীর মাঝে।

যাকে বলে সপ্তরথী বেষ্টিত বীর বালক অভিমন্যু। একদিকে পুলিস ও মিলিটারী বাহিনীসহ ক্যাপ্টেন টেট, ডি. আই. জি. ফারমার প্রমুখ সমরবিদগণ, অন্যদিকে অমরেন্দ্র একা। তবু ইণ্ডিয়ান রিপাবলি-কান আর্মির সৈনিক হয়ে কোনরকমেই তিনি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে রাজী নন।

শেষপর্যন্ত আশ্রয় নিলেন একটা কালভার্টের নিচে। দুহাতে দুটি গুলী-ভর্তি রিভলবার। আসুক না পুলিস বা মিলিটারী, হাতে যখন অস্ত্র রয়েছে, তখন ভয় কি!

—এখনো আত্মসমর্পণ কর। বার বার আবেদন জানাতে লাগল শ্বেতাঙ্গ সমরবিদগণ, কোন ভয় নেই তোমার। অস্ত্র ফেলে দাও। চুপ করে থেকো না। জবাব দাও।

জবাব দিলেন গুলীর মুখে—গ্রাম! গ্রাম! ব্যস্, সব শেষ। আত্মসমর্পণ করার চাইতে শেষপর্যন্ত তিনি ইচ্ছামৃত্যুই বরণ করে নিলেন বীরের মতো, তবু কিছুতেই এতটুকু মাথা নোয়ালেন না সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের কাছে।

মাস্টারদা তখন আশ্রয় নিয়েছেন দলের একান্ত শুভার্থী কোয়েপাড়া নিবাসী বিনয় সেনের বাড়িতে।

যুদ্ধশেষে জালালাবাদ পাহাড় থেকে নিচে নামতে গিয়ে কিছুসংখ্যক সঙ্গীসহ জেনারেল বল যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, সেকথা তোমাকে আগেই বলেছি। খোঁজ-খবর নিয়ে এবার তাঁরাও এসে আবার মাস্টারদার পাশে জড়ো হলেন একে একে।

শুরু হল মন্ত্রণাসভা। কি করা যায় এখন? থামলে চলবে না। আঘাতের পর আঘাত হানতে হবে। শক্ত আঘাত।

রজত সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ রায়, মনোরঞ্জন সেন, সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী প্রমুখ তরুণদল তখন উন্মত্ত, বেপরোয়া। রক্ত চাই! রক্ত দিয়েই আমরা স্মৃতিতর্পণ করব জালালাবাদ পাহাড়ের সেই শহীদদের উদ্দেশ্যে।

শেষপর্যন্ত তাঁরা ধরে বসলেন যুব-বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক, দলের ছোট-বড় সবার প্রিয় নির্মল সেনকে। মাস্টারদাকে আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন নির্মলদা। আমরা অনুমতি চাই।

অনুমতি পাওয়া গেল ৫ই মে তারিখে। মাস্টারদা ও নির্মলদাকে প্রণাম করে যথাসময়ে ছয় বন্ধু বেরিয়ে পড়লেন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে। ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে ওদের রক্ত দিয়েই আজ

শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে। কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না।

না, সুবিধে হল না। চারদিকে সশস্ত্র মিলিটারী। কার সাধ্য তাদের ঐ কঠোর বেষ্টনী ভেদ করে এক পা এগিয়ে যায়! সুতরাং আজকের মতো প্রোগ্রাম স্থগিত রাখা ছাড়া কোন উপায় নেই।

কিন্তু সামনেই রজতদের বাড়ি। রজতের মা বিনোদিনী দেবী দলের ছোট-বড় সবার মা। এই সেদিনও তিনি অনন্তদা, গণেশদা ওঁদের বুক দিয়ে আড়াল করে রেখেছিলেন পুলিস ও মিলিটারীর হিংস্রতার হাত থেকে। এই ফাঁকে ওখানে গিয়ে ঐ চট্টলজননীর পা দুটিতে মাথাটা একবার ঠেকিয়ে আসা যায় না!

—তুই! এতদিন পরে হারানো নিধিকে বুকে পেয়ে আনন্দে ও আবেগে চোখে জল এসে গেল বিনোদিনী দেবীর, আয় বাবা। সবাই বোস এখানে।

—আমার ওপর তুমি রাগ করনি তো মা? প্রণাম করতে গিয়ে আদুরে গলায় বললেন রজত।

—রাগ! চট্টলজননীর সারামুখে মুগ্ধ সম্ভ্রমের বিহ্বলতা—পাগল ছেলে! আমি কি তোদের ওপর রাগ করতে পারি কখনো! তোদের মা বলে আজ আমার কত গর্ব সে শুধু আমিই জানি। শুধু কি আমার? তোরা আজ সারাদেশের গর্বের বস্তু বাবা!

—বড্ড খিদে পেয়েছে মা। কিছু খাবার ব্যবস্থা করে দাও না!

—দিচ্ছি বাবা। তোরা একটু বোস। আমি এখুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

খাবার প্রস্তুত। দেখে প্রতিটি তরুণ খুশিতে ভরপুর। মায়ের নিজের হাতের তৈরি খাবার। সংসারে কোথাও যে এর তুলনা নেই!

খাওয়া কিন্তু আর হল না, মল্লিকা। তার আগেই বাইরে প্রহরারত রজতের ছোট ভাই এসে জানাল—দাদা, কুইক। পুলিস আসছে।

পুলিস! সঙ্গে সঙ্গে সবাই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন উদ্যত

রিভলবার হাতে নিয়ে। মাকে প্রণাম করে পরক্ষণেই তাঁরা পেছনের দরজা দিয়ে অন্ধকারে মিশে গেলেন একে একে। আর তাঁদের দেখা গেল না।

পুলিস বাহিনী অবাক। আশ্চর্য, কেউ নেই। কিন্তু খবর তো মিথ্যে নয়! তাহলে গেল কোথায় ওরা?

ওঁরা তখন কর্ণফুলী নদীর মাঝ-বরাবর। লক্ষ্য—ওপারে যাওয়া। সাম্পানে চেপে কোনরকমে একবার ওপারের মাটিতে পা দিতে পারলে আর পায় কে!

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস বাহিনী তৎপর হয়ে উঠল দ্রুতগামী একটা মোটরলঞ্চ নিয়ে।

চালাও জোরসে। ঐ যে সার্চলাইটের আলোতে ওদের সাম্পান দেখা যাচ্ছে। ফলো কর ওদের। তবে নিরাপদ দূরত্বের ব্যবধান রেখে। ওদের বিশ্বাস নেই। হয়তো ঠাঁই করে একখানা ঝেড়ে দিয়ে কপাল ফুটো করে দেবে। খুব সাবধান!

—সাম্পান থামাও। সার্চলাইট জ্বেলে বার বার সঙ্কেত জানাতে লাগল পুলিস বাহিনী, এক্ষুণি মুখ ফেরাও সাম্পানের।

জবাব না দিয়ে আরো তীব্রগতিতে এবার সাম্পান ছুটে চলল তীরের দিকে। মৃত্যুকে তাঁরা থোড়াই পরোয়া করেন, তা বলে বিনা-যুদ্ধে ধরা দিতে কোনরকমেই তাঁরা প্রস্তুত নন।

ওপারে পৌঁছে পুলিস বাহিনী হতভম্ব। আশ্চর্য, কেউ কোথাও নেই। যেন হাওয়ায় মিশে গেছে ছেলেগুলো!

ইতিমধ্যে অসংখ্য মিলিটারী সহ সদর থানা ইনচার্জ আজিম খাঁ সাহেব, ডি. এস. পি. আসানুল্লা, পটিয়ার দারোগা, কর্ণেল ডেলাস্মিথ, ডি. আই. জি. ফারমার, ম্যাকডোনাল্ড, হেম দারোগা প্রমুখ সবাই ওপারে পৌঁছে গেছে একে একে।

বিপ্লবীদের হদিস না পেয়ে এবার শুরু হল সেই চিরাচরিত কূট-নৈতিক খেলা। অর্থাৎ, এ অঞ্চলের সহজ সরল মুসলমানদের ডাকো।

তাদের বলো যে, তোমাদের গাঁয়ে ডাকাত পড়েছে। ধরিয়ে দিতে পারলে মোটা টাকা পুরস্কার।

কাজেও তাই হল। সঙ্গে সঙ্গেই রব উঠল—ডাকাত! ডাকাত! ঐ যে ওদিকে গেছে। ধর ওদের!

বাধা পেয়ে মুহূর্তে রিভলবার আগুন ছড়াল—দ্রাম! দ্রাম! পথ ছেড়ে দাও ভাইসব। আমরা ডাকাত নই। তোমাদের কোন ক্ষতি আমরা করব না। আমাদের দুশমণ ইংরেজ, তোমরা নও।

কে কার কথা শোনে! ইতিমধ্যে গুলীর আঘাতে কয়েকজন ধূলিশয্যা নিয়েছে, তবু তাদের মুখে সেই একই কথা—ওরা ডাকাত। ওদের ধরতে পারলে অনেক টাকা পুরস্কার মিলবে।

অচেনা অজানা পরিবেশ। পথঘাট সম্বন্ধেও কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। তদুপরি চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না।

সংঘর্ষে আহত হয়ে প্রথমেই ধরা পড়লেন সুবোধ চৌধুরী। তারপরে ফণীন্দ্র নন্দী। বাকি চারজন জুলধা গাঁয়ে ঢুকে পড়লেন গুলীর মুখে পথ পরিষ্কার করে।

পুব আকাশে রঙ ধরেছে। অন্ধকার তরল হয়ে আসছে একটু একটু করে।

তিন দিন খাওয়া নেই। তৃষ্ণার জলটুকু পর্যন্ত জোটেনি কোথাও। হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসছে ক্রমশঃ। কিছু খাবার না পেলে আর এক পা-ও এগুনো সম্ভব নয়।

সামনেই একটি মুসলমান গৃহস্থ-বাড়ি। দরজায় দাঁড়িয়ে জনৈকা বৃদ্ধা।

নিরুপায় হয়ে সবাই এবার এগিয়ে গিয়ে আবেদন জানালেন—আমাদের দুটি পান্তাভাত খেতে দেবে মা? আমরা তিন দিন কিছু খাইনি!

মা! অদ্ভুত একটা মমতায় মুখখানি কোমল হয়ে উঠল বৃদ্ধার।

সারারাত ধরে গাঁয়ে গোলাগুলী চলেছে। বলতে গেলে গোটা গাঁ-টাকেই মিলিটারী ঘেরাও করে রেখেছে চারদিক থেকে।

এ অবস্থায় আগন্তুকদের পরিচয় অনুমান করে নিতে মোটেই দেরি হল না তাঁর। তবু সব কিছু জেনেও ঐ 'মা' সম্বোধনটির চিরন্তন দাবীকে কিছুতেই তিনি পারলেন না উপেক্ষা করতে। তাই মায়ের মতো করেই বললেন—'আমি এখুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তবে তোরা আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস নে বাপধন। ঐ শরবনে গিয়ে গা-ঢাকা দে। আমি একটু পরেই খাবার নিয়ে আসছি।'

এত সাধের খাবার কিন্তু এবারও তেমনি হাতেই ধরা রইল মল্লিকা। তার আগেই কে একজন বাইরের লোক আত্মগোপনকারীদের দেখে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল—'ঐ যে ওরা ওখানে লুকিয়ে রয়েছে!'

সঙ্গে সঙ্গে এখানে-ওখানে পুলিসের সাঙ্কেতিক বাঁশি একটানা বেজে চলল বহুক্ষণ পর্যন্ত। আসামীদের সন্ধান মিলেছে। সবাই চলে এস এদিকে। প্রস্তুত হও। লড়াই আসন্ন।

বেষ্টনী ছোট হয়ে এল ক্রমশঃ। রাইফেল আর মেশিনগান সহ সামরিক বাহিনী বুকে হেঁটে এগুতে লাগল একটু একটু করে। যেন রীতিমত একটা যুদ্ধক্ষেত্র আর কি!

শরবনে আত্মগোপনকারী রজত, স্বদেশ, মনোরঞ্জন ও দেবপ্রসাদ তখন প্রস্তুত। হাতে উদ্যত রিভলবার। প্রাণ যায় তো যাক, তবু আত্মসমর্পণ করে চট্টলের গৌরবময় ইতিহাসকে তাঁরা কলঙ্কিত হতে দিতে রাজী নন।

ডি. আই. জি. ফারমারের নির্দেশে এবার হেম দারোগা চোঙা মুখে দিয়ে জানাল তার শেষ আদেশ—হাতের অস্ত্র ফেলে দাও। এভাবে যুদ্ধ করার একমাত্র অর্থ মৃত্যু। তার চাইতে আত্মসমর্পণ কর।

কি জবাব এল জান মল্লিকা? জবাব এল মনোরঞ্জনের কণ্ঠে —'মনোরঞ্জন ডাজ্‌ নট নো হাউ টু সারেণ্ডার। আই ওয়াণ্ট টু বি যতীন মুখার্জী অফ বালাসোর'।

সঙ্গে সঙ্গেই শরবন থেকে শুরু হল গুলী-বৃষ্টি—ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

শুরু হল ঐতিহাসিক কালারপোল যুদ্ধ।

সামরিক বাহিনীর বিরাট সমর-সম্ভারের বিরুদ্ধে চারটে রিভলবার আর কতক্ষণ! কিছুক্ষণের মধ্যেই গুলী শেষ। তবে কি আত্মসমর্পণ! না, কিছুতেই নয়।

সহসা শরবন থেকে ভেসে এল একজনের দীপ্ত কণ্ঠস্বর—'প্রাণ থাকতে কিছুতেই আমরা ধরা দেব না। দেবুকে আমি গুলী করছি, তারপর তুই আমাকে গুলী কর রজত। এমনি করে আমরা একে অন্যকে গুলী করে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেব, তবু ঐ ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে কোনরকমেই আত্মসমর্পণ নয়। রেডি প্লীজ! ওয়ান-টু-থ্রি—'

ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

স্বদেশ, মনোরঞ্জন ও রজত সঙ্গে সঙ্গেই শেষ। দেবপ্রসাদও আর বেশিক্ষণ নয়। তাঁরও সময় আসন্ন।

প্রভুর নির্দেশে দেবপ্রসাদের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল হেম দারোগা—'আপনি কি কিছু বলতে চান? বড়সাহেব এখানেই রয়েছেন। ইচ্ছে হলে তাঁকে বলতে পারেন।'

আরে বাসরে! যাকে বলে একেবারে আসল কালকেউটের বাচ্চা। মৃত্যুপথযাত্রী দেবপ্রসাদ কি উত্তর দিলেন, শুনবে মল্লিকা?

না, নিজের কোন কথা নয়। বাবা মা ভাইবোন কারো কথাই নয়। বললেন তাঁর একটি মাত্র অন্তিম বাসনার কথা—'কে বড়সাহেব! লোম্যান? হাতটা জখম হয়ে পড়েছে, নইলে এক্ষুণি আমি তাকে গুলী করতাম।'

কি নির্ভীক উক্তি! কল্পনাও বুঝি করা যায় না। তবে দেবপ্রসাদের সেই অন্তিম বাসনা কিন্তু বেশিদিন অপূর্ণ থাকেনি মল্লিকা। মাস তিনেক বাদেই পুলিসের হর্তা-কর্তা-বিধাতা সেই লোম্যানকে একদিন শেষশয্যা নিতে হয়েছিল এই বাংলা দেশেরই মাটিতে। সেকথা পরে আসছে।

এপ্রিল শেষ। মে-ও যায় যায়।

ইতিমধ্যে পুলিস ও সামরিক বাহিনীর তৎপরতার ফলে যুব-বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ ধরা পড়েছেন।

কিন্তু কোথায় সেই মহাবিপ্লবী সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন?

কোথায় তাঁর সর্ব চিন্তা, সর্ব কার্যের সঙ্গী নির্মল সেন?

গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই বা কোথায়? তাঁরা বাইরে থাকা পর্যন্ত কোন-রকমেই যে সরকার বাহাদুরের নিশ্চিন্ত হবার যো নেই।

অঘটন ঘটল ২৮শে জুন তারিখে।

হঠাৎ সেদিন অনন্ত সিংহ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলেন গোয়েন্দা-বিভাগের হেড কোয়ার্টার্স ইলিসিয়াম রো-তে গিয়ে। সঙ্গে সেই লোম্যানকে উদ্দেশ্য করে লেখা একখানি চিঠি। তাতে লেখা রয়েছে—

প্রিয় মিঃ লোম্যান,

১৯৩০ সালের ২৮শে জুন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। আমি নিশ্চিন্ত যে, আমাকে গ্রেপ্তার করার সে সুযোগ তুমি হারাবে না। আমি তার জন্য প্রস্তুত। মনে কর না যে, আমি আত্মসমর্পণ করছি। লোকে কখন আত্মসমর্পণ করে? যখন সে একান্ত অসহায়, বা আত্ম-রক্ষার কোন পথ পায় না, তখনই সে নত হয়।

আমি কি এখন অসহায়? না, কখনোই না। আমার আত্ম-রক্ষার অস্ত্র আছে, খরচ করার মতো প্রচুর অর্থ আছে, সহায়তা করার

মতো লোকও আছে। বাংলা, বাংলার বাইরে বা ভারতের বাইরে থাকবার মতো আশ্রয়ও আছে। তবু যে ধরা দিচ্ছি তার কারণ কি? তুমি কি ভেবেছ আমার কাজের জন্য আমি অনুতপ্ত? না, কখনোই না। আমি একবিন্দু দুঃখিত নই। তবে কি উপর থেকে আমার ওপর কোন আদেশ এসেছে? না, এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়।

বিদ্রোহী অনন্তলাল সিংহ।

খবর শুনে সে কি প্রচণ্ড আলোড়ন সেদিন সারা দেশ জুড়ে! সবার মুখে একই প্রশ্ন। কি ব্যাপার?

অমরেন্দ্র, রজত, স্বদেশ, মনোরঞ্জন, দেবপ্রসাদের মতো ছেলেরা যেখানে আত্মসমর্পণ করার চাইতে আত্মবিসর্জন দেওয়াটাকেই শ্রেয় বলে মেনে নিয়েছেন, সেখানে অনন্ত সিংহের মতো একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা এভাবে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে গেলেন কেন?

এর পেছনে অন্য কোন প্ল্যান নেই তো?

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সিংহের নিজের লেখনী থেকেই এ প্রশ্নের জবাব মিলেছে মল্লিকা। তিনি জানিয়েছেন—না, কোন প্ল্যানই সেদিন তাঁর ছিল না। ওটা তাঁর নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার সঙ্গে যুব-বিদ্রোহের কোনই সম্পর্ক নেই। সুতরাং এ প্রসঙ্গ এখানেই থাক।

তবে অন্যদিক থেকে তাঁর এই আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা যে খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

ধৃত বন্দীদের মধ্যে কয়েকটি অপরিণত বয়স্ক বালক ইতিমধ্যেই কিছুটা স্বীকারোক্তি করেছিল পুলিসের কাছে। প্রিয় নেতা অনন্তদাকে কাছে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাদের মুখে শোনা গেল উল্টো সুর।

না, ও স্বীকারোক্তি আমরা স্বেচ্ছায় দিইনি। পুলিস জোর করে আদায় করে নিয়েছিল আমাদের মুখ থেকে।

নিঃসন্দেহে এ কৃতিত্ব অনন্ত সিংহের। তিনিই যে সেদিন এ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিলেন, কোনমতেই তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এবার পাড়ি দিলেন লোকনাথ বল।

মাস্টারদার নির্দেশে প্রথমেই তিনি এলেন কলকাতায়। তারপর চন্দননগরের সেই গোপন আস্তানায়।

লোকনাথ বল সম্বন্ধে মাস্টারদার এই সিদ্ধান্তের যথেষ্ট কারণ ছিল মল্লিকা।

প্রথমতঃ ব্যায়ামবিদ হিসেবে লোকনাথ বল চট্টগ্রামে অত্যন্ত সুপরিচিত। তদুপরি যেমন সুঠাম চেহারা, তেমনি ফুটফুটে গায়ের রঙ। হঠাৎ দেখলে সুভাষ বোস বলে ভুল হয়। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সত্যিই কষ্টকর।

তবে বেশিদিন আর থাকতে হল না।

তারিখটা ছিল ১লা সেপ্টেম্বর। হঠাৎ সেদিন শেষরাত্রে কলকাতার পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট গোটা বাড়িটাকে ঘিরে ফেললেন কোন এক অজ্ঞাত সূত্র থেকে খবর পেয়ে। তারপরই উভয়পক্ষ থেকে শুরু হল একটানা রিভলবার গর্জন।

বিরাট পুলিস বাহিনীর বিরুদ্ধে সামান্য চারটে রিভলবার আর কতক্ষণ! তাই তীব্র সংঘর্ষের পরে লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত সবাই ধরা পড়লেন একে একে।

স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করে এতকাল যাঁরা তাঁদের সব কিছু থেকে আড়াল করে রেখেছিলেন, সেই শশধর আচার্য ও সুহাসিনী গাঙ্গুলীও রেহাই পেলেন না।

হারিয়ে গেলেন শুধু একজন। তিনি হলেন জীবন ঘোষাল। বলতে গেলে গোটা দেহটাই তাঁর ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল বুলেটের আঘাতে।

৯ই অক্টোবর ধরা পড়লেন অম্বিকা চক্রবর্তী। তখনো তিনি পুরোপুরি সুস্থ নন। জালালাবাদ যুদ্ধের সেই গভীর ক্ষতচিহ্ন তখনো মিলিয়ে যায়নি তাঁর দেহ থেকে।

এদিকে মাস্টারদা তখন প্রস্তুত। একটা অত্যন্ত জরুরী খবর পাওয়া গেছে গোপন সূত্র থেকে।

খবরটা হল পুলিস বিভাগের সর্বময় কর্তা মিঃ ক্রেগের গতিবিধি সম্বন্ধে। যাকে বলে একেবারে পাকা খবর। সুতরাং এ সুযোগ হারালে চলবে না।

চট্টগ্রামের জনসাধারণের ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন চলেছে তার প্রায়শ্চিত্ত এবার তাকে করতেই হবে।

এগিয়ে এলেন দলের অতি দায়িত্বশীল কর্মী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। এবার আমার পালা। বোমা ফেটে আহত হবার দরুন সেদিন আমি যুব-বিদ্রোহে যোগ দিতে পারিনি। তা বলে এবার আমি পিছিয়ে থাকতে রাজী নই।

যথাসময়ে রামকৃষ্ণ ট্রেনে চেপে বসলেন সহকর্মী কালী চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে। লক্ষ্য—চাঁদপুর। ক্রেগ-এরও লক্ষ্য সেই চাঁদপুর। সুতরাং অসুবিধার কিছু নেই।

১লা ডিসেম্বর। শেষরাত্রি। প্রচণ্ড কুয়াশা পড়ছে বাইরে। দুহাত দূরের জিনিসও ভাল করে নজরে পড়ে না।

গাড়ি চাঁদপুরে ইন করতেই ত্রস্তে দুজন এগিয়ে গেলেন প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে। এই সুযোগ, এই অপূর্ব সুযোগটিকে কাজে লাগাতে হবে।

কে ওখানে বসে আছে ওভারকোট গায়ে দিয়ে! ক্রেগ না! হাঁ, তাই তো!

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল দুজনের অগ্নি-বর্ষী রিভলবার—গ্রাম! গ্রাম! গ্রাম! গ্রাম!

শুরু হল হৈ-চৈ চিৎকার আর চেঁচামেচি। ঐ যে ছুটে পালাচ্ছে! ধর ওদের! সব বৃথা। দেখা গেল, কেউ কোথাও নেই।

আরো দেখা গেল যে, নিহত ব্যক্তি ক্রেগ নন, রেল ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জী। তবে হঠাৎ দেখে বোঝা মুশকিল। বেশ সাদৃশ্য রয়েছে দুজনের চেহারায়।

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল কুমিল্লা, লাকসাম, চট্টগ্রাম ও এখানে-ওখানে সর্বত্র। চারদিকে কড়া নজর রাখ। একটি প্রাণীও যেন পুলিসের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই আটক করবে। যে করে হোক, আততায়ীদের ধরা চাই-ই।

পরদিনই সে খবর প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়।

গুলীর আঘাতে ইন্সপেক্টর নিহত

চাঁদপুর স্টেশনে বিষম ব্যাপার

'চাঁদপুর, ১লা ডিসেম্বর। অদ্য খুব সকালে চাঁদপুর রেলওয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে রেলওয়ে পুলিস ইন্সপেক্টর বাবু তারিণী মুখোপাধ্যায় গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন। ২নং ডাউন সুর্মা মেলের সম্মুখে বাংলা পুলিসের ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ ক্রেগকে অভ্যর্থনা করিতে যাইয়াই তারিণীবাবু নিহত হইয়াছেন। তিনি পুলিসের ইউনিফর্ম পরিহিত ছিলেন এবং ঘটনার অব্যবহিত পরেই আহত অবস্থায় হাসপাতালের দিকে নেওয়া হইলে পথিমধ্যেই তিনি মারা যান।

স্থানীয় পুলিস জোর তদন্ত করিতেছে। অপরাধীদের সন্ধানের জন্য সমস্ত স্থানে খানাতল্লাশ হইতেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।' [আনন্দবাজার, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৩০]

তৎপরতা ব্যর্থ হল না। পরদিন দুজনে ধরা পড়লেন পুলিসের হাতে। মৃত্যুর পূর্বে একটি খবর কিন্তু জানিয়ে যেতে ভুল করেননি

তারিণী মুখার্জী। আততায়ীদের একজনের গায়ে নীল রঙের আলোয়ান ছিল। এই নীল রঙের আলোয়ানই কাল হয়ে দাঁড়াল শেষপর্যন্ত।

সংবাদপত্র থেকেই সেই গ্রেপ্তারের বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি।

'চাঁদপুর স্টেশনে ইন্সপেক্টর তারিণীনাথ মুখার্জীর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে গতকল্য অপরাহ্ণ ১ ঘটিকার সময় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় দুই-জন বাঙালী যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের নিকট তিনটি গুলী-ভরা রিভলবার, একটি আস্ত বোমা, কতকগুলি কার্তুজ এবং কয়েকটি বৈদ্যুতিক মশাল পাওয়া গিয়াছে।

তাহাদের গায়ে রঙীন চাদর ছিল এবং তাহারা চাঁদপুর হইতে লাকসামের দিকে আসিতেছিল।

যুবক দুইটির নাম রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং কালীপদ চক্রবর্তী। তাহারা নাকি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার ফেরারী আসামী। তাহাদের কুমিল্লায় আনয়ন করা হইয়াছে।' [আনন্দবাজার, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩০]

বিচারে রামকৃষ্ণের হল প্রাণদণ্ড, আর বয়েস কম বলে কালীপদ চক্রবর্তীকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

যথাসময়ে রামকৃষ্ণ একদিন জীবন উৎসর্গ করলেন ফাঁসি-মঞ্চে, কিন্তু যাবার আগে তাঁর অপূর্ব সংগঠন শক্তির এমন একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেলেন, যা অগ্নিযুগের ইতিহাসে আজও আপন দীপ্তিতে দীপ্যমান হয়ে আছে।

সেই উজ্জ্বল রত্নটি হলেন—প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার।

এই প্রীতিলতাই সেদিন ছোটবোন অমিতা পরিচয়ে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতেন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে গিয়ে। শুধু একদিন নয়, দিনের পর দিন।

পুলিস কোনদিন তা জানতে পারেনি। জেনেছিল অনেক পরে। তখন সব শেষ।

রামকৃষ্ণের ফাঁসির পরেই প্রীতিলতা কলকাতার জীবন শেষ করে চট্টগ্রাম ফিরে গেলেন দুর্জয় একটা সঙ্কল্প বুকে নিয়ে। যে করে হোক, মাস্টারদার সঙ্গে একবার পরিচিত হতে হবে। তাঁকে যে বড্ড প্রয়োজন!

বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। যথাসময়ে একদিন তিনি মাস্টারদার পদপ্রান্তে হাজির হয়েছিলেন ছোট্ট একটি দাবী নিয়ে। এবার আমাকে একটা সুযোগ দিন মাস্টারদা। শুধু একটা সুযোগ!

চট্টগ্রামে তখন পুরোপুরি পুলিস ও মিলিটারীর রাজত্ব চলছে। গাঁয়ে গাঁয়ে কত যে অস্থায়ী ছাউনি গড়ে উঠেছে, তার বোধহয় কোন গোনাগুনতি নেই।

জনসাধারণ তটস্থ। বিশেষ করে বালক, কিশোর ও যুবকদের তো কথাই নেই। সবার জন্য আলাদা আলাদা পরিচয়-পত্র। এই পরিচয়-পত্র ছাড়া কারো পক্ষে এক পা বাইরে যাবার উপায় নেই। তাও একরকম নয়, লাল-নীল-সাদা এমনি বিভিন্ন রকমের পরিচয়-পত্র।

সংবাদপত্র থেকেই তার কিছুটা বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি। এই বিবরণ থেকেই তুমি বুঝতে পারবে যে, চট্টগ্রামবাসীকে সেদিন কিভাবে জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাও একদিন দুদিন নয়, বছরের পর বছর ধরে।

'গতকল্য ১৪৪ ধারা জারির পর হইতে বিভিন্ন কেন্দ্রে সামরিক প্রহরী মোতায়েন করা হইয়াছে। গত রাত্রি হইতে বড় বড় রাস্তাগুলি দিয়া সাঁজোয়া গাড়ি টহল দিয়া বেড়াইতেছে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট একখানা আদেশ জারি করিয়া জনসাধারণকে রাত্রি ১০টার পর বিশেষ অনুমতি লইয়া বাড়ির বাহির হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অশান্তি নিবারণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।' [আনন্দবাজার, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৩১]

কঠোর ব্যবস্থার নমুনা পাওয়া গেল মাত্র তিন দিন বাদেই।

চট্টগ্রামে সামরিক সতর্কতা

মোড়ে মোড়ে মেশিন কামান সজ্জা

'···কমিশনারের ভবনে একটি সভা হয়। কর্তৃপক্ষ সে সভায় যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহা মানিয়া লইয়াছেন।···দায়িত্বসম্পন্ন পুলিস কর্মচারীরা এখন মোড়ে মোড়ে যে সব পাহারা মোতায়েন আছে, সেইসব স্থানে উপস্থিত থাকেন।

রাস্তার লোকজনের উপর খানাতল্লাশ এখনও চলিতেছে এবং লোহার কাঁটা বসান তক্তা দিয়া রাস্তার মাঝে মাঝে এখনও বেড়া দেওয়া আছে, ভীষণদর্শন মেশিন কামানসমূহ আন্দাকালী পাহাড়ের উপরিস্থ বাড়িগুলির উপরে এবং পল্টনে বুলফ ব্রাদার্সের বাড়ির উপরে এবং সামরিক হিসাবে গুরুত্ববিশিষ্ট অন্যান্য মোড়ে বসান হইয়াছে।' [আনন্দবাজার, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৩১]

ওদিকে তখন শুরু হয়েছে মামলা। আসামী মোট বত্রিশ জন।

॥ গণেশ ঘোষ ॥ অনন্ত সিংহ ॥ লোকনাথ বল ॥ হেরম্ব বল ॥ ॥ আশুতোষ ভট্টাচার্য ॥ সুকুমার ভৌমিক ॥ অর্ধেন্দু গুহ ॥ ফণীন্দ্র নন্দী ॥ সহায়রাম দাস ॥ অশ্বিনীকুমার চৌধুরী ॥ সৌরীন্দ্র দত্ত চৌধুরী ॥ শ্রীপতি চৌধুরী ॥ রণধীর দাশগুপ্ত ॥ ধীরেন্দ্রলাল দস্তিদার ॥ ॥ সুখেন্দুবিকাশ দস্তিদার ॥ ননীগোপাল দেব ॥ মলিনবিকাশ ঘোষ ॥ ॥ নিতাইপদ ঘোষ ॥ মধুসূদন গুহ ॥ সুবোধচন্দ্র মিত্র ॥ সুবোধ চৌধুরী ॥ সুবোধ বিশ্বাস ॥ সুবোধ বল ॥ সুবোধ রায় ॥ শান্তিভূষণ নাগ ॥ বিজয়কুমার সেন ॥ অনিলকুমার রক্ষিত ॥ আনন্দ গুপ্ত ॥ ॥ নন্দলাল সিংহ ॥

বাকি তিনজন অভিভাবক। কালারপোল সংগ্রামে রজত সেন ও দেবপ্রসাদ গুপ্ত শহীদের মৃত্যুবরণ করলেও তাঁদের অভিভাবকদের রেহাই নেই। তাই তাঁদেরও এনে দাঁড় করানো হয়েছে আসামীর কাঠগড়ায়। অন্যজন অনন্ত সিংহের পিতা গোলাপ সিংহ। তিনিও আসামী তালিকাভুক্ত।

সারা ভারতের দৃষ্টি তখন চট্টগ্রামের দিকে। বন্দীদের ভাগ্যে কি আছে কে জানে! প্রতিশোধ নেবার এমন সুযোগ কি ইংরেজ সরকার এত সহজে ছেড়ে দেবে?

তবে ভরসার কথা এই যে, শরৎ বসু, বীরেন্দ্র শাসমল, শ্রীশ বসু, অখিল দত্ত, কামিনী দত্ত, এন. আর. দাশগুপ্ত, কালীচরণ ঘোষ, এন. সি. মুখার্জী, মহিম গুহ, জে. কে. ঘোষাল, সন্তোষ বসু প্রমুখ বাংলার সুদক্ষ আইনজীবিগণ সবাই আসামীপক্ষ সমর্থন করছেন। দেখা যাক কি হয়!

এবার এক নতুন পরিকল্পনায় হাত দিলেন মাস্টারদা। যে করে হোক, বিচারাধীন বন্দীদের মুক্ত করে আনতে হবে।

দুটো পথ খোলা আছে। এক—ডিনামাইট চার্জ করে কোর্ট-ভবন উড়িয়ে দিয়ে সেই ফাঁকে সবাইকে মুক্ত করে আনা। আর—জেলখানার দেয়াল উড়িয়ে দিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা।

সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলেন অন্যতম নায়ক নির্মল সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার, মহেন্দ্র চৌধুরী, শৈলেশ রায়, অর্ধেন্দু গুহ, শ্রীপতি চৌধুরী, দীনেশ চক্রবর্তী ও নিবারণ ঘোষ প্রমুখ কর্মিবৃন্দ। এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না। যে করে হোক, এ পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতেই হবে।

বন্দীদের মধ্যে অর্ধেন্দু গুহ, মধুসূদন গুহ প্রমুখ কয়েকজন তখন জামিনে মুক্ত। যথাসময়ে কোর্টে হাজির হয়ে আবার তাঁরা বাড়ি ফিরে যান কোর্টের কাজ শেষ হবার পরে।

প্রধানতঃ অর্ধেন্দুর সাহায্যেই যোগাযোগ স্থাপিত হল মাস্টারদা

ও বিচারাধীন বন্দীদের মধ্যে। কাজও এগিয়ে গেল অনেক দূর। জেলের অভ্যন্তরস্থ সেপাই-সান্ত্রীদেরও হাত করা হল একে একে।

তবু কিছুতেই কিছু হল না। ১৯৩১ সালের ২রা জুন সব কিছুই ফাঁস হয়ে গেল দলের একটি কিশোর কর্মীর আকস্মিক গ্রেপ্তারের ফলে।

শুধু তাই নয়। গর্ত খুঁড়তে গিয়ে জেলের অভ্যন্তরস্থ অস্ত্রশস্ত্রও একদিন ধরা পড়ে গেল ভেতরে কর্মরত রাজমিস্ত্রীদের হাতে। ফলে, এতদিনের পরিশ্রম, এত অর্থব্যয়, সব কিছুই গেল বিপর্যস্ত হয়ে।

সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে পর পর তুলে দিচ্ছি।

চট্টগ্রাম জেলে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র

'প্রকাশ যে, স্থানীয় জেলের মধ্যে ট্রাইব্যুনেল মামলার আসামীদের বাসস্থানের নিকটে আজ সকালে কতিপয় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে।

এতাবৎ সঠিক সংবাদ জানা যায় নাই। লোকনাথ বলের অসুস্থতায় আজ আর স্পেশাল ট্রাইব্যুনেলের অধিবেশন বসে নাই।'

[আনন্দবাজার, ৬ই মে, ১৯৩১]

চট্টগ্রামে ডিনামাইট আবিষ্কার

আদালতের নিকট ডিনামাইট পূর্ণ বাক্স

'অদ্য প্রাতঃকালে জনসাধারণ চট্টগ্রামের আদালতের নিকটস্থ ভূগর্ভে ডিনামাইট আবিষ্কারের বিস্ময়কর সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত চমকিত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, চারিটি অদ্ভুত রকমের কালো বাক্সে পূর্ণ ডিনামাইট কালেক্টারির পশ্চিম দিকের জমির নিচে পাওয়া গিয়াছে এবং এই

অদ্ভুত বাক্সগুলি উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে আদালতের সোপান পর্যন্ত লম্বা তার দিয়া সংযুক্ত করা হইয়াছিল।

বাক্সগুলির চারিদিকেই তার ছিল এবং সেই তারগুলি উত্তর ও দক্ষিণ দিকের লম্বা তারের সহিত যুক্ত করা ছিল। উক্ত কালো বাক্সগুলি আদালত গৃহের প্রধান প্রাচীরের তলে কয়েক ফুট মাটির নিচে খনন করিয়া পাওয়া গিয়াছে।' [আনন্দবাজার, ৩রা জুন, ১৯৩১]

চট্টগ্রামে সান্ধ্য-আইন জারি

'ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে অদ্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৬ হইতে ২৬ বৎসর বয়স্ক সমস্ত হিন্দু ভদ্রলোক যুবকদিগকে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ভোর ৫টা পর্যন্ত—এই সময়ের মধ্যে গৃহত্যাগ করিতে নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

আগামী ৮ই জুন হইতে এই আদেশ বলবৎ করা হইবে এবং চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি, জেটি ও পাহাড়তলি অঞ্চলের মধ্যে যে সমস্ত হিন্দু যুবক বসবাস কিংবা অবস্থান করে, তাহাদের উপর এই আদেশ বর্তিবে।' [আনন্দবাজার, ৬ই জুন, ১৯৩১]

চট্টগ্রামে নিত্যনূতন আবিষ্কার

'প্রকাশ, অদ্য প্রাতঃকালে দেওয়ান বাজারস্থিত একটি বাড়িতে খানাতল্লাশীর সময় পুলিস কতকগুলি তাজা কার্তুজ, দুই বাক্স বিস্ফোরক, এসিড এবং কতকগুলি বৈদ্যুতিক তার পাইয়াছে।

হৃদয় দাস নামক জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরো কয়েকটি বাড়িতে খানাতল্লাশী করিয়া তিনজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। তন্মধ্যে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা সম্পর্কে বিচারাধীন আসামী, অধুনা জামিনে মুক্ত অনিল রক্ষিত নামক জনৈক যুবকও আছে।'

[আনন্দবাজার, ১৮ই জুন, ১৯৩১]

চট্টগ্রামে পিটুনী পুলিস

১৪ দিনের মধ্যে ট্যাক্স দিতে হইবে

'জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিস হইতে চট্টগ্রাম জেলার ৫২ খানা গ্রামের অধিবাসীদের উপর পিটুনী পুলিসের ট্যাক্স দিবার জন্য নোটিশ জারি করা হইতেছে। নোটিশ জারি করিবার ১৪ দিনের মধ্যে ট্যাক্স দিতে হইবে।' [আনন্দবাজার, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩১]

জীবনে সার্থকতা ফেলে কেউ ব্যর্থতা চায় না। তবু তা পেতে হয়। তবু তা মেনে নিতে হয়।

পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করার দুর্বার প্রেরণায় সেদিন যাঁরা স্বেচ্ছায় সুখী ও শান্তজীবন পরিত্যাগ করে কঠিন কঠোর রক্তাক্ত পথকে বেছে নিয়েছিলেন, বাংলাদেশের সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীরাও সেই সহজ সত্যটাকে মেনে নিয়েছিলেন হাসিমুখেই।

চট্টলসূর্য মাস্টারদাও তার ব্যতিক্রম নন। তাই সাময়িক ব্যর্থতাকে বড় করে না দেখে এবার তিনি বিনোদবিহারী দত্ত, সরোজ গুহ, রমেন ভৌমিক, বিনোদ চৌধুরী প্রমুখ দুঃসাহসী তরুণদের জেলার বাইরে পাঠিয়ে দিলেন নতুন এক দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়ে।

যাও, দুঃসাহসের পাখায় ভর করে এগিয়ে যাও। শুধু জেলার মধ্যেই এই বৈপ্লবিক কর্মধারাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। এবার তাকে ছড়িয়ে দাও বাংলাদেশের এখানে-ওখানে—সর্বত্র।

পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পেল ১৯৩১ সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখে। সেদিন ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডুর্নোকে প্রকাশ্য রাজপথে ধূলিশয্যা নিতে হল যুব-বিদ্রোহের দুই তরুণকর্মী সরোজ গুহ আর রমেন ভৌমিকের অব্যর্থ গুলীতে।

কুমিল্লার কুখ্যাত ডি. এস. পি. এলিসনও রেহাই পেল না। তাকেও একদিন চরম শাস্তি মাথা পেতে নিতে হল দুঃসাহসী তরুণ শৈলেশ রায়ের হাতে। পুলিস তাঁর কোন হদিসই পেল না।

বাদ গেল না চট্টগ্রামের গোয়েন্দা বিভাগের জঁাদরেল অফিসার আসানুল্লাও। যাকে বলে মহাশয় ব্যক্তি। চট্টলবাসীরা বোধহয় এ হেন মহাপুরুষটির নির্মম অত্যাচারের কথা কোনদিনই ভুলতে পারবে না।

গ্রেপ্তারের পরে অসুস্থ অম্বিকা চক্রবর্তীর ওপর কি পাশবিক নির্যাতনই না করেছিল এই আসানুল্লা। প্রহারে প্রহারে জর্জরিত হয়ে অম্বিকা চক্রবর্তী তখন গোঙাতে শুরু করেছেন—জল! একটু জল!

—জল! সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীর সর্বাঙ্গে মূত্রত্যাগ করে অট্টহাস্যে ভেঙে পড়েছিল আসানুল্লা—এই নে জল! যত খুশি খা!

বিশ্বাস করা শক্ত। রুচিতেও হয়তো বাধবে। তবু একথা দিবালোকের মতো সত্য।

দেশদ্রোহীর ক্ষমা নেই। আজ হোক, কাল হোক, চরম শাস্তি তাকে পেতেই হবে। এবার এল সেই শাস্তি দেবার পালা।

১৯৩১ সাল। ৩০শে আগস্ট। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপার খান বাহাদুর আসানুল্লা, সবাই সেদিন চট্টগ্রাম নিজাম পল্টন মাঠে উপস্থিত। আজ ফাইনাল খেলা। খেলার শেষে বিজয়ী দলকে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

চারপাশে পুলিসের কঠোর বেড়াজাল। কারোরই সামনে যাবার উপায় নেই। হঠাৎ শোনা গেল রিভলবার গর্জন—গ্রাম! গ্রাম! গ্রাম! ব্যস্, খানবাহাদুর খতম।

আততায়ী ধরা পড়লেন ঘটনাস্থলেই। নাম—হরিপদ ভট্টাচার্য। কিন্তু এ কি! এ যে তেরো-চোদ্দ বছরের একটি বালক মাত্র। বিশ্বাস করাও শক্ত।

বিপ্লবের পথ কোনদিনই সুখের নয়। অপমান, অত্যাচার, নির্যাতন—এ তো তাঁদের কাছে বলতে গেলে একটা কথার কথা মাত্র! তবু সেই তেরো-চোদ্দ বছরের বালক হরিপদর ওপর সেদিন যে পৈশাচিক নির্যাতন করা হয়েছিল, কোথাও বুঝি তার তুলনা নেই।

প্রথমেই আঙুলে সূঁচ ফুটিয়ে দেওয়া হল স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য। তারপর ব্যাটারী চার্জ। বল, তোমাদের নেতা সূর্য সেন কোথায়? বললে পুরস্কার পাবে। অনেক টাকা পুরস্কার।

গরীব পিতামাতার সন্তান। খুবই গরীব। অতিকষ্টে পড়াশুনা করেন, তাও স্কুলে নয়, টোলে। তবু হরিপদ সেই প্রলোভনের কাছে মাথা নোয়ালেন না। একটি বারের জন্যও না।

জবাব না পেয়ে এবার চোখের সামনে বৃদ্ধ পিতামাতার ওপর নির্যাতন শুরু হল। সেই সঙ্গে আগুন দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হল বাড়ি-ঘর-দুয়ার সব। দেখ, দুচোখ ভরে তাকিয়ে দেখ! কেমন লাগছে এখন দেখতে! এখনো বল সূর্য সেন কোথায়? কোথায় তাঁর অন্তরঙ্গ সহচর নির্মল সেন? কোথায় তারকেশ্বর দস্তিদার, বিনোদবিহারী দত্ত, মহেন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ দলের অন্যান্য ছেলেরা?

হরিপদ নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। জেরার পর জেরা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। তবু একটি কথাও কেউ শুনতে পেল না তাঁর মুখ থেকে।

এবার শুরু হল শোভাযাত্রা। চারপাশে পুলিস বেষ্টনী, মাঝখানে হরিপদ। কে কোথায় আছ, তামাসা দেখবে এসো!

লোক জড় হলেই অমানুষিক প্রহার। সেই সঙ্গে অকথ্য গালাগালি। চুপ করে থাকলে চলবে না। ভাল চাস তো এখনো উত্তর দে। বল, ইংরেজ বাহাদুরের জয়!

হাজার নির্যাতনে যা সম্ভব হয়নি, এবার তা সম্ভব হল মল্লিকা।

হরিপদ সত্যিই এবার জবাব দিলেন। কি জবাব দিলেন শুনবে?

প্রহারে প্রহারে জর্জরিত হয়ে হাজার মানুষের সমক্ষে বীর বালক বুক চিতিয়ে জবাব দিলেন—জয় মাস্টারদার জয়! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!

একদিন দুদিন নয়, এমনি করে দিনের পর দিন। প্রহারের চোটে সর্বাঙ্গ দিয়ে অজস্র রক্ত ঝরছে, সঙ্গীনের খোঁচায় চোখ-মুখ সব

কিছু অস্বাভাবিকভাবে ফুলে উঠেছে, তবু বালক হরিপদ একটিমাত্র কথাই সেদিন বলে গেছেন বার বার—'মাস্টারদার জয় হোক! সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক'!

হরিপদ ভট্টাচার্য আজো বেঁচে আছেন মল্লিকা। বয়স কম ছিল বলে ফাঁসির রজ্জু তাঁকে কেড়ে নিতে পারেনি।

কিন্তু আজকের এই স্বাধীন দেশে ক'জন মানুষ তাঁকে চেনে? ক'জন তাঁর নাম শুনেছে?

রাষ্ট্র তাঁকে স্বীকৃতি দিতে না পারে, ইতিহাস তাঁর কৃতিত্বকে বেমালুম অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু তোমরা!

হরিপদর মতো অশেষ নির্যাতনভোগী মানুষগুলোকে যদি আজও তোমরা যথাযোগ্য সম্মান দিতে না পার, তবে সে লজ্জা তাঁদের নয় মল্লিকা, তোমাদেরই।

এখানেই শেষ হল না। দিন কয়েক যেতে না যেতেই আরো একটি উৎসাহী দেশদ্রোহীকে নিয়তির অমোঘ নির্দেশ মাথা পেতে নিতে হল এমনি করেই। তারিখটা ছিল ১৬ই মার্চ।

মাস্টারদা তখন কানুনগো পাড়ার গোপন আস্তানায়। সঙ্গে রয়েছেন সর্বক্ষণের সঙ্গী নির্মল সেন ও গুটিকয়েক বিশ্বস্ত কর্মী।

সেদিন তারকেশ্বর দস্তিদার ও বীরেন দে এসে মিলিত হয়েছেন কানুনগো পাড়ার সেই গোপন আস্তানায়। মাস্টারদার সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে একটু আলাপ-আলোচনা করা দরকার।

আলোচনা শেষ। এবার দুজনকে ফিরে যেতে হবে শহরের সেই নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

তারকেশ্বর তখন রীতিমত অসুস্থ। যুব-বিদ্রোহের দিন কয়েক আগে সর্বাঙ্গ তাঁর দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল বোমা বিস্ফোরণের ফলে। তখনো তার জের মেটেনি। তবু কর্তব্যের প্রেরণায় তিনি এগিয়ে এসেছেন সব কিছু বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে।

মেঘে রৌদ্রে মেশামেশি বৈরাগী অপরাহ্ণ। মন উদাস করা পরিবেশ।

রাস্তায় পা দিয়েই সহসা কি দেখে দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তারকেশ্বরের। অদূরে দাঁড়িয়ে একটি নিরীহ গ্রাম্য লোক। এ গাঁয়েরই কেউ হবে হয়তো।

কিন্তু না, একটু নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। মাস্টারদা আশে পাশেই রয়েছেন। মাথাব দাম তাঁর ধার্য হয়েছে মোট দশ হাজার টাকা। তদুপরি সঙ্গে রয়েছেন নির্মলদা। সুতরাং সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

পরিকল্পনা মতো বেশ জোরে জোরে খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়েই আচমকা দুজনে ঘুরে দাঁড়ালেন পেছনের দিকে। দেখা যাক, লোকটি সত্যিই তাঁদের অনুসরণ করে পেছনে পেছনে আসছে কিনা!

যা ভাবা গিয়েছিল ঠিক তাই। তাঁদের ঘুরে দাঁড়াতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে লোকটি যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে গেল থতমত খেয়ে।

এবার আর চিনতে ভুল হল না তারকেশ্বরের। শশাঙ্ক দারোগা। সাধারণ পোশাকে থাকলেও লোকটি আসলে কুখ্যাত শশাঙ্ক ভট্টাচার্য ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু ও এখানে কেন! কি মতলব ওর! মাস্টারদার অবস্থিতির কথা ও কিছু জেনে ফেলেনি তো!

না, ক্ষমা নেই। এই অহেতুক কৌতূহলের শাস্তি ওকে পেতেই হবে। সর্বাগ্রে মাস্টারদার নিরাপত্তার প্রশ্ন। সুতরাং কোনরকমেই ওকে ছেড়ে দেওয়া চলবে না।

সামনেই একটা দু-মুখো পথের বাঁক। মনস্থির করে এবার দুজনে দুদিকে এগিয়ে গেলেন দ্রুত পায়ে। অর্থাৎ—অনুসরণকারী যে পথ ধরেই আসুক না কেন, তার রেহাই নেই। গুলী-ভর্তি আর্মি রিভলবার দুদিকেই প্রস্তুত।

বাঁক বরাবর এসেই বারেকের জন্য থমকে দাঁড়াল শশাঙ্ক দারোগা। তাই তো! কোন পথে গেল ওরা! তবে কি শিকার ফসকে গেল হাতের মুঠো থেকে!

মুহূর্তমাত্র, পরক্ষণেই কি ভেবে শশাঙ্ক দারোগা এগিয়ে গেল বরমা গাঁয়ের মেঠো পথ ধরে। নিশ্চয় ওরা এ পথে গিয়েছে। যে করে হোক, ওদের নাগাল পাওয়া চাই। ধরিয়ে দিতে পারলে অনেক টাকা পুরস্কার। সেই সঙ্গে চাকরিতে পদোন্নতি। না, এ সুযোগ হারালে চলবে না।

একটা খড়ের গাদার আড়ালে দাঁড়িয়ে তারকেশ্বর তখন প্রস্তুত। ঐ যে শশাঙ্ক দারোগা এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। আর একটু কাছে এলেই হয়। হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে।

বুঝি এক লহমার ব্যাপার, তারপরই তারকেশ্বরের হাতের আর্মি রিভলবার আগুন ছড়াল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

সঙ্গে সঙ্গেই দারোগাবাবু শুয়ে পড়লেন গুরুতরভাবে জখম হয়ে। পুরস্কারটা যে এমন হাতে হাতে মিলে যাবে তা কে জানত!

১৯৩২ সালের ১৩ই জুন শুরু হল ঐতিহাসিক ধলঘাট সংঘর্ষ।

মাস্টারদা, নির্মল সেন, প্রীতিলতা, অপূর্ব সেন সবাই সেদিন আত্মগোপন করে ছিলেন ধলঘাট-নিবাসী সাবিত্রী দেবীর আস্তানায়।

হঠাৎ বিরাট এক গুর্খাবাহিনী নিয়ে ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ এসে হাজির। তারপরই উভয়পক্ষ থেকে শুরু হল অগ্নি-বর্ষণ।

প্রথমেই শেষশয্যা নিলেন সামরিক বাহিনীর অধিকর্তা ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ। তারপর নির্মল সেন। সবশেষে অপূর্ব সেন।

মাস্টারদা অন্যত্র সরে যেতে সক্ষম হলেন প্রীতিলতাকে নিয়ে। হাজার চেষ্টা করেও তাঁর গতিরোধ করা সম্ভব হল না।

যথাসময়ে সে সংবাদ প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়:

চট্টগ্রামে সৈন্য ও বিপ্লবীতে সংঘর্ষ

'এইমাত্র সংবাদ আসিয়াছে যে, গতরাত্রে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ার নিকটে বিপ্লবী ও সৈন্যদের এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে গুর্খা

বাহিনীর ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ ও ২জন বিপ্লবী নিহত হইয়াছেন। বিপ্লবীদের নিকট ২টি রিভলবার ও গুলী ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। নিহত বিপ্লবীদের একজনকে নির্মল সেন বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে।

[আনন্দবাজার : ১৫-৬-৩২]

মানুষের মৃত্যু আছে, কিন্তু ইতিহাসের মৃত্যু নেই।

কোথায় আজ মাস্টারদা! কোথায় প্রীতিলতা বা যুব-বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নায়ক, ছোট-বড় সবার প্রিয় মহানুভব নির্মল সেন!

কেউ আজ বেঁচে নেই। কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনা সম্বন্ধে প্রীতি-লতার নিজের হাতের লেখা ডায়েরীর কয়েকটি পাতা কিন্তু আজো অম্লান হয়ে বেঁচে আছে ইতিহাসের একটি মূল্যবান তথ্যরূপে। বিশেষ কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি।

'...এইদিন নির্মলদা যে সমস্ত কথা বলে যাচ্ছিলেন, তাতে মনে হয়, নির্মলদা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর যা কিছু বলার আছে সেইদিনই বলে ফেলতে হবে, না হলে হয়তো আর বলা হবে না।

নির্মলদা বললেন—মাস্টারদার শেষ কাজটি এখনো বাকি, সেটি হল ফিমেল অ্যাকশন—মেয়েদের দিয়ে একবার শক্তির খেলা দেখানো।

আমি বললাম—আমার বড্ড মরতে ইচ্ছে করছে।

নির্মলদা বললেন—তুই কিসের জন্য মরবি?

কে জানত যে, কয়েক ঘণ্টা পরেই মৃত্যু এসে হাজির হবে, নির্মলদাকে বেঁধে নিয়ে যাবে, আমাকে স্পর্শও করবে না।

আশ্চর্য! মাস্টারদার সঙ্গে এই দুদিন ধরে বেশি কথা বলিনি, সারাদিন প্রায় নির্মলদার সঙ্গেই বসেছিলুম। ইহজীবনের সব কথা যেন একদিনেই শেষ করেছিলাম।

সেদিন সকালবেলা ভোলার (অপূর্ব সেন) জ্বর। এই জ্বর গায়েই

সারাদিন কমিক করেছে। এই আনন্দের জীবন্ত নির্ঝরটাকে যতই দেখছিলাম, ততই যেন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম।

আমি যখন সাগু রান্না করছি ভোলা তখনও গুনগুন করে আবৃত্তি করে চলেছে—'পরাণ আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মত নাচে রে।' আমার হাতে এ জীবনের শেষ-খাওয়া সে খেয়ে নিল।

ঠিক এই সময় মাস্টারদা নিচ থেকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে বললেন—পুলিস এসেছে।

বুঝলাম, এই মুহূর্তেই সব শেষ হয়ে যাবে। ওঁদের বললাম—আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকব।

মাস্টারদা চোখ বড় বড় করে আদেশের স্বরে বললেন—নিচে মেয়েদের মধ্যে চলে যাও, তাদেরই আত্মীয় বলে পরিচয় দিও।

নিচে নেমে গেলাম মই বেয়ে। উপরে ভোলা (অপূর্ব সেন), নির্মলদা ও মাস্টারদা।

ততক্ষণে ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ এসে রিভলবার হস্তে মই বেয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছে। নির্মলদা দাঁড়িয়ে গুলী করলেন। ক্যামেরণ গুলীবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

দুদিক থেকেই গুলী চলতে লাগল। মাস্টারদারা উপর থেকে ও পুলিস বাহিনী নিচে থেকে।

হঠাৎ নির্মলদার আর্তনাদ শুনতে পেলুম। আর স্থির হয়ে থাকতে পারলুম না। উপরে উঠতে গেলাম, নিচের মেয়েরা তিনজনেই চেপে ধরল আমাকে। ওদিকে নির্মলদার ব্যথাকরুণ কণ্ঠ—রাণী, রাণী! (প্রীতিলতার ডাক নাম ছিল রাণী)

এই অন্তিম সময়েও যদি একটিবার নির্মলদার কাছে যেতে পারতুম, জানি না আমায় কি বলতেন! ভগবান আমাকে একটিবার নির্মলদাকে দেখে আসতে দিলেন না।

এমন সময় মাস্টারদা ও ভোলা নিচে নেমে এলেন দেখে ভারি আনন্দ হল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল—ওঁরা কেউ আর নেই।

আমি মাস্টারদার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে বললাম—মাস্টারদা, আমাকে ফেলে যাবেন না। আমি আপনার সঙ্গেই যাব। এ সময়ে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, মাস্টারদার সঙ্গ ছাড়ব না।

মাস্টারদার পাশেই তখন ভোলা দাঁড়িয়ে ছিল। চোখের একটি পলকে তাকে আর একবার দেখে নিলাম। কি চমৎকার লেগেছিল, এতবড় বিপর্যয়েও চোখ-মুখে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। রিভলবারের ট্রিগারে আঙুলটি রেখে মাস্টারদার আদেশের অপেক্ষায় আছে।

তিনজনেই রওনা হলাম, ভোলা চলল পথ দেখিয়ে আগে আগে। শুকনো পাতার ওপর পায়ের খসখস শব্দ হতেই অন্ধকারের বুক চিরে শব্দভেদী গুলী এসে ভোলার বক্ষভেদ করল।

রামকৃষ্ণদা বলেছিলেন—ভোলার সাথে আলাপ করতে। আলাপের চূড়ান্ত হয়ে গেল। আজ দুদিন ধরে কেবল ওর হাসি শুনছিলাম, অবশেষে আমারই দুচোখের সামনে সে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।'

ইতিমধ্যে কখন যে মেঘে মেঘে আকাশটা কালো হয়ে উঠেছে কেউ তা লক্ষ্য করেনি। এবার বৃষ্টি নামল। প্রথমে টিপ টিপ করে। পরে মুষলধারে।

ঝড়-জল মাথায় নিয়েই প্রীতিলতাসহ এবার মাস্টারদা গিয়ে আশ্রয় নিলেন জৈষ্টপুরাতে।

শুধু বাইরে নয়, মনেও তখন তাঁর ঝড় বইছে। উদ্দাম ঝড়। সংগ্রামী জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী নির্মল সেন আজ আর তাঁর পাশে নেই। এ জীবনে আর কোনদিনই তাঁর সাড়া পাওয়া যাবে না। এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত।

মাস্টারদার সেদিনের মনোভাব সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় চারুবিকাশ দত্ত রচিত 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' গ্রন্থ থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি।

'...উপরে উঠিয়া মহেন্দ্র মাস্টারদার বিষণ্ণ মুখের পানে তাকাইয়া শিহরিয়া উঠিল। চক্ষুদ্বয় কোটর-প্রবিষ্ট, মুখখানি অস্বাভাবিক গম্ভীর ও বিষণ্ণ। তাঁহার বুক ফাটিয়া একটা কান্নার স্বর বাহির হইয়া আসিতেছিল।

মহেন্দ্র কাছে বসিয়া এই প্রথম দেখিল—মাস্টারদার চক্ষুর কোল বাহিয়া অশ্রুমালা একটির পর একটি ঝরিয়া পড়িতেছে।

বেদনাবিষণ্ণ কণ্ঠে মাস্টারদা বলিলেন—'আজ আমার বড় দুর্দিন। আজ আমার ডান হাতখানিই ভেঙে গেল। যে সময় নির্মলবাবুরই প্রয়োজন সর্বাধিক, ঠিক সেই সময়েই তাঁকে হারালাম।'

আর বলিতে পারিলেন না। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল। দুর্বহ বেদনাভারে বিপ্লবী নেতা মাস্টারদা ভাষাহারা হইয়া রইলেন।

সেদিনের কুটির আশ্রয়ের প্রতিটি বুকে তখন শোকের ছায়া নামিয়াছে। সবাই জানিলেন, তাঁহাদের নির্মলদা নাই, অপূর্ব সেন নাই। দুরন্ত বাতাসে প্রতিধ্বনি উঠিল—নাই, নাই, নাই।'

ওদিকে তখন ঘুম টুটে গেছে মহামান্য ইংরেজ সরকারের। যে করে হোক, সূর্য সেনকে গ্রেপ্তার করা চাই-ই। অন্যথায় কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। সংবাদপত্র থেকেই তাদের সেই তৎপরতার খবর এখানে তুলে দিচ্ছি।

সূর্য সেনকে ধরিয়া দিতে পারিলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার

'১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন কার্যে বিপ্লবী দলের নেতা বলিয়া কথিত সূর্য সেনকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে, বা এমন সংবাদ দিতে পারিবে যাহাতে সে ধরা পড়ে, তাহাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

গত ১৩ই জুন তারিখে পটিয়ার বিপ্লবীদের সহিত যে সংঘর্ষের ফলে ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ নিহত হইয়াছেন, সূর্য সেনই নাকি সেই সংঘর্ষের পরিচালক।' [আনন্দবাজার : ৩-৭-৩২]

কিন্তু শুধু সূর্য সেনকে ধরলেই চলবে না। সেই সঙ্গে প্রীতি-লতাকেও ধরা চাই। কিন্তু প্রীতিলতা তখন কোথায়! এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কি লেখা রয়েছে শোন :

চট্টগ্রামের পলাতকা

'চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানার ধলঘাটের শ্রীমতী প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার গত ৫ই জুলাই, মঙ্গলবার চট্টগ্রাম শহর হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। তাহার বয়স ১৯ বৎসর। পুলিস তাহার সন্ধানের জন্য ব্যস্ত।' [আনন্দবাজার : ১৩-৭-৩২]

পরবর্তী ঘটনা অগ্নিযুগের ইতিহাসের একটি বিশেষ স্মরণীয় অধ্যায়—বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের নেতৃত্বে পাহাড়তলী ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ।

সামরিক পোশাকে সুসজ্জিতা প্রীতিলতার সারা মনে সেদিন সে কি কূলপ্লাবী আনন্দ! সে কি বিরাট পরিতৃপ্তি! বুঝি এমনি একটা লগ্নের জন্যই তিনি প্রতীক্ষা করে ছিলেন সারা জীবন।

১৯৩২ সাল। ২৪শে সেপ্টেম্বর।

বিদায় নেবার আগে মাস্টারদাকে প্রণাম করে ভাবাবেগে বললেন প্রীতিলতা—মাস্টারদা, জন্মের মতো যাই। আশীর্বাদ করুন, আপনার ইচ্ছার পূর্ণতা সম্পাদনে আমি যেন অযোগ্যা না হই।

—এস বোন। সস্নেহে প্রীতিলতার মাথায় হাত রেখে জবাব দিলেন মাস্টারদা, বিজয়গর্বে দৃপ্তা ভগিনীর গৌরব নিয়ে ফিরে এসো।

—আপনার আশীর্বাদ বিফল হবে না জানি। হাসলেন প্রীতিলতা, তবে, আমি যাই জন্মের মতন।

নিজের মধ্যেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করলেন মাস্টারদা।

চোখের সামনে সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই হারিয়ে গেছেন এক এক করে। হারিয়ে গেছে টেগরা, বিধু, নরেশ, ত্রিপুরা, স্বদেশ, রজত —এমনি আরো কতজন। অন্তরঙ্গ সহচর নির্মলবাবুও হারিয়ে গেছেন নিজের কর্তব্য সুসম্পন্ন করে।

আজ আবার হারাবার পালা। কে বলতে পারে, ওদের মধ্যে কেউ আবার ফিরে আসবে কি না! হয়তো আসবে, হয়তো বা এই জীবনের শেষ দেখা।

কিন্তু প্রীতি! সুযোগ পেলেও সে কি ফিরে আসতে রাজী হবে?

মাস্টারদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যথাসময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেলেন প্রীতিলতা।

সঙ্গে মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে, শান্তি চক্রবর্তী, কালী দে, প্রফুল্ল দাস প্রমুখ গুটিকয়েক মৃত্যু-ভয়হীন তরুণ কর্মী।

সবাই প্রস্তুত। সবাই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। এখন শুধু দলনেত্রীর আদেশের অপেক্ষা মাত্র।

প্রথমেই মহেন্দ্র চৌধুরী আর সুশীল দে মুসলমান গাড়োয়ানের ছদ্মবেশে দিব্যি ভেতরে ঢুকে গেলেন প্রহরারত মিলিটারী পুলিসের চোখের ওপর দিয়ে। যেন বাইরে অপেক্ষমাণ গাড়োয়ানদ্বয় কৌতূহলবশে সাহেব-মেমদের একটু নাচ দেখতে চাইছে আর কি!

প্রীতিলতা ও অন্যান্য সবাই ঢুকলেন পেছনের নির্দিষ্ট ছোট্ট একটি দরজা দিয়ে।

রাত দশটা। ভেতরে তখন শতাধিক শ্বেতাঙ্গ নরনারী পানাহার ও নাচ-গান নিয়ে মত্ত।

সহসা গোটা ক্লাব-ঘরটা কেঁপে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে—বুম্‌ম্‌ম্‌ম্‌! সেই সঙ্গে বেপরোয়া গুলী-বর্ষণ—ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

এমনি করেই তোমরা একদিন নিরপরাধ ভারতবাসীর বুকের রক্তে জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি ভিজিয়ে দিয়েছিলে। আজ তাকিয়ে দেখ যে, ভারতবাসী তার প্রতিশোধ নিতে জানে কি না!

—কম্পানি, ফল ইন! কিছুক্ষণ বাদেই আদেশ শোনা গেল অধিনায়িকা প্রীতিলতার কণ্ঠে—আমাদের কাজ শেষ। এবার ফিরে চল সবাই। রেডি! কুইক মার্চ!

কয়েক পা গিয়েই সহসা কি দেখে থমকে দাঁড়ালেন মহেন্দ্র চৌধুরী।

একি! দলের সবাই রয়েছে, কিন্তু প্রীতিদি কোথায়? তাঁকে দেখা যাচ্ছে না কেন? কোথায় গেলেন তিনি?

উন্মত্তের মত ছুটে গেলেন মহেন্দ্র চৌধুরী। প্রীতিদি! প্রীতিদি! একি, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন প্রীতিদি? ঐ দেখুন মিলিটারী আর্মার্ড কার ছুটে আসছে! আর দেরি করবেন না। চলুন প্রীতিদি!

—না ভাই। হাসলেন প্রীতিলতা, এই রিভলবারটা নিয়ে যাও। এটা মাস্টারদাকে দিও। আর তাঁকে আমার প্রণাম জানিও। আমার আদেশ, আর এক মুহূর্তও এখানে দেরি করো না। এগিয়ে যাও।

দলনেত্রীর নির্দেশে একটা অদম্য কান্না বুকে চেপে মহেন্দ্র চৌধুরী এবার পা বাড়ালেন নিজের গন্তব্য পথের দিকে।

আর প্রীতিলতা! তিনি তখন কোথায়?

ততক্ষণে তিনি পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে সেই অমৃতলোকে চলে গেছেন, যেখানে তাঁর একান্ত প্রিয় রামকৃষ্ণদা ও নির্মলদা অনেক আগেই ঠাঁই নিয়েছেন।

পরদিনই প্রীতিলতার সেই নিঃশেষ আত্ম-বিসর্জনের খবর প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়।

বোমা, রিভলবার ও রাইফেল

'গতকল্য রাত্রি ১১টার সময় বিপ্লবী বলিয়া বর্ণিত একদল লোক পাহাড়তলী ইনষ্টিটিউট নামক আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইয়োরোপীয়ান ক্লাবে অতিশয় দুঃসাহসিক ভাবে ইউরোপীয়ানদের উপর আক্রমণ করে। আক্রমণকারীর দলে পুরুষের বেশে সজ্জিত একজন নারীও ছিল।

আক্রমণকারীরা ঘরের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইহার ফলে একজন বৃদ্ধা ইয়োরোপীয়ান মহিলা নিহত এবং ইন্সপেক্টর ম্যাকডোন্যাল্ড, সার্জেন্ট উইলিস্ এবং অপর ছয়জন ইয়োরোপীয়ান আহত হন।

একজন স্ত্রীলোক ব্যতীত আক্রমণকারীদলের আর সকলেই পলাইয়া গিয়াছে। পুরুষের পোশাকে সজ্জিত ২০ বৎসর বয়স্কা এই নারীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃতদেহ ক্লাব ঘর হইতে কিছু দূরে পড়িয়া ছিল।......

প্রকাশ যে, এই স্ত্রীলোকটিকে কুমারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার বি-এ বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। সে নাকি চট্টগ্রাম শহরের শ্রীযুক্ত জগৎবন্ধু ওয়াদ্দাদারের কন্যা। তাহার পকেটে রিভলবার ও রাইফেলের কতকগুলি কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে।'

[আনন্দবাজার : ২৫-৯-৩২]

সবরকম তদন্তকার্য শেষ হবার পরে প্রীতিলতার দেহ ফিরিয়ে দেওয়া হল তাঁর পিতার হাতে। অগ্নিযুগের প্রথম নারী শহীদ বীরাঙ্গনা প্রীতিলতার পুণ্য দেহ অতঃপর ভস্মীভূত হয়ে গেল সবার অগোচরে। ভয়ে কেউ সেদিন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেনি। সে সাহসও কারো ছিল না।

মৃত্যুর আগের দিন অজ্ঞাতবাস থেকে মাকে লক্ষ্য করে প্রীতিলতা যে চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন, তা সত্যিই বড় মর্মস্পর্শী মল্লিকা। চিঠিটি এখানে তুলে দিলাম।

'মাগো, তুমি আমায় ডাকছিলে? আমার মনে হলো তুমি আমার শিয়রে বসে কেবলি আমার নাম ধরে ডাকছো, আর তোমার অশ্রু-জলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে। মা, সত্যিই কি তুমি এত কাঁদছো? আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না—তুমি আমায় ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেলে।

স্বপ্নে একবার তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম—তুমি তোমার বড় আবদারের মেয়ের আবদার রক্ষা করতে এসেছিলে! কিন্তু মা, আমি তোমার সঙ্গে একটি কথাও বললাম না। দুচোখ মেলে কেবল তোমার অশ্রুজলই দেখলাম। তোমার চোখের জল মোছাতে এতটুকু চেষ্টা করলাম না।

মা, আমায় তুমি ক্ষমা করো—তোমায় বড় ব্যথা দিয়ে গেলাম। তোমাকে এতটুকু ব্যথা দিতেও তো চিরদিন আমার বুকে বেজেছে। তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। আমি স্বদেশ-জননীর চোখের জল মোছাবার জন্য বুকের রক্ত দিতে এসেছি। তুমি আমায় আশীর্বাদ কর, নইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না।

একটিবার তোমাকে দেখে যেতে পারলাম না! সেজন্য আমার হৃদয়কে ভুল বুঝোনা তুমি। তোমার কথা আমি এক মুহূর্তের জন্য ভুলিনি মা। প্রতিনিয়তই তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

আমার অভাব যে তোমাকে পাগল করে তুলেছে তা আমি জানি। মাগো, আমি শুনেছি, তুমি ঘরের দরজায় বসে সবাইকে ডেকে ডেকে বলছ—"ওগো তোমরা আমার রাণীশূন্য রাজ্য দেখে যাও।"

তোমার সেই ছবি আমার চোখের ওপর দিনরাত ভাসছে। তোমার এই কথাগুলি আমার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কান্নার সুর তোলে।

মাগো, তুমি অমন করে আর কেঁদোনা। আমি যে সত্যের জন্য —স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি, তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না?

কি করবে মা? দেশ যে পরাধীন। দেশবাসী যে বিদেশীর অত্যাচারে জর্জরিত। দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলাভারে অবনতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা।

তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলই কাঁদবে?

আর কেঁদোনা মা! যাবার আগে আর একবার তুমি আমার স্বপ্নে দেখা দিও। আমি তোমার কাছে জানু পেতে ক্ষমা চাইবো।

আমি যে তোমার মনে বড়ই ব্যথা দিয়ে এসেছি মা। ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি। তুমি আদর করে আমাকে বুকে টেনে নিতে চাইছো, আমি তোমার হাত ছিনিয়ে চলে এসেছি। খাবারের থালা নিয়ে আমায় কত সাধাসাধিই না করেছো —আমি পেছন ফিরে চলে গেছি।

না, আর পারছি না। ক্ষমা চাওয়া ভিন্ন আর আমার উপায় নেই। আমি তোমাকে দুদিন ধরে সমানে কাঁদিয়েছি। তোমার কাতর ক্রন্দন আমাকে এতটুকু টলাতে পারেনি।

কি আশ্চর্য মা! তোমার রাণী এত নিষ্ঠুর হতে পারলো কি করে? ক্ষমা করো মা; আমায় তুমি ক্ষমা করো।'

ইতিমধ্যে মামলার রায় বেরিয়ে গেছে।

আইনজীবিদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। কাউকে প্রাণদণ্ড দিতে সক্ষম হননি বিচারপতি মিঃ ইউনি।

গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, ফণীন্দ্র নন্দী, সুবোধ চৌধুরী, সুবোধ রায়, আনন্দ গুপ্ত, ফকির সেন, লালমোহন সেন, সুখেন্দু দস্তিদার, রণধীর দাশগুপ্ত, সহায়রাম দাস।

উপরোক্ত ক'জনকে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। নন্দলাল সিংহের দুবছর কারাদণ্ড। অনিলবন্ধু দাসের তিন বছর। বাদবাকি সবাই খালাস।

অন্য একটি মামলায় সরোজকান্তি গুহকে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অম্বিকা চক্রবর্তীর প্রাণদণ্ড। তবে সে আদেশ কার্যকরী হয়নি। আপীলে দণ্ড হ্রাস করে দেওয়া হয়েছে—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে আমি তুলে দিচ্ছি।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার রায়

১২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

'অদ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার রায় বাহির হইয়াছে :—

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছে :—

১। গণেশ ঘোষ, ২। অনন্ত সিংহ, ৩। লোকনাথ বল, ৪। আনন্দ গুপ্ত, ৫। ফণী নন্দী, ৬। সুবোধ চৌধুরী, ৭। সহায়রাম দাস, ৮। ফকির সেন, ৯। লালমোহন সেন, ১০। সুখেন্দু দস্তিদার, ১১। সুবোধ রায়, ১২। রণধীর দাশগুপ্ত।

কারাদণ্ড

অনিলবন্ধু দাসের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, নন্দলাল সিংহের দুই বৎসর কারাদণ্ড।

অবশিষ্ট ১৬ জন আসামীকে স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল মুক্তিদান করেন। কিন্তু তৎসঙ্গেই তাহাদিগকে অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়।… জেলের ভিতর আসামীদের সমক্ষে রায় প্রদত্ত হয়। আসামীরা উৎফুল্লভাবে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি সহকারে রায় গ্রহণ করে বলিয়া জানা গিয়াছে।…

সুদীর্ঘ ১৯ মাস যাবৎ শুনানীর পর অদ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার যবনিকাপাত হইয়াছে। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। জিলা ও দায়রা জজ মিঃ জে. ইউনী আই. সি. এস. (প্রেসিডেন্ট) অবসরপ্রাপ্ত জিলা ও দায়রা জজ মিঃ এন. এন. লাহিড়ী এবং খাঁ বাহাদুর আবদুল হাইকে লইয়া গঠিত ট্রাইবুন্যালে উক্ত মামলার অভিযুক্ত ৩০ জন আসামীর বিচার সমাপ্ত হইল।

যে ১৬ জন আসামীকে মুক্তিদান করা হয় তাহাদিগকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিশেষভাবে ভাড়া করা একখানি জাহাজে অন্যান্য দণ্ডিত ১৪ জন আসামীর সঙ্গে তুলিয়া অজ্ঞাত স্থান অভিমুখে সকলকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।'

[আনন্দবাজার, ২রা মার্চ, ১৯৩২]

কিন্তু আসল মানুষটি কোথায়?

কোথায় সেই অগ্নিযুগের সব্যসাচী সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন?

হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যে শাসকদের ঘুম কেড়ে-নেওয়া ঐ মানুষটিকে কোনমতেই ধরা-ছোঁয়া গেল না।

ফলে, সমস্ত আক্রোশ এবার শতধারায় ফেটে পড়ল চট্টগ্রামের অধিবাসীদের ওপর। সংবাদপত্র থেকেই তার খানিকটা বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি।

চট্টগ্রামের সমস্ত হিন্দু অধিবাসীর উপর ৮০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ

'২৭শে অক্টোবর তারিখের কলিকাতা গেজেটে নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে :—যেহেতু গত দুই বৎসরের যে সমস্ত ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে, ফৌজদারী আদালতের বিচার-ফল হইতে এবং গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত সংবাদ অবগত আছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে চট্টগ্রামের নিকটস্থ পাহাড়তলীতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটে যে উপদ্রব হইয়াছে তাহা 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা' নামক বিপ্লবী সংঘের সদস্যগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং আরও দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম শহর ও জেলার কিছু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে লোক লইয়া এই সংঘ গঠিত হইয়াছে।···

সেইজন্য সপারিষদ গবর্ণর বাহাদুর ১৯৩২ সালের স্পেশাল পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্সের প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা সমগ্রভাবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের উপর ৮০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করিতেছেন।

(১) চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটিতে ট্যাক্স দিতে হয়, এরূপ বাসস্থানের মালিক বা বাসিন্দাগণ, (২) পাহাড়তলী রেলওয়ে উপনিবেশের অধিবাসীবৃন্দ এবং পটিয়া, আনোয়ারা, কাননগুপাড়া, সারোয়াতলী, শাকপুরা, কাট্টালি এবং গোমডাণ্ডির অধিবাসীবৃন্দ।'···

[আনন্দবাজার : ২৭-১০-৩২]

চট্টগ্রামে জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা

'চট্টগ্রামের মিউনিসিপ্যাল এলাকাধীন হিন্দু অধিবাসীগণের প্রতি যে জরিমানার আদেশ হইয়াছে, উক্ত জরিমানা আদায়ের জন্য ব্যবস্থা হইতেছে।

প্রকাশ, কয়েকজন সাব ডেপুটি কলেক্টর কয়েকজন মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীর সাহায্যে ঐ ধার্য জরিমানা আদায় করিবেন।'

[আনন্দবাজার : ২১-১১-৩২]

অবশেষে এল সেই ১৯৩৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি।

মাস্টারদা তখন গৈরালা গ্রামে। ইংরেজ সরকার তাঁর মাথার দাম ধার্য করেছে দশ হাজার টাকা।

গত তিন বছরের মধ্যে একটি লোকও এ ব্যাপারে পুলিসের সঙ্গে কোনরকম সহযোগিতা করতে এগিয়ে যায়নি। মাস্টারদা যে তাদের বড় আপনজন।

দলের বিশ্বস্ত কর্মী ব্রজেন সেন এ গাঁয়েরই লোক। তিনিই মাস্টারদাকে এখানে নিয়ে এসেছেন তাঁর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে।

সঙ্গে রয়েছেন শান্তি চক্রবর্তী, কল্পনা দত্ত, সুশীল দাশগুপ্ত, মণি দত্ত প্রমুখ একান্ত অনুগত সহকর্মীর দল।

আশ্রয় দিয়েছেন বিশ্বাস-বাড়ির গৃহবধূ ক্ষীরোদাপ্রভা বিশ্বাস।

মাস্টারদার মতো দুর্ধর্ষ বিপ্লবীকে আশ্রয় দেওয়া মানে অনিবার্য বিপদকে ডেকে আনা। তবু, তিনি নিজের সিদ্ধান্তে স্থির, অবিচল।

বিপদ যদি আসে তো আসুক, তা বলে জেনে-শুনে এই সর্বত্যাগী মানুষটিকে তিনি হিংস্র হায়েনার মুখে ঠেলে দিতে রাজী নন।

বিপদ এল ব্রজেন সেনের দাদা প্রতিবেশী নেত্র সেনের দিক থেকে। স্ত্রী ও ছোটভাই ব্রজেনের রহস্যময় হাবভাব দেখে তিনি অবাক। রাতদিন ওদের দুজনের কিসের এত ফিস ফিস চাপা গুঞ্জন!

কার জন্য ওরা মাঝে মাঝে বাইরে খাবার নিয়ে যায়! কে সেই লোক!

আসল খবর জানা গেল স্ত্রীর মুখ থেকে।

মাস্টারদা এ গাঁয়েই রয়েছেন।

খাবারগুলো তাঁরই জন্য। অমন লোককে খাওয়ালেও যে পুণ্য হয়!

বটেই তো! শুনেই লাফিয়ে উঠলেন নেত্র সেন। পুণ্য হয় বৈ কি! তা, অমন লোককে তো আর যা-তা খাওয়ানো যায় না! একটু ভাল-মন্দ ব্যবস্থা করতে হয় তো!

যাকে বলে করিৎকর্মা ব্যক্তি, তাই সঙ্গে সঙ্গেই তিনি থলে হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাজারের উদ্দেশ্যে। এমন সুযোগ কখনো হাতছাড়া করতে আছে! মদ আর জুয়ায় সর্বস্ব যেতে বসেছে। টাকাটা পেলে কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত। সোজা টাকা তো নয়, যাকে বলে কড়কড়ে দশ হাজার টাকা।

সেদিন রাত্রে সহসা কি দেখে ছোটভাই ব্রজেন সেন চমকে উঠলেন দারুণভাবে।

এ কি! জানালা দিয়ে আলো দেখিয়ে দাদা কাকে সিগন্যাল পাঠাচ্ছেন এমন করে? কি ব্যাপার?

সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেন সেন বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেলেন বিশ্বাস-বাড়ির দিকে। যে করে হোক মাস্টারদাকে বাঁচাতে হবে। তার জন্য দরকার হলে নিজের প্রাণ দিয়ে দাদার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মাস্টারদা যে কত বড়! কত মহান!

কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন ওয়ামস্লীর নেতৃত্বে বিরাট এক গুর্খা বাহিনী বলতে গেলে গোটা বাড়িটাকেই তখন ঘিরে ফেলেছে। মাঝে মাঝে তাদের নিক্ষিপ্ত রকেট বোমার আলোতে সব কিছুই দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পালাবার পথ নেই বললেই চলে।

শুরু হল প্রচণ্ড গুলী-বর্ষণ। হল উভয়পক্ষ থেকেই।

এরই মধ্যে সবাই চেষ্টা করলেন একফাঁকে অন্যত্র সরে যেতে। বাড়ির পেছনে একটা বাঁশের বেড়া। তারপরই ময়লা জল-ভর্তি একটা এঁদো পুকুর। কোনরকমে এ দুটো পেরিয়ে যেতে পারলে এবারের মতো হয়তো রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

এগিয়ে গেলেন সুশীল দাশগুপ্ত। প্রথমেই তিনি কোলে করে

কল্পনা দত্তকে পৌঁছে দিলেন বেড়ার ওপারে। তারপর আরও দু-একজনকে। এবার মাস্টারদার পালা। কিন্তু কার্যতঃ তা আর হল না। তার আগেই অলক্ষ্য থেকে একটা গুলী এসে সুশীল দাশগুপ্তের হাতটাকেই দিল জখম করে।

এবার নিজেই চেষ্টা করে ওপারে পৌঁছে গেলেন মাস্টারদা, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না। অন্ধকারে চোখে দেখতে না পেয়ে সহসা তিনি পড়ে গেলেন এক গুর্খা সৈন্যের গায়ের ওপর। ফলে, দীর্ঘদিন বাদে চট্টলসূর্য ধরা পড়লেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে।

পরদিনই সে খবর বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়।

চট্টগ্রামের সূর্য সেন গ্রেপ্তার

'১৭ই ফেব্রুয়ারি, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে ফেরারী সূর্য সেনকে—গতরাত্রে পটিয়া হইতে ৫ মাইল দূরে গৈরালা নামক স্থানে—সূর্যকুমার সেন, ওরফে মাস্টারদাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সূর্যকুমার সেনকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার প্রধান ফেরারী আসামী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। গত ১৯৩০ সাল হইতে সূর্যকুমার সেন পলাতক ছিলেন এবং তাহাকে ধরাইয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন।'

[আনন্দবাজার : ১৮-২-৩৩ সাল]

আর নেত্র সেন! তাঁর কি হল? কি হল তাঁর সেই দশ হাজার টাকা পুরস্কারের? পুরস্কার অবশ্য তিনি ঠিকই পেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন কিছুদিন পরেই।

সেদিন রাত্রে সেনমশাই বেশ আয়েস করে খেতে বসেছেন। সারা মুখে তাঁর খুশির ছটা। পুরস্কারের টাকাটা শীগ্‌গীরই পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে। আর দেরি নেই।

সত্যিই আর দেরি হল না! মুহূর্ত বাদেই দেখা গেল যে, তিনি আর তিনি নেই। ভোজালীর এক কোপেই তাঁর মুণ্ডটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে ভাতের থালার ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে।

কে সেই দুর্ধর্ষ তরুণ, যিনি সেদিন সেই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতককে চরম শাস্তি দিয়েছিলেন নিজের হাতে! কি তার নাম!

অনেক প্রশ্ন করেও চট্টল-বিপ্লবীদের কাছ থেকে এর কোন সদুত্তর এতদিন আমি পাইনি মল্লিকা। পেয়েছি মাত্র দিন কয়েক আগে। কথায় কথায় ওঁরাই সেদিন সে কাহিনী উজার করে দিয়েছিলেন আমার কাছে।

নাম তাঁব—কিরণ সেন। সঙ্গে ছিলেন আরো একজন।

উল্লেখযোগ্য যে, মাস্টারদা তখনও বেঁচে ছিলেন। তিনি জেনে গিয়েছিলেন যে, সেই দেশদ্রোহী নেত্র সেনকে চরম দণ্ড দিতে তাঁর মন্ত্রশিষ্যগণ এতটুকুও ভুল করেনি।

মাস্টারদা বন্দী। কিন্তু কল্পনা দত্ত! তাঁর কি হল! সংবাদপত্র থেকেই সে কাহিনী তুমি শোন :

শ্রীমতী কল্পনা দত্ত নিখোঁজ

শ্রীমতী কল্পনা দত্ত এখনও নিখোঁজ। তাঁহাকে খোঁজ করার জন্য প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। পুলিস তাঁহার পিতার এবং বাড়ির অন্যান্য সকলের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি আটক করিয়াছে।

[আনন্দবাজার : ৩-২-৩৩ সাল]

যুব-বিদ্রোহের কার্য-কলাপ কিন্তু এখানেই শেষ হল না মল্লিকা।

এবার হাল ধরলেন প্রিয় শিষ্য তারকেশ্বর দস্তিদার। তাঁর প্রথম লক্ষ্য, জেল ভেঙে মাস্টারদাকে মুক্ত করে আনা। যে করে হোক, যে কোন মূল্যের বিনিময়ে হোক, মাস্টারদাকে চাই-ই। মাস্টারদার অভাব যে কোনদিনই পূর্ণ হবার নয়!

শুরু হল প্রস্তুতি-পর্ব। প্রথমেই বিচারাধীন বন্দী সুখেন্দু দত্ত আর অমূল্য বিশ্বাস ধীরে ধীরে জাল ছড়াতে লাগলেন জেলের ভেতরে।

চাল ব্যর্থ হল না। সিপাই, জমাদার, ওয়ার্ডার, ডাক্তার প্রভৃতি অনেকেই সে জালে ধরা দিতে লাগল আস্তে আস্তে। ক্রমশঃ আটটা রিভলবার, প্রচুর বিস্ফোরক পদার্থ, বিভিন্ন সেল ও ফটকের ডুপ্লিকেট চাবি ইত্যাদি সব কিছুই একে একে গিয়ে জড় হল জেলের অভ্যন্তরে।

তবু কিছুতেই কিছু হল না। সেই আগেকার মতো এবারও সব কিছু ফাঁস হয়ে গেল দলের বিশ্বস্ত কর্মী শৈলেশ রায়ের আকস্মিক গ্রেপ্তারের ফলে।

১৮ই মে তারিখে শুরু হল গহিরা-সংঘর্ষ।

তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত, মনোরঞ্জন দাস প্রমুখ পলাতক বিপ্লবিগণ সবাই সেদিন গহিরাগ্রামের সেই গোপন আড্ডায় উপস্থিত। হঠাৎ রব উঠল—পুলিস! পুলিস! তারপরই শুরু হল একটানা গুলী-বর্ষণ—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

বিরাট সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে রিভলবারের শক্তি আর কতটুকু! ফলে, অব্যর্থ গুলীর আঘাতে প্রথমেই লুটিয়ে পড়লেন দলের তরুণকর্মী মনোরঞ্জন দাস। তারপর গৃহস্বামী পূর্ণ তালুকদার আর নিশি তালুকদার।

বাধ্য হয়েই তখন কল্পনা দত্ত, তারকেশ্বর দস্তিদার প্রমুখ সবাইকে ধরা দিতে হল একে একে। তাছাড়া উপায় কি!

এবার নতুন নেতা নির্বাচিত হলেন বিনোদবিহারী দত্ত।

ইতিপূর্বে বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনকে মৃত্যুদণ্ড দান, কুমিল্লার কুখ্যাত এলিসন হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠনের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ওদিকে সবার অলক্ষ্যে শুরু হল বিচারের প্রহসন। আসামী চট্টলসূর্য সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত। যে সূর্য সেনের ভয়ে সাম্রাজ্যবাদী সরকার গত তিন বছরের মধ্যে একটি দিনও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেনি, তাঁকে যে তারা এত সহজে রেহাই দেবে না, তা বলাই বাহুল্য। কাজেও তাই হল। দুজনকেই দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। কল্পনা দত্তর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

এবার প্রতিশোধ নেবার পালা।

কিন্তু কে নেবে প্রতিশোধ? বলতে গেলে সবাই তখন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। এ অবস্থায় কে নেবে এই গুরুদায়িত্বভার?

'আমরা নেব'।

এগিয়ে এলেন নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য, হিমাংশু ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ চৌধুরী, হরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ চট্টলের মৃত্যুভয়হীন বালকবৃন্দ। অগ্নি-ঋষি মাস্টারদার প্রতি এই অন্যায় দণ্ডাদেশ কিছুতেই আমরা মুখ বুজে সহ্য করব না। এর জবাব আমরা দেবই।

জবাব দিলেন ৭ই জানুয়ারি পল্টনের ক্রিকেট খেলার মাঠে।

শ্বেতাঙ্গ সমাজের সবাই সেদিন উপস্থিত। চারপাশে পুলিস ও মিলিটারীর নিবিড় বেষ্টনী। সুতরাং আশঙ্কার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

নিশ্চিন্ত মৃত্যু জেনেও অমিতবিক্রমে এগিয়ে গেলেন চট্টলের সেই বীর বালকবৃন্দ। তারপরই কান-ফাটানো আওয়াজ—বুম্‌ম্‌ম্! বুম্‌ম্‌ম্! সেই সঙ্গে রিভলবার গর্জন—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

রক্তে রক্তে স্নান করে উঠলেন পুলিস সুপার মিঃ ক্লিয়ারী। আহতের সংখ্যাও কম হল না। তারপরই শুরু হল পুলিস ও মিলিটারীর পাল্টা আক্রমণ।

যা অনিবার্য তাই হল। নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য আর হিমাংশু ভট্টাচার্য ঘটনাস্থলেই নিহত হলেন। কৃষ্ণ চৌধুরী আর হরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রাণ উৎসর্গ করলেন ফাঁসির রজ্জুতে।

তালিকা এখানেই শেষ নয়। এর বাইরেও আরো কয়েকজন তরুণকর্মী বিভিন্ন ঘটনায় প্রাণ দিয়েছেন, যাঁদের কথা এখানে বলা হয়নি। তাঁরা হলেন হিমাংশু সেন, অর্ধেন্দু দস্তিদার, শৈলেশ্বর চক্রবর্তী, বীরেন দে প্রমুখ শহীদবৃন্দ। চট্টল যুব-বিদ্রোহে এঁদের কারো ভূমিকাই কম উল্লেখযোগ্য নয়।

১৯৩৪ সাল। ১১ই জানুয়ারি। সন্ধ্যা সাতটা।

সহসা একটা চাপা চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ল চট্টগ্রাম জেলে আবদ্ধ যুব-বিদ্রোহের বন্দীদের মধ্যে। মাস্টারদা! মাস্টারদা! মাস্টারদা!

কনডেম্‌ড্ সেল থেকে ওয়ার্ডারের সাহায্যে মাস্টারদা গোপনে একটি বাণী পাঠিয়েছেন তাঁর সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে। তাঁর শেষ বাণী।

কাগজের দু'পাতায় লেখা মাস্টারদার সেই অমূল্য অন্তিমবাণীটি আমি এখানে তুলে দিচ্ছি মল্লিকা।

'Ideal and Unity is my farewell message. Rope is hanging over my head. Death is knocking at my door. Mind is soaring towards Eternity. This is the time for 'Sadhana', this is the time for preparation to embrace death as a friend and this is the time to recall lights of other days as well.

Sweet remembrance of you all, my dear brothers and sisters break the monotony of my life and cheer me up. At such a pleasant, at such a grave, at such a solemn moment, what shall I leave behind for you ? Only one thing, that is my dream, a golden dream—a dream of free India. How auspicious a moment it was, when I first saw it. Throughout my life most passionately and untiringly I have pursued it like a lunatic. I know not how far I proceeded towards the fulfilment of my dream.

I know not where I am compelled to stop my pursuit today. If icy hands of death give you a touch before the goal is reached, then give the charge of your further pursuit to your followers as I do today. Onward my comrades, onward—never fall back. The day of bondage is disappearing and dawn of freedom is ushered in. Be up and doing. Never be disappointed. Success sure. God bless you.

Never forget the 18th April, 1930, the day of Eastern Rebellion in Chittagong. Keep ever fresh in your memory the fights of Jallalabad, Julda, Chandernagar and Dhalghat. Write in red letters in the core of your hearts the names of all patriots who have sacrificed their lives at the altar of India's freedom.

My earnest appeal to you—there would be no division in our organization. My blessings to you all inside and outside the jail.

Fare you well.

Chittagong Jail
11th Jan. '34.
at 7 p.m.

Long live Revolution !
*Bandematarm !'

'আমার শেষ বাণী—আদর্শ ও একতা। ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার ওপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলেছে। এই তো আমার সাধনার সময়। এই তো আমার মৃত্যুকে বন্ধুর মতো আলিঙ্গন করার সময়, হারানো দিনগুলোকে নতুন করে স্মরণ করার সময়।

আমার ভাইবোনগণ, তোমাদের সবার উদ্দেশ্যে বলছি—আমার এই বৈচিত্র্যহীন জীবনের একঘেয়েমিকে তোমরা ভেঙে দাও, আমাকে

উৎসাহ দাও। এই আনন্দময়, পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য কি রেখে গেলাম? শুধু একটিমাত্র জিনিস, তা হল আমার স্বপ্ন। একটি সোনালী স্বপ্ন। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথমে এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। উৎসাহ ভরে সারাজীবন তার পেছনে উন্মত্তের মতো ছুটেছিলাম। জানি না, এই স্বপ্নকে আমি কতটুকু সফল করতে পেরেছি।

আমার মৃত্যুর শীতলস্পর্শ যদি তোমাদের মনকে এতটুকু স্পর্শ করে, তবে আমার এই সাধনাকে তোমরা তোমাদের অনুগামীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিও—যেমন আমি তোমাদের দিয়েছিলাম। বন্ধুগণ, এগিয়ে চলো। কখনো পিছিয়ে যেও না। দাসত্বের দিন চলে যাচ্ছে। স্বাধীনতার লগ্ন আসন্ন। ওঠো, জাগো। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের চট্টগ্রাম-বিদ্রোহের কথা কোনদিনও ভুলোনা। জালালাবাদ, জুলধা, চন্দননগর ও ধলঘাট-এর সংগ্রামের কথা সব সময়েই মনে রেখো। যে সব বীর সৈনিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের নাম মনের গভীরে রক্তাক্ষরে লিখে রেখো।

আমার একান্ত অনুরোধ, এই সংগঠনকে তোমরা কোনদিনই ভেঙে দিও না। জেলের বাইরে এবং ভেতরে সবার জন্য আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা রইল। বিদায়!'

চট্টগ্রাম জেল,
১১ই জানুয়ারি, ১৯৩৪ — বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!
সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা — * বন্দে মাতরম্!

* চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের অন্যতম সৈনিক শ্রদ্ধেয় অর্ধেন্দু গুহর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

নিঝুম, নিশুতিরাত্রি। চারদিক মৌন, অকম্পিত।

কনডেম্‌ড্‌ সেলের অভ্যন্তরে মাস্টারদা ঘুমে অচেতন। সারা মুখে তাঁর নিরুদ্বেগ জীবনের সুপ্ত প্রশান্তি।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল দরজা খোলার শব্দে। সব প্রস্তুত। এবার যেতে হবে।

সে দৃশ্য ভোলবার নয়। দৃঢ়, নিশ্চিত পদক্ষেপে বধ্য-মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছেন মাস্টারদা আর তারকেশ্বর দস্তিদার। মুখে তাঁদের সেই একই ধ্বনি। একই মাতৃমন্ত্র—বন্দে মাতরম্‌!

বন্দে মাতরম্‌! নিষ্ফল আক্রোশে গরাদে মাথা ঠুকতে লাগলেন জেলে আবদ্ধ শত শত বন্দীর দল, বন্দে মাতরম্‌! বন্দে মাতরম্‌! মাস্টারদা জিন্দাবাদ!

শুরু হল বেপরোয়া লাঠি-চার্জ। শুধু একবার নয়, বলতে গেলে সারারাত ধরেই। না, কোনরকম জয়ধ্বনি দেওয়া চলবে না। একটি কথাও নয়।

কে কার কথা শোনে! হাজার হাজার পুলিস ও মিলিটারী মেশিনগান দিয়েও যাঁদের পরাভূত করতে পারেনি, তাঁদের স্তব্ধ করা কি এতই সহজ! তাই সব কিছু তুচ্ছ করে একটানা বেজে চলল সেই মাতৃমন্ত্র—বন্দে মাতরম্‌! মাস্টারদা জিন্দাবাদ!

তাঁদের সঙ্গে সুর মেলাল সাধারণ কয়েদীর দল—মাস্টারদা জিন্দাবাদ! মাস্টারদা জিন্দাবাদ! মাস্টারদা জিন্দাবাদ!

সে সুর মিলিয়ে গেল দূর থেকে দূরান্তরে, সেখানেও আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে রব উঠল—মাস্টারদা জিন্দাবাদ! মাস্টারদা জিন্দাবাদ!

সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই আবার নতুন করে আকাশে সূর্য উঠল অমরজ্যোতির লেখায়। সে নতুন আলো বাংলার দিকে দিকে, প্রতিটি ধূলিকণাতে আবার নতুন করে লিখে দিল—'মাস্টারদা জিন্দাবাদ! তোমার মৃত্যু নেই, তুমি অমর, মৃত্যুঞ্জয়ী।'

'—ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়
ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে
গুলি, বন্দুক, বোমার আগুনে
আজো রোমাঞ্চকর।'
—কবি সুকান্ত

অগ্নিযুগ।

ছোট্ট একটি শব্দ। কিন্তু কি গভীর নিষ্ঠা, কি অপরিসীম আত্মত্যাগ, কি অশেষ নির্যাতনের কাহিনীই না জড়িয়ে আছে ছোট্ট ঐ শব্দটির মধ্যে!

তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। বোধহয় হবেও না কোনদিন।

শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। তারপর শুধু ইতিহাস আর ইতিহাস। স্বাধীনতার বেদীমূলে শত সহস্র শহীদের নিঃশেষ আত্ম-বিসর্জনের রক্তরাঙা ইতিহাস।

১৯৩০ সালে অনুষ্ঠিত হল—শেষপর্ব। তার প্রথম সূত্রপাত—চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লব। তারপর এখানে-ওখানে—সর্বত্র।

সুভাষ প্রসঙ্গে আমি শুধু তাঁর সমসাময়িক কাল, অর্থাৎ—এই শেষপর্ব থেকেই কিছু কিছু অংশ তোমাকে শোনাতে চেষ্টা করব মল্লিকা।

চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল।

সুভাষ তখন জেলে। অপরাধ—গত বছরের আগস্ট মাসে নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক দিবস উপলক্ষে সরকারী নির্দেশ অমান্য করে শোভাযাত্রা পরিচালনা করা—ফলে, মোট ন'মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

অসহযোগ আন্দোলনের বন্দীদের ভিড়ে আলিপুর জেল তখন জমজমাট। সুভাষ ছাড়া অন্যান্য নেতৃবৃন্দও রয়েছেন তাঁদের মধ্যে।

সোরগোল তুলল সাধারণ সত্যাগ্রহী বন্দীর দল। ওসব সি-ক্লাস চোর-গাঁটকাটাদের সঙ্গে থাকতে আমরা রাজী নই। তাছাড়া কয়েদী পোশাক আমরা পরব না।

পরবে না মানে! গর্জে উঠল জেল-সুপার মেজর সোমদত্, আলবৎ পরতে হবে। তাছাড়া থাকতেও হবে সি-ক্লাসে।

—কক্ষণো না। কিছুতেই না। বল ভাইসব—বন্দে মাতরম্…

—বটে! সোমদত্-এর নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে পাগলা ঘন্টি বেজে উঠল ঢং ঢং করে।

রে-রে করে ছুটে এল পুলিস, হাবিলদার, ওয়ার্ডার ও সার্জেণ্টের দল। হঠাৎ এই তলব কেন?

সবাইকে লক্‌আপে বন্ধ কর। আদেশ দিল মেজর সোমদত্। এক্ষুণি। জলদি!

ওদিকে ঘণ্টা শুনে ততক্ষণে ওয়ার্ড ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন সুভাষ, যতীন্দ্রমোহন, সত্য বক্সী প্রমুখ খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ। সবার চোখে-মুখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা। কি ব্যাপার! অসময়ে এই পাগলা ঘন্টি কেন!

—কাউকে বাইরে থাকতে দেওয়া হবে না। সুভাষ প্রমুখ সবাইকে দেখেই সগর্জনে বলল মেজর সোমদত্, আমার হুকুম, এক্ষুণি সবাইকে যার-যার ওয়ার্ডে ফিরে যেতে হবে। ইমিডিয়েট্‌লী!

গ্রাহ্যও করলেন না কেউ। ওসব পুলিসী হুঙ্কারকে তাঁরা থোড়াই পরোয়া করেন।

—বটে! রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সোমদত্ এবার আদেশ দিল—চার্জ!

সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র পশুর দল ঝাঁপিয়ে পড়ল সুভাষের বলিষ্ঠ দেহটার ওপর। তারপর শুধু প্রহার আর প্রহার। যাকে বলে অমানুষিক প্রহার!

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সত্য বক্সী, কিরণশঙ্কর রায়, সত্য গুপ্ত নৃপেন ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দও রেহাই পেলেন না। ঢালা

হুকুম যখন পাওয়া গেছে, তখন ভাবনা কি! সুতরাং পেটাও। সব ক'টাকে পেটাও। আচ্ছা করে পেটাও।

সেকি অট্টহাস্য তখন জেল সুপার মেজর সোমদত্-এর! এতবড় সাহস তোমাদের! আমাকে সম্মান দেখাবে না! তাহলে দেখো যে, লাঠির জোরে আমি সম্মান আদায় করতে পারি কি না!

দেখতে দেখতে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল মহানগরীর সর্বত্র।

আলিপুর জেলে লাঠি-চার্জ। কতকগুলো নিম্নশ্রেণীর পাঠান কয়েদীকে লেলিয়ে দিয়ে জেল-সুপার সোমদত্-এর পৈশাচিক উল্লাস।

সুভাষ গুরুতর আহত। এখনো তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। বাঁচবেন কিনা বলা শক্ত।

সেদিনের কলকাতার অবস্থা আজ বোধহয় তুমি কল্পনাও করতে পারবে না মল্লিকা।

সে কি তীব্র উত্তেজনা সেদিন সারা শহর জুড়ে! এতবড় স্পর্ধা ঐ পাঞ্জাবী-পুঙ্গব মেজর সোমদত্-এর! এর প্রতিকার চাই। বিচার চাই!

লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাষা রূপ পেল বি. ভি.-র মুখপত্র 'বেণু'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের ভাষায়। সম্পাদকীয় স্তম্ভে তিনি লিখলেন—'আমরা বাংলার সেই তারুণ্য শক্তিকে আহ্বান করি, যে শক্তি গোটা আলিপুর জেল উপড়ে ফেলে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে সরকারের এই অপকর্মের প্রতিবাদ করবে।'

বিপ্লবীর পরিচয় তাঁর কথায় নয়, কাজে। তাই দলীয় নির্দেশে বীরেন ঘোষ ও অন্য একজন বিপ্লবী সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন গুলী-ভরা রিভলবার পকেটে নিয়ে। সোমদত্-এর শির চাই। নিজের রক্ত দিয়েই তাকে সুভাষের এই রক্তের ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

কোথায় সোমদত্! অত কাঁচা লোক সে নয়। বাঙালী যে কি চীজ তা ইতিমধ্যেই তার জানা হয়ে গেছে। তাই হাজার

প্রয়োজনেও সেপাই-সান্ত্রী পরিবৃত আলিপুর জেলের সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে বাইরে পা বাড়াতে আর কোনমতেই সে প্রস্তুত নয়।

শেষপর্যন্ত কেঁদে পড়ল পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের কাছে গিয়ে। ওদের হাত থেকে আপনি আমাকে বাঁচান পণ্ডিতজী। আপনার পায়ে পড়ি!

গেট আউট! গর্জে উঠলেন পণ্ডিত মালব্য, এতবড় স্পর্ধা তোমার! কার গায়ে তুমি হাত দিয়েছ জানো! যাও, দূর হও আমার সুমুখ থেকে। আমি তোমার মুখদর্শনও করতে চাইনে।

সঙ্গে সঙ্গে বীর-পুঙ্গব বাংলাদেশ থেকে হাওয়া। কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম! আগে তো প্রাণ বাঁচুক, তারপর অন্য কথা।

শুরু হল নতুন পরিকল্পনা। কি করা যায় এখন! সোমদত্ পলাতক। তা বলে রক্তের অক্ষরে লেখা সঙ্কল্প তো আর মিথ্যে হতে পারে না! জবাব যে একটা কিছু দিতেই হবে। এমন জবাব দিতে হবে, যা জন্মেও যেন কোনদিন ওরা ভুলে না যায়।

কি সেই জবাব! পরে তোমাকে সেকথা বলছি।

১৯৩০ সাল।

ওদিকে চট্টলসূর্য সূর্য সেন তখন ইতিহাসের পর ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠেছে এদিককার বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্থাগুলি।

আর দেরি নয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে অবকাশ দিলে চলবে না। এবারে এদিক থেকে আঘাত হানতে হবে। চারদিক থেকে আঘাত হেনে ওদের জাঁতিকলে পিষে মারতে হবে।

প্রথমেই আঘাত হানলেন যুগান্তর দলের দুই দুঃসাহসী তরুণ দীনেশ মজুমদার আর অনুজা সেন।

২৫শে আগস্ট। বেলা তখন প্রায় ১১টা।

ডালহৌসী স্কোয়ার ইস্ট-এ দাঁড়িয়ে দীনেশ মজুমদার আর অনুজা সেন। একটু দূরে শৈলেন নিয়োগী, অতুল সেন আর কালীপদ ঘোষ।

বিপ্লব আন্দোলনের পয়লা নম্বরের শত্রু পুলিস কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট রোজই এ সময়ে লালবাজার গিয়ে থাকেন তাঁর নিজের গাড়িতে করে। আজ আর তাঁর নিস্তার নেই।

সময় হয়ে এল বলে। ঐ যে দূরে তাঁর গাড়িটা বাঁক নিয়েছে। ঐ যে এগিয়ে আসছে একটু একটু করে।

নিমেষে উঁচু হয়ে উঠল দীনেশ মজুমদারের হাতটা। পরক্ষণেই তিনি তীব্র আক্রোশে মারাত্মক টি. এন. টি. বোমাটাকে ছুঁড়ে দিলেন টেগার্টের গাড়ি লক্ষ্য করে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল গোটা ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলটা—বুম্‌ম্‌ম্‌ম্‌!

ধোঁয়া সরে যেতেই পরিণতি লক্ষ্য করে উত্তেজনায় বলিষ্ঠ দেহটা ফুলে উঠল দীনেশ মজুমদারের।

না, ঠিকমত লাগেনি। গাড়ির বাঁ-দিকের দরজায় লেগে বাইরে ফেটে পড়েছে। ফলে, ড্রাইভারের ডান হাতটা সামান্য জখম হয়েছে, কিন্তু টেগার্ট সম্পূর্ণ নিরাপদ।

আর অনুজা! তাঁর কি হল?

কি দুর্ভাগ্য! সামান্য দেরি হল তাঁর বোমাটা ছুঁড়ে দিতে, আর সেই মুহূর্তেই বিস্ফোরণের ফলে তাঁর গোটা দেহটা গেল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে।

সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে অনুজার পেট ফেটে গিয়ে তাঁর সমস্ত নাড়িভুঁড়ি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে এখানে-ওখানে সর্বত্র।

প্রাণপণ শক্তিতে দেহটাকে সোজা রেখে ঐ অবস্থার মধ্যেই অনুজা এগিয়ে গেলেন সামনের পার্কটাকে লক্ষ্য করে। তবে আর

বেশিক্ষণ নয়। হাত বাড়িয়ে কোনরকমে পার্কের একটা রেলিংকে সজোরে চেপে ধরে পরক্ষণেই তিনি লুটিয়ে পড়লেন জীবনী-শক্তির অভাবে। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ।

দীনেশ মজুমদারও রেহাই পেলেন না। চেষ্টা করলেন নিজের রক্তাক্ত দেহ নিয়ে পলায়নপর জনতার ভিড়ে মিশে যেতে। জোর করে গেলেনও কিছুটা দূর, তারপরই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন শক্ত মাটির বুকে। তারপর আর কিছুই মনে নেই।

অদ্ভুত লোক এই চার্লস টেগার্ট। কেউ কখনো তাঁর হাতের মুঠো থেকে বড় একটা ফস্‌কে যেতে পারেনি। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না।

দলের অন্যতম প্রধান নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও কিরণ মুখার্জী আগেই ধরা পড়েছিলেন।

বোমা বিস্ফোরণের পরে প্রথমেই ধরা পড়লেন ডাঃ নারায়ণ রায়। তারপর ডাঃ ভূপাল বসু। অবশেষে যতীশ ভৌমিক, কালীপদ ঘোষ, সুরেন দত্ত, রোহিণী অধিকারী, অদ্বৈত দত্ত, অম্বিকা রায় প্রমুখ সবাই।

মেয়েরাও বাদ গেলেন না। নানা বিপ্লবীদলের বিশিষ্টা সভ্যদের মধ্যে শোভারাণী দত্ত, কমলা দাস, রেণু সেন প্রমুখ সবাই ধরা পড়লেন একে একে।

বোমা ষড়যন্ত্রের অন্যতম নেপথ্য-নায়ক রসিক দাসও ধরা পড়লেন সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ই তারিখে। সব শেষে ধরা পড়লেন গড়পার লেডিজ হোস্টেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট কমলা দাশগুপ্তা—বোমা ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে যাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

একমাত্র ব্যতিক্রম মনোরঞ্জন গুপ্ত। তাও বেশিদিন নয়। মাস তিনেক বাদে তিনিও একদিন ধরা পড়ে গেলেন আকস্মিকভাবে। ফলে, দলের স্বাভাবিক গতি স্বভাবতই একটু মন্থর হয়ে পড়ল সাময়িকভাবে।

এবার বিচারের পালা। হাজার চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে মেয়েদের মামলায় জড়ানো সম্ভব হল না। তাই বাধ্য হয়েই তাঁদের ছেড়ে দিতে হল একে একে। কমলা দাশগুপ্তাও একদিন ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলেন জেলের বাইরে।

শুরু হল মামলা। একটা নয়, দুটো। প্রথমটা কেবলমাত্র দীনেশ মজুমদারের বিরুদ্ধে। অন্যটা বাদবাকি সবার বিরুদ্ধে।

বিচারে কঠোর সাজা দেওয়া হল সবাইকে। দীনেশ মজুমদারকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। পরেরটার বিবরণ সংবাদপত্র থেকেই শোন।

কলিকাতা বোমার মামলায় কঠোর দণ্ডাদেশ

'গতকল্য আলিপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে কলিকাতা বোমা ষড়যন্ত্রের মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে। ১০ জন আসামীর মধ্যে ৮ জনের উপর ১০ বৎসর হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছে। আসামী অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও শরৎচন্দ্র দত্ত মুক্তিলাভ করিয়াছেন।'

দণ্ডের বহর

'ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায় এম. বি. কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন কাউন্সিলার। ইনি ও ডাঃ ভূপাল বসু এম. বি. উভয়েই বিস্ফোরক আইনের ৪-বি ধারার সহিত পঠিত ১২০-বি ধারানুসারে প্রত্যেকে ২০ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রসিকলাল দাস বিস্ফোরক আইনের ৪-বি ধারার সহিত পঠিত ১২০-বি ধারানুসারে ১৫ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

যতীশচন্দ্র ভৌমিক ও অম্বিকাচরণ রায়, ওরফে নন্দ ও আদিত্যচরণ দত্ত ১২ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ডে ও ৩০২ ধারার সহিত পঠিত

১২০-বি ধারানুসারে ৮ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

রোহিণীকান্ত অধিকারী ১০ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।'

[আনন্দবাজার, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৩০]

মামলার রায়ে আরো বলা হল : ৭১নং মির্জাপুর স্ট্রীট ও সরস্বতী প্রেস হচ্ছে মূলকেন্দ্র, যেখান থেকে এই ষড়যন্ত্রের অনুপ্রেরণা এসেছে। এবং যার সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণ গুহ ও ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত প্রমুখ যুগান্তর দলের নেতৃবৃন্দ।

আপীলে কিছুটা হের-ফের হল। সেখানে ডাঃ রায় ও ডাঃ ভূপাল বসুর হল পনেরো বছর। সুরেন দত্তের বারো বছর। যতীশ ভৌমিকের ছবছর।

আর প্রমাণাভাবে মুক্তি দেওয়া হল রসিক দাস, অদ্বৈত দত্ত ও অম্বিকা রায়কে।

তবে এ মুক্তি—মুক্তি নয়। ছাড়া পাবার সঙ্গে সঙ্গে জেল-গেটেই আবার তাঁদের গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হল বছরের পর বছর ধরে।

তবে দীনেশ মজুমদারকে কিন্তু বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব হল না। বছর দুয়েক বাদেই একদিন তিনি উধাও হলেন মেদিনীপুর জেলের আকাশ-ছোঁয়া উঁচু পাঁচিল ডিঙিয়ে। তীব্র সংঘর্ষের ফলে আবার ধরা পড়লেন ১৯৩৩ সালের ২২শে মে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে।

এবার সাজা হল প্রাণদণ্ড। সে আদেশ কার্যকরী হল ১৯৩৪ সালের ৯ই জুলাই তারিখে।

*

এবার দুর্বার বেগে এগিয়ে এল সেই বি. ভি.। আঘাতের পর আঘাত হেনে দেখতে দেখতেই বি. ভি.-র দুর্ধর্ষ তরুণবৃন্দ ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী দম্ভকে একেবারে মিশিয়ে দিলেন পথের ধুলোতে।

সর্বাধিনায়ক হেমবাবুর কথা তোমাকে আগেই বলেছি।

এলোমেলোভাবে কাজ করতে কোনদিনই তিনি অভ্যস্ত নন। তাঁর প্রথম কথাই হল—ডু অর ডাই।

লক্ষ্যভেদ না করে কাউকে ফিরে আসা চলবে না। তার জন্য যদি প্রাণ যায় তো যাক, তবু কার্যোদ্ধার করা চাই-ই। আর আঘাত করতে হবে ব্রিটিশ শাসন-যন্ত্রের ষ্টীলফ্রেম বাছাই করা সব শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের ওপর, কোন সাধারণ লোককে নয়।

রক্তের অক্ষরে শপথ নিলেন বি. ভি.-র বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। তাই হবে। কথা দিলাম যে, কার্যোদ্ধার না করে কোন ক্ষেত্রেই আমরা ফিরে আসব না। একটি প্রাণীও না।

প্রথম টার্গেট—বাংলার ইনস্‌পেক্টর জেনারেল অফ পুলিস এফ. জে. লোম্যান।

সেই লোম্যান—যাকে লক্ষ্য করে চট্টগ্রাম কালারপোল সংগ্রামের বীর শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্ত তাঁর অন্তিম মুহূর্তে খেদোক্তি করে বলেছিলেন—'আমার হাতটা অকেজো হয়ে পড়েছে, নইলে লোম্যানকে আমি গুলী করতাম।'

পরিকল্পনা প্রস্তুত। অস্ত্রশস্ত্রও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এখন শুধু সুযোগের অপেক্ষা মাত্র।

সুযোগ পাওয়া গেল ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট। ডালহৌসী স্কোয়ারের ঘটনার ঠিক চারদিন বাদে।

সকাল তখন প্রায় ন'টা। হঠাৎ ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রাঙ্গণ থেকে ভেসে এল পর পর কয়েকটা রিভলবারের গর্জন—ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

সঙ্গে সঙ্গে দুজনকে লুটিয়ে পড়তে হল শক্ত মাটির বুকে। একজন বাংলার ইনস্‌পেক্টর জেনারেল অফ পুলিস স্বয়ং মিঃ এফ. জে. লোম্যান, অন্যজন ঢাকার সুপারিনটেণ্ডেন্ট অফ পুলিস কুখ্যাত মিঃ ই. হডসন, ঢাকাতে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধাতে যার জুড়ি ছিল না।

পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত। জল-পুলিসের সুপারিনটেণ্ডেন্ট মিঃ

বার্ট অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য তিনি তখন মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুল হাসপাতালে ছিলেন। পুলিস-সুপার হডসনকে সঙ্গে নিয়ে লোম্যান এসেছিলেন তাঁকে দেখতে।

বলাই বাহুল্য যে, এ উপলক্ষে সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি ছিল না। সর্বোপরি সাধারণ পোশাক-পরিহিত গুপ্তচরের দল যে কত ছিল, তার বোধহয় গোনাগুনতিই নেই।

তবু কিছুতেই কিছু হল না। ফেরার পথে হাসপাতালের সিঁড়িতে পা দিতেই পাশের দেবদারু গাছের আড়াল থেকে গর্জে উঠল অগ্নি-বর্ষী রিভলবার—ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। লোম্যান সম্বন্ধে প্রশ্নই ওঠে না। হডসনও বাঁচবে কিনা বলা শক্ত। কারণ, আঘাত গুরুতর। বাঁচলেও তাকে পঙ্গু হয়েই থাকতে হবে আজীবন।

ঘটনাটা যেমন আকস্মিক তেমনি অস্বাভাবিক। কাছাকাছি প্রতিটি লোক বিভ্রান্ত। প্রতিটি লোক দিশেহারা। কি যেন হয়ে গেল, বিশ্বাস করাও যেন শক্ত।

শুধু বিভ্রান্ত হল না সামনেই দাঁড়ানো সরকারী কন্ট্রাক্টর সত্যেন সেন। পুরস্কার ও খেতাবের লোভে সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালী বীর-পুঙ্গব দুহাতে জাপটে ধরলেন আততায়ীকে।

না, মশা-মাছি মারবার জন্য আততায়ী তাঁর মূল্যবান গুলীটাকে নষ্ট করতে রাজী হননি। বিনিময়ে দিয়েছেন শুধু একটি মাত্র ঘুষি। ঐ একটি ঘুষিতেই বীর-পুঙ্গবের খেতাবের লোভ ঘুচে গেল জন্মের মতো।

হৈ-চৈ শুনে বাগানের মালী ও ঠাকুর-চাকরদের মধ্যেও ছুটে এসেছিল কেউ কেউ। তবে আততায়ীকে ধরার চাইতে প্রাণ নিয়ে পালানোর ব্যাপারেই যেন তাদের উৎসাহটা বেশি দেখা গেল। ও তো পহেলে নম্বর ডাকু হ্যায়।

এদিকে আততায়ী তখন অদ্ভুত কৌশলে উঠে গেছেন হাসপাতালের উঁচু পাঁচিলের ওপর।

সামনেই একটা গৃহস্থবাড়ির জলের ট্যাঙ্ক। নিমেষেই তিনি জলের ট্যাঙ্কের ওপর উঠে একবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপরই একলাফে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বাড়ির অভ্যন্তরে। আর তাঁকে দেখা গেল না।

খবর শুনে হৈ-চৈ পড়ে গেল চারদিকে। বলে কি! এত পুলিস, এত সেপাই-সান্ত্রী, তার মধ্যে কিনা এই কাণ্ড! এ যে তাজ্জব ব্যাপার! নাঃ, দেখালে বটে! ধন্য ছেলে!

সবাইকে ছাপিয়ে গেলেন মরমী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। পরদিন বি. ভি.-র অন্যতম নায়ক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের মুখে সব কথা শুনে সে কি তাঁর আনন্দ! বার বার বলতে লাগলেন একটি মাত্র কথা—ধন্য ছেলে! বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আর আমরা মুখ বুজে সব কিছু সহ্য করতে রাজী নই। প্রয়োজন হলে আমরাও জবাব দিতে জানি। দেখা হলে তাকে আমার আশীর্বাদ জানিও। বলো যে, আমি তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি।

শহরের সর্বত্র তখন একটা থমথমে ভাব। রাস্তায় লোকজনের চলাচলও তেমন নজরে পড়ে না। এমন কি, ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত কাঁদতে ভুলে গেছে কি এক অশুভ আশঙ্কায়।

গোয়েন্দা পুলিসের বড়কর্তা নিহত। আঘাতটা যে ব্রিটিশ সিংহ নিঃশব্দে মেনে নেবে না তা বলাই বাহুল্য। প্রতিঘাতটা এবার কোন্‌দিক থেকে আসবে কে জানে!

অনুমান মিথ্যে হল না। শুরু হল অমানুষিক অত্যাচার আর নির্যাতন।

ইঙ্গিত পেয়ে সঙ্গে যোগ দিল শহরের নামী গুণ্ডার দল। বাঁশের চাইতে কঞ্চি দড়, সুতরাং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজও বাদ গেল না। যেন তারাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিভূ আর কি!

বিচিত্র এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ। ইংরেজ কোনদিনও তাদের স্বজাতি বলে স্বীকার করেনি, আবার নিজ আভিজাত্যের গর্বে

ভারতীয়দেরও ওরা আপনজন বলে মেনে নিতে নারাজ। ফলে, ময়ূর-পুচ্ছধারী দাঁড়কাক হয়েই ওরা রইল চিরদিন।

তবে সেদিন কিন্তু ইংরেজ ওদের স্বীকৃতি দিতে এতটুকুও ইতস্তত: করল না। তদুপরি সঙ্গে গুণ্ডার দল তো আছেই। সুতরাং চালাও এক-তরফা মারপিট, গুণ্ডামী আর অত্যাচার। আর লুঠ কর মানুষের যথাসর্বস্ব। মওকা যখন পাওয়া গেছে, তখন এই সুযোগে যত পার হাতিয়ে নাও।

তৎপরতা ব্যর্থ হল না। আততায়ীকে ধরা না গেলেও তদন্তের ফলে তাঁর নাম-ধাম-বিবরণ শেষপর্যন্ত জানতে আর বাকি রইল না শাসকদের।

বিনয় বোস। মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র বিনয় বোস। বিক্রমপুর রাউথভোগ গ্রামের রেবতীমোহন বোসের ছেলে বিনয় বোস। তিনিই এ কাণ্ডের মহানায়ক। সুতরাং যে করে হোক, বিনয় বোসের শির চাই।

কোথায় বিনয় বোস! বাংলাদেশের প্রতিটি স্থানে তাঁর ছবি টাঙিয়ে দেওয়া হল, পুরস্কারের টাকা পাঁচ থেকে দশ হাজারে গিয়ে দাঁড়াল, তবু তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

ফল হল সুদূরপ্রসারী। বিলেতে অনুষ্ঠিত রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সকে কটাক্ষ করে বেশ একটু শ্লেষভরেই স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু উক্তি করলেন :

'হাফ দি ওয়ার্ক অফ রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স পুট থ্রু বাই বিনয় বোস।' অর্থাৎ, তোমরা শক্তের ভক্ত নরমের যম। এদ্দিন হাজার বলা সত্ত্বেও আমাদের কথা তোমরা বুঝতে চাওনি। আজ বিনয় বোসের হাতের শক্ত ডাণ্ডা খেয়ে ঠিক তা বুঝে গেছ।

যাঁকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই বিনয় বোস তখন কোথায়! এবার সেকথাই তোমাকে বলব।

বৃষ্টি। বৃষ্টি। বৃষ্টি।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। জলে থৈ থৈ করছে চারদিক। এমন কি, কোন কোন জায়গায় এরই মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত জল জমে গেছে।

ঝড়-জল মাথায় নিয়েই ছুটি গ্রাম্য মুসলমান হেঁটে চলেছে শহরের রাজপথ দিয়ে। পরনে ছেঁড়া লুঙ্গী। গায়ে ময়লা গেঞ্জী। হাতে তালিমারা জুতো।

বেশ বোঝা যায় যে, গাঁয়ের কোন গরীব মুসলমান। বোধহয় মামলা করতে শহরে এসেছিল। এবার ঘরের মানুষ ঘরে ফিরে চলেছে।

কে এই লোক ছুটি! কি ওদের পরিচয়! অপেক্ষা কর, একটু বাদে নিজেই সব বুঝতে পারবে।

সামনেই দোলাইগঞ্জ স্টেশন। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ যেতে হলে এটাই ঢাকার পরবর্তী রেলস্টেশন।

আস্তে আস্তে লোক ছুটি এবার ঢুকে গেল স্টেশন এলাকার মধ্যে। সিগন্যাল ডাউন। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ-গামী গাড়ি আসার সময় হয়েছে।

কিন্তু না, যাত্রীদের আপাতত প্লাটফরমে যাবার হুকুম নেই। আগে প্রতিটি কামরা তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হবে, তারপর তারা যেতে পারবে।

প্রতিটি কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা হল। এমন কি, কামরার পায়খানাগুলোতে পর্যন্ত তল্লাশী চালানো হল। খোলা মালগাড়ি-গুলোও বাদ গেল না। কিন্তু কোথায় বিনয় বোস! না, এ গাড়িতে সে নেই। এবার যাত্রীরা গাড়িতে উঠতে পারে।

পূর্ণবেগে গাড়িটা ছুটে চলেছে ফতুল্লার দিকে।

কামরার এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে সেই গ্রাম্য লোক ছুটি। মুখে নির্বিকার ঔদাসীন্য। চোখে অর্থহীন শূন্যদৃষ্টি।

বোধহয় কোর্টে মামলা শেষ করে কতক্ষণে বাড়ি গিয়ে বিবির মুখ দেখতে পাবে, সেই কথাই ভাবছে ওরা মনে মনে।

কামরার অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদঙ্গল ছেলে। হৈ-চৈ করে বলতে গেলে গোটা কামরাটাকেই ওরা একেবারে মাথায় তুলে রেখেছে। বেশ বোঝা যায় যে, ছুটির পরে মনের আনন্দে ওরা ঘরে ফিরে চলেছে।

আসলে কিন্তু ঐ গ্রাম্য লোক দুটিই সেদিন ওদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মল্লিকা। যে করে হোক, ওঁদের নিরাপদে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। দলীয় নির্দেশ ছিল তাই।

চাষাড়া স্টেশন। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না। তদুপরি ঝড়-জল-বৃষ্টি তো আছেই।

মাত্র এক মিনিটের বিরতি। গাড়ি আবার আস্তে আস্তে চলতে শুরু করেছে। এর পরের স্টেশনই নারায়ণগঞ্জ।

হঠাৎ একি! বাইরে তীক্ষ্ণ শিস দেবার শব্দ। ডেঞ্জার সিগন্যাল। গেট-আপ্! রেডি! কুইক! নিমেষে গোটা কামরা ফাঁকা।

চোরের ওপর বাটপাড়ি। গোয়েন্দার পেছনে গোয়েন্দা।

ঢাকা থেকে খবর এসেছে, এ গাড়িকে নারায়ণগঞ্জে আবার সার্চ করা হবে। শুধু গাড়িই নয়, প্রতিটি স্টীমার, লঞ্চ, বজরা, পানসী তন্ন তন্ন করে তল্লাশী করা হবে।

এ পক্ষের গোয়েন্দা খবরটা ধরে ফেলেছে। সুতরাং গাড়ির পালা এখানেই ইতি। এখান থেকে নারায়ণগঞ্জের দূরত্ব সামান্যই। চল এবার পায়ে হেঁটে।

এখান থেকেই বিদায় নিলেন বঙ্গেশ্বর রায়, বিনয় বসু (জুনিয়ার), বকুল দাশগুপ্ত প্রমুখ ঢাকার বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। তাঁদের কর্তব্য শেষ। পরবর্তী দায়িত্ব নারায়ণগঞ্জ গ্রুপের। সুতরাং চল ফিরে এবার ঢাকাতে।

দলীয় সদস্য গিরিজা সেনের বাড়ি রাত কাটিয়ে, পরদিন ভোরে খেয়া পার হয়ে বন্দর।

এপারে নারায়ণগঞ্জ, ওপারে বন্দর। বন্দর আসলে কোন সত্যি-কারের বন্দর নয়, জায়গাটার নামই বন্দর। মাঝির লক্ষ্য আপাততঃ বন্দরের দিকেই।

বন্দর থেকে পায়ে হেঁটে বৈদ্যের বাজার। আবার নৌকো।

তবে এবার আর নকল মাঝি নয়, সত্যিকার মাঝির নৌকো। মেঘনা পাড়ি দিতে হবে।

যাত্রী সেই দুজনই। তবে এরা আলাদা লোক। মিঞাসাহেবদের বদলে এবারে এসেছেন অন্য দুটি প্রাণী। জমিদারবাবু, আর ভৃত্য। বোধহয় কোন মহাল বা কাছারী পরিদর্শন করতে চলেছেন।

জমিদারবাবুটি হলেন বি. ভি.-র অ্যাকসন স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য সুপতি রায়। আর ভৃত্যটি! নিজেই সেকথা অনুমান করে নাও।

সকাল গড়িয়ে দুপুর, তারপর রাত্রি।

অশান্ত মেঘনা। অবিরাম ঢেউ গড়ছে আর ভাঙছে। অবিরাম সেই ভাঙা-গড়ার শব্দ চলছে। যেন শেষ নেই এই ভাঙা-গড়া মিছিলের।

দেখতে দেখতে এক সময়ে মেঘে মেঘে কালো হয়ে উঠল আকাশটা। শুরু হল ঠাণ্ডা হাওয়া।

শঙ্কায় শুকনো হয়ে উঠল মাঝির মুখ। গতিক সুবিধার নয়। মেঘনা আজ প্রায় সারাদিন ধরেই অশান্ত। বাতাসও ক্ষেপে উঠেছে। মনে হয় বড় রকমের ঝড় উঠবে। মেঘের কুণ্ডলীতে যেন তারই আভাস।

অনুমান মিথ্যে হল না। সহসা ঈশান কোণ থেকে বাতাস ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্তের মতো।

সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম উচ্ছল মেঘনার সে কি বিচিত্র রূপ! সে কি তার নাচের ঘটা!

বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, উৎক্ষিপ্ত দুবাহু আকাশে তুলে দুরন্ত আক্রোশে মুহুর্মুহুঃ সে আঘাত করতে লাগল নৌকোর নড়বড়ে কাঠের খোলটার ওপর। যেন নিজ রাজ্যে অনধিকার-প্রবেশকারী

এই তুচ্ছ প্রাণী ক'টাকে অতল সমাধিতে না পাঠানো পর্যন্ত কোন-রকমেই তার শান্তি নেই।

—আর পারলাম না কর্তা। হতাশভাবে বলল মাঝি, বাঁচতে হইলে আবার ঘাটের দিকে নাও ফিরাইতে হইব।

—কি সর্বনাশ! জমিদারবাবুর সারা মুখে চিন্তার কালো রেখা, আমার যে অনেক কাজ পড়ে আছে! যেমন করে হোক, আমাকে পার করে দাও মাঝি। তুমি বরং বেশি পয়সা নিও।

—পয়সা! জানই যদি চইলা যায় তো পয়সা দিয়া কি করুম! এই ঝড়-তুফানের মধ্যে মেঘনা পাড়ি দিতে আমি ক্যান, আমার বাপে আইলেও পারব না।

—তাই তো! চিন্তিত হয়ে পড়লেন জমিদারবাবু, এখন উপায়! কি করা যায় এখন?

—ক্যান, অত চিন্তার কি আছে? মাঝি উপায় বাতলে দিল, অত যখন জরুরী কাম, তখন জাহাজে চইলা যান। সামনেই ফিলেগ্ ইষ্টিশান। কন্ তো ইষ্টিশানে তুইলা দিয়া আসি। একটু পরেই জাহাজ আইব।

অগত্যা তাই। শেষপর্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন জমিদারবাবু। উপায় কি! অনেক টাকা খাজনা বাকি পড়েছে। মহালে গিয়ে টাকাগুলো তুলতে হবে তো!

কোন স্থায়ী স্টেশন নয়, একটা অস্থায়ী ফ্ল্যাগ-স্টেশন মাত্র। তবে আশার কথা এই যে, এখানে পুলিসের কোন সমারোহ নেই। বিনয় বোসের মতো একটা ডেঞ্জারাস ছেলের এখানে আসার কোন কারণ নেই। তাছাড়া পুলিসের বেড়াজাল ডিঙিয়ে আসবেই বা কি করে! সুতরাং পুলিস রেখে লাভ কি!

স্টীমারটা একটানা ছুটে চলেছে মেঘনার ঢেউ ভেঙে। লক্ষ্য তার ভৈরব।

না, সপারিষদ জমিদারবাবু উধাও হয়েছেন। পরিবর্তে এসেছে আমাদের পূর্বেকার চেনা সেই সহজ সরল গ্রাম্য মুসলমান দুটি।

বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীর ভিড়। এই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে জমিদার-বাবুটি সেজে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে লাভ নেই। তার চাইতে আগেকার বেশই ভাল।

যথাসময়ে ভৈরব। এবার ট্রেন। স্টেশনে পুলিস অবশ্য রয়েছে, তা থাক না! দরকার হলে যুঝতে হবে। সমানে সমানে পাল্লা দিতে হবে। আত্মসমর্পণ কোনমতেই নয়। সুতরাং বলতে গেলে পিস্তলের ট্রিগার সর্বক্ষণ মাথা উঁচিয়ে আছে। শুধু নেমে আসার অপেক্ষা মাত্র।

চমক ভাঙল কিশোরগঞ্জ গিয়ে। সর্বনাশ! সারাটা প্লাটফরম জুড়ে লাল-পাগড়ির বেষ্টনী। গাড়ি নাকি সার্চ হবে। এখন উপায়! ইতিহাসের শেষপর্বের যে এখনো অনেকটাই বাকি! এরই মধ্যেই কি সব কিছুর ভরাডুবি হবে?

জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে একজন রেলওয়ে টি. টি.। একগাল পান চিবোতে চিবোতে কৌতূহল ভরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তিনি কি দেখছিলেন কে জানে।

সঙ্গে সঙ্গে দুই মিঞাসাহেব গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে একেবারে ভেঙে পড়ল তাঁর পায়ের কাছে—কর্তা, একটা আকাম কইরা ফালাইছি। এইবারের মতো আমাগো পোলাপানগো মাপ কইরা দেন।

—কি হয়েছে? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন টি. টি.।

—আর কন ক্যান্! তাড়াতাড়ি কইরা গাড়িতে উঠতে গিয়া টিকিট কাটতে পারি নাই। অখন আমাগো ক্ষেমাঘেন্না কইরা দুইখান টিকিটের ব্যবস্থা কইরা দেন। নাইলে আমাগো পুলিসে ধইরা লইয়া যাইব। দেখছেন না, কেমন চোখ পাকাইয়া চাইয়া দেখতে আছে!

—দূর পাগল! হেসে বললেন টি. টি., ওসব তোদের জন্য নয়।

—না না, অগো বিশ্বাস নাই। ওরা বেবাক পারে। তার থিকা আপনে আমাগো নিজের হাতে হুইখানা টিকিট কাইটা দেন। আমরা টাকা দিতে আছি। আপনেরেও কিছু দিমু।

—কোথাকার টিকিট চাই? প্রশ্ন করলেন টি. টি.।

—খাইছে! জাগার নাম তো মনে নাই! মগবুলচাচায় কি যেন কইছিল, বেবাক ভুইলা গেছি। সবুর করেন, মনে কইরা কইতে আছি! হ--হ, মনে হইছে। কইলকাতা। কইলকাতা। ঐখানে গিয়া আমরা কাপড়ের কলে কাম করুম। নেন, আর দেরি কইরেন না। আপনের চরণ ধরি। লন যাই টিকিট-ঘরে। আমরাও আপনের লগে যাইতে আছি!

মল্লিকা, দিব্বি হুজনে টি. টি.-র পেছনে পেছনে টিকিট-ঘরের দিকে চলে গেলেন ব্রিটিশ পুলিসকে ভাঁওতা দিয়ে। ওরা দেখেও দেখল না। কেনই বা দেখবে! টি. টি.-র হাতে রোজ এমন কত বিনে-টিকিটের যাত্রীই তো ধরা পড়ে। এরাও তাই হবে হয়তো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার হুজনে ফিরে এলেন মুখে একগাল হাসি নিয়ে। এদিকে তল্লাশী তখন শেষ, সুতরাং গাড়িতে উঠতে আর কোন বাধা নেই।

মজা হল ময়মনসিং-এ গিয়ে। বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো সহসা তীরবেগে কামরায় ঢুকলেন একজন দারোগা সাহেব। সঙ্গে জন-কয়েক পুলিস কনস্টেবল।

সঙ্গে সঙ্গে হুজনের অন্য চেহারা। একজন ছেঁড়া কাঁথায় নিজেকে ঢেকে নিমেষে কামরার কাঠের মেঝেতে শুয়ে লম্বমান, অন্যজন হুহাত জোড় করে অদূরে দণ্ডায়মান একান্ত অনুগত ভৃত্য 'কেষ্ট'র মতো।

গাড়ি স্পীড্ নিয়েছে। দারোগা সাহেবও ততক্ষণে বেশ জমিয়ে বসেছেন দলবল নিয়ে। কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল, আপাততঃ তিনি জগন্নাথ-ঘাটে চলেছেন মস্তবড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে।

তখনকার দিনের দারোগা, সুতরাং দাপট সাংঘাতিক। সিপাইদের লক্ষ্য করে সে কি তাঁর হম্বিতম্বি।

আসুক না বিনয় বোস। আমিও জগন্নাথ-ঘাটে গ্যাঁট হয়ে বসে আছি। চেনে না তো আমাকে। ক্যাঁক্ করে বাছাধনের টুঁটি চেপে ধরব না! এই তেওয়ারী, বন্দুকে সব সময় গুলী ভরে রাখবি। বিশ্বাস নেই বেটাকে। হয়তো ধাঁই করে একখানা মেরে হডসনের মতো কোমর ভেঙে দেবে। আমার আবার 'হার্টে'র ব্যামো। তাই তো এই নতুন মাদুলীটা নিতে হল।

এ কি! নিমেষে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন দারোগা সাহেব, বন্দুকের নলটা আবার আমার দিকে ধরে রেখেছিস কেন! ওটা একটু ঘুরিয়ে রাখ না বাপু। বলছি আমার হার্টের ব্যামো। এসব ধকল কি আমার সয়!

হঠাৎ ছদ্মবেশী সুপতি রায়কে দেখে চমক ভাঙল দারোগা সাহেবের। তাই তো! এ লোকটা কে! সেই কখন থেকে হাত-জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেই বা কেন?

—কি! সঙ্গে সঙ্গে নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন দারোগা সাহেব—অমন ঘোড়ার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে! ওদিকে বসলেই তো পারিস!

—পোলাপানের মতো কি যে কন হুজুর! বিনয়ে একেবারে গলে গেলেন সুপতি রায়—আপনে হুকুম না দিলে কি আমরা বইতে পারি! বেয়াদপী হইব না!

খুশি হলেন দারোগা সাহেব। হ্যাঁ, এই তো চাই। আহা, বিনয় বোসটা যদি এরকম লক্ষ্মীছেলে হত, তাহলে এমন হার্টের ব্যামো নিয়ে আর এভাবে দৌড়-ঝাঁপ করতে হত না তাঁকে।

—ঠিক আছে, তুই বোস ওদিকে। নিমেষে উদার হয়ে উঠলেন দারোগা সাহেব—আমি তোকে বসতে হুকুম দিলাম। তা, তোর পায়ের কাছে ওটা আবার কে কাঁথা-মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে?

—আর কন ক্যান্ হুজুর! প্রায় কেঁদে ফেললেন সুপতি রায়—আমার চাচাতো ভাই নুরমিঞা। জ্বরে একেবারে বেহুঁশ। গা দিয়া দু-চারটা গোটাও বাইর হইছে। আল্লার মনে কি আছে কে জানে!

এঁ্যা! একে হাটের ব্যামো, তার ওপর আবার বসন্ত!

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে নিমেষে কামরার অন্যপ্রান্তে সরে গেলেন দারোগা সাহেব। কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম! এসব ছোঁয়াচে রোগ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। বিশেষ করে এই হাটের ব্যামো নিয়ে।

জগন্নাথ-ঘাট। এ লাইনে এটাই শেষ স্টেশন। এবার আবার স্টীমার।

নিজের পদমর্যাদা জাহির করে দলবল নিয়ে সর্বাগ্রে নেমে গেলেন দারোগা সাহেব। সবশেষে নামলেন সুপতি রায় তাঁর অসুস্থ চাচাতো ভাই নুরমিঞাকে নিয়ে। ছন্নছাড়া বিহঙ্গের মতো অসহায় ভাব।

হবেই তো! বেচারা চাচাতো ভাইটির একে জ্বর, তার ওপর আবার বসন্ত। আল্লার মনে কি আছে কে জানে!

স্টীমারটা সাঁতার কেটে চলেছে জলের ওপর দিয়ে। এবারের লক্ষ্য সিরাজগঞ্জ ঘাট। দূরত্ব সামান্যই।

তিন দিন পেটে কোন আহার পড়েনি। আজও যে পড়বে, তেমন কোন ভরসা নেই।

কষ্ট! না, কষ্ট কিসের! পরাধীনতার নাগপাশ যাঁরা ছিন্ন করতে চান, সেইসব ঘরছাড়া হতভাগ্যের দল জানে যে, এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়।

সুতরাং সামান্য এই ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁদের বিচলিত হবার কথা নয়।

বিচলিত হলেন সুপতি রায়। হলেন বিনয়ের কথা ভেবেই। এ ছেলে সাধারণ ছেলে নয়। অদ্ভুত ওর সাহস। অসাধারণ ওর দক্ষতা। নির্ভুল ওর নিশানা।

অদূর ভবিষ্যতে এর চাইতেও অনেক বড় সংগ্রামে ওর মূল্যবান অধিনায়কত্বের প্রয়োজন। সেই দুরন্ত সংগ্রামে সিংহের মতো রুখে দাঁড়াতে হলে ওকে সুস্থ ও সমর্থ রাখা একান্তভাবেই দরকার।

সুতরাং নিজের জন্য না হলেও অন্তত ওর জন্য কিছু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এখনই প্রয়োজন। পরে যে সুযোগ পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

স্টীমারে একমাত্র উপায় বাটলার। তবে প্রথম শ্রেণীর সাহেব-সুবো নিয়ে তার কারবার। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কথায় সে কি রাজী হবে?

দেখাই যাক না একবার চেষ্টা করে! কনস্টেবলকে 'হাবিলদার সাহেব' বলে আপ্যায়ন করলে অনেক ক্ষেত্রেই কাজ পাওয়া যায়। সুতরাং চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি!

—এই যে! একগাল হেসে বাটলারের কেবিনের দরজার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন সুপতি রায়, আপনেই বুঝি এই লাইনের বড় বাটলার সাহেব?

—হ্যাঁ, কেন? বাটলার নিজের পদমর্যাদায় গম্ভীর।

—না, কিছু না। আমাগো সাহেব আপনের কথা অখনো প্যাচাল পারে। কয় যে, জগন্নাথ-ঘাট লাইনের বড় বাটলার সাহেবের হাতে যে খাওয়া একবার খাইছি, তা বিলাতেও কোনদিন খাই নাই। যেন জন্মের শেষ-খাওয়া।

—কোন্ সাহেব? প্রশ্ন করে বাটলার।

—ক্যান, আমাগো চটকলের সাহেব। এই তো গত চৈত্ মাসে আপনের হাতে খাইয়া গেল। আপনের মনে নাই?

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বাটলার। কি জানি! হয়তো হবে!

এমন কত সাহেবই তো এ লাইনে যাতায়াত করে। তাদের মধ্যে কে যে কোন্ কোম্পানির সাহেব, তা কে আর মনে রাখতে গেছে!

—তা, কইছিলাম কি, আমাগো দুইজনেরে কিছু দেন না কেনে! এত যখন নাম, তখন একটু চাইখা দেখি! না না, আপনের কোন ক্ষেতি করুম না। পয়সা যা লাগে, দিমু।

আর কোন আপত্তি করল না বাটলার সাহেব। কেনই বা করবে! এই হাবা-গবা লোক দুটোর কাছ থেকে যদি বেশ কিছু হাতিয়ে নেওয়া যায় তো মন্দ কি!

জগন্নাথ-ঘাট থেকে স্টীমারে সিরাজগঞ্জ। সিরাজগঞ্জ থেকে সোজা শিয়ালদা স্টেশন।

কিন্তু না, শিয়ালদা নয়। দমদমেই মিঞাসাহেবরা নেমে গেলেন গাড়ি থেকে। শিয়ালদা অনেক বড় স্টেশন। সংবর্ধনার আয়োজনটাও হয়তো বড়রকমই থাকবে।

কি লাভ! তার চাইতে ছোট স্টেশন দমদমই ঢের ভাল। এবার মগবুলচাচার সেই কাপড়ের কলে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারলে আর ভাবনা কি!

সাত নম্বর ওয়ালিউল্লা লেন। বাড়ির মালিক সুরেশ মজুমদার।

গোটা একতলাটা জুড়ে রিক্সা ও মোটর গ্যারেজ। জায়গাটা যেমন ঘিঞ্জি, তেমনি অন্ধকার। বারো ঘর এক উঠান। নানাজাতীয় লোকের বাস। পাঞ্জাব থেকে শুরু করে উৎকল পর্যন্ত কেউ বাদ নেই। হৈ-হল্লা সর্বক্ষণ লেগেই আছে।

দোতলাটা ঠিক তার বিপরীত। ঘরগুলিও বেশ প্রশস্ত ও মোটামুটি সুসজ্জিত। পরিবেশের দিক থেকেও অনেকটা শান্ত।

তখনকার সময়ে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে বি. ভি.-র বেশ কয়েকটি গুপ্ত ঘাঁটি ছিল। সুরেশবাবুর এই দোতলা বাড়িটাই ছিল তার হেড কোয়ার্টার। বাংলার গভর্ণর অ্যাণ্ডারসন স্যুটিং মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিতা উজ্জ্বলা মজুমদার তাঁরই মেয়ে।

যথাসময়ে সুপতি রায় এখানে এসে হাজির হলেন বিনয়কে নিয়ে। যে গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছিল তাতে তিনি ব্যর্থ হননি। এবার নিশ্চিন্ত।

নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না সুরেশবাবু ও বি. ভি.-র কর্মকর্তাগণ। জায়গাটা শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। নিচে বহুরকম লোকের আনাগোনা। এ অবস্থায় বিনয়ের মতো ছেলেকে এখানে রাখা কোনদিক থেকে যুক্তিযুক্ত নয়। যত শীগ্‌গীর সম্ভব তাঁকে আর কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু কাজটা সহজ নয়। বাংলাদেশের সর্বত্র তাঁর ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান পুরস্কার ঘোষণা। আগে ছিল পাঁচ হাজার, এখন পুরো দশ। এ পরিস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের ওপর দিয়ে তাঁকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা চাট্টিখানি কথা নয়।

সব চাইতে বড় কথা—টেগার্ট। বিপ্লব আন্দোলনের সব চাইতে বড় শত্রু চার্লস টেগার্ট।

সত্যিই বিচক্ষণ লোক। মাত্র কিছুদিন আগে ডালহৌসী স্কোয়ারে তার ওপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল, কিন্তু লাভ হয়নি কিছুই। এখনো তার জের মেটেনি। ধর-পাকড় সমানেই চলছে। নেকড়ের মতো হিংস্র চোখ নিয়ে সে যে এখানেই এসে হানা দেবে না, তা কে বলতে পারে?

শত্রু হলেও বুদ্ধি, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য টেগার্টকে প্রশংসা না করে উপায় নেই। ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাসে এমন ধূর্ত ও

তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন অফিসার আর দ্বিতীয়টি দেখা যায়নি। বিশেষ করে পুলিশ কমিশনার হিসেবে কলকাতার গুণ্ডার বংশকে যেভাবে তিনি নির্বংশ করে ছেড়েছিলেন, তাকে শতমুখে প্রশংসা করতে হয়।

অধুনা ভাবনা তার গুণ্ডাদের নিয়ে নয়, ভাবনা বাংলাদেশের এই মৃত্যু-পাগল ছেলেগুলোকে নিয়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভাবনা-মুক্ত করতে হলে ওদের নির্মমভাবে দমন করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

এহেন টেগার্টের নজর এড়িয়ে বিনয়কে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা সম্ভব হবে কি! দেখা যাক।

সিগন্যাল ডাউন।

কলকাতা থেকে গাড়ি আসার সময় হয়েছে। এরই মধ্যে এঞ্জিনের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেছে গোটা স্টেশন অঞ্চলটা।

ব্যাণ্ডেল জংশনে পাহারারত সশস্ত্র পুলিস বাহিনী প্রস্তুত। কঠোর নির্দেশ, কলকাতা থেকে বাইরে যাবার প্রতিটি গাড়ি, প্রতিটি কামরার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বিনয় বোস কোনরকমেই যেন বাইরে পালিয়ে যেতে না পারে। খুব সাবধান!

কিন্তু এ কি! সহসা কি দেখে তটস্থ হয়ে উঠল সশস্ত্র পুলিস বাহিনী। স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি এদিকেই এগিয়ে আসছে যে! কি ব্যাপার! তবে কি সাহেব এ ট্রেনে বাইরে কোথাও যাচ্ছেন সরকারী কাজে?

না, সাহেব নন, তাঁর কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক সরোজ রায়। সঙ্গে রয়েছেন আরো দুজন। একজন যুবক, অন্যজন প্রবীণ। রায়-বাবুরই কোন আত্মীয়-টাত্মীয় হবে হয়তো।

—সেলাম বাবুজী। সরোজবাবুকে দেখেই অভিবাদন জানাল সশস্ত্র প্রহরীর দল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেলাম। হেসে জবাব দিলেন সরোজবাবু, ভাল করে চারদিকে নজর রেখো। দেখো, আসামী যেন কোনমতেই পালিয়ে যেতে না পারে। ধরিয়ে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার, তা যেন ভুলে যেয়ো না।

আত্মীয় দুজনকে ট্রেনে তুলে দিয়ে একটু বাদেই আবার যথাস্থানে ফিরে গেলেন সরোজ রায়। সেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িতে। সঙ্গে সাহেবের সেই সুপরিচিত উর্দি-পরা ড্রাইভার আর আর্দালি।

মল্লিকা, বিশ্বাস কর আর নাই কর, যুবকটি কিন্তু আসলে স্বয়ং বিনয় বোস ছাড়া আর কেউ নন। আর প্রবীণটি হলেন বি. ভি.-র অ্যাকশন স্কোয়াডের সিনিয়ার সদস্য, রডা অস্ত্র-লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক শ্রদ্ধেয় হরিদাস দত্ত।

যাঁকে ধরবার জন্য এত কাণ্ড, সেই বিনয় বোস যে স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি করে তাদের নাকের ওপর দিয়ে এমনি করে বাইরে চলে যাবে, তা বোধহয় শাসকদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এ ব্যাপারে বি. ভি.-র শুভার্থী বন্ধু সরোজ রায়ের ভূমিকা ছিল সত্যিই অসাধারণ। সরকারী কর্মচারী হয়েও যেভাবে তিনি নিজের ওপর সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে এ কাজে এগিয়ে এসেছিলেন, সচরাচর তার তুলনা মেলে না।

কলকাতা থেকে কাতরাসগড় কোলিয়ারী। আশ্রয় নিলেন দলীয় বন্ধু অনাথবন্ধু দাশের কোয়ার্টারে। বেশ বড় কোয়ার্টার। সুতরাং অসুবিধের কিছু নেই।

খুশি হতে পারলেন না বিনয়। বুক জুড়ে সর্বক্ষণ কিসের যেন একটা চাপা অস্থিরতা। পুলিসের বড়কর্তা লোম্যানকে তিনি নিজের হাতে শাস্তি দিয়েছেন। এখানেই কি তাঁর কর্তব্য শেষ! আর কিছুই কি তাঁর করণীয় নেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে!

কিছুই বুঝতে বাকি রইল না অভিজ্ঞ বিপ্লবী হরিদাসবাবুর। তাই দিনকয়েক বাদেই আবার তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন বিনয়কে নিয়ে।

আশ্রয়ের ব্যবস্থা হল বেলেঘাটায়। সবশেষে দলের একনিষ্ঠ কর্মী মেটিয়াবুরুজের রাজেন গুহর বাড়িতে।

রাজেনবাবু মহাখুশি। বিনয়ের মতো ছেলে তাঁর আশ্রয়ে থাকবে, এতো ভাগ্যের কথা। এমন ভাগ্য ক'জনের হয়!

বিনয়েরও খুশির অন্ত নেই। লোক হিসেবে রাজেনদার সত্যিই তুলনা নেই। তার চাইতেও বড় কথা—তাঁর ঐ কচি কচি শিশু-গুলো। দেখলেই যেন আদর করতে ইচ্ছে করে।

সর্বোপরি—বৌদি। বৌদি তো নন, ঠিক যেন মা। সংসারে একমাত্র মা ছাড়া আর কারো কাছ থেকেই বুঝি এমন নিঃস্বার্থ, অনাবিল স্নেহ পাওয়া সম্ভব নয়।

এবার শুরু হল মন্ত্রণা-সভা। কি করা যায় এখন বিনয়কে নিয়ে! সর্বাগ্রে তাঁর নিরাপত্তার প্রশ্ন। এ ব্যাপারে যা হোক, একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।

অনেক ভেবে-চিন্তে সুভাষ তাঁর অভিমত জানালেন—বিনয় বিদেশে চলে যাক। চিরদিন কারো পক্ষে পুলিসের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। একদিন না একদিন ধরা তাকে পড়তেই হবে। তার চাইতে আপাতত সে তাদের নাগালের বাইরে চলে যাক।

একই অভিমত ব্যক্ত করলেন মেজদা শরৎ বোস, আচার্য পি. সি. রায়, লেডি অবলা বসু প্রমুখ সবাই। হ্যাঁ, বিদেশে চলে যাওয়াই ভাল।

অসাধ্য সাধন করতে হরিদাসবাবুর জুড়ি ছিল না। শুধু রডা কোম্পানির অস্ত্র-লুণ্ঠন নয়, পরবর্তী কালেও তিনি তাঁর প্রমাণ রেখেছিলেন বার বার।

এবারও তাই করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হাত করে ফেললেন মিঃ মিল নামক কিংস জর্জ ডকের একজন পদস্থ কর্মচারীকে। ঠিক

হল, পরদিনই ভোর পাঁচটায় তিনি বিনয়কে তুলে দেবেন সমুদ্রগামী এক জাহাজে। তারপর সোজা ইটালী। ব্যস্, আর কি চাই!

সব বৃথা। বেঁকে বসলেন বিনয় নিজেই। কারণ, বি. ভি.-র পরবর্তী অভিযান।

সে এক ভয়ানক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা। এমন ভয়ঙ্কর কথা সেদিন বোধহয় কারো পক্ষে চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের সবচাইতে শক্ত ঘাঁটি রাইটার্স বিল্ডিং। এবার সেই শক্ত ঘাঁটির ওপর আঘাত হানতে হবে। আঘাতে আঘাতে ওদের সমস্ত দম্ভকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে।

পরিকল্পনা প্রস্তুত। দলের অন্যতম নেতা প্রফুল্ল দত্ত শুধু অ্যাক্‌শন স্কোয়াডের সদস্যই নন, একজন ইঞ্জিনিয়ারও বটে। তাঁর সাহায্যে রাইটার্স বিল্ডিং-এর কোথায়, কোন্ তলায় কার ঘর, তার খুঁটিনাটি সমস্ত কিছুর একটা নক্সাও হাতে এসে গেছে। দিন-তারিখও স্থির হয়ে গেছে। এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র।

প্রথম লক্ষ্য—কারা-বিভাগের সর্বময় কর্তা কর্নেল সিম্পসন। অনেক রক্তই সেদিন ঝরেছিল আলিপুর জেলে বন্দী সুভাষের দেহ থেকে। কারা-বিভাগের অধিকর্তা হিসেবে তাকেই এবার নিজের রক্ত দিয়ে সুভাষের সেই রক্তের ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

বিনয় চিরদিনই স্বল্পভাষী। সব শুনে এবারও মাত্র দুটি কথার মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর অভিমত জানালেন—'আমি যাব।'

সেদিন যাঁরা বি. ভি.-র কার্যকরী সংসদের সদস্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা হলেন দলের ছোট-বড় সবার একান্ত প্রিয় মেজদা হরিদাস দত্ত, সত্য বক্সী, মেজর সত্য গুপ্ত, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, প্রফুল্ল দত্ত, মণীন্দ্র রায় ও রসময় শূর।

কার্যকরী সংসদের প্রধানতম সহায়ক ছিলেন জ্যোতিষ জোয়ারদার, যতীশ গুহ, তেজোময় ঘোষ, জিতেন সেন, সুধীর নন্দী,

অশোক সেন, গোপাল সেন, অনিমেষ রায়, শচীন ভৌমিক, মণি সেন আর নির্মল গুহ।

মহিলা কর্মী সংগঠনের ভার ছিল অধ্যাপিকা মীরা দত্তগুপ্তার ওপর। অস্ত্রশস্ত্রও তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখা হত কখনো কখনো। পিতা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। সুতরাং সব দিক থেকেই নিরাপদ।

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় ও মেজর সত্য গুপ্ত বন্দী হবার পর ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে একটি অ্যাক্‌শন স্কোয়াড। সেই স্কোয়াড পরিচালনা করতেন মেজদা হরিদাস দত্ত, প্রফুল্ল দত্ত, রসময় শূর, নিকুঞ্জ সেন আর সুপতি রায়।

প্রস্তাব শুনে সবাই সমর্থন জানালেন একবাক্যে। বিনয় নিজেই যখন আগ্রহ প্রকাশ করেছে, তখন তার ওপর আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ঠিক হল, অভিযান পরিচালনা করবেন বিনয় স্বয়ং। সঙ্গে থাকবেন আরো দুজন মৃত্যুভয়হীন তরুণ বিপ্লবী। দীনেশ গুপ্ত আর বাদল গুপ্ত।

দীনেশ গুপ্ত। বি. ভি.-র দুরন্ত দুঃসাহসিক সৈনিক দীনেশ গুপ্ত। চোখে দিগন্ত সীমার মতো উন্মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। বুকে দুর্বার সাহস। পেশীবহুল স্বাস্থ্য আর প্রাণ-প্রাচুর্যে যেন উপচে পড়ছে তাঁর জীবনপাত্র।

শিল্পী, কবি, দার্শনিক, প্রতিটি বিশেষণই ছিল তাঁর সম্বন্ধে সমান-ভাবে প্রযোজ্য। সাহিত্যিক হিসেবেও পিছিয়ে ছিলেন না। মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর লেখা গল্প ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছিল প্রচুর। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ তো বলতে গেলে তাঁর ধ্যান-জ্ঞান সব কিছু। এমন রবীন্দ্র-ভক্ত সত্যিই বিরল ছিল তখনকার দিনে।

তবে সবার উপরে ছিল তাঁর অপূর্ব সংগঠন-শক্তি। পরবর্তীকালে যে মেদিনীপুর একদিন অগ্নিযুগের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল, তার মূলে ছিলেন এই দীনেশ। তিনিই ছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেদিনীপুর শাখার প্রতিষ্ঠাতা।

হঠাৎ নির্দেশ দেওয়া হল—তোমাকে মেদিনীপুর যেতে হবে দীনেশ। ওখানকার ছেলেদের সংঘবদ্ধ করা দরকার। আশা করি তুমি তা পারবে।

সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা ত্যাগ করে মেদিনীপুর কলেজে গিয়ে ভর্তি হলেন দীনেশ। আমি পারব। পারতেই হবে আমাকে। যত বাধা-বিপত্তিই মাথা উঁচিয়ে আসুক না কেন, সব কিছু পযুদস্ত করে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে আপন লক্ষ্যের দিকে।

কাজ, কাজ আর কাজ! নিরবচ্ছিন্ন কাজ! নতুন জীবন, নতুন পরিবেশে দেখতে দেখতে কাজের নেশায় মশগুল হয়ে গেলেন দীনেশ। কাজ ছাড়া আর সব কিছুই বুঝি চাপা পড়ে গেল মনের অতল গভীরে।

ফল হল আশাতীত। দেখতে দেখতে ঘুমন্ত দৈত্য যেন জেগে উঠল কোন্ মায়া-কাঠির স্পর্শ পেয়ে।

শেষপর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, ছেলেদের ধরে রাখা দায়। উন্মত্ত তরুণ রক্ত যেন অসহ্য আবেগে ফেটে পড়তে চায়। কাজ চাই! কাজ চাই!

হঠাৎ আবার একদিন জরুরী তলব এসে হাজির। অবিলম্বে ঢাকা চলে এস দীনেশ। তোমাকে বড্ড দরকার।

উপযুক্ত সহকর্মীর হাতে মেদিনীপুরের ভার ন্যস্ত করে সঙ্গে সঙ্গে আবার ঢাকাতে। আগে পার্টি, তারপর অন্য কথা। ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার সেখানে কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সাত নম্বর ওয়ালিউল্লা লেনের মতো বি. ভি.-র আর একটি গুপ্ত ঘাঁটি ছিল নিউ পার্ক স্ট্রীটের একটি দোতলা বাড়িতে। নীচে দলীয় সদস্য ডাঃ অনিমেষ রায় ও ডাঃ হিমাংশু ব্যানার্জীর চেম্বার।

দোতলায় আত্মগোপনকারী বাঘা-বাঘা সব বিপ্লবী। অ্যাক্‌শন স্কোয়াডের সদস্য নিকুঞ্জ সেন ও সুপতি রায় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন।

আর রয়েছেন দীনেশ ও বাদল। সতর্কতা হিসেবে আগে থেকেই তাঁদের এখানে এনে রাখা হয়েছে।

৭ই ডিসেম্বর। অভিযানের আর একদিন মাত্র বাকি।

ওদিকে প্রস্তুতি-পর্ব শেষ। আগ্নেয়াস্ত্রগুলো বার বার পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

বহুমূল্য ইয়োরোপীয়ান পোশাক-পরিচ্ছদগুলোও তৈরি হয়ে এসে গেছে। ঐ পোশাকের ঠাট দেখিয়েই কাল তিনজনকে গট গট করে ঢুকে যেতে হবে রাইটার্স বিল্ডিং-এর অভ্যন্তরে। যেন কোন বড়দরের অফিসার আর কি! নইলে দ্বাররক্ষীদের কাছ থেকে বাধা পাওয়া বিচিত্র নয়।

হঠাৎ একটা জরুরী কথা মনে পড়ে গেল নিকুঞ্জবাবুর। নক্সাতে খুঁটি-নাটি সব কিছু দেওয়া থাকলেও বিরাট ঐ রাইটার্স বিল্ডিং-এর অলি-গলি সম্বন্ধে কারো কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। কাউকে একবার দেখিয়ে-শুনিয়ে আনলে কেমন হয়!

বিনয় পলাতক, তাঁর সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ওঁদের কাউকে একবার ঘুরিয়ে আনলে ক্ষতি কি!

শেষপর্যন্ত বাদলকে নিয়েই পথে পা দিলেন নিকুঞ্জবাবু। বাদল শুধু তাঁর স্কুলের ছাত্রই নন, নিজের হাতে গড়া উপযুক্ত শিষ্যও বটে। নিরলস কর্মী বাদলকে তাঁর চাইতে বেশি আর কে জানে!

সন্ধ্যার আগেই আবার তাঁরা ফিরে এলেন যথাস্থানে। পরিচিত

লোকের সাহায্যে বাদলকে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দিতে কোন অসুবিধা হয়নি। সুতরাং সব দিক থেকেই নিশ্চিন্ত।

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' নিয়ে দীনেশ তখন ধ্যানমগ্ন। দেখে মনে হয়, এ যেন এতদিনকার চেনা সেই দীনেশ নয়। আমূল পরিবর্তিত কোন ভিন্ন সত্তা। শান্ত স্নিগ্ধ সমাহিত দীনেশের এই রূপ চিন্তাও বুঝি করা যায় না।

অজ্ঞাতেই কখন মনটা কানায় কানায় ভরে ওঠে নিকুঞ্জবাবুর। আজও একান্ত প্রিয় দীনেশ ও বাদল তাঁদের চোখের সামনে রয়েছে।

কিন্তু কাল! শুধু ভাগ্যদেবতাই বলতে পারেন কাল ওদের অদৃষ্টে কি অপেক্ষা করে আছে! আশীর্বাদ, না অভিশাপ!

—শোন দীনেশ। তন্ময়তা ভেঙে বললেন নিকুঞ্জবাবু, তুমি তো খেতে ভালবাসো। কাল যাবার আগে কি খেতে চাও বলো?

—অ্যাঁ। 'বলাকা' রেখে নিমেষে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন দীনেশ—খাওয়াবেন! ঠিক আছে, রাজী আছি। তবে মেনু ঠিক করে দেব আমরা। আর একটা কথা। 'আর না' বলা পর্যন্ত খাইয়ে যেতে হবে। কি বলিস বাদল!

মনে মনে হাসলেন বাদল। খাইয়ে বলে দীনেশদার বরাবরই মনে মনে বেশ একটু গর্ব আছে। দেখা যাবে কাল তাঁর সেই গর্ব কোথায় থাকে! চেনে না তো বাদল গুপ্তকে!

১৯৩০ সাল। ৮ই ডিসেম্বর। অগ্নিযুগের রক্তরাঙা ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় দিন।

সকাল থেকেই সাজ-সাজ রব পড়ে গেল নিউ পার্ক স্ট্রীটের সেই গুপ্তকেন্দ্রে। দিন আগত ঐ।

প্রথমেই শুরু হল দীনেশ ও বাদলের সেই ফিস্ট। সে এক দেখার মতো জিনিস বটে! যেমন দীনেশ, তেমনি বাদল। এ বলে আমায়

দেখ, ও বলে আমায় দেখ। দুজনেই সমান। কেউ হার মানতে রাজী নন।

—আর মাংস দেব দীনেশ? প্রশ্ন করলেন নিকুঞ্জবাবু।

—সেকি! দীনেশ অবাক, এখনো তো শুরুই করিনি!

—তোমাকে দেব বাদল?

—আপনি দিতে থাকুন। সময় হলে আমিই মানা করব।

—পারবিনে বাদল, পারবিনে। তেড়ে ওঠেন দীনেশ, আমার সঙ্গে টেক্কা দিয়ে কোন লাভ নেই। হেরে ভূত হয়ে যাবি।

নিজের মধ্যেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করলেন নিকুঞ্জবাবু। স্বাধীনতার বেদীমূলে আজ ওদের চরম আত্মোৎসর্গের দিন। কেউ ফিরবে না। কেউ কোনদিন আর পৃথিবীর মুখ দেখবে না।

কিন্তু দেখে কে বলবে যে, তার জন্য ওঁদের মনে এতটুকুও দুর্ভাবনা আছে! মৃত্যু যেন ওঁদের কাছে একটা খেলা মাত্র।

অথচ কতই বা বয়েস ওঁদের। বিনয়ের বাইশ, দীনেশের কুড়ি, বাদল আঠারোয় পা দিয়েছেন মাত্র। ভাবতেও যেন অবাক লাগে।

খাওয়া শেষ। কিছুই পড়ে নেই। কিছুই অবশিষ্ট নেই।

সব শেষ। জামা-কাপড় পরাও শেষ! এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র।

দেখে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন নিকুঞ্জবাবু। একটা ট্যাক্সি ডেকে আনা দরকার। তারপর সোজা খিদিরপুরের পাইপ রোডের মোড়ে। বিনয়কে নিয়ে ওখানেই এসে রসময়বাবু অপেক্ষা করবেন বলে ঠিক হয়ে আছে।

খানিক বাদেই নিকুঞ্জবাবু ফিরে এলেন ট্যাক্সি নিয়ে। আর দেরি নয়। এবার ওদের ডেকে আনলেই হয়।

ডাকতে গিয়েও কিন্তু ডাকতে পারলেন না নিকুঞ্জবাবু। তার আগেই কি শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল তাঁর চলার গতি।

ভেতরে দীনেশ তখন তন্ময় হয়ে আবৃত্তি করে চলেছেন তাঁর

একান্ত প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা থেকে বিশেষ কয়েকটি লাইন—

'যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।'

নিদারুণ শূন্যতায় বুকটা হাহাকার করে ওঠে নিকুঞ্জবাবুর।

দীনেশের আবৃত্তি! শুধু আজই নয়, কত দিন, কত সন্ধ্যায়, কত নিভৃত অবকাশে দীনেশের কণ্ঠ এমনি করে ক্ষণে ক্ষণে মুখর হয়ে উঠেছে।

আজ সব কিছুর ইতি। সব কিছুর পরিসমাপ্তি। লগ্ন আসন্ন। মন না চাইলেও এবার তাঁকে বিদায় দিতে হবে! চির বিদায়!

এক মুহূর্তের দ্বিধা। তারপর আস্তে আস্তে ডাকলেন নিকুঞ্জবাবু, —দীনেশ!

—কে! নিমেষে বাস্তব পৃথিবীতে নেমে এলেন দীনেশ—ও, আপনি! ট্যাক্সি এসে গেছে বুঝি! গেট-আপ বাদল, গেট-আপ! কুইক! আমাদের যাত্রা হল শুরু···

ওদিকে মেটিয়াবুরুজের রাজেন গুহর বাড়িতেও তখন সেই একই দৃশ্য।

সকাল থেকে নিঃশ্বাস ফেলবার বুঝি সময় নেই বৌদি সরযূ দেবীর। ঠাকুরপো কি খেতে ভালবাসে, কোন্‌টা বেশি পছন্দ করে—এই নিয়েই তিনি ব্যস্ত।

শুরু হয়েছে অবশ্য কাল থেকেই, তবে এখনো তার জের মেটেনি। কেবলি মনে হয়, কিছু বুঝি বাদ রয়ে গেল।

মাঝে মাঝে দুঃসহ বেদনায় বুকটা হাহাকার করে ওঠে, আবার পরক্ষণেই প্রাণপণ শক্তিতে সামলে নেন নিজেকে।

আজ সব কিছুর পরিসমাপ্তি। স্নেহ-বুভুক্ষু ভাইটি কাল থেকে আর কোনদিনই তাঁর হাতে খেতে আসবে না।

সকাল সাতটা। বিনয় তখনও ঘুমে অচেতন। নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ জীবনের সুগভীর নিদ্রা।

বৌদি বার বার এসে দেখে গেছেন, তবু ইচ্ছে করেই ডাকেননি। কেমন যেন মায়া হয়েছে। আহা ঘুমোক! আর কতক্ষণই বা! এরপর তো হাজার ডাকলেও আর সাড়া মিলবে না।

কিন্তু আর তো দেরি করা যায় না! সওয়া সাতটা হয়ে গেল। সকাল ন'টার মধ্যেই যে ওঁকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে হবে।

—ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! অসীম মমতা ঝরে পড়ল বৌদির কণ্ঠ থেকে।

ধড়মড় করে উঠে বসলেন বিনয়—ইস্, কত বেলা হয়ে গেছে! আমাকে ডাকোনি কেন বৌদি?

—চা-টা খেয়ে নাও ভাই। যাও, মুখটা ধুয়ে এস।

মুখ ধুয়ে ফিরে এসে বিনয় অবাক—একি! এত মিষ্টি কেউ কখনো খেতে পারে!

—লক্ষ্মী ভাইটি, খেয়ে নাও। বৌদির চোখের তারায় সকরুণ মিনতি।

—তোমার হাতে যখন পড়েছি, তখন আর উপায় কি! খেতে খেতে জবাব দিলেন বিনয়, কিন্তু আর তো বেশিক্ষণ দেরি করা যাবে না বৌদি! ঠিক ন'টার সময় লোক এসে যাবে। তার আগেই আমাকে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। আমি বরং এই ফাঁকে স্নানটা সেরে ফেলি।

স্নান করে আসতে না আসতেই আবার খাবার তাগিদ। প্রতিবাদ করা বৃথা, সুতরাং বসতেই হল।

যাকে বলে রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার। নানারকম মাছ, মাংস, তরকারী, পোলাও, দই, মিষ্টি কিছুই বাদ নেই। একজন কেন, দশজনের পক্ষেও বুঝি এ খাবার খেয়ে শেষ করা সম্ভব নয়।

—খাও ভাই। বৌদির দুচোখে আসন্ন বর্ষণের ইঙ্গিত, নইলে এ দুঃখ আমার জীবনেও যাবে না। আমি যে তোমার জন্যই এসব করেছি!

—দেখ দেখি! হাসতে হাসতে বললেন বিনয়, এত খাবার কখনো মানুষ খেতে পারে! তাছাড়া তুমি তো সবই জানো বৌদি। শরীর ভারী হয়ে গেলে লড়ব কি করে! কব্জির জোর দেখাতে হবে তো! ঠিক আছে, তুমি দুঃখ করো না। আমি আস্তে আস্তে খেয়ে নিচ্ছি।

খাবার শেষ। এবার পোশাকের পালা। সাধারণ পোশাক নয়, বহুমূল্য রাজবেশ। দামী স্যুট, দামী নেকটাই, দামী জুতো, সব কিছুই চোখ ঝলসানো ব্যাপার। মাথার হ্যাটটাও তাই। দীনেশ ও বাদলের জন্যও একই ব্যবস্থা।

দলের অন্যতম নেতা রসময় শূর এসে গেছেন। আর দেরি নয়। ওদিকে পাইপ রোডের মোড়ে হয়তো দীনেশ ও বাদল ইতিমধ্যেই এসে গেছে।

অপূর্ব সংযমের বলে এতক্ষণ নিজেকে সংযত করে রাখলেও এবার আর কিন্তু নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না বৌদি। ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের বেদনায় সহসা তিনি ভেঙে পড়লেন ছোট্ট শিশুর মতো।

—একি! নিমেষে নিজেকে দৃঢ় করে তোলেন বিনয়, যে দেশের মায়েরা যুদ্ধে যাবার আগে সন্তানকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিতেন, সে দেশের মেয়ে হয়ে এ সময়ে তোমার চোখে জল কেন বৌদি? তাছাড়া তুমিও দলের একজন সহকর্মী। তুমিও বিপ্লবী। এ দুর্বলতা তো তোমার সাজে না বৌদি!

—ঠিক কথা। সায় দিয়ে স্ত্রীর হাতে পোশাকগুলো তুলে দিলেন রাজেনবাবু, এই তো সত্যিকার মানুষের কথা। ছেলে তোমার

পরাধীন দেশের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করতে যাচ্ছে। এ সময়ে উপযুক্ত মায়ের মতোই তুমি তাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দাও। নাও, ধর। এতবড় সৌভাগ্য, এতবড় সুযোগ জীবনে আর কোন-দিনও পাবে না। শুরু কর।

আস্তে আস্তে নিজেকে দৃঢ় করলেন বৌদি। তাই তো! এমন ছেলে ক'জনের আছে। সে যে কত বড়। কত মহৎ। বীরের মতো আজ সে নিজেকে উৎসর্গ করতে চলেছে স্বাধীনতার বেদীমূলে। এ সময়ে চোখের জল ফেলা সত্যিই তাঁর সাজে না। তার চাইতে নিজের হাতেই তিনি আজ তাকে সাজিয়ে দেবেন মায়ের মতো করে।

—'যাই বৌদি!' বিদায়ের আগে মাতৃসমা বৌদির পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলেন বিনয়।

—'এসো ভাই!' একটি মাত্র কথা। আর কিছু বলার মতো শক্তি সত্যিই তখন ছিল না বৌদির।

ইঙ্গিত করতেই পাঞ্জাবী ড্রাইভার গাড়িটা ছেড়ে দিল। লগ্ন আসন্ন। আর দেরি নয়।

অপলক দৃষ্টিতে শেষপর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন বৌদি। যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণই তাকিয়ে রইলেন। তারপর এক সময়ে গাড়িটা মিলিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে। আর তাকে দেখা গেল না।

তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ ছুটোকে মুছে নিলেন বৌদি। শোক করার অবকাশ তাঁর কোথায়!

হয়তো এখুনি প্রতিবেশীদের চোখগুলো কৌতূহলে প্রখর হয়ে উঠবে। হয়তো প্রশ্নের পর প্রশ্নে তারা মুখর হয়ে উঠবে।

না, এ দুঃখ তাঁর একার। এ বেদনার ভাগ দেওয়া চলবে না কাউকেই। বুকটা ব্যথায় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলেও মুখের হাসি তাঁকে জিইয়ে রাখতে হবে সর্বক্ষণ। এছাড়া কোন উপায় নেই।

মল্লিকা, সেদিন শুধু এই বৌদিটিই নন, এমনি কত বৌদি, কত মা, কত স্নেহময়ী দিদি যে বাংলাদেশের এই দামাল ছেলেগুলোকে ধৈর্য

দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে সবরকম বিপদ থেকে আগলে রেখেছিলেন, তার বোধহয় আদি-অন্ত নেই।

প্রতিদানে তাঁরা কি পেয়েছেন জানো। পেয়েছেন শুধু অপমান আর অত্যাচার। লাঞ্ছনা আর নির্যাতন। দুঃখ আর দারিদ্র্য। লজ্জা আর ঘৃণা।

মল্লিকা, আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, হিসেব-নিকেশের পালাও শুরু হয়েছে বেশ ঘটা করেই।

সবারই এক দাবী। অর্থাৎ, স্বাধীনতা-আন্দোলনে আমার দানই সর্বাধিক, সুতরাং অন্য সবার চাইতে আমাকে তোমরা একটু বেশি সুবিধা দিতে বাধ্য।

এমন কি, আমাদের দেশের কোটিপতি ব্যবসায়ীরাও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁরাও এই বলে তাঁদের ফিরিস্তি দাখিল করেছেন যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা যা করেছেন, এমনটি নাকি আর কেউ কোনদিনই করেনি। সুতরাং কিছু সুবিধা তাঁদের অবশ্যই প্রাপ্য।

আজ যখন এসব দেখি, আর শুনি, তখন ঐসব লক্ষ লক্ষ হতভাগ্যের কথাই মনে পড়ে বার বার। ওঁরা ওঁদের হিসেব মেলাতে পারেননি। সে চেষ্টাও করেননি কোনদিন। তাই দুর্ভাগ্য ওঁদের নিত্যসঙ্গী হয়েই রইল চিরদিন।

মল্লিকা, তোমরা একালের মেয়ে। পরাধীনতার জ্বালা যে কি তীব্র, সে অনুভূতি তোমাদের নেই।

সে দুঃসহ জ্বালায় ওঁরা জ্বলেছেন চিরদিন। ওঁদের তোমরা শ্রদ্ধা করো। প্রণাম করো। নইলে অকৃতজ্ঞ বলে ইতিহাসে তোমরা মসীলিপ্ত হয়ে থাকবে চিরদিন।

মনে রেখো—আজ সারা দুনিয়ার সামনে স্বাধীন জাতি বলে তোমরা যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছ, সে স্বাধীনতা ওঁদেরই সমাধির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসে ওঁদের তুলনা নেই।

ছুটি বাহু এক হল খিদিরপুর পাইপ রোডের মোড়ে এসে।

এদিক থেকে এলেন বিনয় আর রসময় শূর। ওদিক থেকে দীনেশ, বাদল আর নিকুঞ্জ সেন।

এবার যাত্রা শুরু। ঐতিহাসিক যাত্রা।

ইঙ্গিত করতেই ট্যাক্সিটা এগিয়ে চলল ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে।

স্থির অপলক দৃষ্টিতে শেষপর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন রসময় শূর ও নিকুঞ্জ সেন। বিপ্লবী জীবন অতি কঠিন, কঠোর। তুচ্ছ ভাবাবেগে ভেঙে পড়লে তাঁদের চলে না। তবু তাকিয়ে থাকতে থাকতে অজ্ঞাতেই বুঝি চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে বার বার।

ঐ যে ওরা চলে যাচ্ছে। ঐ যে গাড়িটা জনারণ্যের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। আর ওরা ফিরে আসবে না। হাজার ডাকলেও ওদের আর সাড়া পাওয়া যাবে না। কোনদিনও না।

বিদায় বন্ধুগণ, বিদায়! বিনয়, বাদল, দীনেশ, তোমাদের এই নিঃশেষ আত্ম-বিসর্জন ব্যর্থ হবে না। আজ হোক, কাল হোক স্বাধীনতা আমরা অর্জন করবই। সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তোমাদের এই চরম আত্ম-বিসর্জনের কাহিনী সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল।

গাড়িটা ছুটে চলেছে ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে। দূরত্ব কমে আসছে ক্রমশঃ।

ভেতরে স্থির অচঞ্চল হয়ে বসে আছেন বিনয়, বাদল আর দীনেশ। বুকে দুর্বার সাহস। চোখে দিগন্ত-সীমার মতো উন্মুক্ত, স্বচ্ছ দৃষ্টি।

আঘাত হানতে হবে। চরম আঘাত হানতে হবে আজ ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদকে। যত বাধাই আসুক না কেন, সব কিছুকে পর্যুদস্ত করে বুকটান করে এগিয়ে যেতে হবে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে সব।

তার জন্য চরম মূল্য দিতে তারা প্রস্তুত। দেবেও। ব্রিটিশ শক্তির সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে ফিরে আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সে চেষ্টাও তারা করবে না।

তবে তার আগে দেখিয়ে দিতে হবে যে, স্বাধীনতার সৈনিক মৃত্যুকে কোনদিনও ভয় পায় না। দেখিয়ে দিতে হবে যে, ভিক্ষায় কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না। এমনি করেই চরম মূল্য দিয়ে তাকে অর্জন করতে হয়।

আমাদের পালা শেষ। এবার তোমরাও এস আমাদের এই ফেলে-যাওয়া রক্তরেখা অনুসরণ করে।

কাঁটায় কাঁটায় ১২টা। লগ্ন সমাগত। আর দেরি নয়।

সামনেই দুর্ভেদ্য দুর্গ রাইটার্স বিল্ডিং। দুর্গই বটে! কারণ, তখনকার দিনে কারো পক্ষে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢোকা এত সহজ ছিল না। বিশেষ করে ১৯৩০-৩৫ সালে তো নয়ই। বাঙালী জুজুর ভয়ে ইংরেজ সেদিন থরথর কম্পমান।

বেলা তখন ১২টা। নিজের অফিসে বসে কতগুলি জরুরী ফাইল নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন কারা-বিভাগের সর্বময় কর্তা কর্নেল সিম্পসন। সামনে দাঁড়িয়ে একান্ত সচিব জ্ঞান গুহ।

সহসা কি শুনে কান দুটো সজাগ হয়ে উঠল সিম্পসনের।

কারা যেন তালে তালে পা ফেলে এদিকেই এগিয়ে আসছে। পা ফেলার ধরন দেখে মনে হয়, কোন মিলিটারী অফিসার হবে হয়তো।

কে! কে! নিমেষে চোখ কপালে উঠে গেল সিম্পসনের। কে ওরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে! হাতে ওগুলো কি ওদের!

গর্জে উঠলেন অধিনায়ক বিনয় বোস—'প্রে টু গড্ কর্নেল! ইওর লাস্ট আওয়ার ইজ কামিং।'

বলতে না বলতেই পর পর ছ'টা গুলী বেরিয়ে এল তিন-তিনটে রিভলবারের মুখ দিয়ে।

ব্যস, সব শেষ। আর একটি কথাও বলতে হল না কর্নেল সিম্পসনকে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনজন। এখানকার কাজ শেষ। পরবর্তী লক্ষ্য হোম সেক্রেটারী আলবিয়ান মার। চল এবার তার ঘরে। ঐ যে দেখা যাচ্ছে।

ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম! নিমেষে হোম ডিপার্টমেণ্টের কাঁচের জানালা সব ভেঙে পড়ল ঝন ঝন করে। কোথায় আলবিয়ান মার! শুট হিম!

কাণ্ড দেখে উদ্যত রিভলবার নিয়ে ছুটে এলেন ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিস মিঃ ক্রেগ।

ছুটে এলেন ফোর্ড। ছুটে এলেন সহকারী ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ জোনস। গুলীও তাঁরা ছুঁড়লেন কয়েক রাউণ্ড।

কিন্তু সব বৃথা। দীনেশ, বাদল, বিনয় তিনজনেই তখন সমান বেপরোয়া। তাই সমানেই তাঁরা জবাব দিতে লাগলেন তিনটি অগ্নি-বর্ষী রিভলবারের মুখ দিয়ে।

হিসেব অত্যন্ত সোজা। গুলীর বদলে গুলী। রক্তের বদলে রক্ত। এছাড়া অন্য কোন হিসেব বুঝি সেদিন জানা ছিল না তাঁদের।

বাধ্য হয়েই গা-ঢাকা দিলেন শ্বেতাঙ্গ বীরপুরুষের দল। মাই গড! এ যে একেবারে আসল কেউটের বাচ্চা দেখছি! কে যাবে ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেঘোরে প্রাণটা দিতে!

গোটা রাইটার্স বিল্ডিং জুড়ে তখন সে এক বিভীষিকার তাণ্ডব। চারদিকে ভীত, আতঙ্কিত, পলায়নপর শ্বেতাঙ্গের দল। হৈ-হল্লা,

চিৎকার আর চেঁচামেচি। পালাও! পালাও! বাঁচতে চাও তো এক্ষুণি পালাও!

খবর পেয়ে ছুটে এলেন পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট।

ছুটে এলেন ডেপুটি কমিশনার মিঃ গর্ডন। ছুটে এলেন মিঃ বার্ট। সঙ্গে অসংখ্য সশস্ত্র পুলিস।

কিছুতেই কিছু হল না। হবে কি করে। বেতনভোগী সৈন্যদের দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির সংগ্রামের সঙ্গে দেশের মুক্তিকামী সৈনিকদের সংগ্রামের যে অনেক তফাত! তাই স্বাভাবিক কারণেই তারা হার মানলেন সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করে।

এদিকে ঘটনা তখন ঘটে চলেছে দুর্বার গতিতে। একটি একটি করে ঘটনা ঘটছে, আর রচিত হচ্ছে ইতিহাস।

পরবর্তী লক্ষ্য পাসপোর্ট অফিস। নিমেষে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল গোটা অফিসটা।

সে এক বিচিত্র দৃশ্য! কেউ হামাগুড়ি দিয়ে পালাচ্ছে। কেউ টেবিলের নিচে আত্মগোপন করছে। কেউ বা কোনকিছু করতে না পেরে চোখ বুজে মেরীমাতার নাম করছে মনে মনে।

মজা করলেন মিশনারী পাদ্রি মিঃ জনসন। কাণ্ড দেখে সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাতীর মতো বিরাট দেহটা নিয়ে নিচে ঝুলে পড়লেন ড্রেন-পাইপ বেয়ে। আগে প্রাণ, তারপর অন্য কথা। ওখানে থেকে বেঘোরে প্রাণ দিতে তিনি রাজী নন।

গ্রাম! গ্রাম! গ্রাম!

ঘুরে পড়লেন জুডিশিয়াল সেক্রেটারী মিঃ নেলসন। ঘুরে পড়লেন মিঃ ট্যয়নাম। ঘুরে পড়ল এমনি আরো অনেকেই।

বিনয়, বাদল, দীনেশ তখনো অক্ষত। সামান্য আঁচড়টিও লাগেনি তাঁদের গায়ে।

উপায়ান্তর না দেখে শেষপর্যন্ত ডাকা হল গুর্খাবাহিনীকে। তারপর শুরু হল সেই ঐতিহাসিক 'অলিন্দ-যুদ্ধ'।

সংঘর্ষ নয়, যুদ্ধ। ইংরেজ মুখপত্র স্টেটস্‌ম্যান পর্যন্ত সেদিন এই মারাত্মক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে আখ্যা দিয়েছিল 'বারান্দা ব্যাট্‌ল' বলে।

অবিশ্বাস্য! অভাবনীয়! অকল্পনীয়!

একদিকে হাঁটু মুড়ে পোজিশন নিয়েছে অগণিত গুর্খা ফৌজ, অন্যদিকে লাইং ডাউন পোজিশনে বিনয়, বাদল আর দীনেশ।

একদলের হাতে শক্তিশালী রাইফেল, অন্যদলের হাতে স্বল্প পাল্লার রিভলবার মাত্র।

একদিকে বহুযুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ সমরবিদগণ, অন্যদিকে পরাধীন দেশের তিনটি মাত্র স্বাধীনতাকামী সৈনিক।

কতই বা বয়েস তাঁদের! সবে তো কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিয়েছেন মাত্র।

কিন্তু কার সাধ্য তাঁদের সামনে এগোয়। উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁরা ছড়িয়ে চলেছেন জলন্ত সীসের গুলী। এর মধ্যে এক পা এগুনো মানেই মৃত্যু।

দেখতে দেখতে বাতাস ভারী হয়ে উঠল ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে। সব অন্ধকার। দুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না। গুলীর শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনাও যায় না।

বাধ্য হয়েই এবার প্ল্যান পালটাতে হল শাসকদের। ফলে, রণাঙ্গন এবার বিস্তৃত হয়ে পড়ল বহুদূর পর্যন্ত। কখনো এ বারান্দায়, কখনো ও বারান্দায়। কখনো এপ্রান্তে, কখনো ওপ্রান্তে।

সব কিছু ছাপিয়ে মাঝে মাঝে মেঘ-গর্জনের মতো রব ওঠে—বন্দে মাতরম্‌!

বন্দে মাতরম্‌। ছোট্ট কথা। ছোট্ট শব্দ। কিন্তু এই ছোট্ট শব্দটির

যে কি অপরিসীম শক্তি, তা আজ বোধহয় তুমি কল্পনাও করতে পারবে না মল্লিকা।

সেদিন অনেক রক্তই ঝরেছিল এই ছোট্ট শব্দটির জন্য। অনেক লাঞ্ছনা। অনেক নির্যাতন। তবু দেশ-বন্দনার এই ছোট্ট শব্দটিকে সবাই প্রাণপণে আঁকড়ে রেখেছিল মূল্যবান ঐশ্বর্যের মতো।

এদিকে যুদ্ধ তখন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছে। দুপক্ষই সমান। কেউ কম যায় না।

হঠাৎ একটি গুলী এসে লাগল দীনেশের পিঠে। ভ্রূক্ষেপও নেই। *পিঠে লেগেছে তো কি হয়েছে! হাত তো ঠিকই আছে!* তবে আর ভাবনা কি! ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

এমনি করে কিছুক্ষণ, তারপরই একেবারে চুপ। সেই চিরন্তন সমস্যা। গুলী শেষ। দীনেশ ও বিনয়ের তবু একটা করে অবশিষ্ট আছে, বাদলের তাও নেই।

মুহূর্তে একটা খালি ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন ওঁরা তিনজন। কর্তব্য শেষ। এবার মাটির পৃথিবী থেকে তাঁদের বিদায় নেবার পালা।

শেষবারের মতো বল সবাই—বন্দে মাতরম্!

বন্দে মাতরম্! সমবেত কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষে বুঝি কেঁপে উঠল গোটা ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলটা।

আর দেরি নয়। রেডি প্লীজ! নিমেষে তিনজন মুখে পুরে দিলেন মারাত্মক সায়ানাইডের পুরিয়া। এবার দাঁত দিয়ে কামড়ে কাঁচের অ্যাম্পুলটা ভেঙে দিতে পারলেই, ব্যস্।

দীনেশ আর বিনয় কিন্তু এখানেই থামলেন না। এখনো একটা করে গুলী অবশিষ্ট আছে। ওটা ফেলে রেখে লাভ কি! মনস্থির করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ট্রিগারে টান দিলেন নিজেদের কপালে লক্ষ্যস্থির করে।

ড্রাম! ড্রাম! শেষবারের মতো রিভলবার দুটো গর্জে উঠেই

হঠাৎ থেমে গেল। তারপর একসঙ্গে তিনজনের দেহই লুটিয়ে পড়ল শক্ত মাটির বুকে।

ভেতরে বহুক্ষণ পর্যন্ত কোনরকম সাড়াশব্দ না পেয়ে এবার শাসককুল পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল অতি সন্তর্পণে। ওদের বন্দী করতে হবে। কঠিন শাস্তি দিতে হবে।

কোথায় তখন ওঁরা?

বাদল শেষ। দীনেশ ও বিনয় দুজনেই গুরুতর আহত। দীনেশের গলার বাঁ-দিকে গুলীবিদ্ধ হয়েছে। বিনয়ের গুলীবিদ্ধ হয়েছে কপালের দুদিকেই। সায়ানাইডের পুরিয়া তাঁদের বেলায় কার্যকরী হয়নি। গুলীবিদ্ধ হবার দরুন অ্যাম্পুলটা ভাঙবার মতো অবকাশই তাঁরা পাননি।

এবার শুরু হল সরকার বাহাদুরের বীরত্বের পালা।

বাদলের মৃতদেহ সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হল পুলিসের হেপাজতে। অবিলম্বে এর পরিচয় খুঁজে বের করো।

বিনয় ও দীনেশকে কড়া পাহারায় পাঠানো হল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ওদের সুস্থ করে তুলে বিচারের নামে চরম শাস্তি দিতে হবে। ফাঁসিতে ঝোলাতে হবে।

এদিকে খবর শুনে মহানগরী স্তম্ভিত। চোখে-মুখে তাদের চাপা উল্লাস। ধন্য তোমরা। পরাধীন জাতির ইতিহাসে তোমারা যা দেখালে, কোথাও বুঝি তার তুলনা নেই।

ধন্য বিনয় বোস! মাত্র তিনমাসের মধ্যে দু-দুটো ক্ষেত্রে তুমি যে অসাধ্য সাধন করেছ, তা একমাত্র তোমার পক্ষেই বুঝি সম্ভব। ধন্য তুমি! ধন্য তোমার সুযোগ্য সহকারী দীনেশ আর বাদল!

পরদিনই সে খবর বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল বিভিন্ন সংবাদ-পত্রের পাতায়। স্টেটস্‌ম্যান লিখলেন:

'...Lt. Col. N. S. Simpson was shot dead.

...Mr. J. W. Nelson, Judicial Secretary, was

wounded in the leg. Another bullet narrowly missed Mr. A. Marr, Finance member, who on hearing the shots came to the door of his room.

Orderly of the D. P. I. was wounded in leg. Passersby were dumb-founded to see in broad day light, in the heart of the business quarters of Calcutta an incident that had all the elements of a Chicago gunning affair.' [Statesman, 9th Dec., 1930]

অমৃতবাজার পত্রিকার বিবরণ :

'...Between I. G. of Prisons' room and Mr. Nelson's room, many Europeans had hair-breadth and providential escapes. Mr. Towneu, Agricultural and Industrial Secretary had the skirts of his coat and waist-coat shot through without any injury to his person. Mr. Prentice, Home member, escaped unhurt.

Mr. Marr, Finance member, had a providential escape. Mr. Stapleton, D. P. I., along with his P. A. and another European official narrowly escaped.

Holes near the gate of Mr. Nelson's room and another at the ceiling of Mr. Prentice's room were found latter on, Holes were of the size of Tennis ball.

They dashed into Passport Office and re-loaded their revolvers there. One American Missionary, Mr. E. S. Johnson, waiting in that office out of fear made his escape down with the help of a drain-pipe' ! [A. B. 9th Dec., 1930]

আনন্দবাজার পত্রিকার বিবরণ :

গুলীর আঘাতে বাংলার কারা-বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল নিহত।

'গতকল্য বেলা ১২টার সময় কলিকাতার বুকের উপর রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এক বিষম দুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। ৩ জন বাঙালী যুবক বাংলার কারাগার-বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল সিম্পসনকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে।

বেলা ১২-১৫ মিঃ হইতে ১২-৩০ মিনিটের মধ্যে ৩ জন বাঙালী যুবক কারাগার-বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফিসে (রাইটার্স বিল্ডিং) আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্নেল সিম্পসন তখন তাঁহার খাসমুন্সির (পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট) সঙ্গে তাঁহার অফিসে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন। যুবকত্রয় তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে চাপরাশি তাহাদিগকে উপরোক্ত কারণে অপেক্ষা করিতে বলে এবং কি কাজের জন্য তাহারা দেখা করিতে চায় তাহা যথারীতি এক টুকরা কাগজে লিখিয়া দিতে বলে। কিন্তু যুবকগণ ইহা করিতে অস্বীকৃত হয় এবং তাহাকে একপাশে ঠেলিয়া স্প্রিংয়ের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং দ্রুতগতিতে কর্নেল সিম্পসনের প্রতি ৫।৬ বার গুলী নিক্ষেপ করে। গুলীর আঘাতে কর্নেল সিম্পসন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কর্নেল সিম্পসনের ঘর হইতে বাহির হইয়া আততায়ীরা বারান্দা দিয়া চলিয়া আসে। দৌড়াইবার সময় তাহারা অফিসগুলির কাঁচের জানালায় এবং সিলিং-এ গুলী করিতে থাকে। রাজস্ব-সচিব মিঃ মারের অফিসের জানালায় গুলীর চিহ্ন রহিয়াছে। মিঃ জে. ডব্লিউ. নেলসনের অফিসেও গুলীর চিহ্ন রহিয়াছে।

অতঃপর তাহারা পাসপোর্ট অফিসে প্রবেশ করে এবং একজন আমেরিকানকে গুলী করে, কিন্তু গুলী ব্যর্থ হয়। কোন চাপরাশির গায়ে গুলী লাগে নাই।

অতঃপর আততায়ীগণ নেলসন সাহেবের ঘরে প্রবেশ করে এবং তাহার উরুতে গুলী করে। তাহার আঘাত গুরুতর নহে।

শেষ খবরে জানা যায়, একজন আততায়ী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে। অপর দুইজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। একজনকে বিনয়কৃষ্ণ বসু বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে। সে নাকি এই মর্মে এক মৃত্যুকালীন জবানবন্দী দিয়াছে যে, সে-ই বিনয়কৃষ্ণ বসু এবং সে-ই মিঃ লোম্যানকে হত্যা করিয়াছে। আততায়ীগণ তিন-জনেই ইয়োরোপীয় পোশাকে ভূষিত হইয়াছিল। বারান্দা দিয়া গুলী করিতে করিতে অগ্রসর হইবার সময় উহারা বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিতেছিল।' [আনন্দবাজার : ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩০]

আরো বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গেল ১১ই তারিখের সংবাদপত্রে।

সিম্পসন হত্যাকাণ্ডের জের। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে
পাহারার কড়াকড়ি।

'রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যাতায়াত সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে। পশ্চিমদিকের সিঁড়ি ছাড়া আর সকল সিঁড়িতে সাধারণের যাতায়াত সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে। যাহাতে কেহ প্রবেশপত্র ছাড়া উপরে যাইতে না পারে, এজন্য প্রত্যেক সিঁড়ি ও লিফটে সার্জেন্ট পাহারা বসান হইয়াছে। নিচতলায় বাহিরের লোকের জন্য চেয়ার টেবিল রাখা হইয়াছে। যাহারা অবিরত রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যাতায়াত করে, তাহাদিগকে একখানা করিয়া প্রবেশপত্র দানের ব্যবস্থা হইবে।···

তিনজনেই বিষপান করিয়াছিল।

তদন্তে জানা যায় যে, আততায়ীগণ তিনজনেই রাইটার্স বিল্ডিংয়েই বিষপান করিয়াছিল। কিন্তু বিনয় ও দীনেশের পাকস্থলীতে

বিষ প্রবেশ করিবার পূর্বেই তাহারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে গুলী করে ও অজ্ঞান হইয়া পড়ে। হাসপাতালে আনীত হইবার পরই উহাদের দেহ হইতে বিষ বাহির করিয়া ফেলা হয়।

বিনয় ও দীনেশ

গতকল্য বৈকালে খোঁজ লইয়া জানা যায়, বিনয় বসুর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে। তাহার মাথার মগজ ক্ষতমুখ বাহিয়া এখনও রক্ত চুয়াইয়া পড়িতেছে। বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত উভয়কেই মঙ্গলবার দিবস রঞ্জনরশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। প্রকাশ যে, দীনেশের মাথায় যে গুলী আটকাইয়া রহিয়াছে, উহার উপর অস্ত্রোপচারের ধাক্কা দীনেশ সহিতে পারিবে না, এই আশঙ্কায় আর বাহির করিবার চেষ্টা করা হয় নাই।'

হাসপাতালে পাশাপাশি বেডে বিনয় আর দীনেশ। তখনো পর্যন্ত কারোরই জ্ঞান ফিরে আসেনি। আদৌ আসবে কিনা বলা শক্ত।

অবশ্য চিকিৎসকদের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। আশা যদিও খুবই কম, তবু শেষপর্যন্ত দেখতে হবে বৈকি!

কিন্তু একি! বিনয়ের ডানহাতের আঙুলগুলোতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কেন? ওখানে তো কোনরকম গুলীর আঘাত লাগেনি! তা হলে কে এজন্য দায়ী?

দায়ী স্বয়ং টেগার্ট। বিনয় তাঁর অহঙ্কারে আঘাত করেছেন। দু-দুটো ক্ষেত্রে তাঁকে অত্যন্ত অপদস্থ হতে হয়েছে বিনয়ের কাছে। তাই এবার তিনি তাঁর সমস্ত জ্বালা মিটিয়ে নিয়েছেন বুটের সাহায্যে অচৈতন্য বীরের হাতের আঙুলগুলো ভেঙে দিয়ে।

এর নাম বীরত্ব!

এই প্রথম নয়। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের প্রতি এমনি বীরত্ব ওরা দেখিয়েছে অসংখ্যবার।

চট্টগ্রাম-বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের কথাই ধরা যাক। গ্রেপ্তারের পরে রুগ্ন, অসুস্থ মাস্টারদার ওপর কি নির্মম অত্যাচারই না করেছিল এই হিংস্র পশুর দল। বিশেষ করে তাঁর অন্তিম মুহূর্তে ওরা যা করেছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও বুঝি তার নজীর নেই।

ফাঁসি-কাঠে ঝোলাবার পূর্ব মুহূর্তে কখনো কোন বন্দীকে নির্মম-ভাবে প্রহার করা হয়েছে, এমন কথা কোনদিনও শুনেছ কি? ব্রিটিশ শাসকরা কিন্তু সেদিন তাও করেছিল। আঘাতে আঘাতে মাস্টারদার সবগুলো দাঁতই সেদিন ওরা তুলে নিয়েছিল। শেষপর্যন্ত ওরা ফাঁসি দিয়েছিল মাস্টারদাকে নয়, তাঁর রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত অচৈতন্য দেহটাকে।

একই সঙ্গে ফাঁসির বন্দী তারকেশ্বর দস্তিদারের ভাগ্যেও সেদিন জুটেছিল তাই। ফাঁসির পূর্বে নির্মম বুটের আঘাতে সেদিন ওরা তারকেশ্বরের একটা চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল।

ভারতে এই হল অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আসল রূপ।

শুধু কি ভারতে! বর্মায় কি করেছিল শুনবে?

একই সঙ্গে ওরা ফাঁসি দিল বাহাত্তর জন মুক্তি-সৈনিককে। তারপর তাঁদের মুণ্ডগুলো আলাদা করে কেটে নিয়ে, তার ছবি তুলে ছড়িয়ে দিল বর্মার সর্বত্র। অর্থাৎ, সাবধান! নইলে তোমার ভাগ্যেও এই জুটবে।

অথচ এর বিপরীত চিত্র দেখ। যে চট্টগ্রাম সশস্ত্র-বিপ্লবকে দমন করার জন্য সেদিন ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারের সীমা-পরিসীমা ছিল না, ঘটনাটা ঘটেছিল তখনই। কাহিনীর নায়ক বীর বিপ্লবী লোকনাথ বল। এ কাহিনী আমার তাঁর কাছ থেকেই শোনা।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। স্থান, চট্টগ্রাম রেলওয়ে অস্ত্রাগার।

রাত ঠিক দশটা। সহকারীদের নিয়ে অধিনায়ক লোকনাথ বল

হাজির। যে যেখানে আছ সরে দাঁড়াও। বেঘোরে প্রাণ দিয়ে লাভ নেই। আমাদের কাজ আমরা করবই।

উপস্থিত বাহাত্তর জন সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া। কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম! এসব ডাকু ছেলেদের রিভলবারের সামনে দাঁড়ানোর চাইতে গা-ঢাকা দেওয়াই নিরাপদ।

উপদেশে কর্ণপাত না করে রিভলবার খুলে বাধা দিলেন সার্জেন্ট মেজর ফেরেল। অধিনায়কের আদেশে সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুলীর আঘাতে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

এবার লোকনাথ বলের পায়ের কাছে এসে ভেঙে পড়লেন মিসেস ফেরেল—'আমাকে ও আমার এই শিশুটিকে তুমি বাঁচতে দাও।'

কি উত্তর দিলেন লোকনাথ বল, জানো মল্লিকা? উত্তর দিলেন—'আমি দুঃখিত সিস্টার। এছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি বা আমার কোন লোক তোমার এতটুকুও অমর্যাদা করবে না।'

সিস্টার! যে ব্রিটিশ শাসক সেদিন আন্দোলনকে দমন করতে গিয়ে নারীর মান-সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করেনি, তাদের দেশেরই একটি মহিলাকে সেদিন সম্মান দেওয়া হল সিস্টারের মর্যাদায়। দিলেন তাঁরাই, ওদের ভাষায় যাঁরা বহু-নিন্দিত 'সন্ত্রাসবাদী' ছাড়া আর কিছু নন।

তাহলে কে বড় মল্লিকা? সুসভ্য ব্রিটিশ শাসক চার্লস টেগার্ট, না, বাংলাদেশের তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীর দল?

ইতিমধ্যে দুজনের অবস্থাই বেশ ভালর দিকে চলেছে। মনে হয়, চিকিৎসার গুণে এ যাত্রা হয়তো বেঁচে গেলেও বা যেতে পারেন।

কিন্তু একি! সহসা কি দেখে চমকে উঠলেন চিকিৎসকদল। সর্বনাশ! বিনয় বোসের মাথার ব্যাণ্ডেজ খোলা কেন! ক্ষতস্থানে একটা গভীর গর্তই বা দেখা যাচ্ছে কেন!

কে করেছে এমন কাজ! কে করেছে!

কে আবার! করেছেন বিনয় নিজেই।

ব্রিটিশ তাঁর শত্রু। জীবনে যাদের তিনি সবচাইতে বেশি ঘৃণা করেছেন, তাদের আওতায় থেকে সামান্য সেবা-শুশ্রূষা গ্রহণ করতেও তাঁর আত্মসম্মানে বাধে। অথচ এ অবস্থায় কোন উপায়ও নেই। সুতরাং এই দুঃসহ অবস্থা থেকে রেহাই পাবার একটা উপায় খুঁজে বার করতেই হবে।

খুঁজে পেতে দেরি হয়নি। নিজে তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একজন মেধাবী ছাত্র। এ অবস্থায় কি করলে কি হয়, তা তিনি ভাল করেই জানেন। তাই নিজেকে নিঃশেষ করার জন্য এই অচৈতন্য অবস্থার মধ্যেই কখন তিনি মাথার ক্ষতস্থানের ভেতরে গভীরভাবে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছেন অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে।

ফলে সেপটিক। ঘা দস্তুরমত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। বিকারও শুরু হয়েছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

চিকিৎসকদের মুখ গম্ভীর। কখন কি হয় বলা শক্ত। জোর করে কিছু বলা মুশকিল। তাছাড়া প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন। এ অবস্থায় কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়।

গম্ভীর চার্লস টেগার্টও। তবে কি হাতে এসেও ফস্‌কে যাবে লোকটা! তাহলে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মান-মর্যাদা আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না!

পাঁচ দিন ধরে যমে-মানুষে টানাটানি, কিন্তু অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। বরং জীবনী-শক্তি যেন কমেই আসছে ক্রমশঃ।

ইতিমধ্যে বিনয়ের বাবা মা দুজনেই এসে গেছেন। সদাশয় সরকার তাঁদের শেষ দেখা দেখতে অনুমতি দিয়েছেন। স্তব্ধ হয়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের শিয়রে।

সবশেষে পাদ্রি সাহেব এলেন শান্তির ললিতবাণী শোনাতে। অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত। এ সময়ে যীশুর বাণী শোনাতে পারলে

লোকটা ইহকালে না হোক, অন্তত পরকালে গিয়ে হয়তো কথঞ্চিৎ ব্রিটিশ-ভক্ত ভাল ছেলে হতে পারে।

সহসা কি শুনে বিনয়ের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন পাদ্রি সাহেব। বিকারের ঘোরে রোগী কি যেন বলছে বিড় বিড় করে।

কিন্তু এ কি!

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে সভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন পাদ্রি সাহেব।

কি সর্বনাশ! কাকে তিনি শান্তির ললিতবাণী শোনাবেন! রোগীকে!

মৃত্যুপথযাত্রী রোগী যে উল্টো তাঁকে ভয়ঙ্কর এক শান্তির বাণী শোনাতে শুরু করেছেন বিকারের ঘোরে! এই সংজ্ঞাহীন অবস্থার মধ্যেও ক্রমাগত তিনি বলে চলেছেন—অ্যাটেনশন প্লীজ! ফরোয়ার্ড মার্চ! লেফট্...রাইট্, লেফট্...রাইট্, লেফট্...চার্জ! গো ফরোয়ার্ড!

বাইবেল বন্ধ করে পত্রপাঠ বিদায় নিলেন পাদ্রি সাহেব। খুব হয়েছে বাবা, আর নয়। এমন ছেলের কাছে আর যেন কোনদিনও তাঁর ডাক না পড়ে।

অদূরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পিতা রেবতীমোহন বোস। না, দুঃখ নয়। নিজে তিনি নাম-করা শিকারী। জীবনে কোনদিনও তাঁর গুলী মিস্ হয়নি।

ছেলেও হয়েছেন তেমনি বাপকা বেটা। একটা গুলীও তাঁর মিস্ হয়নি। দশজনের কাছে এমন ছেলের বাপ বলে পরিচয় দিয়েও সুখ!

শিয়রে মা। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি যেন। নিশ্চল পাষাণের মতো সেই কখন থেকে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ছেলের শিয়রে। একটি কথাও বলেননি।

শুধু শেষ মুহূর্তে একবার ঝুঁকে পড়ে ছেলের মাথায় হাত রেখে

আস্তে আস্তে ডাকলেন—'আমি এসেছি খোকা। একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ বাবা, আমি যে তোকে দেখবো বলেই এমন করে ছুটে এসেছি।'

আশ্চর্য! গত ক'দিনের মধ্যেও যাঁর চেতনার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি, মায়ের এই ডাক শুনে এবার যেন তাঁর দেহটা বারেকের জন্য নড়ে উঠল। সারা মুখে আস্তে আস্তে ফুটে উঠল একঝলক প্রসন্ন হাসি। তারপর একটু একটু করে কখন হাতটা কপালের কাছে উঠে গেল স্যালুটের ভঙ্গিতে।

নিজে তিনি ছিলেন স্বাধীনতার সৈনিক। তাই অন্তিমকালেও নিজের মাকে, জন্মভূমিকে, লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত দেশবাসীকে সামরিক ভঙ্গিতে স্যালুট জানিয়ে গেলেন বীর সেনানীর মতো।

মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের সঙ্গে পিতামাতার এই শেষ সাক্ষাৎকারের মর্মস্পর্শী বিবরণ পরদিনই প্রকাশিত হল বিভিন্ন সংবাদপত্রের পাতায়।

মৃত্যুশয্যায় বিনয় বসু
জনক-জননীর নিকট হইতে শেষ বিদায়

'গতকল্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে, বিনয়কৃষ্ণ বসু মরণাপন্ন। সে অচেতন অবস্থায় চক্ষু বুজিয়া রহিয়াছে।

প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া গতকল্য বিনয়ের বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন বসু, বৃদ্ধা মাতা এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু হাসপাতালে বিনয়কে দেখিতে যান। তাঁহারা 'বিনয় বিনয়' বলিয়া বারংবার ডাকিতে থাকেন এবং কাঁদিতে থাকেন।

বিনয় সাড়া দিতে সমর্থ হয় নাই। একবার মাত্র সে তাহার ডান হাতখানি উঠাইয়া কপালে ঠেকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। বোধহয় জনক-জননীকে শেষ নমস্কার জানাইতেছিল। বৃদ্ধ পিতামাতার

নিকট এই দৃশ্য অসহ্য হইল, তাঁহারা সাশ্রুলোচনে হাসপাতাল ত্যাগ করিলেন।

বিনয় ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার রাউথভোগ গ্রামের শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন বসুর পুত্র। সে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সে ঢাকা মেডিকেল বোর্ডিং-এ থাকিত। বিনয়ের ছয়টি ভাই আছে। বিনয়ের পিতামাতা এবং দাদা জামসেদপুরে থাকেন। গতকল্য প্রাতে তাঁহারা বিনয়কে দেখিতে কলিকাতা আসিয়াছেন।' [আনন্দবাজার, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩০]

তারপর! তারপর এল সেই কালরাত্রি। সেই কালরাত্রির কথা আজো অম্লান হয়ে আছে সংবাদপত্রের পাতায়।

বিনয় বসুর পরলোকগমন

'শনিবার প্রাতঃ সাড়ে ছয়টার সময় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিনয়কৃষ্ণ বসুকে মৃত দেখা গিয়াছে। রাত্রিতে কখন তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই।

ডেপুটি কমিশনার নয়টার সময় শবটি দিবেন বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দিতে দিতে রাত্রি দশটা হয়।

বিনয়ের পিতা শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন বসু এবং বিনয়ের অন্যান্য কতিপয় আত্মীয়-স্বজন লাশ-ঘরের নিকট প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শবটি তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করা হইলে শবটিকে একখানা সুসজ্জিত খাটিয়ায় রাখা হয়। অতঃপর তাঁহারা খাটিয়াখানি লইয়া নিমতলা ঘাটের দিকে অগ্রসর হন। কতিপয় পুলিস কর্মচারী এবং কয়েকজন লোক শবানুগমন করে। মাঝে মাঝে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি হইতে থাকে।

নিমতলা ঘাটে শবটি দাহ করা হইবে এ সংবাদ পূর্বেই সান্ধ্য সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবল শীত সত্ত্বেও বহু লোক নিমতলা ঘাটে সমবেত হয়।

শবটি নিমতলা ঘাটে পৌঁছিলে সমবেত জনতা বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিয়া বিনয়ের শবদেহে বহু পুষ্পমাল্য প্রদান করে।

সর্বপাপহারিণী গঙ্গার জলে বিনয়ের দেহটাকে স্নান করান হয় এবং যথা আচারে চিতায় ভস্মীভূত করা হয়। ভস্ম গঙ্গায় দিয়া বিনয়ের আত্মার শান্তি কামনা করিয়া বিনয়ের আত্মীয়-স্বজন গৃহে ফিরেন।'

[আনন্দবাজার, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩০]

খবর শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াল গোটা বাংলাদেশ। গোটা ভারতবর্ষ। মাথা নোয়াল কোটি কোটি নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষ'

হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি কণ্ঠে জেগে উঠল মহাকবির সেই অমর বাণী—'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

বিপ্লবীর মৃত্যু নাই। তাঁর মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই তিনি জাতির ইতিহাসে বেঁচে থাকেন চিরকাল।

বিনয় বোস আজ সেই ইতিহাসের নায়ক। তাঁর মৃত্যু নাই। ক্ষয় নাই।

পরদিন ভোরেই কি দেখে চমকে উঠলেন টেগার্ট। মাত্র ক'দিন আগেই শহরের বুকে বড় বড় পোস্টার পড়েছিল—'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা।' তারপরই রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঘটে গেল এই অভাবনীয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

আশ্চর্য, আজ আবার সেই পোস্টার। রাশি রাশি পোস্টার! লেখা রয়েছে—'Benoy's Blood Beckons For more Blood!'

অথৈ ভাবনা-সাগরে ডুবে গেলেন চার্লস টেগার্ট। আরো রক্ত! কি ভয়ঙ্কর কথা! তবে কি ঝড় থেমে যায়নি! বিনয়ের ঘটনা কি তার সূচনা মাত্র! তাহলে কোথায় এর শেষ! কোথায় সমাপ্তি!

বাদল গত। তারপর একে একে তিন দিন কেটে গেছে, তবু পুলিস তাঁর মৃতদেহ ছেড়ে দিতে সম্মত নয়। আগে পরিচয় চাই, তারপর অন্য কথা।

অবশ্য একেবারে যে কিছু জানা যায়নি, তা নয়। বাদলের পকেটে বি. এন. দে নামাঙ্কিত একটা কার্ড পাওয়া গেছে।

কে এই বি. এন. দে? কি তার পরিচয়?

রহস্যের অবগুণ্ঠন খুলল দিনকয়েক বাদে। সংবাদপত্র থেকে তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি।

সিম্পসনের আততায়ী সুধীর গুপ্ত : আততায়ীর প্রকৃত নাম

'রাইটার্স' বিল্ডিংয়ে সিম্পসন সাহেবের হত্যাকাণ্ডের পর যে যুবকটি বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল তাহার নাম বি. এন. দে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, তাহার নাম শ্রীমান সুধীর গুপ্ত, ওরফে বাদল। সে ৫৬নং গৌরীবাড়ি লেনের ভবানী ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীর শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত গুপ্তের ভ্রাতা, শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত গুপ্তের পুত্র। অবনীবাবুর বাড়ি ছিল ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিদগাঁও গ্রামে। পদ্মায় বাড়ি ভাঙিয়া যাওয়ায় সম্প্রতি ঢাকা জিলার টঙ্গীবাড়ি থানার অন্তর্গত সিমুলিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

তরণীবাবু মৃতদেহ সনাক্ত করিয়াছেন। সুধীরের পিতৃব্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং ধরণী গুপ্ত মুরারীপুকুর বোমার মামলায় দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

সুধীরের আত্মীয়-স্বজন তাহার মৃতদেহ সংকারের জন্য পুলিস কমিশনারের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। পুলিস কমিশনার রাত্রি

দশ ঘটিকার পর মৃতদেহ শব-ব্যবচ্ছেদাগার হইতে লইয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে তাহার মৃতদেহ রাত্রি দশ ঘটিকার পর নিমতলা শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিস প্রহরী ও সার্জেণ্ট মোতায়েন করা হইয়াছিল। শবাধার পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। অনেক মহিলাও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন।

তথায় রাত্রি পৌনে বারটার সময় বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যে তাহার মৃতদেহে অগ্নি-প্রদান করা হয়।

সিম্পসন হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত বিনয়কৃষ্ণ বসুর বাড়ি ঢাকা জিলার রাউথভোগ গ্রামে, দীনেশের বাড়ি যশোলং এবং সুধীরের বাড়ি সিমুলিয়া। এই তিনটি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত।' [আনন্দবাজার, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩০]

দীনেশের অবস্থা তখন ভালর দিকে।

শুয়ে শুয়ে সবই তিনি দেখলেন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। বাদল আগেই চলে গেছে। আজ বিনয়দাও চলে গেলেন। নির্বান্ধব পৃথিবীতে এবার পড়ে রইল সে একা।

কোন দুঃখ নেই। সঙ্গীরা সবাই চলে গেছে একে একে। তাকেও একদিন যেতে হবে এমনি করেই। তার জন্য দুঃখ কিসের! কিসের ক্ষোভ! এ তো জানা কথাই!

দুঃখ পেলেন ইংরেজ সরকার। আহা, কি আপসোস! হাতের নাগালে এসেও কিনা দু-দুজন এমনি করে সট্‌কে পড়ল! এ দুঃখ যে জীবনেও কোনদিন যাবে না!

যাক, এখনো একজন অবশিষ্ট আছে। ওর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হবে না। কাউকে দেখতে দেওয়া হবে না। শুধু ডাক্তার আর নার্স।

অতি কষ্টে দেখা করার অনুমতি পেলেন দীনেশের দাদা জ্যোতিষ গুপ্ত। নসু যে তাঁর বড় আদরের। তার এই অবস্থায় তিনি দূরে থাকবেন কি করে!

দাদাকে দেখেই দীনেশের সারা মুখে ফুটে উঠল একঝলক প্রসন্ন হাসি। মা কেমন আছেন? আর বৌদি? খুকুদির খবর কি? আমার জন্য চিন্তা করতে মানা করবেন। আমি খুব ভাল আছি।

সত্যিই দীনেশ ভাল হয়ে উঠলেন একটু একটু করে। এ ব্যাপারে ডাক্তার ও নার্সদের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। ধৈর্য দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে সেদিন দীনেশকে সুস্থ করে তোলার ব্যাপারে তাঁদের চেষ্টার এতটুকুও ত্রুটি ছিল না।

এ প্রসঙ্গে একজন বিদেশিনী নার্সের কথা আজো স্মরণীয় হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়।

হোক বিদেশিনী, তবু তিনি নারী। তাই অজ্ঞাতেই বুঝি দুরন্ত, দুঃসাহসী এই দামাল ছেলেটির জন্য স্নেহ ও মমতায় মন তাঁর ভরে উঠেছিল কানায় কানায়।

কোন প্রত্যাশা নয়। কোন দাবীও নয়। শুধু দূর থেকে বন্দীকে একপলক চোখের দেখা মাত্র। এইটুকু ছাড়া সেদিন আর কিছুই বুঝি কাম্য ছিল না তাঁর।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে দীনেশ একদিন রহস্য করে বললেন—'Sorry Nurse, I am still breathing!'

'May God grant you long life.' এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে এগিয়ে এসে চাপা গলায় বললেন বিদেশিনী—'Why did you take posion and shoot yourself?'

হেসে দীনেশ উত্তর দিলেন—'Just to finish myself after the completion of work.'

—'Committing suicide is a crime. No?'

—'It was nothing of a suicide. It was self-

emolation—a voluntary death—a death of fulfilment, and not a despair.'

এক মুহূর্তের দ্বিধা। তারপরই ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করলেন বিদেশিনী—'Do you hate me? Do you hate all the Britishers?'

—'No, I hate those who want to rule over us, directly or indirectly.'

—'Wish you long life. Good night, brave boy!'

কথাটা বলে ত্রস্তে পালিয়ে গেলেন বিদেশিনী। বাইরে যেন কার পায়ের শব্দ। কে যেন এদিকেই আসছে একটু একটু করে। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর এই রাজদ্রোহীকে প্রকাশ্যে সহানুভূতি জানাবার অধিকার তাঁর কোথায়! তিনি যে শাসক সম্প্রদায়েরই একজন!

মেডিকেল কলেজ থেকে আলিপুর জেলের কনডেম্‌ড্‌ সেল। সাধারণতঃ ফাঁসির আসামীদেরই এই কনডেম্‌ড্‌ সেলে রাখা হয়।

অবশেষে একদিন আলিপুরের সেসন জজ গার্লিকের সভাপতিত্বে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে শুরু হল তাঁর বিচারের পালা।

এ সম্বন্ধে এতটুকুও উৎসাহ দেখা গেল না দীনেশের দিক থেকে। শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশ্যে একটি কথাই তিনি জানিয়ে দিলেন বার বার, —'ওসব জেনে আমার কি হবে? আমি যা ভাল বুঝেছি—করেছি। এবার ওদের বিচার ওরা করুক। তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।'

দীনেশের মাথাব্যথা না থাকলেও বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষগুলির কিন্তু সেদিন দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না মল্লিকা।

বিচারের দিনে আদালত-প্রাঙ্গণে উপস্থিত জনতার সে কি বিরাট উত্তেজনা! সে কি অভাবনীয় চাঞ্চল্য! সবাই চায় স্বাধীনতার বীর বিপ্লবী দীনেশকে দূর থেকে একবার দেখতে। তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে। দীনেশ যে তাদের বড় গর্বের ধন! অদৃষ্টে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করে আছে কে জানে!

দীনেশ নির্বিকার। কনডেম্‌ড্‌ সেলের অভ্যন্তরে জীবন কাটে তাঁর একই তালে। সেখানে একই রঙ নিয়ে আসে ভোরের সূর্য, স্তব্ধ দুপুর আর শান্ত বিকেল। উঁচু পাঁচিল ঘেরা এই বিচিত্র পৃথিবীতে সব কিছুই যেন বর্ণহীন, স্বাদহীন, বৈচিত্র্যহীন।

নিস্তরঙ্গ নদীতে ঢেউ তুললেন সুভাষ।

সেবার এসেছিলেন নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ কলকাতায় শোভাযাত্রা পরিচালনা করার জন্য ন'মাসের কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে। এবার আইন-অমান্য করে।

আইন-অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত বন্দীদের ভিড়ে আলিপুর জেল তখন জমজমাট। সুভাষ থেকে শুরু করে হেমচন্দ্র ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী, বিপিন গাঙ্গুলী, পূর্ণ দাস, নিশি গাঙ্গুলী, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় কেউ বাদ নেই।

কারাগারে সুভাষের উপস্থিতি মানেই—ঝড়। বলা বাহুল্য যে, এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। দেখতে দেখতেই আবার একদিন ঝড় উঠল নতুন করে। উদ্দাম ঝড়।

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জেলার মিঃ সোয়ান ছুটে এলেন হন্ত-দন্ত হয়ে। জাতে আইরিশ হলেও আপসহীন বিপ্লবী সুভাষের প্রতি মনে মনে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম।

—বলুন, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি? প্রশ্ন করলেন জেলার মিঃ সোয়ান।

—আমি জেলের ভেতরে সরস্বতী পুজো করব। অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন।

—বেশ, তাই হবে। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—তাই করুন। আর হ্যাঁ, সবাইকে নিয়ে আমি একসঙ্গে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেব। কাউকে বাদ দিলে চলবে না। দীনেশ গুপ্ত, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, ওদেরও আমরা চাই।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন মিঃ সোয়ান। বলে কি! কনডেম্ড্ সেলের আসামীদের তিনি বাইরে আসার সুযোগ দেবেন কি করে?

ইতিপূর্বে বেলফাস্ট জেলে এমন বহু বিপ্লবী তিনি দেখেছেন। কিন্তু এমন অদ্ভুত দাবী এর আগে কোথাও তিনি শোনেননি। এ যে একেবারেই অসম্ভব!

কিন্তু দাবী তুলেছেন স্বয়ং সুভাষ বোস। সোজা লোক তো নন। হয়তো এ নিয়ে একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন। কাজ নেই বাপু অত ঝামেলা করে। আমি বিশ্বাস করে তোমার ওপর সব ছেড়ে দিচ্ছি। দেখো বাপু, আর যাই হোক, গরীবের চাকরিটা যেন না যায়।

শুরু হল পুজোর আয়োজন।

কিন্তু একি! কাণ্ড দেখে চোখে পলক ফেলতেও বুঝি ভুলে গেল শ্বেতাঙ্গ শাসক সম্প্রদায়। শেষে কিনা পুজো-প্যাণ্ডেলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন! ব্রিটিশ কারাগারে একথা যে চিন্তাও করা যায় না। শীগ্গীর মানা কর ওকে।

কে মানা করবে? কে যাবে সাধ করে ঐ জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মুখোমুখি দাঁড়াতে? ঝড়ে উড়ে যেতে হবে না!

এখানেই শেষ নয়। সেদিন আরো কিছু রহস্য অপেক্ষা করে ছিল উপস্থিত রাজনৈতিক বন্দীদের অদৃষ্টে। সে রহস্যের অবগুণ্ঠন খুলল আরো কিছুক্ষণ পরে।

পুজো শেষ। এবার অঞ্জলি দেবার পালা।

সহসা এক কাণ্ড করে বসলেন সুভাষ। কন্‌ডেম্‌ণ্ড্‌ সেল থেকে দুজনকে নিয়ে পুজো-মণ্ডপের দিকে যেতে যেতে আচমকা তিনি এক ধাক্কা মেরে দীনেশকে সামনের একনম্বর ওয়ার্ডে ঢুকিয়ে দিয়ে একা রামকৃষ্ণকে নিয়েই এগিয়ে চললেন প্যাণ্ডেলের দিকে।

ওখানে ওঁর দলীয় কর্মী সুনীল সেনগুপ্ত রয়েছেন। এমন সুযোগ আর কখনো মিলবে না। এমন নিভৃত অবসর। কিছু বলার থাকলে এইবেলা বলে নিক।

দীর্ঘদিন বাদে পরিচিত সহকর্মীকে কাছে পেয়ে সে কি আনন্দ তখন দীনেশের!

মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! সাময়িকভাবে হলেও কন্‌ডেম্‌ণ্ড্‌ সেলের বাইরে এসে আবার যে তিনি কোনদিন প্রিয়জনের সঙ্গে এমনি করে মিলতে পারবেন, তা বুঝি তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আনন্দে, আবেগে সুনীলবাবুকে জড়িয়ে ধরে একটি কথাই দীনেশ বলতে লাগলেন বার বার—'হেমদাকে বলবেন, আমি ঠিকই আছি। আমার জীবনের জীবন্ত আদর্শ হল বাদল আর বিনয়দা। সে আদর্শ আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বজায় রাখব।'

দিনের পর রাত্রি। আবার রাত্রি এক সময়ে হারিয়ে যায় নতুন দিনের সমারোহে।

অবশেষে একদিন বিচারপতি গার্লিক তাঁর রায় জানালেন।

মামলার ফলাফল যে কি দাঁড়াবে সে বিষয়ে অবশ্য কারো মনেই কোন সন্দেহ ছিল না। তবু সেদিন প্রতিটি বাঙালী, প্রতিটি পরাধীন মানুষের একমাত্র কামনা ছিল দীনেশকে যেন চরম সাজা দেওয়া না হয়। বোধহয়, এর চাইতে বড় কাম্য সেদিনের মানুষের কাছে আর কিছুই ছিল না

দেশবাসীর সেই আকুল আবেদনে কোন কানই দিলেন না ইংরেজ সরকার। সুতরাং সাজা হল প্রাণদণ্ড। এবার প্রিভি কাউন্সিল থেকে হুকুমটা এসে গেলেই হয়।

সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠল গোটা বাংলাদেশে। দুরন্ত ঝড়। এ আদেশ আমরা মানব না। দীনেশ আমাদের জাতীয় বীর। তাঁর প্রতি এই অন্যায় আদেশ আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না।

জাতির ভাষা রূপ পেল বিপ্লবী নায়িকা বিমলপ্রতিভা দেবীর কণ্ঠে। পার্কে-পার্কে, সভায়-সমিতিতে, মনুমেণ্টের তলায় প্রকাশ্যেই তিনি আহ্বান জানালেন তরুণ সমাজকে :

'বাংলার তরুণ, ভারতের তরুণ, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হস্তে তোমাদের মজ্জার মজ্জা, রক্তের রক্ত, ঐ বীর সাধকের মৃত্যু তোমরা ক্লীবের মতো সহ্য করো না। দুর্বার কণ্ঠে জানাও যে, দীনেশের মৃত্যুদণ্ড আমরা সহ্য করব না। দীনেশ দীর্ঘজীবী হোক।'

সাড়া দিল গোটা বাংলাদেশ। সাড়া দিল লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষ। আমরা সহ্য করব না। দীনেশের মৃত্যুদণ্ড আমরা কিছুতেই সহ্য করব না।

বিশেষভাবে সাড়া দিল দীনেশের হাতে গড়া মেদিনীপুর। তাদের সাফ জবাব, আমরা বদ্‌লা নেব। একেবারে মেদিনীপুর থেকে ঝাড়ে-বংশে নিশ্চিহ্ন করে দেব ঐ রক্ত-চোষা জাতকে।

দীনেশ নিশ্চিন্ত নির্বিকার। সেলের নির্জন কক্ষে অধিকাংশ সময়ই তাঁর কাটতে লাগল গীতা আর রবীন্দ্র-কাব্য নিয়ে। শুধু পড়া আর পড়া। দুদিন বাদে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। তার আগে যতটা জ্ঞানার্জন করে নিতে পারা যায়।

মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসে। ইচ্ছা করেই তখন তিনি দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দেন বাইরের দিকে। পাঁচিল পেরিয়ে আকাশের দূর দিগন্তে। আর কোন কাজ নেই। কেবল অপেক্ষা। শেষ-বিদায়ের আগে কয়েকটা অলস মন্থর দিন। সেগুলো পার হবার জন্য এক ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা।

পৃথিবী কারো মুখ চেয়ে তার চলার গতি বন্ধ করে না। অবশেষে এল সেই ১৯৩১ সালের ৬ই জুলাই।

সকাল থেকে আলিপুর জেলে সেদিন সাজ-সাজ রব। প্রিভি কাউন্সিল দীনেশের দণ্ডাজ্ঞা বহাল রেখেছে। কাল ভোরে তাঁর ফাঁসি। উপর থেকে নির্দেশ এসে গেছে। আর দেরি নয়। কালই।

প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত। ম্যানিলা রজ্জুতে মোম মাখানো হয়ে গেছে। সমান ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে পরীক্ষার পালাও শেষ। এখন অপেক্ষা মাত্র।

দীনেশ তেমনি নিশ্চিন্ত, নির্বিকার। মৃত্যুকে তিনি বরাবর 'মিত্র' রূপেই দেখে এসেছেন। তাই এসব উদ্যোগ-আয়োজন তাঁর কাছে একটা ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়। পশ্চিম আকাশ লালে লাল। ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে কখন একফালি রশ্মি এসে ছড়িয়ে পড়েছে কনডেম্‌ড্‌ সেলের অভ্যন্তরে।

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসা দীনেশের সারা মন ভরে উঠল এক অপার্থিব আনন্দের হিল্লোলে। রশ্মিটুকু গায়ে মেখে নিয়ে তারপরই তিনি সুর তুললেন তন্ময় হয়ে—

'রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার
যাবার আগে,—

আপন রাগে,
গোপন রাগে,

তরুণ হাসির অরুণ রাগে
অশ্রুজলের করুণ রাগে।

যাবার আগে যাও গো আমায়
জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণদোলা—
লাগিয়ে দিয়ে'

দেখতে দেখতে এক সময় শেষ রশ্মিটুকু মিলিয়ে গেল। কণ্ঠও নীরব হল। কিন্তু তার রেশ জেগে রইল বহুক্ষণ পর্যন্ত।

হে অস্তগামী দিবাকর, তোমাকে শেষ প্রণাম জানাই। সব যেমন ছিল তেমনই থাকবে। সবই চলবে অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে। শুধু আমিই থাকব না।

কোন দুঃখ নেই তার জন্য। কোন ক্ষোভ নেই। চাইবারও কিছু নেই। শুধু তোমার ঐ শেষ রশ্মিটুকু আমার সর্বাঙ্গে আরো নিবিড় করে বুলিয়ে দিয়ে যাও। যাবার আগে এইটুকুই শুধু আমার শেষ মিনতি।

শব্দহীন মন্থরতায় কেটে গেল মুহূর্তের পর মুহূর্ত।

সহসা কি ভেবে একতাড়া চিঠির কাগজ টেনে নিলেন দীনেশ। মাকে চিঠি লিখতে হবে। লিখতে হবে বৌদি, মণিদি, খুকিদি প্রভৃতি সবাইকে। আর কতক্ষণই বা! সময় যে ঘনিয়ে এল!

জেল থেকে লেখা দীনেশের সেই চিঠিগুলো আজো বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় হয়ে আছে মল্লিকা। তখনকার দিনে 'বেণু' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত এই চিঠিগুলো পড়ে সেদিন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বাংলার বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী। মাত্র বিশ বছরের একটি যুবকের পক্ষে এতটা পরিণতি কি করে সম্ভব! এ যে অবিশ্বাস্য!

শুধু তাই নয়, মনে রেখো, এই চিঠিগুলো পড়তে পড়তে সেদিন অনেক জলই ঝরেছিল একটি মানুষের দুচোখ দিয়ে।

পড়া শেষ করে রুদ্ধস্বরে মাত্র একটি কথাই তিনি বলতে পেরেছিলেন—'এ তো চিঠি নয়, এ যে মূল্যবান জীবনদর্শন।'

মানুষটি কে জানো? তিনি স্বয়ং সুভাষচন্দ্র।

চিঠিগুলো তুমি মন দিয়ে শোন। বার বার শোন। শুনে বিচার কর। তারপর নিজেকেই প্রশ্ন কর যে, সেদিন পরাধীন দেশের একটি বিশ বছরের ছেলে তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে যে বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রেখেছিলেন, আজকের এই স্বাধীন দেশের তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে তার সামান্য ছিটে-ফোঁটাও আশা করা যায় কি? যাক, কয়েকটি চিঠি আমি তোমার কাছে তুলে ধরছি।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল
২. ২. ৩১. (রবিবার)

স্নেহের বেণ্টু ভাই,

…কিছুদিন আগে একটা গান শুনেছিলাম। আজ তার পদগুলো বারে বারে মনে পড়ছে—

'আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে,
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে॥
কোন দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে,
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তার বিরহ ব্যথার মালা
গোপন-মিলন অমৃত গন্ধ ঢালা
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি—
হার মানি তার অজানা জনের সাজে॥'

শীতের কুজ্ঝটিকার সঙ্গে সঙ্গে আমার দিনও ফুরিয়ে এল। আমায় ভুলো না ভাই। শীতের পুনরাগমনের সঙ্গে আমিও আবার তোমাদের মধ্যে ফিরে আসব। উত্তুরে বাতাসের পরশ পেলে মনে

কোরো, আমি এসেছি তোমাদের আলিঙ্গন করতে, তোমাদের ভালবাসা কুড়িয়ে নিতে।

—দাদা।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল,
২৯. ৩. ৩১. রবিবার, কলিকাতা।

শ্রীচরণেষু,

বৌদি, গতকল্য তোমার চিঠিখানা পাইলাম। আজ মা ও দাদা আসিয়াছিলেন। দাদার কাছে শুনিলাম, আমার ফাঁসির হুকুমই বহাল রহিয়াছে।

বৌদি, এ জন্মের মতো তোমাদের কাছ হইতে বিদায় চাহিতেছি। জানি, বিদায় দিতে তোমাদের বুক ভাঙিয়া যাইবে, কিন্তু কি করিব, বিদায় যে লইতেই হইবে।

অনেক দিনের অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। সেই যেদিন তোমাকে আমার বৌদিরূপে পাইলাম, সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত সমস্ত কথাই আমার চোখের সমুখে যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তোমাকে আমার দশ বৎসর বয়স হইতে এই কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত অনেক যন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছি। সমস্তই তুমি স্নেহের অত্যাচাররূপে হাসিমুখে সহ্য করিয়া আসিয়াছ, কখনও বিরক্ত হও নাই, কখনও মুখভার করিয়া থাক নাই। চিরকালই অসুখে তোমার হাতের বার্লি, আহারে তোমার হাতের রান্না আমার সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে, তাহা তুমি জান। তুমি আমাকে কেন, আমাদের সকলকেই তোমার একান্ত আন্তরিক ভালবাসা দ্বারা জয় করিয়া লইয়াছিলে। সেদিন পর্যন্ত আমার যদি অনেক টাকা হয় তবে তোমাকে কি কি প্রিয় জিনিস আমি তোমায় উপহার দিব, সেই সম্বন্ধে নানা উদ্ভট কল্পনা মনে মনে করিয়াছি। যাক, ভগবান জন্ম-জন্মান্তরে তোমার মতো বৌদিই যেন আমায় পাওয়াইয়া দেন, এই প্রার্থনা।

কিসে তোমাদের মনে শান্তি আসিতে পারে, তুমি তাহার উপায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমিই কি আর তাহা বলিতে পারি! তবে আমার মনে হয়, মরণকে আমরা বড় ভয় করি, তাই মরণের কাছে আমরা পরাজিত হই। এই ভয় যদি জয় করিতে পারি, তবে মরণ আমাদের কাছে তুচ্ছ হইয়া দাঁড়াইবে। মরণকে আমাদের ভয় না করিয়া নির্ভয়ে প্রশান্ত চিত্তে বরণ করিয়া লইতে হইবে। মরণকে ভয় করিলে ধর্মের প্রধান সোপানই যে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। আমরা জানি, মরণ আমাদের হয় না, হয় এই নশ্বর দেহের। আত্মা অবিনশ্বর। সেই আত্মাই আমি—আর সেই আত্মাই ভগবান। মানুষের যখন সেই উপলব্ধি হয়, তখনই সে বলিতে পারে, 'আমিই সে। আগুন আমাকে পোড়াইতে পারে না, জল আমাকে পচাইতে পারে না, বায়ু আমাকে শুষ্ক করিতে পারে না, আমি অজর, অমর, অব্যয়।' গীতা বলিয়াছেন—'শস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নিতে দহন করিতে পারে না, জলে ভিজাইতে পারে না, বায়ুতে শুষ্ক করিতে পারে না। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী।'

তুমি বলিবে, এসব কথা তো আমিও জানি, কিন্তু মন তো শান্তি মানিতে চায় না। মন শান্ত করিবার একমাত্র উপায় ভগবানে আত্মসমর্পণ। ইহা ভিন্ন শান্তি পাইবার আর কোন উপায়ই নাই। আমরা যতই জপ-তপ করি না কেন, যতই ফোঁটা-তিলক কাটি না কেন, কিন্তু তাঁহাকে আমরা ভালবাসিতে পারি কই? তাঁহাকে যে ভালবাসিতে পারে, মরণ তো তাহার কাছে একটা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। তাঁহাকে তেমন করিয়া ভালবাসিয়াছিল বাংলার নিমাই, প্রেমাবতার যীশুখ্রীষ্ট, আর আমাদের দেশের সেই সকল ছেলেরা, যাহারা হাসিমুখে মরণকে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছিল।

মনের আবেগে আজ অনেক কথা লিখিয়া ফেলিলাম। তোমাদের কষ্টের কারণ আমি হইয়াছি জানিয়া আমি নিজের মনেও কম ব্যথা পাই নাই। তোমরা আমাকে ক্ষমা করিও।

আমার সঙ্গীটি* এখন বেশ ভালই আছে। অসুখ-বিসুখ আর নাই। আমিও ভালই আছি। ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

—স্নেহের ঠাকুরপো।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, কলিকাতা।

মণিদি,

কথা দিয়েও কথা রাখতে পারলাম না। বলেছিলাম রবিবারেই আপনার চিঠির জবাব দেব, কিন্তু দু'দিন পেছিয়ে পড়লাম, যদিও এতে আমার দোষ বিশেষ কিছুই নেই।

নতুন বছর শুরু হয়েছে, 'আটত্রিশ সনের ভেতর' সাঁইত্রিশ সন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। নতুনের কাছে পুরাতন হার মেনেছে। গাছের জীর্ণ পাতা ঝরে পড়ে নব কিশলয়কে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে। প্রকৃতির এই-ই নিয়ম। নিরন্তর ভগবানের চির-নবীন সত্যমূর্তি এর ভেতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে।

কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের যত নিয়ম-কানুন সবই উল্টো; এখানে বুড়োরা সমাজে ও রাষ্ট্রে নিজেদের একেবারে অচল, অনড় করে রেখে দিয়েছে। গদী তো ছাড়বেই না, বরং সময় অসময় চোখ রাঙাবে আর এঁড়ে গলায় চিৎকার করে একথাই জানিয়ে দেবে যে, বুড়ো হয়ে চোখ-কান আর আত্মসম্মানের মাথা না খাওয়া পর্যন্ত কেউ-ই কোন কাজের যোগ্য হয় না। আমাদের দেশে তরুণেরাও সাপের মাথায় ধুলো পড়ার এসব কথা শুনে নিজেদের বল-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। এটা তারা কিছুতেই বুঝবে না যে, বৃদ্ধ ও তরুণের মত ও পথ চিরকাল ভিন্ন। এদের এক করতে গেলে হয় তরুণকে বৃদ্ধ হতে হবে, নয়তো বৃদ্ধকে তরুণ হতে হবে। এদেশে তরুণই বৃদ্ধ হয়। ভালবাসা জানবেন।

—স্নেহের দীনেশ।

---

*সঙ্গীটি হলেন পাশের সেলের চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। ৪ঠা আগস্ট তিনি প্রাণ উৎসর্গ করেন ফাঁসি-মঞ্চে।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল,
১৮ই জুন, ১৯৩১, কলিকাতা।

বৌদি,

তোমার দীর্ঘ পত্র পাইলাম। অসময়ে কাহারও জীবনের পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। যাহার যে কাজ করিবার আছে, তাহা শেষ হইলেই ভগবান তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লন। কাজ শেষ হইবার পূর্বে তিনি কাহাকেও ডাক দেন না।

তোমার মনে থাকিতে পারে, তোমার চুল দিয়া আমি পুতুল নাচাইতাম। পুতুল আসিয়া গান গাহিত—'কেন ডাকাইছ আমায় মোহন ঢুলী?' যে পুতুলের পার্ট শেষ হইয়া গেল, আর তাহাকে স্টেজে আসিতে হইত না। ভগবানও আমাদের নিয়ে পুতুলনাচ নাচাইতেছেন। আমরা এক একজন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে পার্ট করিতে আসিয়াছি। পার্ট করা শেষ হইলে প্রয়োজন ফুরাইয়া যাইবে। তিনি রঙ্গমঞ্চ হইতে আমাদের সরাইয়া লইয়া যাইবেন। ইহাতে আপসোস করিবার কি আছে?

পৃথিবীর যে কোন ধর্মমতকে মানিলেই আত্মার অবিনশ্বরতা বিশ্বাস করিতে হয়। অর্থাৎ—দেহের মৃত্যু হইলেই আমাদের সব শেষ হইয়া যায় না, একথা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা হিন্দু, হিন্দুধর্মে এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছে, কিছু কিছু জানি। মুসলমান ধর্মেও বলে, মানুষ যখন মরে, তখন খোদার ফেরেস্তা তাহার রুকবজ্ করিতে আসেন। মানুষের আত্মাকে ডাকিয়া বলেন, 'অ্যায় রুহ্ নিকল্ ইস্ কালিব সে চল্ খুদাকা জান্নাৎ মে।' অর্থাৎ, তুই দেহ ছাড়িয়া ভগবানের কাছে চল। তাহা হইলে বোঝা গেল, মানুষ মরিলেই তাহার সব শেষ হইয়া যায় না, মুসলমান ধর্মের এ বিশ্বাস আছে।

খ্রীষ্টান ধর্ম বলে, 'Very quickly there will be an end of the here, consider what will become of the next world.'—অর্থাৎ, দিন তো তোমাদের ফুরিয়ে এল, পরকালের কথা চিন্তা কর। বোঝা গেল, খ্রীষ্টান ধর্মও বিশ্বাস করে মানুষের দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মা মরে না। এই তিন ধর্মের কোন একটা স্বীকার করিতে হইলেই আমাকে মানিয়া লইতে হইবে যে, আমার মৃত্যু নাই। আমি অমর। আমাকে মারিবার সাধ্য কাহারও নাই।

ভারতবাসী আমরা নাকি বড় ধর্মপ্রবণ। ধর্মের নামে ভক্তিতে আমাদের পাণ্ডতদের টিকি খাড়া হইয়া উঠে। তবে আমাদের মরণের এত ভয় কেন? বলি, ধর্ম কি আছে আমাদের দেশে? যে দেশ দশ বৎসরের মেয়েকে পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ ধর্মের নামে বিবাহ করিতে পারে, সে দেশে ধর্ম কোথায়? সে দেশের ধর্মের মুখে আগুন।

যে দেশে মানুষকে স্পর্শ করিলে মানুষের ধর্ম নষ্ট হয়, সে দেশের ধর্ম আজই গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। সবার চাইতে বড় ধর্ম মানুষের বিবেক। সেই বিবেককে উপেক্ষা করিয়া আমরা ধর্মের নামে অধর্মের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি। একটা তুচ্ছ গরুর জন্য, না হয় একটু ঢাকের বাদ্য শুনিয়া আমরা ভাই-ভাই খুনোখুনি করিয়া মরিতেছি। এতে কি ভগবান আমাদের জন্য বৈকুণ্ঠের দ্বার খুলিয়া রাখিবেন, না খোদা বেহস্তে আমাদিগকে স্থান দিবেন?

যে দেশকে ইহজন্মের মতো ছাড়িয়া যাইতেছি, যাহার ধূলিকণাটুকু পর্যন্ত আমার কাছে পরম পবিত্র, আজ বড় কষ্টে তাহার সম্বন্ধে এসব বলিতে হইল।

আমরা ভাল আছি; ভালবাসা ও প্রণাম লইবে।

—স্নেহের ছোট ঠাকুরপো।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল,
৩০শে জুন, ১৯৩১, কলিকাতা।

মা,

যদিও ভাবিতেছি কাল ভোরে তুমি আসিবে, তবু তোমার কাছে না লিখিয়া পারিলাম না।

তুমি হয়তো ভাবিতেছ, ভগবানের কাছে এত প্রার্থনা করিলাম, তবুও তিনি শুনিলেন না। তিনি নিশ্চয় পাষাণ, কাহারও বুক-ভাঙা আর্তনাদ তাঁহার কানে পৌঁছায় না।

ভগবান কি আমি জানি না, তাঁহার স্বরূপ কল্পনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তবু একথাটা বুঝি, তাঁহার সৃষ্টিতে কখনও অবিচার হইতে পারে না। তাঁহার বিচার চলিতেছে। তাঁহার বিচারের উপর অবিশ্বাস করিও না, সন্তুষ্ট চিত্তে সে বিচার মাথা পাতিয়া নিতে চেষ্টা কর। কি দিয়া যে তিনি কি করিতে চান, তাহা আমরা বুঝিব কি করিয়া ?

মৃত্যুটাকে আমরা এত বড় করিয়া দেখি বলিয়াই সে আমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে। এ যেন ছোট ছেলের মিথ্যা জুজুবুড়ির ভয়।

যে মরণকে একদিন সকলেরই বরণ করিয়া লইতে হইবে, সে আমাদের হিসাবে দুইদিন আগে আসিল বলিয়াই কি আমাদের এত বিক্ষোভ, এত চাঞ্চল্য ?

যে খবর না দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাহাকে পরম শত্রু মনে করিব ? ভুল, ভুল—মৃত্যু 'মিত্র' রূপেই আমার কাছে দেখা দিয়াছে। আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

—তোমার নসু।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল,
৩০. ৬. ৩১. কলিকাতা।

খুকুদি,

তোমার চিঠি পেলাম। মানুষ কোন কাজই করতে পারে না, আনন্দিত মনে যদি না সে কাজটাকে সে ভালবাসে। সংসারী ব্যক্তি সংসারের জন্য দিনরাত খেটে যাচ্ছে কেন? সংসারকে সে ভালবাসে, তাই। সন্ন্যাসী কেন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছে? সৎকে সে ভালবাসে, তাই সৎকে পাবার জন্য তার এই প্রচেষ্টা।

ভালবাসা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিস।

যে যাকে ভালবাসে, তার জন্য প্রাণ দিতেও কি সে কুণ্ঠিত হয় কখনও? মানুষের বড় বড় কাজ দেখে আমরা অপরিসীম বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকি। ভাবি, এ কাজ সে করল কি করে? কিন্তু মূল খুঁজলে পাওয়া যাবে ভালবাসার প্রস্রবণ। তারই সরস রসে সিঞ্চিত হয়ে মানুষ দিতে পারে হাসিমুখে আত্ম-বিসর্জন। কঠিন কাজ হয়ে পড়ে অতি সোজা।

ভালবাসা হিসেব জানে না। বে-হিসেবে উছলে পড়াই তার স্বভাব। আপনাকে বিলিয়ে দিতে যে চায়, প্রতিদানে ভিক্ষার কণা পাবার দুর্বুদ্ধি তার নেই। তাই সে সুন্দর, অতুলনীয়। দিয়েই যায় সে, নেয় না কখনও।

আমাদের সবচেয়ে মুশকিল হল কি জান? আমাদের ভালবাসার গণ্ডী বড় সঙ্কীর্ণ, বড়ই অল্পপরিসর। একে বড় করতে হবে। পারবে না?

ভালবাসার সাধনা করতে হয়। স্বার্থত্যাগ সে সাধনার প্রথম কথা। স্বার্থ আমাদের বড় জড়িয়ে ধরে, তাই কিছু করতে পারি না।

পারব, আমরা সব পারব। যাঁর কাছে গিয়ে ভালবাসা আপন উৎস খুঁজে পায়, তিনি আমাদের হৃদয়ে উৎসারিত ভালবাসা দেবেন—সে ভালবাসা তাঁকেই উৎসর্গ করে ধন্য হয়। ভালবাসা ও প্রণাম জানবে।

—স্নেহের নমু।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল,

৩. ৭. ৩১.

মণিদি,

ভগবানের আশীষ যারা পায় অশেষ দুঃখ জোটে তাদেরই কপালে। সে দুঃখের মালা গলায় পরবার সৌভাগ্য ও শক্তি ক'জনের হয় জানি না, তবে যার হয়, তার জীবন পরম সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ভগবান যাকে আসল কাজের জন্য বেছে নেন, তার সুখ-সম্পদ সব কিছু দেন ধুলোয় লুটিয়ে, করেন তাকে পথের ভিখারী, রিক্ত, কাঙাল। সে মালা কি সহজ?

—'এ তো মালা নয় গো,
এ যে তোমার তরবারী
জ্বলে ওঠে আগুন যেন
বজ্রসম ভারি
এ তো তোমার তরবারী।'

এ জীবনে সুখ পাওয়া বড় কথা হতে পারে, কিন্তু দুঃখ পাওয়া তার চেয়েও বড়। সুখ ভোগ করতে পারে সকলেই, কিন্তু স্বেচ্ছায় দুঃখের বোঝা নিতে পারে ক'জন?

শক্তির উৎস তিনি। যাকে তিনি তাঁর কাজের ভার দেন, সে ভার বহন করবার শক্তিও তাকে অযাচিতভাবে দান করেন তিনিই।

নইলে সাধ্য কি তার যে, সে গুরুভার এক মুহূর্তও সে সহ্য করে?

যার প্রাণ আছে, শ্রেয়কে বরণ করবার জন্য যার আছে শ্রদ্ধা—সে কি কখনও তাঁর মহাশঙ্খের আহ্বান শুনে স্থির থাকতে পারে? কি শক্তি আছে সংসারের এই মিথ্যা মোহের যে তাকে আটকে রাখবে? তাঁর আহ্বানে কি শক্তি আছে জানি না—

'শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।'

আজ যাই দিদি। এই হয়তো শেষ প্রণাম।

—স্নেহের দীনেশ।

১৯৩১ সাল। ৬ই জুলাই। দিনান্তের রঙ মুছে গেল। কণ্ঠও নীরব হল। তখন দীনেশ যে চিঠি দুটো লিখেছিলেন, এবার তার কথা তোমাকে বলব মল্লিকা।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, ৫॥টা (সন্ধ্যা)
৬. ৭. ৩১. কলিকাতা।

স্নেহের ভাইটি,

তুমি আমাকে চিঠি লিখিতে বলিয়াছ, কিন্তু লিখিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে জীবন-সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

যাবার বেলায় তোমাকে আর কি বলিব? শুধু এইটুকু বলিয়া আজ তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি নিঃস্বার্থপর হও, পরের দুঃখে তোমার হৃদয়ে করুণার মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হউক।

আমি আজ তোমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি বলিয়া দুঃখ করিও না ভাই। যুগ যুগ ধরিয়া এই যাওয়া-আসাই বিশ্বকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে, তাহার বুকের প্রাণস্পন্দনকে থামিতে দেয় নাই। আর কিছু লিখিবার নাই। আমার অশেষ ভালবাসা ও আশীষ জানিবে।

—তোমার দাদা।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল, ৫॥টা (সন্ধ্যা)
৬. ৭. ৩১.

মা,

তোমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না। কিন্তু পরলোকে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব। তোমার কিছুই কোনদিন করিতে পারি নাই। সে না করা যে আমাকে কতখানি দুঃখ দিতেছে তাহা কেহই বুঝিবে না, বুঝাইতে চাইও না।

আমার যত দোষ, যত অপরাধ, দয়া করিয়া ক্ষমা করিও। আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

—তোমার নসু

১৯৩১ সাল। ৬ই জুলাই। প্রহরে প্রহরে রাত্রি এগিয়ে চলেছে। থমথমে রাত্রি।

এক-দু নম্বর ওয়ার্ডের রাজনৈতিক বন্দী-মহলে সেদিন কেউ ঘুমিয়ে নেই। সবাই জেগে রয়েছেন প্রচণ্ড একটা দুর্নিবার জ্বালা বুকে নিয়ে।

সহকর্মী দীনেশ। কবি, শিল্পী, লেখক, দার্শনিক দীনেশ। সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রতিহিংসার বলি হিসেবে শুরু না হতেই তাঁর জীবনের শেষপ্রহর ঘনিয়ে এল। এমনি করে আরো কতজনকে যেতে হবে কে জানে।

তা বলে এ অন্যায় আমরা কিছুতেই মুখ বুজে সহ্য করব না। ওদের সবাইকে এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে নিজের রক্তের বিনিময়ে। দীনেশকে হত্যার প্রতিশোধ আমরা নেবই।

৭ই জুলাই, ১৯৩১ সাল।

পুব আকাশে রঙ ধরেছে। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে একটু একটু করে।

দীনেশ ঘুমিয়ে আছেন। সারা মুখে তাঁর নিরুদ্বেগ জীবনের সুপ্ত প্রশান্তি। কোথাও তার মধ্যে এতটুকু মালিন্য নেই।

হঠাৎ কি শুনে ঘুম ভেঙে গেল দীনেশের।

তালে তালে পা ফেলে কারা যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। স্পষ্ট তাদের পায়ের শব্দ ভেসে আসছে—গট্-গট্-গট্-গট্-গট্-গট্···

দেখতে দেখতে দীনেশের সারা মুখে ফুটে উঠল এক টুকরো রহস্যময় হাসি। এ সময়ে কারা যে অমন করে এগিয়ে আসছে সে-কথা তাঁর অজানা নয়। লগ্ন সমাগত। এবার যেতে হবে।

—গুডমর্ণিং সার্জেন্ট! অগ্রগামী শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্টটিকে লক্ষ্য করে শুভেচ্ছা জানালেন দীনেশ, ওয়ান মিনিট প্লীজ! একটা চিঠি পেয়েছি। তার জবাবটা লিখে রেখে যেতে চাই।

তাড়াতাড়ি একটা কাগজ টেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দীনেশ লিখে চললেন তাঁর জীবনের শেষ চিঠি—

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল,
৭.৭.৩১. (প্রত্যুষে) কলিকাতা।

বৌদি,

এইমাত্র তোমার চিঠিখানা পাইলাম। আমার জীবন-কাহিনী জানাইবার সুযোগ হইল না। কি-ই বা জানাইব বল তো? আমার সকল কথাই তো তোমাদের বুকে চিরকাল আঁকা থাকিবে; তুচ্ছ কালির আঁচড় কি তাহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিবে? আমার যত অপরাধ ক্ষমা করিবে। এ জন্মের মতো বিদায়। ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

—তোমার ঠাকুরপো।

—এই নাও। চিঠিটা সার্জেণ্টের হাতে তুলে দিলেন দীনেশ, প্লীজ, এটা তুমি অফিসে জমা দিয়ে দিও। চল, এবার আমি প্রস্তুত।

কিছুদূরে গিয়েই এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়ালো রক্ষী বাহিনী। সামনেই স্নানের জায়গা। বন্দীকে স্নান করানো হবে। তাই নিয়ম।

—স্নান করতে হবে বুঝি! হাসলেন দীনেশ, কি আশ্চর্য, নতুন পোশাকও রয়েছে দেখছি! ভড়ংটুকু দেখছি ঠিকই আছে। ঠিক আছে, তুমি আমার চশমাটা ধর সার্জেণ্ট, আমি স্নান সেরে নিচ্ছি। না না, কাউকে সাহায্য করতে হবে না। আমি একাই পারব।

মনের আনন্দে গায়ে জল ঢালতে ঢালতে অজ্ঞাতেই কখন সূর্যস্তব মূর্ত হয়ে উঠল দীনেশের কণ্ঠে—

'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্টটি। ফাঁসির বন্দী জীবনে তিনি কম দেখেননি, কিন্তু এ লোকটি যেন সব দিক থেকেই ব্যতিক্রম।

যে কনডেম্‌ড্‌ সেলের নাম শুনলে পর্যন্ত কয়েদীরা ভয়ে-আতঙ্কে শুকিয়ে আধখানা হয়ে যায়, দিনের পর দিন সেখানে বাস করেও এ লোকটি কত নিশ্চিন্ত, কত নির্বিকার। বরং এই ক'মাসে তাঁর দেহের ওজন আগেকার তুলনায় অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত। এ বয়সে মৃত্যুকে জয় করার মতো এতবড় শক্তি উনি পেলেন কি করে ?

—তোমার ভয় করে না ইয়ংম্যান ? সার্জেন্টের সারা মুখে কোমল অনুভূতি।

—ভয়! হা-হা করে হেসে উঠলেন দীনেশ, কিসের ভয়! আমাদের গীতায় কি বলেছে জান ?

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥'

অর্থাৎ, যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর পরিগ্রহ করে।—তাহলে ভয় কিসের! এ দেহ পরিত্যাগ করে আবার আমি নূতন দেহ ধারণ করে আসব। আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

—আমার সঙ্গে দেখা হবে! সার্জেন্ট অবাক, কোথায় দেখা হবে ?

—বোধহয় এখানেই। কে বলতে পারে, হয়তো সেদিনও তোমাকেই এই অপ্রিয় কাজটার ভার নিতে হবে।

কথাটা বলেই হেসে উঠলেন দীনেশ। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনের প্রাণখোলা হাসি। সে হাসিতে কোন খাদ নেই।

—যাক, আমার হয়ে গেছে। স্নানশেষে পোশাক-পরিচ্ছদ পরে নিয়ে হাসতে হাসতেই বললেন দীনেশ, এবার যাওয়া যেতে পারে। আমি প্রস্তুত। লেটস্ হ্যাভ আওয়ার পার্টিং কিসেস সার্জেণ্ট!

ধীর বলিষ্ঠ পদে ফাঁসি-মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়ালেন দীনেশ। কোন ক্ষোভ নেই। কোন শঙ্কা নেই। কোন ভয় নেই। কিসের ভয়! শহীদ প্রমোদ চৌধুরী ও অনন্তহরি মিত্রের পদস্পর্শে ধন্য এই ফাঁসি-মঞ্চ তো তাঁর কাছে তীর্থভূমি! তাহলে ভয় কিসের!

—তোমার কিছু বলার আছে বন্দী?

—প্লীজ স্টপ! আমাদের বলার অধিকার যে কারা কেড়ে নিয়েছে, সেকথা তো তোমরা ভাল করেই জান। তাহলে কি লাভ এসব মিথ্যে ফর্মালিটি দেখিয়ে! ডু ইওর ডিউটি। আই অ্যাম রেডি।

মুখের ওপর জবাবটা ছুঁড়ে দিয়েই দীনেশ সহসা বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—বন্দে মাতরম্!

নিমেষে একটা ঝড় বয়ে গেল যেন গোটা জেলখানাটার ওপর দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে শত শত, হাজার হাজার আটক রাজনৈতিক বন্দী ধ্বনি তুললেন—বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! শহীদ দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ!

তাঁদের সঙ্গে সুর মেলাল সাধারণ কয়েদীর দল—দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ! দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ!

একই ধ্বনি উঠল জেল-গেটের বাইরে অপেক্ষমাণ হাজার হাজার জনতার কণ্ঠে—দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ!

সে সুর মিলিয়ে গেল দূর থেকে দূরান্তরে। সেখানেও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে রব উঠল—দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ!

দেখতে দেখতে বন্ধ হয়ে গেল কোর্ট-কাছারি, অফিস-আদালত, ট্রাম-বাস, স্কুল-কলেজ, দোকান-পাট সব কিছু। সবার মুখেই একই কথা। একই রব। দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ!

বিকেলে লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হল মনুমেণ্টের নিচে। তাদের মুখেও সেই একই শপথ। দীনেশ গুপ্তকে আমরা কোনদিনই ভুলব না। দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ!

দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ! লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ভাষা রূপ পেল 'ডেইলী অ্যাডভান্সের' পাতায়। বড় বড় অক্ষরে তাঁরা শিরোনামা দিলেন—'ডণ্ট্‌লেস দীনেশ ডাইজ অ্যাট্‌ ডন্‌।'

আরো একধাপ এগিয়ে গেল মাসিক 'বেণু' পত্রিকা। নিমেষে তাদের হাজার হাজার কপি 'দীনেশ-সংখ্যা' কোথায় উড়ে গেল কর্পূরের মতো। ফলে রাজরোষ। 'দীনেশ-সংখ্যা' চলবে না। ওটা বে-আইনী। অবিলম্বে ওটা বন্ধ করো।

নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন কলকাতা কর্পোরেশন। সরকারী ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই তাঁরা এক প্রস্তাব পাস করলেন দীনেশ গুপ্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি।

দীনেশ গুপ্তের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

কর্পোরেশনের সভা স্থগিত

'স্বীয় আদর্শের অনুসরণে জীবন উৎসর্গকারী দীনেশচন্দ্র গুপ্তের ফাঁসিতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া গতকল্য বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ কর্পোরেশনের সভা আগামী শুক্রবার পর্যন্ত স্থগিত রহিয়াছে।···

প্রস্তাবটি সম্পর্কে মেয়র ডাক্তার বিধান রায় বলেন:

···'হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ব্যাকল্যাণ্ড রায়ে বলিয়াছেন যে, তাঁহার মতে এই যুবক আত্মস্বার্থ বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য এই কার্য করে নাই। প্রকৃতপক্ষে বিচারপতি ব্যাকল্যাণ্ড ইতিহাসের রায়ই লিখিয়াছেন। ইতিহাসে আমরা এমন অনেক

কাহিনী পাঠ করিয়াছি, যাহারা এক সময় এরূপ কার্যের জন্য দণ্ডিত হয়, পরবর্তীকালে তাহারাই আত্মোৎসর্গকারী বীর বলিয়া পূজা পায়।

সুতরাং এই যুবক তাহার আদর্শের অনুসরণে যে অবিচলিত সাহস দেখাইয়াছে, আসুন, আমরা সকলে তৎপ্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি।' সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।'···

'This Corporation records its sense of grief at the execution of Dinesh Chandra Gupta who sacrificed his life in the pursuit of his ideal'.

[The Corporation of Calcutta, 8th July, 1931]

একই দৃষ্টান্ত দেখালেন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি। তাঁদের প্রস্তাবে বলা হল :

'That this meeting records its deep sense of sorrow at the lamentable execution of Sj. Dinesh Chandra Gupta, and while sharing the profound grief with the members of the bereaved family prays to the Almighty that the soul of the departed Great may rest in everlasting peace.'

[The Howrah Municipal Office, 7th July, 1931]

অত্যন্ত মর্মস্পর্শী একটি রচনা প্রকাশিত হল আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে। তাতে বলা হল :

'বিশ বছরের বালক দীনেশ ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিল। কৌতূহলী বালক যেমন নূতন খেলনা ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া গ্রহণ করিতে লালায়িত হয়, অসীম রহস্যময় মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইতে তাহার তেমনি সাধ হইয়াছিল।

মাতাপিতা, স্নেহশীলা ভ্রাতৃজায়া সকলকে সে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছে—মৃত্যু ভয়ঙ্কর নহে, সে মরণমালা। মরণমালা গলায় পরিয়া মরণজয়ী জীবনের জয়োল্লাসে চলিয়া গেল।···

অনেকে মনে করিয়াছিল, অন্তত প্রাণ ভিক্ষা দিয়া গভর্ণমেণ্ট জন-মতের প্রতি কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন। হাইকোর্টের বিচার-পতি ব্যাকল্যাণ্ডের মন্তব্যে এই আশা দৃঢ় হইয়াছিল।

কিন্তু চরম দণ্ডের অন্যথা করিতে গভর্ণমেণ্ট স্বীকৃত হইলেন না। অসহায় জাতি—তদপেক্ষা নিরুপায় মাতার অশ্রুসিক্ত আবেদন ব্যর্থ হইল।

দীনেশ বাঁচিল না—তাহাকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করা গেল না। খেদখিন্ন নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস একটা জাতির পঞ্জর-পিঞ্জর কাঁপাইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। কম্পিত অধরোষ্ঠে কি কথা মৌন রহিয়া গেল, বোঝা গেল না। কেহ কি বুঝিবে?'

এবার মেদিনীপুরের পালা। তাদের কথা, আমরা প্রতিশোধ নেব। অলিন্দ-যুদ্ধের বীর সেনানী দীনেশ গুপ্তকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেবার চরম প্রতিশোধ আমরা নেব।

প্রতিশোধ তারা সত্যিই নিয়েছিল মল্লিকা। শাসকদের বুকের রক্তে গোটা মেদিনীপুরটাকেই বুঝি সেদিন তারা লালে লাল করে দিয়েছিল।

তবে শেষপর্যন্ত কিন্তু তারা দীনেশের ফাঁসি পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারেনি। তার আগেই তারা দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বৈশাখী ঝড়ের মতো।

প্রথম টার্গেট—পেডি। ব্রিটিশ দম্ভের কুখ্যাত প্রতীক জেলা-শাসক জেমস্ পেডি।

কি করেনি সেদিন এই জেমস্ পেডি!

আইন-অমান্য আন্দোলনে ধৃত পুরুষদের বেত্রাঘাতে জর্জরিত করা, মেয়েদের উলঙ্গ করে থুথু দেওয়া, যখন-তখন জেলে ঢুকে বন্দীদের ওপর বেপরোয়া লাঠি-চার্জ করা, কি করতে সে বাকি রেখেছিল!

সেদিনের সেই পৈশাচিক অত্যাচারের কাহিনী শুনলে আজো বোধহয় তোমরা ঘৃণায় শিউরে উঠবে।

জানি, একথা বিশ্বাস করতে তোমার মনে কিছুটা সংশয় জেগেছে। কারণ, ইতিহাসে পড়েছ যে, ইংরেজ বীরের জাত। তদুপরি নারীর সম্মান রাখতে তাদের জুড়ি নেই।

আরো পড়েছ যে, বুড়ি বালামের তীরে নিহত বিপ্লবী বীর বাঘা যতীনকে টুপি খুলে শ্রদ্ধা-নিবেদন করেছিল স্বয়ং পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট। সুতরাং ইংরেজ বীরের জাত না হয়ে যায় না!

স্রেফ ভণ্ডামী মল্লিকা, স্রেফ ভণ্ডামী। ইংরেজ আর কিছু না জানলেও পাবলিসিটির ভড়ংটুকু বেশ ভালই করেই জানে। তাই ক্ষুব্ধ দেশবাসীর কাছ থেকে বাহবা নেবার জন্য সেদিন এই শো-টুকু দেখানো তার প্রয়োজন ছিল।

নইলে যে চার্লস টেগার্ট সেদিন টুপি খুলে নিহত বাঘা যতীনকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল, সে-ই আবার চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অপরাধে শ্রদ্ধেয়া সুহাসিনী গাঙ্গুলীকে ক্রমাগত চড় মেরে মেরে জখম করেছিল। এই জ্বলন্ত সত্যকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই!

আরো প্রমাণ—বাংলাদেশের প্রথম মহিলা স্টেট্ প্রিজনার ননীবালা দেবী।

স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য সেদিন সুসভ্য ইংরেজ সরকারের পুলিস এই নিষ্ঠাবতী বিধবা মহিলাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে তাঁর দেহের অভ্যন্তরে লঙ্কা-বাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

অপরাধ! অপরাধ মারাত্মক!

বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদার হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর রিভলবারটা! কোথায় তিনি লুকিয়ে রেখে গেছেন রিভলবারটাকে! ওটা যে এখুনি চাই!

অসাধ্য সাধন করলেন ননীবালা দেবী। রামবাবুর স্ত্রী সেজে সোজা তিনি জেলে গিয়ে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। একফাঁকে সব

কিছু জেনে নিয়ে তারপরই তিনি রিভলবারটা তুলে দিলেন তাঁর সহকর্মীদের হাতে।

অবশেষে একদিন ধরা পড়লেন ননীবালা দেবী। তারপর শুরু হল ঐ অকথ্য নির্যাতন।

এবার তুমিই বল যে, পৃথিবীর অন্য রাষ্ট্রে এ ধরনের পাশবিকতার কোন নজীর আছে কি ?

যে দক্ষিণ আফ্রিকা, পর্তুগীজ বা রোডেশিয়া সরকারের বিরুদ্ধে তোমাদের কণ্ঠ প্রতি মুহূর্তে সোচ্চার হয়ে ওঠে, তাদের পক্ষেও কোন-দিন এতখানি কুৎসিত নির্যাতন সম্ভব হয়েছে কি ?

ইংরেজের পক্ষে কিন্তু সম্ভব হয়েছিল। বীরের জাত কিনা!

যাক, পেডির কথাতেই ফিরে যাই। অত্যাচারে, উৎপীড়নে, আঘাতে, অপমানে গোটা জেলাটাকে শ্মশানে পরিণত করেই কিন্তু থামল না পেডি। সেই সঙ্গে শোনা গেল তার সদম্ভ চ্যালেঞ্জ। মেদিনীপুরকে এমন শিক্ষা দেব, যা সে কোনদিনই ভুলতে পারবে না।

বটে! সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল দীনেশের নিজের হাতে গড়া বি. ভি.-র মেদিনীপুর শাখার বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। আমাদের শিক্ষা দেবে! দেখা যাক, কে কাকে শিক্ষা দেয়! রইল চ্যালেঞ্জ!

সারা বাংলা, সারা ভারত, সারা বিশ্ব এবার তাকিয়ে দেখুক যে, আমরা মেদিনীপুরের ছেলেরা আমাদের দীনেশদার প্রতি চরম দণ্ডা-দেশের প্রতিশোধ নিতে পারি কিনা! তাকিয়ে দেখুক যে, আমরা গুরু-প্রণামী দিতে জানি কিনা!

হিসেব আমাদের অত্যন্ত সোজা। লাইফ ফর লাইফ। ব্লাড ফর ব্লাড। এছাড়া অন্য কোন হিসেব আমাদের জানা নেই।

লাইফ ফর লাইফ! প্রমাণ মিলল ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল। দীনেশের ফাঁসির তিনমাস আগেই।

সেদিন পেডি এসেছেন মেদিনীপুর জেলা-স্কুলে একটি শিক্ষা-প্রদর্শনীর আমন্ত্রণে।

সন্ধ্যা উতরে গেছে। পেডি একটার পর একটা ছবি দেখে চলেছেন হ্যারিকেনের স্তিমিত আলোতে। সঙ্গে আরো দুজন পদস্থ রাজপুরুষ।

হঠাৎ গুলীর শব্দ—গ্রাম! গ্রাম! গ্রাম! গ্রাম! গ্রাম! গ্রাম পর পর ছ-বার।

শুরু হল হৈ-চৈ, চেঁচামেচি আর চিৎকার। আশ্চর্য, এত সশস্ত্র প্রহরী, এত লোকজন, তার মধ্যে কিনা এই কাণ্ড! ধর শীগ্‌গীর, ধর ওদের!

কাকে ধরবে! কোথায় কে! আশ্চর্য, কেউ নেই! কাজ শেষ করে কখন যে মেদিনীপুরের দুই দুর্ধর্ষ তরুণ বিমল দাশগুপ্ত আর যতীজীবন ঘোষ দিব্যি হাওয়ায় মিশে গেলেন, কেউ তা টেরই পেল না।

পরদিনই সে খবর বেশ বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল সংবাদ-পত্রের পাতায়।

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলী

স্কুল-গৃহের মধ্যে মিঃ পেডি আহত

'মেদিনীপুর, ৭ই এপ্রিল। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জেমস্ পেডি, সি. আই. ই.-র উপর অদ্য মেদিনীপুর স্কুল-ভবনের মধ্যে ৬ বার গুলী নিক্ষিপ্ত হয়।

মিঃ পেডি শিকার হইতে অদ্য সন্ধ্যাকালে শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় শিক্ষা-প্রদর্শনী পরিদর্শনের জন্য স্থানীয় স্কুল-ভবনে গমন করেন। ঐ সময় প্রদর্শনী-ঘরের মধ্যে তাঁহার উপর গুলী বর্ষিত হয়।

তিনটি গুলী তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বিদ্ধ হয়, দুইটি গুলী তাঁহার বাহুতে বিদ্ধ হইয়াছে। একটি গুলী তাঁহার তলপেট ভেদ করিয়া গিয়াছে।'

[আনন্দবাজার, ৮ই এপ্রিল, ১৯৩১]

এ খবর ৮ই এপ্রিলের। এবার শোন তার পরদিন, অর্থাৎ ৯ই এপ্রিলের খবর।

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডির মৃত্যু

'মেদিনীপুর, ৮ই এপ্রিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জেমস্ পেডি অদ্য অপরাহ্নকাল পাঁচটা দশ মিনিটের সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। গতকল্য সন্ধ্যাকালে তিনি গুলীর আঘাতে জখম হন।

অদ্য দ্বিপ্রহরের পূর্বে তাঁহাকে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করা হয়, তাহার ফলে আরও দুইটি গুলী বাহির করা হয়। কিন্তু অপরাহ্ন-কালে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া উঠে এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এতৎসম্পর্কে কয়েকটি বাড়িতে খানাতল্লাশি করা হইয়াছে এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।' [আনন্দবাজার, ৯ই এপ্রিল, ১৯৩১]

যতীজীবন ও বিমল দাশগুপ্ত দুজনেই তখনো পর্যন্ত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তবে বেশিদিন নয়। তদন্তের ফলে যথাসময়েই একদিন বিমল দাশগুপ্তের নামটা পৌঁছে গেল পুলিসের কানে।

কি করে তা সম্ভব হল! সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি।

বিমলদা সাহেবকে মারিয়াছে

'পেডি সাহেবের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে গোয়েন্দা-বিভাগ একটি গুরুতর সন্ধানের খোঁজ পাইয়াছে।

কলেজিয়েট স্কুলের নিকটস্থ একবাড়ির এক পরিচারিকার এক অল্পবয়স্ক পুত্র নাকি স্থানীয় লোকদিগকে বলিয়াছে যে, বিমলদা সাহেবকে মারিয়া পলাইয়া গিয়াছে।

এই যুবকের সন্ধান অজ্ঞাত। খানাতল্লাশিতে অপরাধজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

বিমল দাশগুপ্তের পিতার নাম অক্ষয়কুমার দাশগুপ্ত। তাঁহার বাড়ি বরিশাল। তিনি গত ৩০ বৎসর যাবৎ এখানে কবিরাজী করিতেছেন।' [আনন্দবাজার, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৩১]

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে। বিমলদা। বিমলদা। বিমল দাশগুপ্ত। কবিরাজ অক্ষয়কুমার দাশগুপ্তের ছেলে বিমল দাশগুপ্ত। ওরফে মাখন।

ধরো এবার বিমল দাশগুপ্তকে। যে করে হোক, তার শির চাই।

কিন্তু কোথায় বিমল দাশগুপ্ত! শহরের সুপরিচিত রঘু গয়লার সঙ্গে তার ছেলে সেজে ততক্ষণে তিনি কলকাতা গিয়ে নানা জায়গা ঘুরে পৌঁছে গিয়েছেন মেটিয়াবুরুজের সেই রাজেন গুহর বাড়িতে, যেখানে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের বীর অধিনায়ক বিনয় বোস তাঁর জীবনের শেষ ক'টি দিন কাটিয়েছিলেন পরম আনন্দে।

পিতার স্নেহ ও মায়ের আদর সংসারে আর যার কপালেই থাক না কেন, বিপ্লবীদের জন্য নয়। বিশেষ করে ফাঁসির রজ্জু যাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে, সে সব পলাতক বিপ্লবীদের জন্য তো নয়ই। সে সাহসই বা কোথায়!

সেদিক থেকে অন্তরের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যময়ী সরযূ দেবী ও রাজেনবাবু ছিলেন একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

অগ্নিযুগের কত ঘর-ছাড়া পলাতক বিপ্লবী যে সেদিন তাঁদের স্নেহ-চ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার বোধহয় কোন গোনাগুনতি ছিল না।

যাক, আগের কথায় ফিরে যাই। বিমল দাশগুপ্ত। নামটা তুমি ভাল করে লক্ষ্য কর মল্লিকা। নইলে, পরে কিন্তু তোমাকে এ নিয়ে অনেকখানি বিভ্রান্ত হতে হবে। কারণ, এই বিমল দাশগুপ্ত নামটি নিয়ে অনেক মজাই সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তীকালে।

প্রথমে লোম্যান, তারপর সিম্পসন, সবশেষে পেডি। এখানেই কি শেষ!

মোটেই না। সর্বনাশের খেলার এই তো সবে শুরু। এর শেষটাও দেখে নিতে হবে যে!

কিন্তু এবার কার পালা?

কাকে ধরা যায় এবার?

নির্দেশ এল প্রেসিডেন্সি জেলের অভ্যন্তর থেকে—গার্লিককে ধর। ও-ই তো সেদিন দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিল। এর আগেও সে এমনি আদেশ দিয়েছিল চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের এক-নিষ্ঠ কর্মী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের বেলায়। সুতরাং ওকে ছেড়ো না। কিছুতেই যেন ও রেহাই না পায় তোমাদের হাত থেকে।

সত্যিই রেহাই পেলেন না। ১৯৩১ সাল, ২৭শে জুলাই। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির ঠিক কুড়ি দিন পরের কথা।

আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন জজ মিঃ আর. আর. গার্লিক, আই. সি. এস.-এর আদালত।

চারদিকে সশস্ত্র প্রহরী। প্রহরী অবশ্য বরাবরই ছিল, তবে সম্প্রতি তা আরো বাড়ানো হয়েছে। কারণ, ইতিমধ্যে গার্লিক বেশ কয়েকখানি ভীতিজ্ঞাপক চিঠি পেয়েছেন বিপ্লবীদের তরফ থেকে। তাতে স্পষ্টই জানানো হয়েছে যে, মৃত্যু তাঁর আসন্ন। তারই জন্য এই অতিরিক্ত সতর্কতা।

আদালতের কাজ চলেছে। বিচারকের আসনে বসে গার্লিক। কি একটা মামলার তিনি শুনানী শুনছেন মন দিয়ে।

হঠাৎ মাথার ওপর আকাশটা ভেঙে পড়ল শব্দ করে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উন্নত মাথাটা লুটিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর।

ঝাঁপিয়ে পড়ল তৎপর প্রহরীর দল। ঝাঁপিয়ে পড়ল সার্জেণ্ট, কনস্টেবল ও গোয়েন্দা-বিভাগের একজন দারোগা। আগুন ছুটল উভয়পক্ষ থেকেই। কেউ কাউকে ছাড়তে রাজী নয়।

গোটা আদালত জুড়ে হুলস্থুল কাণ্ড। চারদিকে ছুটোছুটি, দাপাদাপি আর চিৎকার। এই চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে কে শত্রু, আর

কে যে মিত্র, বোঝাও মুশকিল। তবু তারই মধ্যে দেখা গেল একজন সশস্ত্র প্রহরী ধূলিশয্যা নিয়েছে।

সংখ্যাধিক্যের বিরুদ্ধে একক সংগ্রামে ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়লেন মুক্তি-সৈনিক। ফলে, শেষপর্যন্ত গুলী ছেড়ে শুরু হল ধস্তাধস্তি।

চারদিকে পুলিসের বেড়াজাল। কোনরকমেই তাদের এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তবু তিনি শাসকদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে রাজী নন। শেষপর্যন্ত মুখে পুরে দিলেন সায়ানাইড বিষের পুরিয়া। তারপরই আস্তে আস্তে ঢলে পড়লেন শক্ত মাটির বুকে।

মৃত্যুর পরে তাঁর পকেটে কি পাওয়া গিয়েছিল জানো? পাওয়া গিয়েছিল ছোট্ট একটি চিঠি। তাতে লেখা ছিল—'ধ্বংস হও, দীনেশ গুপ্তকে অবিচারে ফাঁসি দেবার পুরস্কার লও।' ইতি—

মল্লিকা, ইতির পরে নামটা কি ছিল জানো?

বিমল দাশগুপ্ত! পেডি-হত্যাকারী সেই বিমল দাশগুপ্ত। এবার বুঝেছ, কেন আমি তোমাকে বিমল দাশগুপ্ত নামটি বিশেষভাবে মনে রাখতে বলেছিলাম।

কিন্তু সত্যিই কি ইনি বিমল দাশগুপ্ত?

মোটেই না। মৃতদেহ দেখে বিমলের বাবা, মা, দাদা, সবাই রায় দিলেন একবাক্যে, ইনি বিমল দাশগুপ্ত নন। এঁর পরিচয় তাঁদের অজ্ঞাত।

পুলিস বিভ্রান্ত। তাই তো! তাহলে ইনি কে? কি এঁর পরিচয়?

অবশেষে একনাগাড়ে চার মাস ধরে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল বিভিন্ন সংবাদপত্রের পাতায়।

'A reward is hereby declared, worth Rupees Five hundred to be given to one who can identify the murderer of Mr. Garlik.'

সব বৃথা। হাজার চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত মৃতদেহ সনাক্ত করা সম্ভব হল না পুলিসের পক্ষে। রহস্য যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেল।

তাহলে ইনি কে?

দেশ ও জাতির প্রয়োজনে নিজের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন করে কেন তাঁর এই নিরাসক্ত আত্মবিলুপ্তি?

কি তাঁর নাম?

নাম কানাই ভট্টাচার্য। বিপ্লবী নেতা সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গড়া কর্মী মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ কানাই ভট্টাচার্য। সাতকড়িবাবুই তাঁকে একাজে পাঠিয়েছিলেন জেলের অভ্যন্তর থেকে নির্দেশ দিয়ে।

কিন্তু কেন? কানাই ভট্টাচার্যের পকেটে কেন বিমল দাশগুপ্ত নামাঙ্কিত চিঠি?

কি এর কারণ?

এর কোন প্রয়োজন ছিল কি?

ছিল বৈকি! এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিমল দাশগুপ্তকে পুলিসের হাত থেকে রক্ষা করা।

বিমল দাশগুপ্ত পলাতক। পুলিস তাঁর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবার তারা জানুক যে, বিমল দাশগুপ্ত আর বেঁচে নেই। তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখা এখন নিরর্থক।

আসল বিমল দাশগুপ্ত তাহলে কোথায় গেলেন? ব্যস্ত হয়ো না। যথাসময়ে তুমি আবার তাঁর দেখা পাবে।

লোম্যান, সিম্পসন, পেডি আগেই গিয়েছে। এবার গেলেন গার্লিক। এসব দেখে-শুনে সেদিন কি ব্রিটিশ-সিংহ চুপ করে বসে ছিল?

মোটেই না। একটার পর একটা আঘাতে ক্রমশঃই তারা হিংস্র থেকে হিংস্রতর হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে গার্লিক-হত্যার পরে তাদের সেই আক্রোশ যেন সহসা শতধারায় ফেটে পড়ল। পড়ল মেদিনীপুরের বুকেই।

মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর থেকে মাত্র মাইল দুয়েক দূরে অবস্থিত হিজলী বন্দী-নিবাস। প্রায় শ' দুয়েকের মতো রাজবন্দীকে সেখানে আটক করে রাখা হয়েছিল বিনা বিচারে।

সেদিন ছিল ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ সাল।

রাত তখন প্রায় সাড়ে আটটা। বন্দীরা কেউ কেউ খাওয়া-দাওয়া সারছেন, কেউ বা গল্প-গুজব করছেন, আবার কেউ বা শুয়ে পড়েছেন এরি মধ্যেই।

ঠিক তখনই ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ অফিসার তার হিংস্র প্রহরী দলকে লেলিয়ে দিল বন্দীদের বিরুদ্ধে। এই সুযোগ। ওরা এখন অপ্রস্তুত। এই সময়ে যা পার করে নাও।

শুরু হল নারকীয় হত্যাকাণ্ড। শুরু হল এক-তরফা নির্মম আক্রমণ। ডাইনে-বাঁয়ে, যেদিকে ইচ্ছা গুলী চালাও। কাউকে রেহাই দিও না। সেদিন গালিকের হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে ওরা উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। আজ তার শোধ তুলে নাও।

সত্যিই সেদিন ওরা শোধ তুলে নিল মল্লিকা। ফলে, গুলীর আঘাতে নিহত হলেন বন্দী তারকেশ্বর সেনগুপ্ত ও বাপ-মায়ের একমাত্র আদরের দুলাল, সুভাষের সহপাঠী বন্ধু, সন্তোষ মিত্র। আর আহত হলেন এক শ'য়ের চাইতেও বেশি। গোবিন্দপদ দত্ত তাঁদের অন্যতম। তাঁর পুরো হাতটাই কেটে বাদ দিতে হল অপারেশন করে।

খবর শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সারা বিশ্ববাসী। কোন সভ্য গভর্ণমেণ্টের জেলখানায় যে বিনা বিচারে আবদ্ধ অসহায় নিরস্ত্র বন্দীদের ওপর এ ধরনের নির্মম আক্রমণ হতে পারে, তা বোধহয় তাদের ধারণারও বাইরে ছিল।

কিন্তু ইংরেজ সরকারের কথা আলাদা। নিজেদের সাম্রাজ্য-লিপ্সাকে বজায় রাখার জন্য সেদিন এমন কোন হীন কাজ ছিল না, যা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ধিক্কার উঠল শতকণ্ঠে। আসমুদ্র-হিমাচল একসঙ্গে সোচ্চার হয়ে উঠল—ধিক তোমাদের, শতধিক! তোমরা মানুষেরও অধম। মানুষ কখনো অসহায় নিরস্ত্র বন্দীকে এভাবে হত্যা করে না।

মল্লিকা, গত বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের প্রচার-মহিমায় বন্দীদের প্রতি হিটলারের কত নৃশংসতার কাহিনীই না আমরা শুনেছি। এমন কি, পাইকারী হারে বন্দীদের হত্যা করার কাহিনীও আমরা শুনেছি এমনি কতবার।

কিন্তু সুসভ্য ইংরেজই কি তার পথ-প্রদর্শক নয়?

পরাধীন ভারতে এমনি অসংখ্যবারই কি তার উদাহরণ দেখা যায়নি?

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ, অধ্যাপক নৃপেন্দ্র ব্যানার্জী, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ছুটে গেলেন হিজলীতে।

ফিরে এলেন পরদিন শহীদদের মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে। হাওড়া স্টেশন থেকে শুরু করে কেওড়াতলা শ্মশানঘাট পর্যন্ত সে কি মর্মস্পর্শী দৃশ্য সেদিন! এমন মর্মস্পর্শী দৃশ্য, এমন সুসংবদ্ধ মিছিল কলকাতা-বাসী বোধহয় বহুকাল দেখেনি।

বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে এতদিন সুভাষপন্থী আর সেনগুপ্তপন্থীদের মধ্যে দলাদলির অন্ত ছিল না। সমস্ত ভুলে গিয়ে, বি. পি. সি. সি. থেকে পদত্যাগ করে সেই রাত্রেই সুভাষ দেশবাসীর কাছে এক আবেদন প্রচার করলেন আবেগময়ী ভাষায়।

'আমি খড়্গপুর হইতে অবর্ণনীয় বেদনা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। আমাদের বন্ধুদের জেলের মধ্যে কুকুর-বিড়ালের মতো গুলী করিয়া মারিবে, আর আমরা কি এখনো বিবাদ-বিসম্বাদে রত থাকিব! সকল বিভেদ ভুলিয়া আজ আমাদিগকে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে হইবে, শত্রুর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।'

পরদিন ১৯শে সেপ্টেম্বর এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখা গেল মনুমেন্টের নিচে। একই সভামঞ্চে হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি

দাঁড়িয়ে যতীন্দ্রমোহন আর সুভাষ। সব পথই স্বাধীনতার পথ। সবারই লক্ষ্য এক। সুতরাং আর বিরোধ নয়।

তারপর সভা। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সেদিন সেই বিরাট জনসভায় দাঁড়িয়ে কে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে দৃপ্তকণ্ঠে ধিক্কার জানিয়েছিলেন জানো?

তিনি হলেন বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ। সেদিন প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন:

'এত বড় জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক; কিন্তু যখন ডাক পড়ল, থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে।

যখন দেখা যায়, জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত আনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধরে নিতেই হবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল।

...এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশী রাজা যত পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্ম-সম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়।

প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে; কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি?

একথা ভুললে চলবে না যে, প্রজাদের অনুকুল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের দায়িত্ব নির্ভর করে।

আমি আজ উত্তেজনা বাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাইনে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন একথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতঃই আপন কলঙ্ক-লাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যত ঊর্ধ্বে ধরে আছে, তত ঊর্ধ্বে আমাদের ধিক্কার বাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছতে পারবে না।'

আর ধিক্কার জানিয়েছিলেন বীরেন্দ্র শাসমল। মেদিনীপুর গৌরব সেই পুরুষসিংহ বজ্রকণ্ঠে সেদিন প্রশ্ন করেছিলেন :

…'What would have happened to His Excellency Sir Stanly Jackson, if he was the premier of England and such an occurrence had taken place in a British Jail and he was coolly moving about Downing Street and Westminster? I believe he would have been torn to pieces by the English mob.'

[আমি জিজ্ঞেস করি, আজ গভর্ণর স্ট্যানলী জ্যাকসন যদি ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হতেন এবং সেখানকার কোন জেলে যদি এমনি ঘটনা ঘটত, তাহলে কি তিনি নিরুপদ্রবে ডাউনিং স্ট্রীট বা ওয়েস্ট মিন্স্টারের ধারে পাশে ঘুরে বেড়াতে পারতেন? আমি বিশ্বাস করি ইংল্যাণ্ডের জনতা তাহলে তাঁকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলত।]

[History of Midnapore, pt. II-P. 181]

দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করলেন সুভাষ। তিনি বললেন :

'…So on this day only cry that rings out of the heart is, let on the blood of the martyrs be built up the edifice of Freedom…'

যথাসময়ে তদন্ত কমিটি বসল হিজলীর ব্যাপার নিয়ে। কমিটির চেয়ারম্যান নির্ধারিত হলেন বিচারপতি এস. সি. মল্লিক।

শহীদ তারকেশ্বরের আদিনিবাস বরিশাল জেলার গৈলাতে। নির্দিষ্ট দিনে সুভাষ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি।

'গৈলা, ২৪শে অক্টোবর। আত্মত্যাগী তারকেশ্বরের চিতাভস্ম সমাহিতকরণ উৎসব উপলক্ষে তারকেশ্বরের ঐকান্তিক যত্ন ও সেবায় গঠিত গৈলা সেবাশ্রমে গত ২৪শে অক্টোবর বৈকালে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সদলবলে বেলা ৪॥০টায় আসিয়া উপস্থিত হন। উৎসবের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত রজনী চট্টোপাধ্যায় প্রার্থনা করেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ প্রার্থনায় যোগদান করেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন :

'...আমরা জানি, আত্মত্যাগীর রক্তের বিনিময়েই স্বাধীনতা ক্রয় করা সম্ভবপর। সকল যুগ, সকল সময় হইতেই আমরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিতেছি। আমাদের পক্ষেও উহার ব্যতিক্রম আশা করা উচিত নয়।

হিজলীর গুলী-বর্ষণের ঘটনায় এই সত্যই আমাকে প্রবোধ দান করিয়াছে। হিজলী-চট্টগ্রামের ব্যাপার বাংলা কখনও নীরবে সহ্য করিবে না। একবাক্যে ইহার প্রতিকার দাবী করিবে'। [আনন্দবাজার : ২৮-১০-৩১]

তদন্ত কমিশনের রায় জানা গেল অক্টোবর মাসের ৩০ তারিখে। রায়ে কি বলা হয়েছিল শোন।

হিজলীতে গুলী চালাইবার কোনই সঙ্গত কারণ ছিল না
সরকারী তদন্ত কমিটির সিদ্ধান্ত

'হিজলীর গুলী চালনা ব্যাপার সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে বিচারপতি মিঃ এস. সি. মল্লিক (চেয়ারম্যান)

ও মিঃ জে. জি. ড্রামণ্ডকে লইয়া যে তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছিল, উক্ত কমিটি তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন :

'…আমাদের মতে সিপাহীরা যে বন্দী-নিবাসের উপর বেপরোয়া গুলী চালাইয়া (২৯ বার গুলী ছোঁড়া হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়) দুইজন রাজবন্দীকে নিহত ও অপর কয়েকজনকে জখম করিয়াছিল, তাহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বন্দী-নিবাসের ভিতরে প্রবেশ করিয়া কয়েকজন সিপাহী যে অপরাপর কয়েকজন রাজবন্দীকে নানাভাবে জখম করিয়াছিল তাহারও কোন সঙ্গত কারণ নাই।'

[আনন্দবাজার : ৩০-১০-৩১]

সরকারী কাগজগুলোর মুখে শোনা গেল অন্য কথা। না, গুলী চালিয়ে প্রহরীরা এমন কিছু অন্যায় করেনি। তাদের কর্তব্য তারা করেছে, তার মধ্যে অন্যায়ের কি আছে!

এবার প্রতিবাদ করলেন রবীন্দ্রনাথ। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ২রা নভেম্বর তারিখে দার্জিলিং থেকে এক বিবৃতি দিয়ে তিনি জানালেন :

'হিজলী বন্দিশালার বন্দীদের ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্ডারগণের প্রতি খ্রীষ্টান-সুলভ মনোভাবের দ্বারা বার বার সহানুভূতি প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্প্রতি একখানি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজে আমরা ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। ঐসব ওয়ার্ডারগণই তাহাদের রক্ষাধীন বন্দীদিগকে হত্যা করিয়াছিল। এই অপরাধের অনুষ্ঠাতাদিগের প্রতি গুরু কার্যভারের দোহাই দিয়া অনুকম্পা প্রদর্শন করা হইয়াছে।

এইসব মদগর্বিত ব্যক্তিরা সুখে-স্বচ্ছন্দে ব্যারাকে বাস করিয়া স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। ইহারাই দলবদ্ধভাবে নিতান্ত বর্বরোচিত প্রথানুযায়ী কারারুদ্ধ এবং অনির্দিষ্ট নিয়তির অসহনীয় মর্মপীড়ায় দগ্ধ অসহায় বন্দীদের উপর রাত্রির অন্ধকারের আবরণে নরঘাতী আক্রমণ চালাইয়াছিল।

তাহাদের সেই কার্যের জন্য প্যারাগ্র্যাফেব উপর প্যারাগ্র্যাফে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করা হইয়াছে।

লোভ, যন্ত্রণা, ক্রোধের অদম্য তাড়না এমন একটি চরম অবস্থায় পৌঁছায়, যখন সামাজিক দায়িত্ববোধ বা পরিণাম-চিন্তা হারাইয়া যায়। হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, এইরূপ কোন দারুণ বিক্ষোভ হইতেই অধিকাংশ অপরাধের উৎপত্তি। এইরূপ অপরাধ যদিও অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনার মুহূর্তে এবং মানসিক দুঃস্বপ্নগ্রস্ত অবস্থায় সাধিত হয়, তথাপি আইন তাহা ক্ষমা করে না এবং সেইজন্যই ভয় এবং আত্ম-সংযম অপরাধাত্মক বৃত্তিগুলিকে বাধা দেয়।

কিন্তু যদি কর্মচারীদের কৃত খুনের জন্যই দয়ার ভাণ্ডার সযত্নে পূর্ণ করিয়া রাখা হয়, এবং যাহারা তাহাদের মনে শাস্তি এড়াইবার আশা পোষণ করে ও যাহারা আইন-শৃঙ্খলার রক্ষাকর্তারূপে ঐ আইন ও শৃঙ্খলা সদম্ভ বিজয়োল্লাসের সহিত ভঙ্গ করে, তাহাদের জন্য যদি ন্যায় বিচারের একটি বিশেষ ধারা কৃতকার্যতার সহিত সমর্থন করা হয়, তাহা হইলে তদ্দারা সমগ্র সভ্যদেশের আইন-কানুনে ঘোষিত ন্যায়-পরায়ণতার নীতিকেই অবমাননা করা হইবে এবং জনসাধারণের মনের উপর তাহা এমন প্রতিক্রিয়া করিবে, যাহা কোন রাজদ্রোহকর প্রচার কার্যই করিতে পারে না।'... [আনন্দবাজার : ৪-১১-৩১]

সরকারী তদন্ত কমিটির রায় প্রকাশিত হল। প্রমাণিত হল যে, এভাবে গুলী-বর্ষণের কোন সঙ্গত কারণই সেদিন ছিল না। কিন্তু তারপর! গভর্ণমেণ্ট কি সিদ্ধান্ত নিলেন এ ব্যাপারে! সে কাহিনীও এখানে তুলে দিচ্ছি সংবাদপত্রের পাতা থেকে।

হিজলীর ঘটনার জন্য রাজবন্দীরাই দায়ী

'গতকল্য ৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় নিম্নলিখিত সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে :

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ তারিখ হিজলী বন্দী-নিবাসে যে ঘটনা ঘটিয়াছে এবং তৎবিষয়ে তদন্ত কমিটি অনুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, স-পরিষদ লাট বাহাদুর তৎসম্পর্কে বিবেচনা

করিয়া যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :

…১৫ই তারিখের ব্যাপার রাজবন্দী এবং সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তিনি মন্তব্য করিতেছেন যে, সমস্ত ব্যাপারে রাজবন্দীরাই ছিল উপদ্রব সৃষ্টিকারী।' [আনন্দবাজার : ৬-১২-৩১]

ব্যস, ঝামেলা মিটে গেল। তদন্ত কমিটি যা-ই বলুক না কেন, 'তিনি' মন্তব্য করিতেছেন যে, সব দোষ রাজবন্দীদের। সুতরাং 'তিনি'র কথার ওপর আর কোন কথাই চলতে পারে না।

স্টেটস্‌ম্যান, ইংলিশম্যান এবং ইয়োরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থাগুলির বক্তব্য আরো স্পষ্ট। না, কোন খাতির নয়। সরকারের উচিত—বিপ্লবী বলে যাকে সন্দেহ হবে, তাকেই দেয়ালের পাশে দাঁড় করিয়ে গুলী করে হত্যা করা।

কি করবে এখন মেদিনীপুর! হিজলী যে মেদিনীপুরের মধ্যেই! এতবড় অন্যায়, অবিচারের পরেও কি তারা চুপ করে বসে থাকবে?

দীনেশের নিজের হাতে গড়া মেদিনীপুরের তরুণ রক্ত কি এর প্রতিশোধ নেবে না?

অসহ্য উত্তেজনায় ফেটে পড়বে না?

রক্তে রক্তে মেদিনীপুরের মাটিকে ভিজিয়ে দেবে না?

দিয়েছিল মল্লিকা। দিয়েছিল ঘটনার মাসাধিককাল বাদেই। তারিখটা ছিল ২৯শে অক্টোবর।

দুপুরবেলা। ক্লাইভ স্ট্রীটের গিলেণ্ডার হাউসে অবস্থিত ইয়োরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশন তখন জমজমাট। সভাপতি মিঃ ই. ভিলিয়ার্স।

হঠাৎ কার হাতের রিভলবার সেখানে সশব্দে আগুন ছড়াল—ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

সঙ্গে সঙ্গে ভিলিয়াস এলিয়ে পড়লেন আহত হয়ে। রক্ত! আরো রক্ত! হেল্প! প্লীজ হেল্প!

দূর থেকে একটা চেয়ার ছুঁড়ে মারার দরুন আচমকা বেশ খানিকটা জখম হয়ে পড়লেন তরুণ বিপ্লবী। তারপরই ধরা পড়লেন চারপাশ থেকে ঘেরাও হয়ে।

ফলে, যা হবার তাই হল। এল পুলিস। এল সেপাই-সান্ত্রী। এল পুলিস বিভাগের বড় বড় সব অফিসারবৃন্দ। আসামী ধরা পড়েছে। এবার কোথায় যাবে বাছাধন!

বাছাধনের নামটি কি জানো মল্লিকা? শুনে চমকে উঠো না যেন। নাম—বিমল দাশগুপ্ত। পেডি-হত্যাকারী সেই আসল বিমল দাশগুপ্ত।

গ্রেপ্তারের পরে অকথ্য নির্যাতন করা হল বিমল দাশগুপ্তের ওপর, কিন্তু সব বৃথা। একটি কথাও কেউ শুনতে পেল না তাঁর মুখ থেকে। এবার বিচার। সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি।

স্পেশাল ট্রাইবিউনালে বিমল দাশগুপ্ত

'বুধবার দিন আলিপুরে মিঃ বাটলি (প্রেসিডেণ্ট), রায় বাহাদুর নলিনীকান্ত বসু এবং বাবু প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ দ্বারা গঠিত স্পেশাল ট্রাইবিউনালে বিমল দাশগুপ্তের বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, গত ২৯শে অক্টোবর বেলা প্রায় ১১টা ৩০ মিনিটের সময় আসামী ইয়োরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্সের ক্লাইভ স্ট্রীটস্থ অফিস-গৃহে যাইয়া তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত ৩টি গুলী করে।

২টি গুলী লাগে নাই, একটি গুলী লাগিয়া মিঃ ভিলিয়ার্স পৃষ্ঠদেশে আহত হন। রয়ালিস্ট লীগের ৩ জন সদস্য তৎক্ষণাৎ আসামীকে ধরিয়া ফেলে এবং আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলীসহ আসামীকে পুলিসের নিকট সমর্পণ করা হয়।' [আনন্দবাজার: ১২-১১-৩১]

বিচারকালে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন বন্দী বিমল দাশগুপ্ত—হ্যাঁ, আমি মেরেছি। কিন্তু কেন।

'The Savage repressions in Midnapore, Chittagang and Hijli Camp were always inspired by the European Association. So I came to settle accounts with its President.' [মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম ও হিজলী বন্দী-নিবাসে বর্বর অত্যাচারের মূলে রয়েছে এই ইংরেজ বণিকসভার উস্কানি। তাই আমি এসেছিলাম তাদের সভাপতির সঙ্গে চূড়ান্ত হিসেব-নিকেশ করতে।]

সাজা হল দশ বছর। মাত্র দশ বছর।

তা বলে এখানেই শেষ নয়। যাবে কোথায়? পেডি-হত্যার জন্য সাজা নিতে হবে না? ফাঁসির রজ্জু তো তার জন্য বাঁধাই রয়েছে।

কিন্তু সাক্ষী! সাক্ষী-সাবুদ কোথায়? না, মেদিনীপুরবাসী তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজী নয়। হাজার প্রলোভনেও নয়। সুতরাং পেডি-হত্যা মামলা ডিসমিস।

সংবাদপত্রের পাতা থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি।

বিমল দাশগুপ্ত

পেডি-হত্যার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি

'গত ৭ই এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জেমস্ পেডিকে হত্যার সম্পর্কে অভিযুক্ত বিমল দাশগুপ্তের বিচার গতকল্য কলিকাতা হাইকোর্টে এক নাটকীয়ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

অ্যাডভোকেট জেনারেল তাহার বিরুদ্ধে পেডি-হত্যা সম্পর্কে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করায় ঐ অভিযোগ হইতে তাহাকে অব্যাহতি দান করা হইয়াছে'। [আনন্দবাজার ১৩-১-৩২]

মন উঠল না মেদিনীপুরের।

কি করে উঠবে! আহত হওয়া সত্ত্বেও ভিলিয়ার্স বেঁচে গেল, আর তার জন্য হারাতে হল কিনা বিমল দাশগুপ্তের মতো ছেলেকে!

উঁহু হিসেব মিলছে না। সুতরাং হিসেব মেলাতে হবে। এমন জবাব দিতে হবে, যাতে দুবারের খরচ একবারেই উঠে আসে।

কিন্তু জবাব দিতে চাইলেই জবাব দেওয়া যায় না। তার জন্যে সময়ের দরকার।

মেদিনীপুরকে প্রস্তুত হবার সুযোগ দিয়ে চল আমরা এই ফাঁকে একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি, মল্লিকা। কারণ, হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো এ সময়ে বাংলাদেশের বিপ্লবের ইতিহাসে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেল, যা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

তার মধ্যে বিশেষ দু-একটা ঘটনার কথা সংক্ষেপে বলে নিয়ে একটু বাদেই আবার আমরা ফিরে আসব মেদিনীপুরের মাটিতে।

ইতিমধ্যে ঢাকার কমিশনার মিঃ এ. ক্যাসেল ঘায়েল হয়েছেন ২১শে আগস্ট, টাঙ্গাইল শহরের সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ কার্যালয়ে। বিচারে ললিত রাহার সাজা হল মোট পাঁচ বছর।

বিস্ময়ের চমক নিয়ে অবশেষে এল সেই স্মরণীয় ১৪ই ডিসেম্বর।

শোনা গেল কুমিল্লার জেলা-শাসক মিঃ ষ্টিভেন্স নিহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে যাঁরা ধরা পড়েছেন, তাঁরা ছেলে নন, মেয়ে। ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, শান্তিসুধা ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরী।

পরদিনই সে খবর বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়।

কুমিল্লাতে বাঙালী রমণীর রিভলবারের গুলীতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খুন

'প্রকাশ, অদ্য প্রাতে আন্দাজ ৯টার সময় দুইটি বালিকা মিঃ ষ্টিভেন্সের বাংলোতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল।

তাহারাই রিভলবার দ্বারা গুলী করিয়া মিঃ ষ্টিভেন্সকে হত্যা করিয়াছে।

ঘটনার সময় সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন। তিনিই উক্ত দুই বালিকাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করেন। ইহাদিগকে জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, মিঃ ষ্টিভেন্সের আততায়ী বলিয়া ধৃত বালিকা দুইটির নাম—কুমারী শান্তি ঘোষ ও কুমারী সুনীতি চৌধুরী। ইহারা উভয়েই কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের ৮ম মান শ্রেণীর ছাত্রী।'

[আনন্দবাজার : ১৫-১২-৩১]

খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল সারা দেশ। বলে কি! এ যে শুনেও গা-হাত-পা কাঁপে। ওঁদের কি ভয়-ডর বলেও কিছু নেই!

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের মতো কুমিল্লাও সেদিন পিছিয়ে ছিল না। বিপ্লবী নেতা ললিত মোহন বর্মনের নেতৃত্বে সেখানেও গড়ে উঠেছিল একটি শক্তিশালী বৈপ্লবিক সংস্থা, অগ্নিযুগের ইতিহাসে যার ভূমিকা মোটেই তুচ্ছ ছিল না।

শহীদ অসিত ভট্টাচার্য, প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম, ঊর্মিলা গুহ, শান্তি সেন, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, অখিল নন্দী, চিত্ত দত্ত, হেমেন্দ্র ভট্টাচার্য, সত্যব্রত সেন, সুধীর ব্রহ্ম, কানুপ্রিয় দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন দেব, নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য, ননী মজুমদার, অনিল রায় বর্মন, সুরেন্দ্র দাস, সুধাংশু ভট্টাচার্য, অমূল্যকাঞ্চন দত্ত, ভুবন বর্ধন, সুবোধ মুখার্জী, চন্দ্রশেখর সরকার, লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, সুবোধ রায়, বঙ্কিম চক্রবর্তী, বিরাজ দেব, সতীশ রায়, বিনয় দত্ত, সুনীল বর্মন, রথীন্দ্র চৌধুরী, জিতেন্দ্র ভদ্র, সুকুমার চৌধুরী, নৃপেন সেনগুপ্ত, অপূর্বকাঞ্চন দত্ত, জিতেন ঘোষ, রবীন্দ্র গোস্বামী, মণীন্দ্র রায় চৌধুরী, বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত, হীরালাল দেবগুপ্ত, বিমল তলাপাত্র, নিমাই দাস, সুকুমার মুখার্জী, সমরেন্দ্র পাল, মোহিনী ব্যানার্জী, ধীরেন চক্রবর্তী, গোপাল

মজুমদার, হাবুল ব্যানার্জী, শৈলেন চ্যাটার্জী, মণি বিশ্বাস, প্রবোধ চক্রবর্তী, ইন্দু ভট্টাচার্য, ননী রায়, সতীশ রায় প্রমুখ সংস্থার সদস্যদের অবদানও তার পেছনে কম ছিল না।

বৈপ্লবিক সংস্থা বি. ভি.-র সঙ্গে কুমিল্লার এই দলের সম্পর্ক ছিল খুবই প্রীতিপূর্ণ। সবসময়েই তাঁরা যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন বি. ভি.-র অ্যাকশন স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য প্রখ্যাত বিপ্লবী সুপতি রায়ের সঙ্গে।

এসব ব্যাপারে সচরাচর যা হয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। শুরু হল ব্যাপক ধর-পাকড়। অনেককেই গ্রেপ্তার করা হল একে একে। গ্রেপ্তার হলেন সুনীতির দাদা শিশির চৌধুরী। গ্রেপ্তার হলেন অপূর্বকাঞ্চন দত্তরায়, বিভূতি বসু, শিশির সোম, অনন্ত দে, সন্তোষ চ্যাটার্জী প্রমুখ অনেকেই।

গ্রেপ্তার হলেন ভুবন বর্ধন। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। পরীক্ষা চলছে। তবু রেহাই নেই। পরীক্ষার হল থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে ঢোকানো হল লৌহ-কারার অন্তরালে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হল ফণীন্দ্র গুহ, বিনয় নন্দী, সমরেন্দ্র নন্দী, অমরেন্দ্র পাল প্রমুখ আরো কয়েকজনকে।

মেয়েদের মধ্যে ধরা পড়লেন চট্টগ্রামের অনন্ত সিংহের দিদি কুমারী ইন্দুমতী সিংহ ও কুমারী নীলিমা নন্দী। আর ধরা পড়লেন কুমারী প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম।

অদ্ভুত নিরলস কর্মী ছিলেন এই প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম। বিশেষ করে, কুমিল্লার নারী সংগঠনের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে 'বিপ্লবী ললিত মোহন বর্মন' গ্রন্থ থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি মল্লিকা। এই লাইন ক'টি থেকেই তুমি বুঝতে পারবে যে, কুমিল্লার ওপর দিয়ে কি উন্মত্ত ঝড় সেদিন বয়ে গিয়েছিল স্টিভেন্স-হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

'...শান্তি ঘোষ ও স্থনীতি চৌধুরী গ্রেপ্তার হইলেন—সরকারী চণ্ডনীতি এবার ক্ষিপ্তভাবে নির্যাতনের মুষল চালাইল। দলের প্রতিটি কর্মীর বাড়ি খানাতল্লাশ হইল—পরিচিত প্রায় প্রতিটি পরিবারের উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু হইল।

স্থনীতির পরিবারের উপর, তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতার উপর অকথ্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল। পুলিস ব্রাহ্মণবাড়িয়া চিত্তরঞ্জন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বড় বড় ঘরগুলি হাতী দিয়া ভাঙিল ও ললিতবাবুর দীর্ঘদিনের চেষ্টায় গঠিত ও কষ্টে সংগৃহীত মস্ত লাইব্রেরীর সমুদয় বই. স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিল।'

বিস্ময় চরমে উঠল যখন শান্তি ও স্থনীতিকে আদালতে নিয়ে আসা হল।

কি আশ্চর্য! এ যে একেবারেই বালিকা! ওরা মেরেছে সাহেবটাকে! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত।

যাঁদের নিয়ে এত কাণ্ড, তাঁরা কিন্তু তখন অন্য জগতে। গানে-গল্পে-হাসিতে-উচ্ছ্বাসে বলতে গেলে গোটা আদালতটাকেই বুঝি তাঁরা মাথায় করে তুলেছেন।

বাচ্চা হলে কি হবে, যাকে বলে একেবারে বিচ্ছু মেয়ে।

একদিন কি করলেন জানো! বসতে চেয়ার দেওয়া হয়নি বলে সেদিন সে কি কাণ্ড ওঁদের! চেয়ার দেবে না! দাঁড়াও, মজাটা দেখাচ্ছি।

সত্যিই ওঁরা মজা দেখালেন মল্লিকা। কোর্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত সর্বক্ষণ সেদিন ওঁরা হাকিমের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলেন দেয়ালের দিকে মুখ করে। অর্থাৎ—হয় চেয়ার দাও, নয়তো দেখতে হয় তো আমাদের পেছন দেখ।

লাল মুখ আরো লাল হয়ে উঠল হাকিমসাহেবের। গেল, মান-ইজ্জৎ সব গেল এই বিচ্ছু মেয়েদের পাল্লায় পড়ে। সিপাই, জলদি চেয়ার দাও।

সবচাইতে মজা হল যখন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে এস. ডি. ও. নেপাল সেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন।

প্রশ্নের উত্তরে কি একটা কথা বলেছেন কি ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে দুজনে সমস্বরে কোরাস তুললেন—গ্রেট লায়ার! গ্রেট লায়ার! গ্রেট লায়ার!

ব্যস্, হয়ে গেল। তারপর যতবার তিনি মুখ খুলতে চেয়েছেন, ততবার সেই একই কথা—গ্রেট লায়ার! গ্রেট লায়ার! গ্রেট লায়ার!

উচ্ছল প্রাণবন্ত মেয়ে। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। সেদিন ওঁদের এই হাসি দেখে বিপক্ষের আইনজীবিদেরও বুঝি বিস্ময়ের আর সীমা-পরিসীমা ছিল না। অজ্ঞাতেই বুঝি মনটা কখন ব্যথায় ভরে উঠেছিল কানায় কানায়। আহা, একেবারেই বালিকা। অদৃষ্টে কি অপেক্ষা করে আছে কে জানে? ওদের এই হাসি যেন কোনদিনই মিলিয়ে না যায়!

তবু গিয়েছিল। কোন্ দিন জানো মল্লিকা?

যেদিন তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হল। সে কি দুঃখ! সে কি অভিমান! বড় সাধ ছিল দিব্যি হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়িটা নিজের হাতে গলায় তুলে নেবে, আর এই সাহেবটা কিনা শত্রুতা করে মাঝ থেকে সব পণ্ড করে দিল! দূর ছাই! ভাল লাগে না বাপু!

ঐ এক মুহূর্ত। তারপরই আবার সেই হাসি। হাসতে হাসতেই দুজনে গিয়ে উঠলেন জেলের কয়েদী-গাড়িতে। সেখানেও হাসি। এমন কি, পরবর্তীকালে জেল-জীবনেও তাঁদের সেই হাসি মিলিয়ে যায়নি কোনদিনও।

গল্প নয় মল্লিকা। প্রমাণ, তখনকার দিনের সংবাদপত্র। সেদিনের ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কি লেখা রয়েছে শোন।

শান্তি ও সুনীতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

'গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্টিভেন্স তাঁহার নিজ বাংলোয় পিস্তলের গুলীতে নিহত হন। পুলিস এই সম্পর্কে শান্তিসুধা ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী নাম্নী দুইটি বালিকাকে গ্রেপ্তার করে। উহারা উভয়েই স্থানীয় ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী।

উহাদের বিচারের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ পিয়ার্সন, বিচারপতি পি. মল্লিক এবং বিচারপতি মিঃ এস. কে. ঘোষকে লইয়া একটি বিশেষ আদালত গঠিত হয়। গতকল্য বুধবার বিশেষ আদালত এই মামলার রায় প্রদান করেন। বিচারে শান্তি ও সুনীতি উভয়েই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিতা হন।

বিচারকগণ আসামীদ্বয়কে স্বেচ্ছায় ও মিলিতভাবে মিঃ স্টিভেন্সকে হত্যা করিবার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

আদালতে বালিকাদ্বয়ের প্রবেশ

শান্তি ও সুনীতি লাল পাড় শাড়ি ও অনুরূপ রঙের জ্যাকেট পরিয়া এবং হাতে ফুল লইয়া কাঠগড়ায় প্রবেশ করে। তাহারা শান্ত-ভাবে দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করে।

কাঠগড়া হইতে লইয়া যাইবার কালে তাহারা অনুচ্চ কণ্ঠে কিছু বলিতেছে বলিয়া মনে হইল এবং এইরূপ বলিতে শোনা গেল যে, 'মৃত্যুই ভাল ছিল'—অবশিষ্টাংশ শ্রুতিগোচর হইল না।

এরূপ প্রকাশ যে, নিচের তলায় বন্দী-গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিবার সময় তাহারা গান গাহিতেছিল।...' [আনন্দবাজার : ২৮-১-৩২]

মল্লিকা, এই হল সেদিনের শান্তি আর সুনীতি। আর আজ! পথ-ঘাটে কত মেয়ে আজ দেখা যায়, কিন্তু কোথায় শান্তি-সুনীতির

মতো অমন উচ্ছল, প্রাণবন্ত, দুঃসাহসী মেয়ে! কোথায় সেই প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর বিপুল নারীসত্বা! একালে শান্তি-সুনীতির মতো মেয়েরা ইতিহাসের কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। এবার বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন বাংলাদেশের দুটি আশ্চর্য নারী, বীণা দাস আর কমলা দাশগুপ্তা। একজন প্রকাশ্যে, অন্যজন নেপথ্যে।

ঘটনাটা যেমন অভাবনীয়, তেমনি অকল্পনীয়। অগ্নিযুগের ইতিহাসে এমন নজীর সত্যিই দুর্লভ। কারণ, ইতিপূর্বে যখন যা কিছু ঘটেছে, তার সব কিছুরই মূলে ছিল পার্টি বা দলীয় নির্দেশ। এক্ষেত্রে সে প্রশ্ন ছিল গৌণ। প্রধান লক্ষ্য ছিল—সুযোগের সদ্ব্যবহার করা।

বীণা দাস তখন স্থির, দৃঢ়সঙ্কল্প। গভর্ণর স্ট্যানলী জ্যাকসনকে হাতের মুঠোয় পাওয়া গেছে। এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না।

কিন্তু রিভলবার! একটা গুলী-ভরা রিভলবার চাই যে!

অবশ্য দিদি কল্যাণী দাস বাইরে থাকলে ভাবনা ছিল না। কিন্তু তিনিও তখন রয়েছেন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। এ অবস্থায় কোথায় পাওয়া যাবে এখন রিভলবার! কার কাছে!

শেষপর্যন্ত ধরে বসলেন দিদির বন্ধু কমলা দাশগুপ্তাকে। সেই কমলা দাশগুপ্তা—ডালহৌসী স্কোয়ারের বোমা ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে যাঁর সহযোগিতার কথা আগেই তোমাকে বলেছি।

চট করে কোন জবাব দিতে পারলেন না কমলা দাশগুপ্তা। দেওয়া সম্ভবও ছিল না। নিজে তিনি যুগান্তর পার্টির বিশিষ্টা সভ্যা। কিন্তু বীণা দাস অন্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। তাঁকে তিনি রিভলবার দেবেন কিসের দাবীতে! কোন্ যুক্তিতে!

তবে কি এমন অপূর্ব সুযোগটা হাত ফসকে চলে যাবে! তাই বা কি করে হয়!

ভাবনার পর ভাবনা। কি করা যায় এখন!

আগে হলে কথা ছিল না, কিন্তু এখন দলের প্রতিটি সহকর্মী রয়েছেন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। কেউ বাইরে নেই। এমন কি, এ ব্যাপারে কারো সঙ্গে একটু বুদ্ধি-পরামর্শ করার মতো পর্যন্ত কেউ অবশিষ্ট নেই। সিদ্ধান্ত যা করার নিজেকেই করতে হবে। এমন সিদ্ধান্ত করতে হবে, যাতে দলীয় সম্মান বা ঐতিহ্য যেন কোনদিক থেকেই এতটুকু ব্যাহত না হয়।

ভাবতে ভাবতে এক সময়ে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন কমলা দাশগুপ্তা।

আচ্ছা, ভূপেনবাবু (দত্ত) এ সময় কাছে থাকলে কি করতেন?

কি সিদ্ধান্ত নিতেন সহপাঠী-বন্ধু ও গুরু দীনেশ মজুমদার?

রসিকবাবু (দাস) বা মনাদা (মনোরঞ্জন গুপ্ত)-ই বা কি বলতেন বীণার এই আবেদনের উত্তরে?

প্রশ্নের জবাব মিলল ১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি।

সিনেট হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। চ্যান্সেলার গভর্ণর স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন।

হঠাৎ আসন ছেড়ে রুদ্রমূর্তিতে উঠে দাঁড়ালেন বীণা দাস। তারপরই তাঁর হাতের রিভলবার সশব্দে গর্জে উঠল—গ্রাম! গ্রাম! গ্রাম!

ত্বরিতে টেবিলের নিচে আত্মগোপন করলেন লাটবাহাদুর। আরে বাস রে বাস! আগুনে মেয়ের হাতে আগুনে রিভলবার! ঐ রিভলবারের সামনে লাটসাহেবের লাটে উঠতে কতক্ষণ!

সংবাদপত্র থেকেই তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি।

কলিকাতা বিশ্ব বদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় বাঙ্গলার লাটের উপর গুলী

'গতকল্য শনিবার দিন অপরাহ্নে সিনেট হাউসে এক বিষমকাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। ৪॥ ঘটিকার সময় বাঙ্গলার গভর্ণর বাহাদুর যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক কনভোকেশন সভায় বক্তৃতা

করিতেছিলেন, সেই সময় ডায়োসেশান কলেজের বীণা দাস নাম্নী মহিলা গ্র্যাজুয়েট গভর্ণরকে বিষমভাবে আক্রমণ করে। গভর্ণর দৈবক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছেন। একথা জানিতে পারিয়া তত্রত্য জনতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।...

ঘটনার পূর্বের অবস্থা

৩-১৫ মিনিট হইতে কনভোকেশনের কার্য যথারীতি আরম্ভ হইয়া ৪-২৫ মিনিট পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই চলে। সেই সময় একজন ভারতীয় মহিলা গ্র্যাজুয়েটের একাডেমিক গাউনের খস্‌খস্‌ শব্দ শুনিতে পাইয়া সকলেরই দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হয়। ঐ গ্র্যাজুয়েট যুবতী একটু অগ্রসর হইয়া আসে এবং মুহূর্তের মধ্যে পর পর ৪টি গুলী গভর্ণরকে লক্ষ্য করিয়া করে।

গভর্ণর বাহাদুর কয়েক পা পিছাইয়া সৌভাগ্যক্রমে ডানদিকে কাত হইয়া পড়িয়া যান। সেই সময় সমগ্র জনতার মধ্যে একটা বিষম উদ্বেগের ভাব প্রকাশ পায়।

ধোঁয়ার মধ্যেই পুলিস কর্মচারীগণ ঐ যুবতীর দিকে দৌড়াইয়া যায় এবং তাহাকে ধরিয়া ফেলে। ভাইস-চ্যান্সেলার ও মঞ্চস্থিত অন্যান্য সমস্ত লোকই গভর্ণরের দিকে দৌড়াইয়া যান এবং পাঁচ মিনিটের জন্য সভায় একটা বিষম চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল।

ঘটনার পর

লেডী জ্যাকসন মঞ্চের নিম্নে প্রথম সারিতেই বসিয়াছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া গভর্ণরের নিকট দৌড়াইয়া যান। ইতিমধ্যেই পুলিস ঐ যুবতীকে একটু ধস্তাধস্তির পর গ্রেপ্তার করে।......’ [আনন্দবাজার : ৭-২-৩২]

জ্যাকসনের তৎপরতায় লক্ষ্যভ্রষ্টা হলেন বীণা দাস। ধরাও পড়লেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তারপর শুরু হল সেই চিরাচরিত

একঘেয়ে নাটক। বল, রিভলবার কোথায় পেলে? কে দিয়েছে তোমাকে? বলতেই হবে।

কে জবাব দেবে! পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার জন্য যে মেয়ে নিজের জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া তুচ্ছজ্ঞান করে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিতে পারেন, তাঁকে তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা এত সহজ নয়। তাই শান্তি-সুনীতির মতো তিনিও নিরুত্তর রইলেন সর্বক্ষণ।

পুলিসও সহজ পাত্র নয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা এনে হাজির করল পিতা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, স্বয়ং সুভাষের শিক্ষাগুরু আচার্য বেণীমাধব দাসকে। অর্থাৎ—তিনি একবার বুঝিয়ে বলুন মেয়েকে। বাপের কথায় মেয়ে যদি মুখ খোলে তো ঝঞ্ঝাট চুকে যায়।

বীণা দাস তখন কি উত্তর দিয়েছিলেন জানো! পুলিস অফিসারকে লক্ষ্য করে হেসে বলেছিলেন—'কেন শুধু শুধু বাবাকে এখানে নিয়ে এসেছেন বলুন তো! আমার বাবা কোনদিনও তাঁর মেয়েকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শেখাননি।'

বিচারকালে বীণা দাসের মুখ থেকে একটি বিবৃতি শুনে হৈ-চৈ পড়ে গেল সারা ভারতে। সারা ইংল্যাণ্ডে। এ তো শুধুমাত্র একটি বিবৃতি নয়, এ যে ক্লাসিক লিটারেচার! ভারতবর্ষের মর্মবাণী।

'Just see, does't she look like Madonna !'

স্পষ্ট ও দৃঢ়স্বরে বীণা দাসকে বিবৃতি পাঠ করতে দেখে সেদিন আদালত-গৃহে কে এই উক্তি করেছিলেন জানো মল্লিকা!

তিনি হলেন ডায়োসেশান কলেজের সিস্টার ডরোথি। কি ভালই না তিনি বাসতেন তাঁর প্রিয় ছাত্রী বীণা দাসকে। ঘটনার খবর শুনে সেদিনই তিনি জেলখানায় গিয়ে বীণা দাসের সঙ্গে দেখা করে ভেঙে পড়েছিলেন গভীর উদ্বেগে।

'Bina dear, I love you so much ! How could you do it ?'

উত্তর দিয়েছিলেন বীণা দাস :

'Sister, I love you no less, but I love my country more.'

এবার বীণা দাসের সেই বিবৃতি থেকে কিছু কিছু অংশ তোমাকে শোনাচ্ছি মল্লিকা।

'I confess I fired at the Governor on the last convocation day, at the Senate House. I hold myself entirely responsible for it. My object was to die, and if to die, to die nobly fighting against this despotic system of Government, which has kept 300 millions people of my country in perpetual subjection, to its infinite shame and endless suffering,—and fighting in a way which cannot but tell !

I had been thinking—is life worth living in a miserable India, subject to wrong and groaning under the tyranny of a foreign Government—or is it not better to make one Supreme Protest against it, by offering one's life away ?

Would not the immolation of a daughter of India and of a son of England, awaken India to the sin of its acquiessances to the cotinued state of subjection and England to the inequities of its proceedings ? This was one question which kept thundering at the gates of my frenzied brain, like the incessant hammer-blow, that could neither be stilled nor muffled !

* * *

Now I stand alone before the Judgment seat of God and open myself before Him and pray for this

all-forgiving love to wash me clean, that I may be a worthy offering to Him.

May I see the benignant countenance of the Mother Divine and feel Her loving embrace for me,—even for me, at this the most solemn moment of my life, if it be Her will that I should die. If She however, out of Her infinite mercy spares it to be used by Her as Her instrument, may I consecrate my life to the service of suffering humanity, which was the deepest longing of my heart. May God fulfil Himself through my death—or life, it so pleases Him'.

সারারাত জেগে দীর্ঘ পঁচিশ পৃষ্ঠাব্যাপী এই বিবৃতিটি সেদিন কে দিয়েছিলেন জানো মল্লিকা! বেণীমাধব দাস। বীণা দাসের পিতা, স্বয়ং সুভাষচন্দ্রের শিক্ষাগুরু আচার্য বেণীমাধব দাস। বীণা দাস দু-এক জায়গা সামান্য অদল-বদল করে দিয়েছিলেন মাত্র।

রায় দেওয়া হল ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ই তারিখে। সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ তুমি শোন।

গভর্ণরকে হত্যা চেষ্টার মামলা
বীণা দাসের ৯ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড

'গতকল্য সোমবার কলিকাতা হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবিউনালে কুমারী বীণা দাসকে বাঙ্গলার লাটের প্রাণনাশের চেষ্টা সম্পর্কে অভিযুক্ত করা হয়। অভিযোগের উত্তরে আসামী নিজেকে দোষী বলেন। ট্রাইবিউনাল তাঁহাকে নয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। গত ৬ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশনে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

আদালতে বীণা দাস

আসামী বীণা দাস জাফরাণী রঙের খদ্দরের শাড়ি পরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে বসিবার জন্য চেয়ার দেওয়া হইয়াছিল। তিনি শান্তভাবে দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।' [আনন্দবাজার : ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২]

আদালতের বিচারে ন' বছরের দণ্ড মাথায় নিয়ে শেষপর্যন্ত বীণা দাসও একদিন হাসতে হাসতে চলে গেলেন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। পেছনে পড়ে রইল অগণিত দেশবাসীর মুগ্ধ, বিস্মিত, সগর্ব অভিনন্দন। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। এতকাল তাঁরা শুধু গোপন-সহযোগিতা দ্বারাই বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। এবার কঠিন, কঠোর, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে প্রকাশ্যেই উপযুক্ত ভূমিকা নিতে শুরু করেছেন। সাবাস বাংলার মেয়ে, হাজার অভিনন্দন তোমাদের!

বলা বাহুল্য যে, কমলা দাশগুপ্তাকেও রেহাই দেওয়া হল না। প্রত্যক্ষ মামলায় জড়াতে না পেরে শেষপর্যন্ত তাঁকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হল বছরের পর বছর ধরে। যা ডেঞ্জারাস মেয়ে! ওঁদের আর বিশ্বাস নেই। কখন কি করে বসবে ঠিক কি!

ডেঞ্জারাস মেয়ে!

কথাটা অত্যুক্তি নয় মল্লিকা। সেদিন পুলিসের খাতায় এই নামেই চিহ্নিত হয়েছিলেন কমলা দাশগুপ্তার মতো মেয়েরা।

আর আজ! নিজেকেই প্রশ্ন কর মল্লিকা। প্রশ্ন কর যে, পরাধীন দেশের তিন দশকের মেয়েরা শিক্ষা, দীক্ষা, ত্যাগ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ইতিহাসে যে উল্লেখযোগ্য নজীর রেখেছিলেন, আজ স্বাধীন দেশের মেয়েদের মধ্যে তার ছিটে-ফোঁটাও কোথাও দেখা যায় কি?

তবে এজন্য কাউকেই খুব একটা দায়ী করা চলে না মল্লিকা। দায়ী দেশের বর্তমান পরিস্থিতি।

জীবন আজ দুর্বহ। প্রাণ-ধারণের গ্লানি অসহ্য। প্রাত্যহিক এই কঠিন, কঠোর, নির্মম জীবনযাত্রার মধ্যে মানুষের ন্যায়, নীতি, নিষ্ঠা, আদর্শ ইত্যাদি সুকোমল বৃত্তিগুলি ব্যর্থ হতে বাধ্য। কোথাও পথ না পেয়ে গড্ডলিকা-প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি-ই বা করণীয় আছে আজকের মানুষের!

আবার মেদিনীপুর। আবার সেই বি. ভি.।

আর. কে. ডগলাস, এবার তোমার পালা। পেডির পরে তুমিই এসেছ এখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে।

কিন্তু কেন? তুমি তো জান যে, মেদিনীপুরে কোন শ্বেতাঙ্গ শাসককেই আমরা বরদাস্ত করতে রাজী নই!

তাহলে কেন এসেছ? এর প্রতিফল তোমাকে পেতেই হবে।

তাছাড়া গুরুতর অপরাধে অপরাধী তুমি। হিজলী-হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে যে তদন্ত-কমিশন বসেছিল, তুমিই সেখানে নাক গলিয়ে সত্যিকার অপরাধীদের আড়াল করে রেখেছ কতগুলো বাজে মন-গড়া যুক্তির অবতারণা করে। সুতরাং তোমার ক্ষমা নেই। রক্তের ঋণ তোমাকে রক্ত দিয়েই শোধ করতে হবে।

ভয়ে-ত্রাসে শ্বেতাঙ্গ সমাজ সেদিন অস্থির। পাঠান ও গুর্খা সৈন্য সহ কাঁটাতার বেষ্টিত কোয়ার্টারে বাস করেও শান্তি নেই। শুধু ভয়। শুধু আতঙ্ক। এই বুঝি কিছু একটা ঘটে গেল!

বিশেষ করে এপ্রিল মাস এলে তো কথাই নেই। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সালে। পরের বছর ৭ই এপ্রিল নিহত হয়েছেন মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেমস্ পেডি। আবার বছর ঘুরে সেই অলুক্ষুণে এপ্রিল এসেছে। কি হবে কে জানে!

শ্বেতাঙ্গ জননীদের সবার মুখে সেদিন শোনা যেত সেই একই গান। দুষ্টু ছেলেকে শান্ত করতে গিয়ে অজ্ঞাতেই বুঝি তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসত এক আতঙ্কবিহ্বল ঘুম-পাড়ানি সঙ্গীত:

'Baby, sleep on, another April is coming!'

আশঙ্কা ওদের অমূলক নয় মল্লিকা। এবারও অঘটন ঘটল সেই এপ্রিলেই।

১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল।

সন্ধ্যা তখন প্রায় হয়-হয়। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অফিসে সভার কাজ চলছে। সভাপতি স্বয়ং ডগলাস।

চারদিকে অসংখ্য সশস্ত্র প্রহরী। তাদের সতর্ক চোখ এড়িয়ে এক পা-ও কাছে এগুবার উপায় নেই।

তাছাড়া ডগলাসের নিজের হাতেই ধরা রয়েছে গুলী-ভরা উদ্যত রিভলবার। মেদিনীপুরকে বিশ্বাস নেই। ওরা সব পারে। সুতরাং হুঁশিয়ার থাকা ভাল।

সব বৃথা। মৃত্যু যার শিয়রে এসে হানা দিয়েছে, কে তার গতিরোধ করবে!

সহসা দুই দুর্ধর্ষ তরুণ, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য আর প্রভাংশু পাল কোথা থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গুলী-ভরা রিভলবার হাতে নিয়ে। তারপরই শুরু হল একটানা রিভলবার গর্জন—ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

সঙ্গে সঙ্গে ডগলাস হুমড়ি খেয়ে এলিয়ে পড়লেন টেবিলের ওপর। তারপর গড়িয়ে একেবারে মাটিতে।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল উপস্থিত প্রতিটি লোক। বুঝি এক মুহূর্তের ব্যাপার, তারপরই সবাই একযোগে হৈ-হৈ করে উঠল—ধর, ধর, ঐ যে পালাচ্ছে ওরা।

ছুট—ছুট—ছুট! কাজ শেষ। এবার ছুটে চল। আরো জোরে। আরো!

পেছনে ছুটে আসছে হিংস্র শিকারীর দল। ছুটে আসছে

তমলুকের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জর্জ, ঝাড়গ্রামের নৃপেন মিত্র প্রমুখ রাজভক্তের দল। হাতে তাদের উদ্যত রিভলবার। ঐ যে যাচ্ছে। জোরসে পা চালাও। ধরতেই হবে ওদের।

ধরবে! ঠিক আছে, কাম অন্! নতুন করে রিভলবারে গুলী ভরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগারে টান দিলেন প্রভাংশু—ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

তারপরই হঠাৎ এক সময়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন 'অমর লজ'-এর পাশের রাস্তা ধরে। কেউ তাঁর কোন হদিসই পেল না।

প্রদ্যোৎ ছুটে চললেন সদর রাস্তা ছেড়ে দক্ষিণ দিকে। পেছনে সেই রাজভক্তবৃন্দ ও দেহরক্ষীর দল।

দূরত্বের ব্যবধান কমে আসছে ক্রমশঃ। আরো কাছে এসে পড়েছে ওরা। অনেকটা কাছে। আর বেশি বাকি নেই।

সহসা ঘুরে দাঁড়ালেন প্রদ্যোৎ। তারপরই ট্রিগারে চাপ দিলেন দেহের সমস্ত শক্তিকে হাতে জড় করে এনে।

কিন্তু একি! গুলী তো ছুটল না! আবার চাপ দিলেন, কিন্তু ফল দাঁড়াল সেই একই।

কি ব্যাপার! তবে কি কোন যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিল রিভলবারে! নইলে এমন তো হবার কথা নয়!

বলা বাহুল্য যে, সঙ্গে সঙ্গেই প্রদ্যোৎ ধরা পড়লেন ইংরেজের সেই খয়ের খাঁ-বৃন্দ ও রক্ষীদলের হাতে।

ধরা পড়ার পর প্রদ্যোতের পকেটে কি পাওয়া গিয়েছিল জানো? পাওয়া গিয়েছিল ছোট্ট একটি চিরকুট। তাতে রক্তের অক্ষরে লেখা ছিল—'হিজলী অত্যাচারের ক্ষীণ প্রতিবাদ।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্দীবীরকে নিয়ে থানায় গিয়ে ঢুকল বীর প্রহরীবৃন্দ। চোখে-মুখে তাদের বিজয়ীর উল্লাস। একজন অবশ্য হাত ফস্‌কে পালিয়ে গেছে, তা যাক গে! যা পাওয়া গেছে তাই বা মন্দ কি!

প্রদ্যোৎ নির্বিকার। থানায় ঢুকেই তিনি দারোগাকে লক্ষ্য করে কি বললেন, শুনবে? বললেন—বড্ড গরম লাগছে স্যার। একটু চান করব। কাইগুলি একটু ব্যবস্থা করে দিন।

কড়া পাহারায় স্নান করে ফিরে এসেই আবার তিনি বললেন—এবার আমি একটু ঘুমোব। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। দেখবেন, কেউ যেন আমাকে ডিসটার্ব না করে।

দেখতে দেখতে থানায় এসে ভিড় করলেন বড় বড় সব পুলিস অফিসারবৃন্দ। মুখে তাঁদের বড় বড় সব বুলি। ডাকো আসামীকে। জেরা করে সব কথা বের করতে হবে।

কোথায় আসামী! দিব্যি তিনি তখন ঘুমে অচেতন। সারা মুখে তাঁর নিরুদ্বেগ জীবনের স্বপ্ন প্রশান্তি। দেখে কে বলবে যে, এই ঘুমন্ত কিশোরই এতবড় একটা কাণ্ডের অধিনায়ক! বিশ্বাস করাও যেন শক্ত!

—বল, তোমার সঙ্গে আর কে ছিল? যথাসময়ে প্রশ্ন করা হল প্রদ্যোৎকে।

—প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। জবাব দিলেন প্রদ্যোৎ, হাজার প্রশ্ন করলেও যে এ সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে কোনরকম সদুত্তর পাবেন না, সে তো ভাল করেই জানেন।

—বলবে না তুমি সঙ্গীর নাম?

—না। ছোট্ট করে জবাব দিলেন প্রদ্যোৎ।

—এর পরিণাম কি জানো? গর্জে উঠলেন শ্বেতাঙ্গ অফিসারগণ।

—জানি। একঝলক প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল প্রদ্যোতের সারা মুখে—নির্যাতন করবেন, এই তো? করুন! যত নির্যাতন করবেন ততই দেশবাসী জেগে উঠবে। বুঝতে পারবে যে, এই হল ইংরেজ-শাসকদের আসল রূপ।

অবাক বিস্ময়ে শ্বেতাঙ্গ অফিসারবৃন্দ তাকিয়ে রইলেন বড় বড় নীল চোখ মেলে। কি নির্ভীক উক্তি! শাসকদের মুখের ওপর

এমন নির্ভীক উক্তি করতে এদেশের ক'জন লোক পারে! এ যে অদ্ভুত ছেলে!

সত্যিই অদ্ভুত ছেলে, মল্লিকা! যেমন সুস্থ-সবল মিষ্টি চেহারা, তেমনি আচার, ব্যবহার ও কথাবার্তা। তাছাড়া অত্যন্ত মেধাবী ছেলে। মাত্র কিছুদিন আগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন হিন্দু স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়ে।

শুধু কি স্কুল-কলেজের পড়া! ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শন, অর্থনীতি, কিছুই বুঝি বাদ নেই। শুধু পড়া আর পড়া। রাতদিন পড়া। নাড়াজোল রাজ পুস্তকাগারের কোন বই-ই বুঝি আর বাকি নেই তাঁর।

দীনেশ গুপ্তের শিক্ষাধীনে এরই ফাঁকে ফাঁকে আবার আয়ত্ত করেছেন লাঠি, ছোরা, যুযুৎসু, কুস্তি ইত্যাদি সব কিছু। এককথায় যাকে বলে চোখ-জুড়ানো, সোনার টুকরো ছেলে। মেদিনীপুরের নয়নমণি।

শুধু প্রদ্যোৎ নন মল্লিকা। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেদিন এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে যাঁরা দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন এমনি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর দল।

বিনয়, দীনেশ, প্রীতিলতা, কল্পনা, কল্যাণী, বীণা দাস, কমলা দাশগুপ্তা, দীনেশ মজুমদার, শান্তি, সুনীতি কেউ তার ব্যতিক্রম নন।

শুধু পড়া আর পড়া। পৃথিবীর ইতিহাসকে জানতে হবে। বুঝতে হবে। শিখতে হবে। সুতরাং পড়াশুনা সর্বাগ্রে দরকার।

শুধু স্কুল-কলেজে নয়, পরবর্তীকালে জেল-জীবনেও তাঁদের এই পড়াশুনার স্পৃহার এতটুকুও কমতি ছিল না। বন্দী-জীবনে নিয়মিত-ভাবে পড়াশুনা করে এমন অনেকেই সেদিন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষাগুলোতে।

আর আজ! নিজের মনকেই প্রশ্ন কর মল্লিকা। আশা করি তার উত্তর পেতে তোমার এতটুকুও দেরি হবে না।

যাক, আগেকার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ডগলাস নিহত হলেন ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩২ সাল। এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কি বলা হয়েছিল শোন।

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগলাস নিহত

'৩০শে এপ্রিল, অদ্য সন্ধ্যায় মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস যখন জেলাবোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিতেছিলেন তখন প্রায় তিনবার তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী নিক্ষিপ্ত হয়।

প্রকাশ যে, তাঁহার বাহুতে ও বক্ষস্থলে গুলী লাগিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ডগলাস সাহেব রাত্রি ৯৷৷০ টায় মারা গিয়াছেন।

এই সম্পর্কে রিভলবার-সহ একজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। [আনন্দবাজার : ১-৫-৩২]

সচরাচর যা হয় এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। শুরু হল অমানুষিক নির্যাতন। বল, কে ছিল তোমার সঙ্গে ? কি নাম তার ? আর কে কে রয়েছে তোমাদের দলে ? কোথায় পেলে এই রিভলবার ?

প্রদ্যোৎ নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। না, একটি কথাও নয়। এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলার নেই তাঁর।

—ছিঃ প্রদ্যোৎ! ঠাট্টা করে বললেন ভূপেন দারোগা, তোমার মতো বুদ্ধিমান ছেলে কি না এমন একটা রিভলবার নিয়ে এলে, যা কাজের বেলায় কোন সাড়াই দিল না!

প্রদ্যোৎ এর উত্তরে কি বলেছিলেন জানো মল্লিকা ? শৃঙ্খলিত হাত দুটি কপালে ছুঁইয়ে বলেছিলেন :

'Irony of fate Bhupen Babu! Had my revolver spoken out I would not have been here in this condition, the story would have been otherwise'. [অদৃষ্টের পরিহাস ভূপেনবাবু! আমার রিভলবার ঠিকমত সাড়া

দিলে কি আমাকে এ অবস্থায় এখানে দেখতে পেতেন! কাহিনী তাহলে অন্যরকম হত।]

এবার নিয়ে আসা হল প্রদ্যোতের দাদা শর্বরীভূষণকে। তারপর সেই অমানুষিক নির্যাতন। প্রহারে প্রহারে তিনি পাগল হয়ে গেলেন শেষপর্যন্ত। তবু রেহাই নেই। বলতেই হবে সব কথা। না জানলেও বলতে হবে।

প্রদ্যোতের বন্ধু ফণী দাস, ক্ষিতি সেন ও নরেন দাসকেও রেহাই দেওয়া হল না। নির্যাতনের যতরকম পন্থা আছে, একে একে সব কিছুই প্রয়োগ করা হল তাঁদের ওপর। ভাল চাও তো এখনো বল। নইলে দেখে নেব যে, তোমাদের মেদিনীপুর কত শক্তি ধরে!

সব বৃথা। সব নিষ্ফল। এত নির্যাতন, এত অপমান, তবু সব কিছুই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল বিপ্লবী চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তার কাছে।

শুরু হল সেই চিরাচরিত কূটনৈতিক চাল। আসামীকে তোমরা ধরিয়ে দাও। তোমাদের পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেব। চাই কি বেশিও দিতে পারি। কিন্তু ধরিয়ে দেওয়া চাই-ই।

কিছুতেই কিছু হল না। ফলে, প্রদ্যোতের সঙ্গী প্রভাংশু পালের নাম পুলিসের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

এবার বিচারের পালা। সচরাচর যা হয়, তাই হল। অর্থাৎ, প্রাণদণ্ড।

...সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি।

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের প্রাণদণ্ড

'অদ্য প্রাতে ডগলাস হত্যাকাণ্ডের মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে। নরহত্যার অপরাধে আসামী প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্যের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সে শান্তভাবে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করে।

[আনন্দবাজার: ২৫-৬-৩২]

বেঁকে বসলেন ট্রাইবুন্যালের অন্যতম বিচারপতি আই. সি. এস. জ্ঞানাঙ্কুর দে।

অসম্ভব! ফাঁসি হতে পারে না। আসামীর বয়েস কম। তাছাড়া সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা গিয়েছে যে, কার্যকালে তার রিভলবার অকেজো হয়ে পড়েছিল। গুলী করেছে অন্য লোক। এ অবস্থায় ফাঁসির হুকুম দেওয়া সংবিধান-বিরোধী।

জ্বলে উঠলেন শাসক-কুল। তুমি কে হে বাপু! সংবিধানে এ নিয়ম নেই তো ওটা একটু পালটে নাও। তা বলে এ হেন সিংহ-শাবককে হাতের মুঠিতে পেয়েও ছেড়ে দিতে হবে নাকি! ওসব চালাকি চলবে না।

অগত্যা হাইকোর্ট। হাকিম নড়ল তো হুকুম নড়ল না। ফাঁসির আদেশই বহাল রইল। দেখা গেল, অন্যান্য ক্ষেত্রে না হলেও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীদের ফাঁসি দেবার বেলায় সংবিধানের ধারাগুলোকে তেমন না মানলেও খুব একটা ক্ষতি নেই। মোট কথা, ছলে হোক, বলে হোক, ফাঁসি দেওয়া চাই-ই।

সেদিন শাসকদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করার মূল্য কিন্তু বিচারক জ্ঞানাঙ্কুর দে-কে বেশ ভাল করেই দিতে হয়েছিল মল্লিকা। তখনকার সময়ে এমন নির্ভীক ও সুদক্ষ বিচারক বাংলাদেশে খুব কমই ছিলেন। সে হিসেবে পরবর্তীকালে যে পর্যায়ে তাঁর পৌঁছনো উচিত ছিল, সেখানে আর কোনদিনই তিনি যেতে পারেননি। বিশ্বাস কি! ওঁর হাতে মামলা পড়লে এরপর হয়তো বেকসুর খালাসই দিয়ে বসবেন। সুতরাং চেপে দাও ওঁকে।

ওদিকে ফাঁসির আদেশ শুনেও এতটুকু ভাবান্তর দেখা গেল না প্রদ্যোতের। গুরু দীনেশের মতোই নির্জন কারাকক্ষে প্রহরগুলো তাঁর কাটতে লাগল নানাবিধ বই ও ধর্মগ্রন্থ পড়ে।

শুধু পড়া আর পড়া। গীতা আর রবীন্দ্রনাথ। দুদিন বাদে

পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে, তবু এই অবসরে যতটা জ্ঞানার্জন করে নিতে পারা যায়।

তবু মাঝে মাঝে মনটা উদাস হয়ে যায়। যায় বিধবা মায়ের কথা ভেবে। মা হয়তো কত ভাবছেন। মা যে তাঁর বড় শ্রদ্ধার, বড় আদরের, বড় আপনজন। মা-র মতো এমন কে আর আছে সংসারে!

মল্লিকা, শুধু প্রদ্যোৎ নন, মায়ের প্রতি এই অন্তহীন শ্রদ্ধার নিদর্শন সেদিন লক্ষ্য করা গিয়েছিল প্রতিটি বিপ্লবীর জীবনেই। বোধহয় দেশজননী, আর গর্ভধারিণী জননী সেদিন এক হয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল তাঁদের কাছে।

প্রদ্যোতের লেখা একটা চিঠি এখানে আমি তুলে দিচ্ছি মল্লিকা। বিপ্লব কি, কি তার সংজ্ঞা এই নিয়ে মাঠে-ময়দানে, এখানে-ওখানে কত বড় বড় কথাই না আজকাল শুনতে পাই।

কিন্তু আজ থেকে ছত্রিশ বছর আগে সেই কন্‌ডেম্‌ণ্ড সেল থেকে মৃত্যুপথযাত্রী প্রদ্যোৎ তাঁর মা পঙ্কজিনী দেবীকে গোপনে এই যে চিঠিখানি লিখে পাঠিয়েছিলেন, তার তুলনা কোথায় বলতে পার?

চিঠিটা তুমি মন দিয়ে পড়। একবার নয়, বার বার পড়। বুঝতে চেষ্টা কর। তারপর নিজেকে প্রশ্ন কর যে, বিপ্লবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে এমন সুনিশ্চিত বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে তুমি আর কোথাও পড়েছ কি? মনে রেখ, সেদিন তাঁর বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর। যাক, চিঠিটা তোমাকে শোনাচ্ছি।

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'

'মাগো,

আমি যে আজ মরণের পথে আমার যাত্রা শুরু করেছি তার জন্য কোন শোক করো না। আর আমার ভাইদের বলো যে, আমি আমার অসমাপ্ত কাজের ভেতর আমার হৃদয় রেখে গেলাম। আমার জন্যে দুদিন চোখের জল ফেলে ভুলে যাওয়ার চেয়ে আমার সেই অসমাপ্ত

কাজ সমাপ্ত করতে চেষ্টা করলে আমার ঢের বেশি তর্পণ করা হবে। এবং আমার আত্মাও তাতে বেশি পরিতৃপ্ত হবে।

আজ যদি কোন ব্যারামে আমায় মরতে হত, তবে কি আপসোসই না থাকত সকলের মনে! কিন্তু আজ একটা আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন করছি। তাতে আনন্দ আমার মনের কানায় কানায় ভরে উঠছে, মন খুশিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফাঁসির কাঠটা আমার কাছে ইংরেজের রসিকতা বলে মনে হচ্ছে। আমার এই অন্তরের কথাটা তোমারই অন্তরের প্রতিধ্বনি।

মা, তুমি কিন্তু আমার কাছে কাজের কোন কৈফিয়ৎ চাইতে পারবে না। তুমি হয়তো জান না, তোমরাই নিজের প্রয়োজনে আমাদের সৃষ্টি করেছ, কিন্তু তোমাকে আমি জানিয়ে যাচ্ছি, আমরা হাজার হাজার বছর ধরে তোমাদের—অর্থাৎ বাংলার মায়েদের মনে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সৃষ্টি হচ্ছিলাম। আজ ধীরে ধীরে আমরা আত্মপ্রকাশ করছি।

আর আমি চিরদিনই জানি যে, আমি বাঙালী আর তুমি বাংলা, একই পদার্থ, কোনদিন আলাদা করে ভেবে উঠতে পারিনি। তাই কোন বিপদাশঙ্কাই আজ আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি।

যুগ যুগ ধরে তুমি যে অপমান, লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করে এসেছ, মাটিতে মুখ থুবড়ে বোবা গরুর মতো মার খেয়েছ, তারই বিরুদ্ধে তোমার মনে যে বিদ্রোহের ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বয়ে যাচ্ছিল, সেই পুঞ্জীভূত বিদ্রোহ-ই আমি।

সেই বিপ্লব আজ যদি আত্মপ্রকাশ করে, তবে তার জন্য চোখের জল ফেলবে কেন?

আমার এই কথাটা খুব সত্য বলে জেনো। আর তোমায় যদি কেউ খুনীর মা বা ডাকাতের মা বলে অবজ্ঞায় পরিহাস করে, তবে নিজজ্ঞানে অন্তরের নিরুপম সৌন্দর্য বহন করে, নীরবে করুণ নেত্রে তার অজ্ঞতাকে ক্ষমা করো।

'মানুষকে আমরা খুন করি না, মানুষকে আমরা বাঁচাই।'

একথা বাংলাদেশে এখনো বোঝানো হয়নি। বাংলার বিপ্লবের ইতিহাস ক'দিনেরই বা! তাই আমাদের আদর্শ এখনো সাধারণে প্রচারিত হয়নি। সেই জন্য লোকে আমাদের হয়তো ভুল বোঝে, নতুবা জেনেও জানবার চেষ্টা করেনি।

আমাদের গালি দেওয়ার লোক পদে পদেই। ইংরেজ আমাদের কালিতে চিহ্নিত করে, কিন্তু ভারী দুঃখ হয় যখন অহিংসা-বাদীরাও আমাদের হিংস্র বলে নিন্দা করে। তখন মনে হয় পরাধীন দেশে এটাই বুঝি সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

আমরা আজ যে আদর্শের সন্ধানে চলেছি তা অহিংসাবাদীদের কল্পনারও অতীত। মানবের হিংস্রতা থেকে মানবকে রক্ষা করার জন্যই আমাদের এই প্রয়াস।

বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসটা প্রায় পঁচিশ বছরের শিশু। এখনো ভাল করে কথা বলতে শেখেনি। তাই অনেকের গলাবাজির চোটে হয়তো তার কণ্ঠস্বর তলিয়ে যায়।

কিন্তু আজ এই শিশুকণ্ঠ হতে যে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বেজে উঠেছে, তা শীগ্‌গীরই জগৎকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দেবে।

লোকে আমাদের ভাব-প্রবণ বলে উপহাস করে।

কিন্তু আমি এটা ভেবে পাই না, এই বাংলাদেশের হাজার হাজার ছেলে, যারা নেহাত ছেলেমানুষ নয়, লেখাপড়া শিখেছে, জ্ঞানলাভ করেছে এবং অনেক অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছে, তারা একজোটে ভাব-প্রবণ হয় কি করে?

বুড়োরা আমাদের প্রায়ই বলে থাকেন, 'ভ্রান্ত যুবক' এবং করুণায় বিগলিত হয়ে বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের অনেকেই আমাদের 'ভ্রান্ত' পথ থেকে ফেরানোর অনেক চেষ্টাই নাকি করেছেন। এমন কি, খুব নিঃস্বার্থভাবে কমিটিও নাকি গঠন করেছেন শুনেছি।

বুঝলে মা, এর ভেতরে কিছুই নেই। শুধুই উপর-চালাকি।

আসল কথাটা কি জানো মা, যাঁরা এরকম উঠে-পড়ে আমাদের ফেরানোর চেষ্টা করছেন, হয় তাঁরা অথর্ব, নয় কাপুরুষ।

কাউকে আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার মোটেও নেই। কিন্তু এ জিনিসটা দিনের আলোর মতোই স্বচ্ছ।

'বিপ্লব' জিনিসটা কিছু আমোদের নয়। কিন্তু মানব জাতিকে ধ্বংসের হাত হতে বাঁচানোর জন্য যুগে যুগে এটার প্রয়োজন হয়েছে।

বৃদ্ধ যাঁরা, তাঁদের নমস্কার করি। তাঁরা আমার পূজ্য, কিন্তু তাঁদের জরাগ্রস্ত দেহ-মন নড়ে-চড়ে বসবার সাময়িক কার্যটাকেও খুব বড় করে দেখেন এবং বাইরে তার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করেন এবং নতুন জলে ভেসে-আসা আগাছার মতো যখন আমাদের পেছন ছাড়তে চান না, তখন বিরক্ত না হয়ে থাকতে পারিনে।

কি করব! তখন বাধ্য হয়ে সেই তথাকথিত অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের শিশুর পর্যায়ে ফেলতে হয়।

যাঁদের প্রত্যেক রক্তবিন্দুটি দাসত্বের কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়ে গেছে তাঁদের কথা ভাবি না। প্রকৃতির নিয়মে তাঁরা নিজের ক্ষতে নিজেরা পচে মরবেন, স্বখাত সলিলে ডুবে মরবেন।

কিন্তু যাঁরা মধ্যপন্থী, আপস-মীমাংসায় এখনো বিশ্বাসবান, তাঁদের জন্য দুঃখ হয়, কষ্টও হয়। তাঁদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দুই-ই আছে কিন্তু নাই কেবল আত্মসম্মান জ্ঞান। এ বস্তু জোর করে কাউকে কখনো শেখানো যায় না, বোঝানোও যায় না। এটা যৌবনের ধর্ম।

তোমাকে কেউ যদি আমার চোখের সামনে নির্যাতন করে এবং আমি যদি পাগলের মতো লাফিয়ে না পড়ে বিচার করতে বসে যাই—এতে কোন সুরাহা হবে কিনা, এতে কতখানি বিপদ আছে, একলা ওর সঙ্গে পারব কিনা, কিংবা সামনে কোন থানা থাকলে এজাহার দিয়ে পরে সেই পলাতক অত্যাচারীর সন্ধান নিয়ে বেটাকে জেলে দেওয়া কিংবা সম্মানজনক আপস-মীমাংসা করা যাবে কিনা, আর

অত্যাচারী যদি এরা না পড়ে, তবে কোন খবরের কাগজে তীব্র প্রবন্ধ লেখা যায় কিনা ইত্যাদি করে ধীর-মস্তিষ্কের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেব সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-হৃদয়টা কি ছি ছি করে জ্বলে উঠবে না,—'ছেলেবেলায় বুকের দুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে কেন এই ক্লেদের পিণ্ডটাকে মেরে ফেলিনি?'

একথাটা খুবই সত্যি। যতই অধিক বিচার করবে ততই যুক্তি ও উপপত্তি অধিকারিক উৎপন্ন হয়ে শেষের নির্ণয় দুর্ঘট হয়ে পড়ে। যাক, তোমার অপমান যথেষ্ট হয়েছে। আর চোখের জল ফেলে অপমানের ভার বাড়াব না।

কি অমৃতস্পর্শে যে মরবার আগেই আমাদের ওজন বেড়ে যায় তা সাধারণ লোকে বুঝতে পারবে না বলেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকে। নইলে এটা একটা হিসাব-নিকাশের ব্যাপার মাত্র।

বেশি আর কি বলব! জীবনে অনেক আশাই ছিল যে, দেশের মধ্যেই আমার আদর্শটাকে অস্ত্রে অস্ত্রে ছড়িয়ে যাব, নবযুগের কুসংস্কারমুক্ত ভাব নিয়ে জাতিকে ও সমাজকে নবরূপ দেব, একেবারে আমূল সংস্কার করে একটা নবজাতি গড়ে রেখে যাব, সমস্ত গ্লানি, সমস্ত আবর্জনা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে যাব।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষের জীবন! হঠাৎ একটা ডাক এল, আমাকে যেতে হল।

কিন্তু একথা মনেও স্থান দিও না মা, যে, আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত চিন্তা বা আশাও লোপ পেয়ে গেল। সব রয়ে গেল আমার বাংলার ছেলেমেয়েদের মনে, আর আমার বাংলার মায়েদের অন্তরে।

বাংলার ভূমি এত উর্বরা যে, তার ফসল উপচে পড়ছে। এ বৎসরে অগ্রহায়ণে যে ফসল অঙ্কুর হতে না হতেই শুকিয়ে গেল, আসছে হেমন্তে সে দ্বিগুণ হয়ে ফলে উঠবে। পরের ফসল দেশের মধ্যে সোনা ছড়িয়ে দেবে।

তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার কিছুই নেই—এইটুকু শুধু বলছি, বড় হলে আরো ভাল করে বলতে পারতাম। কিন্তু আর কেউ এই একটু 'মুখের কথা' বলুক বা না-ই বলুক, তুমি কিন্তু সম্যকরূপে বুঝবে। কেননা, এটা তো তোমারই অন্তরের কথা।

মা, তোমার প্রদ্যোৎ কি কখনো মরতে পারে? আজ চারদিকে চেয়ে দেখ, লক্ষ লক্ষ প্রদ্যোৎ তোমার দিকে চেয়ে হাসছে। আমি বেঁচেই রইলাম মা, অক্ষয় অমর হয়ে। বন্দে মাতরম্!'

১৯৩৩ সাল, ১২ই জানুয়ারি। পৃথিবী থেকে প্রদ্যোতের শেষ-বিদায় নেবার দিন।

ভোর পাঁচটা। ডাকতে গিয়ে রক্ষীদল অবাক। আশ্চর্য! স্নানশেষে পুজো সম্পন্ন করে, কপালে চন্দন-তিলক এঁকে এর মধ্যেই প্রদ্যোৎ প্রস্তুত। মুখে তাঁর প্রশান্ত হাসি। ঠিক যেন প্রাচীন ভারতের কোন ঋষিপুত্র। এইমাত্র যজ্ঞ শেষ করে উঠেছেন।

রক্ষীদের দেখেই উঠে দাঁড়ালেন প্রদ্যোৎ। তারপর নিজে থেকেই গিয়ে ফাঁসি-মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন দৃঢ় বলিষ্ঠ পা ফেলে। মুখে তাঁর তেমনি প্রশান্তি। যেন এটা একটা খেলামাত্র।

—আর ইউ রেডি প্রদ্যোৎ?

—নিশ্চয়ই। হাসতে হাসতেই জবাব দিলেন প্রদ্যোৎ, মৃত্যুর জন্য আমি মোটেই ভীত নই। কারণ, আমি জানি যে, আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু বাংলার ঘরে ঘরে শত শত প্রদ্যোতের সৃষ্টি করবে। বন্দে মাতরম্!

পরদিনই সে খবর প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়:

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসি

ভোর পাঁচটায় সব শেষ

'মেদিনীপুর, ১২ই জানুয়ারি, ডগলাস হত্যাকাণ্ড মামলায়

প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসি অদ্য প্রত্যুষে পাঁচটার সময় মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে হইয়া গিয়াছে।

ফাঁসির পূর্বে

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, প্রদ্যোৎ ভোর বেলা স্নান করে। স্নান করিবার পর সে গীতা পাঠ করিতেছিল, এমন সময় ফাঁসির মঞ্চের দিকে যাইবার জন্য তাঁহাকে ডাকা হয়। সে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়। তাঁহার দুই ভ্রাতাকে যখন জেলের ভিতর লওয়া হইল, তখন তাঁহারা গিয়া দেখেন যে, প্রদ্যোৎ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। অবিলম্বে তাঁহাকে ফাঁসির মঞ্চে উঠিতে বলা হয়। সে অবিচলিত পদক্ষেপে ফাঁসি মঞ্চের উপর গিয়া উঠে, তৎপর ফাঁসির রজ্জু চুম্বন করিয়া জল্লাদের হাতে আত্মসমর্পণ করে।…' [আনন্দবাজার: ১৩-১-৩৩]

প্রদ্যোৎ চলে গেলেন। কিন্তু এ মৃত্যু মৃত্যু নয়। এ হল জীবনাদর্শে উজ্জীবিত চরম আত্মোৎসর্গ। মানুষের কল্যাণই যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, এভাবেই তাঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত হয়।

কিন্তু মেদিনীপুর! মেদিনীপুর যে বরাবরই শক্তির উপাসক! তাঁরা কি এতবড় আঘাতটাকে নিঃশব্দে মেনে নেবে?

'পড়ি গেল কাড়াকাড়ি—
আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি।'

কথাটা মিথ্যে নয়। কে আগে প্রাণ দেবে তাই নিয়ে সত্যিই সেদিন কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল মল্লিকা।

বস্তুত, মৃত্যুকে এমন করে ব্যঙ্গ করতে সেদিনের মতো আর কোনদিনই বুঝি বড় একটা দেখা যায়নি।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৪—এই পাঁচ বছরে বাংলাদেশের কত বিপ্লবী তরুণ যে সেই মৃত্যু-যজ্ঞে নিজেকে স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করেছিলেন, তার বোধহয় কোন গোনাগুনতি নেই।

বলা বাহুল্য যে, ইংরেজও চুপ করে বসে ছিল না। সভ্যতার যে মুখোশটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও খুলে ফেলে দিয়ে সেদিন তারা আত্ম-প্রকাশ করেছিল হিংস্র হায়েনার রূপ ধরে। বাংলার উদ্বেলিত যৌবনকে পঙ্গু করে দেবার জন্য অত্যাচার, উৎপীড়ন, আঘাত, অপমান কিছুই বোধহয় সেদিন তারা করতে বাকি রাখেনি।

প্রমাণ, ঢাকার শ্রীসংঘের দায়িত্বশীল কর্মী, ছাত্রনেতা অনিল দাস। নীলক্ষেত লেভেল-ক্রসিং ডাকাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহে গ্রেপ্তার করে কি নির্মম অত্যাচারই না সেদিন তাঁর ওপর করা হয়েছিল লালবাগ থানার অভ্যন্তরে!

একদিন নয়, দিনের পর দিন। সেই অত্যাচারের ফলেই একদিন তাঁর জীবনদীপ নিভে গেল লোকচক্ষুর অন্তরালে। কি যে হল জানতেও পারল না কেউ।

দাবী জানালেন সন্তানহারা জননী। খুবই ছোট্ট দাবী। অন্তত পোস্টমর্টেম করার সময় আমার নির্বাচিত একজন সার্জেনকে কাছে থাকতে দেওয়া হোক!

তাই মেনে নিলেন মহানুভব সরকার। নির্দিষ্ট সময়ও জানিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গেই।

কিন্তু কোথায় কি! যথাসময়ে হাজির হয়ে সার্জেন অবাক। না, আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ওসব নাকি আগেই চুকে-বুকে গিয়েছে।

কিন্তু রিপোর্ট! না, তা দেওয়া হবে না। এবং কোনদিনও তা দেওয়া হয়নি।

একইভাবে একদিন হারিয়ে গেলেন ময়মনসিংহের ধীরেন দে। তিনিও একদিন বিদায় নিলেন আই. বি. দারোগা মফিজুদ্দিন সাহেব ও তার প্রিয়পাত্র কুখ্যাত গেঁদা গুণ্ডার অকথ্য অত্যাচারের ফলে।

তারপর যা করা হল তা আরো মারাত্মক। পুলিস-সুপার টেলার নির্দেশ দিলেন—গলা কেটে লাসটাকে জঙ্গলে ফেলে দাও, আর সেই

সঙ্গে রটিয়ে দাও যে, 'স্পাই সন্দেহে ওর পার্টির লোকেরাই ওকে হত্যা করেছে।'

কাজেও তাই করলেন মফিজুদ্দিন সাহেব। সেই সঙ্গে শুরু করলেন ব্যাপক গ্রেপ্তার। হাজার হোক, তার এলাকায় একটা মানুষ খুন হয়েছে। সেদিক থেকে তাঁর একটা কর্তব্য রয়েছে তো!

বি. ভি.-র মেদিনীপুর শাখার দুই অনমনীয় তরুণ সন্তোষ বেরা আর নবজীবন ঘোষও একদিন হারিয়ে গেলেন এমনি করেই। বন্দী-জীবনে তাঁদেরও একদিন জীবনদীপ নিভে গেল হিংস্র পুলিসের বর্বর আক্রমণের ফলে। সেকথা পরে আসছে।

মল্লিকা, এই ছিল সেদিন ইংরেজ শাসনের সত্যিকারের রূপ। কিন্তু একটা কথা। ইংরেজ অত্যাচার করেছিল তার সাম্রাজ্য রক্ষার খাতিরে। কিন্তু তার পারিষদদল!

মনিবের স্নেহচ্ছায়ায় পুষ্ট এই পারিষদদল কিন্তু সেদিন কম অত্যাচার করেনি মল্লিকা। বরং মনিবকে খুশি করার জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা তাদেরও বুঝি ছাপিয়ে গিয়েছিল। ভাবটা এই যে, হাতে যখন ক্ষমতা পাওয়া গেছে, তখন চালাও দেশবাসীর ওপর যত খুশি অত্যাচার আর উৎপীড়ন। চাকরি-জীবনে উন্নতি করতে হলে এটাই তো সবচাইতে সোজা পথ!

আজ আর তাদের চেনার উপায় নেই। চেনা যেত, যদি দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস বিভাগ থেকে কতগুলো গোপন নথিপত্র রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে না যেত।

ওগুলো থাকলে আজকের দিনের কোন কোন জনদরদী দেশ-সেবক, নামী পত্রিকার নামী সম্পাদক—অনেকেরই মুখোশ খুলে যেত দেশবাসীর কাছে।

কারণ, বাইরে দেশ-সেবকের পোশাক পরে থাকলেও আসলে তাঁরাই ছিলেন সেদিন মহামান্য সরকার বাহাদুরের সবচাইতে বড় ভরসার স্থল। বিপ্লব-আন্দোলনের অনেক মূল্যবান তথ্যই তাঁরা

হুজুরের দরবারে নিবেদন করেছিলেন যথাযথভাবে। একথা ঐতিহাসিক সত্য।

এমনি একটি মহাপুরুষের কথাই এবার তোমাকে বলব মল্লিকা। ঢাকা জেলাবাসীর কাছে আজও বোধহয় তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। অন্তত সেদিনের লোকদের কাছে তো বটেই।

লোকটি হল ঢাকা-মুন্সীগঞ্জের স্পেশাল মহকুমা-শাসক কামাখ্যা সেন।

কতরকম কায়দা-কানুনই না জানতেন ভদ্রলোক। আড়ং ধোলাই, বস্তা ধোলাই, কচুয়া ধোলাই, আঙুলে সূঁচ ফোটানো, মলদ্বারে রুল ঢোকানো ইত্যাদি কোন কিছুই বুঝি অজানা ছিল না তাঁর।

বিশেষ করে সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি মেয়েছেলে হলে তো আর কথাই নেই। চালাও তখন নতুন নতুন কায়দা।

সত্যি বলতে কি, তাঁর এই নিত্য-নতুন উদ্ভাবনী শক্তি দেখে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা পর্যন্ত মোহিত হয়ে যেতেন এক এক সময়ে। চিয়ার আপ্ মাই বয়! চালিয়ে যাও!

অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল জনসাধারণ। একি অন্যায় কথা! হ্যাশের পোলাগুলি কি মরছে নাকি! তোগ চোখ নাই! দেখতে পাস না তোরা!

একে ১৯৩২ সাল, তার ওপর বিনয়-বাদল-দীনেশের বিক্রমপুর। সারা দেশ জুড়ে তখন চলছে দেশপ্রেমের বন্যা।

এ-ঘরের ছেলে যদি আন্দামানে যায় তো ও-ঘরের ছেলে দিব্যি লটকে পড়ে ফাঁসির দড়িটা গলায় নিয়ে। বস্তুত ঐ সময়ে বিক্রমপুরে এমন একটি পরিবারও বোধকরি ছিল না, যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন না কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেননি।

এ হেন বিক্রমপুরে যে ছেলে ছিল না, তা নয়। শাসকদের ভাষায় ডেঞ্জারাস সব ছেলেই ছিল। চোখও তাদের বন্ধ ছিল না।

তবু একটু দ্বিধা ছিল। হাজার হোক, দেশবাসী। কি হবে

অহেতুক একটা বুলেট নষ্ট করে! তবে বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে লোকটা। কিছু একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়।

সাবধান করে দেবার জন্য প্রথমেই একখানি থান কাপড় পাঠিয়ে দেওয়া হল তাঁর স্ত্রীর ঠিকানায়। অর্থাৎ—এখনো সংযত হও। নইলে পৃথিবীর আর-এক প্রান্তে পালিয়ে গেলেও আমাদের হাত থেকে তুমি রক্ষা পাবে না। তখন থান কাপড়ের প্রয়োজন হবে নিশ্চয়ই! ওটা আগে থেকেই তোমাকে আমরা উপহার দিয়ে রাখলাম।

গ্রাহ্যই করলেন না কামাখ্যা সেন। কেনই বা করবেন! তাঁর পুলিস রয়েছে। সেপাই রয়েছে। তাছাড়া পেছনে রয়েছে খুঁটির জোর ইংরেজ বাহাদুর। তাহলে ভাবনা কি! সুতরাং ডাণ্ডা যেমন চলেছে, তেমনই চলুক। কি করবে ওরা!

যাদের জোরে এত মাতব্বরী, এবার কিন্তু তারাই ভয় পেয়ে গেল দারুণভাবে। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে মাই বয়। শীগ্‌গীর পালাও এখান থেকে। যেখানে হোক, কিছুদিনের জন্য চলে যাও। কুইক!

কিন্তু কোথায় পালাবে তুমি কামাখ্যা সেন!

না, কোন উপায় নেই। নিজের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য নিজেই তুমি মৃত্যুকে ডেকে এনেছ। সুতরাং যেখানেই যাও না কেন, নিয়তির অমোঘ নির্দেশ তোমাকে মেনে নিতেই হবে। স্বদেশবাসী হলেও স্বাধীনতার শত্রুর ক্ষমা নেই।

মুন্সীগঞ্জ থেকে ঢাকা। আশ্রয় নিলেন উয়াড়ী র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীটে সদর মহকুমা-হাকিম শচীন চ্যাটার্জীর বাংলোতে। যাক, বাঁচা গেল। কাক-পক্ষীও টের পায়নি এখানে আসার খবরটা। সুতরাং নিশ্চিন্ত।

নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না গৃহস্বামী শচীন চ্যাটার্জী। লোকটির অসম্ভব পপুলারিটির কথা তাঁর অজানা নয়। কখন কি ঘটে যায় কে বলতে পারে! তাই বার বার তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন—'রাত্তিরে শোবার আগে জানালাগুলো নিজের হাতে বন্ধ করতে ভুলবেন না যেন। দোহাই আপনার।'

—ঠিক আছে। ঠিক আছে। তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন কামাখ্যা সেন। যত সব ভীতুর কাণ্ড! সদর ফটকে সশস্ত্র প্রহরী রয়েছে, তবু কিনা এত ভয়! ভয়ের কি আছে! তাছাড়া এতদূরে এসে এখানে তার সন্ধানই বা ওরা পাবে কি করে! জানলে তো!

১৯৩২ সাল। ২৭শে জুন।

রাত অনেক। সারা পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে নিঝুম ঘুমের অতলান্তে।

শুধু ঘুম নেই কামাখ্যা সেনের চোখে। বড্ড গরম। জানালাটা একটু খুলে দিলে হয় না! হলই বা একতলা, তবু চারপাশে সশস্ত্র প্রহরী রয়েছে। এখান থেকেও তাদের বুটের শব্দ কানে আসছে। তাহলে ভয়ের কি আছে!

আস্তে আস্তে জানালাটা খুলে দিলেন কামাখ্যা সেন।

আঃ! বাইরের খোলা হাওয়ায় প্রাণটা জুড়িয়ে গেল।

কিন্তু একি! কে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে? হাতে ওর কি ওটা?

এতটুকুও শব্দ করার মতো অবকাশ পেলেন না কামাখ্যা সেন। তার আগেই সশব্দে রিভলবার গর্জে উঠল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল গৃহস্বামী শচীনবাবুর। কিসের যেন একটা শব্দ হল না!

সঙ্গে সঙ্গে তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন কামাখ্যা সেনের ঘরে। ছুটে এল বাংলোর প্রতিটি প্রাণী।

কিন্তু কাম্যাখ্যা সেন তখন কোথায়? অব্যর্থ গুলীর আঘাতে ততক্ষণে তিনি শেষ।

ছুটে এল পুলিস বাহিনী। ছুটে এল শাসক-সম্প্রদায়। কিন্তু সব বৃথা। আততায়ীর কোন চিহ্নও নেই সেখানে। যেন হাওয়ায় মিশে গেছে লোকটা।

সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি।

ঢাকায় গুলীর আঘাতে মুন্সীগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কামাখ্যা প্রসাদ সেন নিহত

'ঢাকা, ২৭শে জুন। মুন্সীগঞ্জের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কামাখ্যা প্রসাদ সেন অদ্য ভোর ৪টায় অজ্ঞাত আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন। মিঃ সেন কয়েক দিনের জন্য ঢাকায় আসিয়াছিলেন এবং উয়াড়ীতে সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এস. এম. চ্যাটার্জীর বাড়িতে অবস্থান করিতেছিলেন।' [আনন্দবাজার : ২৮-৬-৩২]

এবার শোন ঘটনার পরের দিনের খবর।

নিহত ম্যাজিস্ট্রেটের লাস কুমিল্লায় প্রেরিত

'গতকল্য সকালবেলা মিঃ কামাখ্যা প্রসাদ সেন গুলীর আঘাতে নিহত হন, এ সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। মিঃ সেনের বিধবা পত্নী ঢাকাতে যাইয়া তাহার স্বামীর শেষচিহ্ন দেখিতে অসমর্থ হওয়াতে মিঃ সেনের শব একটি বরফের বাক্সে পুরিয়া কুমিল্লাতে প্রেরণ করা হয়।

এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সন্দেহক্রমে এ পর্যন্ত ১৩ জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।' [আনন্দবাজার : ২৯-৬-৩২]

দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার ইতিহাস কোনদিনও ক্ষমা করে না মল্লিকা। তাই কামাখ্যা সেনের নিহত হবার খবর শুনে সেদিন ধন্য ধন্য করে উঠেছিল গোটা বিক্রমপুর।

মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ অসহায় নির্যাতিতা নারী। মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! অত্যাচারী কামাখ্যা সেন বিদায় নিয়েছে। এবার অবারিত মুক্তি!

শুধু কামাখ্যা সেন নয়, ইতিহাসের এই অমোঘ নির্দেশকে সংসারে কোন অত্যাচারী শাসকই বুঝি কোনদিন এড়াতে পারেনি।

জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নায়ক মাইকেল ও'ডায়ারই কি তা পেরেছিল কোনদিন।

না, পারেনি। শত শত নিরস্ত্র অসহায় মানুষের তাজা রক্তে একদিন যে গোটা পঞ্চনদের মাটিকে ভিজিয়ে দিয়েছিল, পরবর্তীকালে সেই পঞ্চনদের উধম সিং-ই তাকে রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য করেছিলেন খাস ইংল্যাণ্ডের মাটিতে দাঁড়িয়ে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ······

শত সহস্র নিরপরাধ নরনারীর রক্তে সেদিন লাল হয়ে গিয়েছিল ঐতিহাসিক জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি। বৃদ্ধ, যুবক, শিশু কেউ বাদ যায়নি।

এমন কি, গর্ভবতী নারীরা পর্যন্ত সেদিন রেহাই পায়নি পাঞ্জাবের কুখ্যাত গভর্ণর মাইকেল ও'ডায়ার এবং তার উপযুক্ত সহচর সেনাধ্যক্ষ বিগ্রেডিয়ার জেনারেল হ্যারী ডায়ারের পাশবিক অত্যাচার থেকে।

শুধু অস্ত্রহীন, অবলম্বনহীন নির্দোষ নরনারীকে বুলেটের বন্যায় ধরাশায়ী করেই ওরা সেদিন ক্ষান্ত থাকেনি।

শহরের গণ্যমান্য নাগরিকদের ঘর থেকে বাইরে টেনে এনে বুকে হেঁটে পথ চলতে বাধ্য করা, প্রকাশ্য রাজপথে তাদের দিয়ে নাকে খৎ দেওয়ানো, জোয়ানদের বেত মেরে মেরে অজ্ঞান করা, মেয়েদের বে-আব্রু করে থুতু দেওয়া, সভ্যতার মুখোশ পরা সেই নরপশুদের কাছে এসব ছিল সেদিন একটা খেলামাত্র।

খবর শুনে সারা দেশ স্তম্ভিত। তারপরই আসমুদ্র-হিমাচল ফেটে পড়ল তীব্র প্রতিবাদে। ধিক তোমাদের, শত ধিক! এই কি তোমাদের সভ্যতার নমুনা! তোমরা পশুরও অধম।

কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের ক্ষোভ ও বেদনা ভাষায় রূপ পেল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। নিজের 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডকে তিনি লিখলেন:

'বিচারের নামে যারা আমাদের দেশের অসহায় নরনারীকে এভাবে নির্বিচারে হত্যা করতে পারে, তাদের দেওয়া এই সম্মানের গুরুভার বইতে আমি অক্ষম।'

শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, স্যার শঙ্কর নায়ারের মতো ব্রিটিশ-ভক্ত নাগরিক পর্যন্ত বড়লাটের কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করলেন ক্ষুব্ধ হয়ে। যেভাবে আমার অসহায় দেশবাসীকে তোমরা হত্যা করেছ, তারপর শাসনকার্যের কোন ব্যাপারে যুক্ত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দয়া করে আমাকে রেহাই দাও।

উত্তরে বিগ্রেডিয়ার জেনারেলের সে কি দম্ভোক্তি! সে কি অট্টহাসি!

'দুর্ভাগ্য, আমার কাছে সেদিন এক হাজার দু'শো পঞ্চাশ রাউণ্ড গুলীর মধ্যে আর একটাও অবশিষ্ট ছিল না। থাকলে তারও সদ্ব্যবহার করতাম। রাস্তাটা সরু, তাই মেশিনগান দুটো ভেতরে নিয়ে যেতে পারিনি। পারলে আমার চাইতে বেশি খুশি বোধকরি আর কেউ হত না।'

একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল পাঞ্জাবের গভর্ণর মাইকেল ও' ডায়ারের মুখ থেকে। ঠিকই করেছেন বিগ্রেডিয়ার জেনারেল। নেটিভরা উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে।

বিলেতের হাউস অফ লর্ডস-এরও সেই একই অভিমত। উল্টে তাঁরা আরো অভিনন্দন জানালেন বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ও' ডায়ারকে।

তার চাইতেও বেশি করলেন বিলেতের অভিজাত শ্রেণীর নর-নারীগণ। শুধু অভিনন্দন নয়, সঙ্গে ছাব্বিশ হাজার পাউণ্ড তারা বিগ্রেডিয়ার জেনারেলকে পুরস্কার দিলেন তার এই অসাধারণ বীরত্বের জন্য।

বীরত্বই বটে! তাই এখানেই বীরসুন্দর থামলেন না। কিছুদিন বাদেই আবার তিনি বীরত্ব দেখালেন 'India as I knew it' নামে

একটি বই লিখে—যার মূল বক্তব্য হল—ভারতবাসী মনুষ্য নামেরও অযোগ্য, ভারবাহী পশুর চাইতে তাদের মর্যাদা কোনরকমেই উচ্চস্তরের নয়। হতে পারে না। হওয়া উচিত নয়।

কতই বা সেদিন বয়েস ছিল উধম সিং-এর! চৌদ্দ-পনের বছরের কিশোর মাত্র।

সেই কিশোর মনেই সেদিন জন্ম নিল বিচিত্র এক অনুভূতি। বিচিত্র এক চেতনা।

যারা অকারণে আমার দেশের সহস্রাধিক ভাইবোনকে হত্যা করেছে, একদিন তাদের আমি নিজের হাতে হত্যা করব। তাদের রক্ত দিয়ে হোলি খেলব।

তারপর এক এক করে কেটে গেল দীর্ঘ একুশ বছর।

উধম সিং তখনো নিজের প্রতিজ্ঞায় স্থির। প্রতিশোধ আমি নেবই।

কিন্তু বিগ্রেডিয়ার জেনারেলকে আর পাওয়া যাবে না। মহাকাল তাকে আগেই ছিনিয়ে নিয়েছে।

বাকি রয়েছে ঐ কুখ্যাত গভর্ণর ও'ডায়ার! তাকেই আমি হত্যা করব। করবই!

কিন্তু কোথায় ও'ডায়ার! চাকুরি-জীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি তখন বহাল তবিয়তে বিলেতে।

বিলেতেই আমি যাব।

উধম সিং তখন মরীয়া। একজন ফাঁকি দিয়ে সরে পড়েছে। আর একজন যেন কোনরকমেই পালাতে না পারে।

তাকে আমার চাই। তার জন্য বিলেতে কেন, পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যেতেও আমি কুণ্ঠিত হব না।

অবশেষে বিলেত।

তারপর শুরু হল প্রতীক্ষা। কোথায় সেই শয়তান! শুধু একটা সুযোগ চাই। তার মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো একটা মাত্র সুযোগ।

অবশেষে এল সেই ঐতিহাসিক ১৯৪০ সালের ১৩ই মার্চ।

বিলেতে ক্যাক্সটন হলের টিউডর রুমে সেদিন দারুণ ভিড়। রয়েল সেণ্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটি ও ইস্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে এক সভা আহ্বান করা হয়েছে। বিষয়বস্তু—আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সভাপতি, লর্ড জেটল্যাণ্ড।

সভায় তিলধারণেরও জায়গা নেই। নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে অনেকেই এসে গেছেন। উধম সিংও রয়েছেন তাঁদের মধ্যে।

বেলা তখন প্রায় তিনটে। কেসিংটনের গৃহ থেকে সভার উদ্দেশ্যে যাবার কালে পরিজনদের লক্ষ্য করে জানালেন ও'ডায়ার—'Good bye. I shall be back in time for tea at 5'O clock.'

অর্থাৎ, পাঁচটার সময় ফিরে এসে এখানেই তিনি চা খাবেন।

শুরু হল সভার কাজ। প্রথমেই উঠে দাঁড়ালেন লর্ড জেটল্যাণ্ড। লেডিজ এ্যাণ্ড জেণ্টেলমেন···

সহসা কি দেখে চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলে উঠল উধম সিং-এর। কে! কে!

এইমাত্র কে এসে ঢুকল টিউডর রুমে! কে এই লোকটা!

মাইকেল ও'ডায়ার না?

হ্যাঁ, তাইতো! যাকে নিজের হাতে হত্যা করার একান্ত সাধ এতকাল ধরে তিনি মনে মনে পোষণ করে এসেছেন, সেই নররক্ত-লোভী মাইকেল ও'ডায়ারই তো এই মুহূর্তে তাঁর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত দিলেন উধম সিং। আজ কোথায় যাবে শয়তান!

কিন্তু না। অনেক দূর। ভিড় ঠেলে আস্তে আস্তে আরো খানিকটা এগিয়ে যাওয়া দরকার। নইলে ফস্‌কে যেতে পারে। না, সে সুযোগ ওকে দেওয়া হবে না।

সভা শেষ। এবার বিদায় নেবার পালা।

বিদায় নেবার পালাই বটে! কারণ, ইতিমধ্যেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে উধম সিং পোজিসন নিয়েছেন দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। আর দেরি নেই। লগ্ন সমাগত। ঐ যে ও'ডায়ার চেয়ার ছেড়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। আরো কাছে। আর একটু। হ্যাঁ, এবার হয়েছে।

সহসা রক্তে যেন আগুন ধরে গেল উধম সিং-এর।

পেয়েছি। দীর্ঘ-প্রতীক্ষার পরে আজ তোমাকে পেয়েছি। এবার তাকিয়ে দেখ যে, ভারতবাসী তার জাতীয় অবমাননার চরম প্রতিশোধ নিতে জানে কিনা!

বুঝি এক লহমার ব্যাপার, তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই উধম সিং-এর হাতের রিভলবার সশব্দে গর্জে উঠল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

এক গুলীতেই শেষ, তবু সব ক'টি গুলীই উধম সিং শেষ করলেন এক এক করে। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়াই ভালো।

শুরু হল হৈ-চৈ, চিৎকার আর চেঁচামেচি। সর্বনাশ! পালাও! বাঁচতে চাওতো এক্ষুণি পালাও এখান থেকে!

উধম সিং নির্বিকার। ধীর স্থির ভাবেই তিনি আত্মসমর্পণ করলেন শ্বেতাঙ্গ পুলিসের কাছে। জীবনের একমাত্র সাধ আজ এতদিন পরে তাঁর সার্থক হয়েছে। আজ তিনি সুখী, সার্থক ও বিজয়ী।

খবর শুনে সারা ভারতে সেদিন কি প্রচণ্ড আলোড়ন! সাবাস উধম সিং, সাবাস! তুমি দেখালে বটে! তোমার তুলনা নেই!

সত্যিই তুলনা নেই। কারণ, একটি গুলীও তাঁর ব্যর্থ হয়নি। সব ক'টাই কাজে লেগেছে। একটা পিঠে ঢুকে দেহের বাঁ-পাশ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেছে। অন্যটা ঢুকেছে পেটে। দুটোই মারাত্মক।

পরদিনই উধম সিংকে হাজির করা হল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে। তারপর শুরু হল জেরা।

'কি নাম তোমার ?'

বয়ে গেছে উধম সিং-এর জবাব দিতে। সব কিছু উপেক্ষা করে তিনি তাকিয়ে রইলেন অন্যদিকে।

'কাগজ-পত্র থেকে জানা গেছে তোমার নাম রাম মহম্মদ সিং আজাদ। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। তাই কি ?'

উধম সিং তেমনি নিঃশব্দ। যেন শুনতেই পাননি তিনি কোন কিছু।

শুরু হল তদন্ত। কে এই রাম মহম্মদ সিং আজাদ! কি তার পরিচয়!

পরিচয় জানা গেল কয়েক দিন বাদে। আসামী পাঞ্জাবের অধিবাসী। নাম—উধম সিং। তবে সচরাচর রাম মহম্মদ সিং আজাদ নামেই সে নিজের পরিচয় দিতে অভ্যস্ত। শুধু এখন থেকে নয়, অনেক দিন আগে থেকেই।

তাছাড়া আসামী সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ একাজ করেনি। বেশ বোঝা যায় যে, অনেকদিন ধরেই সে এ ব্যাপারে নিজেকে প্রস্তুত করছিল।

সোস্যালিস্ট পার্টির কর্মী হিসাবে ইতিপূর্বে জেলও খেটেছিল রাজদ্রোহকর বক্তৃতা দেবার অপরাধে। তবে এখানে নয়, ভারতে।

আবার উধম সিংকে কোর্টে হাজির করা হল এপ্রিল মাসের দুই তারিখে। তারপর শুরু হল প্রশ্ন।

'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই উধম সিং।'

'কে উধম সিং! আমি উধম সিং নই। আমার নাম রাম মহম্মদ সিং আজাদ!'

'কিন্তু আমরা জানি তোমার আসল নাম—উধম সিং। তাহলে নিজেকে সর্বত্র রাম মহম্মদ সিং আজাদ বলে পরিচয় দাও কেন?'

'আমার খুশি।'

'তবু সব কিছুর পেছনেই একটা যুক্তি থাকা উচিত।'

'যুক্তি আমারও আছে।'

'কি যুক্তি!'

'উধম সিং বলতে পাঞ্জাবী ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। নিজেকে আমি ঐ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে ইচ্ছুক নই। ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতির বাস। কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ শিখ, কেউ খ্রীষ্টান, কেউ বা অন্য কোন ধর্মমতে বিশ্বাসী। রাম মহম্মদ সিং আজাদ নামটার মধ্যে আমি একটা সর্বভারতীয় সমন্বয় খুঁজে পাই। তাই ও নামেই সর্বত্র নিজের পরিচয় দিয়ে থাকি।'

'তুমি দোষী, না নির্দোষ?

'কেন, তাতে কোন সন্দেহ আছে নাকি?' হাসলেন উধম সিং।

'নিজের অপরাধের জন্য তুমি কি অনুতপ্ত?'

'নেভার।' গর্জে উঠলেন উধম সিং, 'কক্ষণো না। বিন্দুমাত্রও না।'

'তুমি যা বলছ, তা ভেবেচিন্তে বলছ নিশ্চয়ই?'

'নিশ্চয়ই। আমি এতটুকুও দুঃখিত নই আমার কৃতকর্মের জন্য। ঐ লোকটার বিরুদ্ধে আমার চরম অভিযোগ জমা হয়েছিল অনেকদিন ধরে। সেদিক থেকে আমি ঠিকই করেছি।'

'তোমার এই স্বীকৃতির অর্থ কি জানো?'

'খুব জানি। মৃত্যুর জন্য আমি মোটেই পরোয়া করিনে। বুড়ো বয়েস পর্যন্ত বেঁচে থেকে কি লাভ! ঐ তো লর্ড জেটল্যাণ্ড! বুড়ো বয়সে এখনো দিব্বি বেঁচে আছেন। কি লাভ! ভেবেছিলাম দুজনকেই মুক্তি দেব। ছুঁড়েও ছিলাম ওঁর পাকস্থলী লক্ষ্য করে একটা গুলী। দুর্ভাগ্য, বেঁচে গেলেন।'

২১শে এপ্রিল বোস্ট্রীট পুলিস কোর্টে চার্জ আনা হল উধম সিং-এর বিরুদ্ধে। অপরাধ—ইচ্ছাকৃত নরহত্যা।

উধম সিং নির্বিকার। করুক না ওরা যত খুশি মামলা। আমি যা ভালো বুঝেছি—করেছি। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।

দেশটা ভারত নয়, বিলেত। তাই হত্যাপরাধে অভিযুক্ত আসামী হলেও একশ্রেণীর ইংরেজ অফিসার কিন্তু এই অসাধারণ বীরত্বের জন্য মনে মনে উধম সিংকে শ্রদ্ধা না করে পারেননি। তাঁদের একজন একদিন সেলে আবদ্ধ উধম সিংকে লক্ষ্য করে বললেন :

'কনগ্রাচুলেশন মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড। যেভাবে তুমি তোমার জাতীয় অবমাননার প্রতিশোধ নিয়েছ, তার জন্য মনে মনে আমি তোমাকে সত্যিই শ্রদ্ধা করি।'

'ধন্যবাদ।' হাসলেন উধম সিং।

'মনে হয় তোমার বিচার শেষ হতে অনেকদিন লাগবে।'

'কারণ! দেরির কি আছে, সবই তো পরিষ্কার!'

'নিজের জীবনের জন্য কি তোমার একবারও দুঃখ হয় না?'

'মোটেই না। কেন দুঃখ হবে! আমি যে দেখেছি আমার দেশের মানুষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে উপবাসে নিঃশেষ হয়ে যেতে। না, আমি দুঃখিত নই। নিজের জন্য এতটুকুও দুঃখ হয় না আমার। আমি যা করেছি, ঠিকই করেছি! এ তো আমার মহান কর্তব্য। দেশের সম্মান রক্ষার্থে প্রাণ দেব, এ যে আমার পক্ষে আশাতীত সৌভাগ্য!'

কাজেও তাই হল। শেষপর্যন্ত ওল্ড বেইলী সেন্ট্রাল ক্রিমিন্যাল কোর্ট রায় দিল, প্রাণদণ্ড।

আদেশ শুনে এতটুকুও মাথা নোয়ালেন না উধম সিং। কোনরকম ক্ষমাভিক্ষাও নয়। তাঁর কাজ শেষ। এবার তাঁর ছুটি।

১৯৪০ সালের ১লা জুন বীরের মতোই বুক টান করে পেন্টনভেলি জেলের ফাঁসি-মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন উধম সিং।

তখনো তাঁর মুখে সেই একই কথা—আমার প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করেছি। এজন্য আমি গর্বিত।

নিজের কর্তব্য শেষ করে উধম সিং বিদায় নিলেন।

শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াল সারা পঞ্চনদ। সারা বাংলা। সারা ভারতবর্ষ।

মাথা নোয়াল কোটি কোটি নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষ।

ধন্য উধম সিং, তুমি ধন্য! তোমাকে আমরা কোনদিনই ভুলব না।

সত্যিই ভোলেনি। আজো বীর শহীদ উধম সিং-এর নামে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষ মাথা নোয়ায় পরম শ্রদ্ধা ভরে।

ভোলেনি অমর শহীদ মদনলাল ধিংড়াকেও। ধিংড়াই প্রথম শহীদ, যিনি সর্বপ্রথম ফাঁসি-মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বিদেশের কারাগারে।

অগ্নিযুগের প্রথম পর্বের কথা।

কার্জন উইলি তখন ব্রিটিশ ভারতের সেক্রেটারী অফ স্টেটের রাজনৈতিক এ. ডি. সি.। সরকারী মতে তার কাজ হল বিলেতে অবস্থিত নেটিভ ছাত্রদের দেখাশোনা করা। আসল কাজ, তলে তলে গোয়েন্দাগিরি করা।

ভারতে অগ্ন্যুৎসব শুরু হয়ে গেছে। এরি মধ্যেই তিনভাই দামোদর, বালকৃষ্ণ ও বাসুদেব ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ দিয়েছেন। প্রাণ দিয়েছেন বিনায়ক রাণাডে, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রফুল্ল চাকি, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, চারু প্রমুখ আরো কয়েকজন। কোথায় এর শেষ কে জানে। সুতরাং ভারতীয় ছাত্রদের ওপর কড়া নজর রাখা দরকার।

হাজার বাধা। হাজার বিধিনিষেধ। দেখে দেখে ক্রমশঃ মরীয়া হয়ে উঠলেন ধিংড়া। তারপর একদিন রক্তের অক্ষরে শপথ নিলেন, —ভারতবাসীর এই জাতীয় অবমাননার প্রত্যুত্তর আমি দেব।

১৯০৯ সালের ১লা জুলাই।

ন্যাশন্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে লণ্ডনের জাহাঙ্গীর হল সেদিন বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর ভিড়ে জমজমাট। কার্জন উইলিও রয়েছে তাদের মধ্যে।

গানের পালা শেষ। এবার শুরু হবে অন্য অনুষ্ঠান। কাজে কিন্তু তা আর হল না মল্লিকা। তার আগেই আগুন ঝলসে উঠল ধিংড়ার হাতের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখ দিয়ে—গ্রাম! গ্রাম! গ্রাম!

বাধা দিতে এল লালকাকা নামে জনৈক রাজভক্ত পার্সী। ফলে, উইলির সঙ্গে সঙ্গে সেও শেষ।

১০ই জুলাই ধিংড়াকে হাজির করা হল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। প্রশ্নের উত্তরে সেদিন আদালতে দাঁড়িয়ে ধিংড়া যে নির্ভীক উক্তি করেছিলেন, অগ্নিযুগের ইতিহাসে আজো তা অম্লান অক্ষয় হয়ে আছে, মল্লিকা। বলেছিলেন:

'জার্মানদের যেমন ব্রিটেন দখল করার অধিকার নেই, ব্রিটেনেরও তেমনি ভারতবর্ষ দখলের কোন এক্তিয়ার নেই। যে ইংরেজ আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষকে অপবিত্র করতে চায়, তাকে হত্যা করা আমাদের কাছে ন্যায়ের নির্দেশ। ইংরেজের কপটতা, অশোভন মিথ্যাচার ও বিদ্রূপ-বর্ষী আচরণ দেখে আমি স্তম্ভিত।'

এখানেই থামেননি ধিংড়া। ওল্ড বেইলির আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন:

'I believe that a nation held down by foreign bayonets is in at perpetual state of War. Since open battle is rendered impossible to a disarmed race, I attacked by surprise; since guns were denied to me, I drew forth my pistol and fired.' [আমি বিশ্বাস করি যে, বিদেশী বেয়নেটের চাপে একটা জাতিকে দাবিয়ে রাখা মানে সেই

জাতিকে নিয়ত যুদ্ধরত থাকতে বাধ্য করা। কিন্তু প্রকাশ্য যুদ্ধের সুযোগ নেই। কারণ, আইন করে আমাদের অস্ত্র অপহরণ করা হয়েছে। তাই আমি আচমকা আমার শত্রুকে আক্রমণ করেছি। বন্দুকের লাইসেন্স আমাকে দেওয়া হবে না, তাই এক্ষেত্রে গর্জে উঠেছে আমার গোপন পিস্তল।]

আরো বলেছেন ধিংড়া :

'The only lesson required in India at present is to learn how to die and the only way to teach it is by dying ourselves, therefore I die and glory is my martyrdom.' [ভারতবর্ষকে বর্তমানে কেবল একটি মাত্র শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে—সে হল মৃত্যুবরণের শিক্ষা, এবং সে শিক্ষা দেবার পদ্ধতি মাত্র একটি—নিজে মৃত্যুবরণ করে মৃত্যুভয়হীন হবার শিক্ষাদান। তাই আমি নিজে মৃত্যুবরণ করছি। আমার আত্ম-নিবেদন জয়যুক্ত হোক।]

সব শেষে বিধাতার কাছে জানালেন তিনি তাঁর অন্তিম প্রার্থনা :

'My only prayer to God is that I may be re-born of the same Mother and I may re-die for the same sacred cause till the cause is successful and she stands Free for the good of Humanity.' [আমার একমাত্র কামনা, আমি যেন বার বার আমার গর্ভধারিণীর বুকে জন্মগ্রহণ করে বার বার দেশোদ্ধারের সাধনায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি—যতদিন না আমার ভারতভূমি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে বিশ্বসভায় গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিতা হন।]

কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।

কোথায় আজ ইংরেজ! কোথায় তার সেই জগৎজোড়া সাম্রাজ্য! কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই।

ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিলেও ধিংড়ার কাহিনী কিন্তু

আজো অম্লান অক্ষয় হয়ে বেঁচে আছে ইতিহাসের পাতায়। শুধু স্বদেশেই নয়, বিদেশেও।

ঐতিহাসিক ডব্লিউ. এস. ব্লাণ্ট পর্যন্ত সেকথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন তাঁর 'মাই ডায়েরিজ' গ্রন্থের পাতায়। তিনি লিখেছেন:

'কোন ক্রিশ্চিয়ান শহীদই খিংড়ার চাইতে অধিক নিঃশঙ্কতায় ও মাহাত্ম্যে বিচারকের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। খিংড়ার 'মৃত্যুদিন' ভারতবর্ষে আবহমানকাল শহীদ-তর্পণের সৌন্দর্যে পালিত হবে।··· পৃথিবীখ্যাত রাজনীতিক নেতা লয়েড জর্জ পর্যন্ত চার্চিলের কাছে সেদিন বলেছিলেন: খিংড়ার কোর্টে প্রদত্ত উক্তি দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠতম মাধুর্যে উজ্জ্বল। তার তুলনা চলে শুধু 'প্লুটার্ক'-এর মতো মৃত্যুঞ্জয়ী বীর্যবানদের সঙ্গে।' [My Diaries: Part III, P. 288]*

যাক, কামাখ্যা সেনের কথাতেই ফিরে যাই। সেদিন আততায়ীর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল পরদিন।

আশ্চর্য, প্রতিটি ব্যাপারে আগাগোড়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এসে এ কাণ্ডের নায়ক কালীপদ মুখার্জী পরদিন ধরা পড়লেন কিনা সামান্য একটা টেলিগ্রাম করতে গিয়ে। অন্তত সেদিনের পক্ষে তার ভাষাটা ছিল সত্যিই সন্দেহজনক। তাতে লেখা ছিল:

'কামাখ্যার অপারেশন সাকসেসফুল। চিন্তা করো না।'

সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়লেন কালীপদ মুখার্জী। সামান্য এই ভুলের জন্য শেষপর্যন্ত তিনি তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করলেন ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ উৎসর্গ করে। সংবাদপত্রের ভাষায়:

কালীপদ মুখুজ্যের ফাঁসি

'ঢাকা, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, মুন্সিগঞ্জের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যা প্রসাদ সেনকে হত্যা করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কালীপদ

* বিপ্লবী নায়ক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব' গ্রন্থ থেকে তথ্য গৃহীত।

মুখুজ্যেকে অগ্ন প্রাতঃ ৬টার সময় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২৭শে জুন তারিখে হত্যাকাণ্ড ঘটে। কালীপদর স্ত্রী একটি শিশুপুত্র প্রসব করিয়া গত ৭ই জানুয়ারি তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কালীপদ পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। [আনন্দবাজার : ১৭-২-৩৩ সাল]

আরো একটি কিশোর বিপ্লবীকে এসময়ে প্রাণ উৎসর্গ করতে হল বরিশাল জেলের ফাঁসি-মঞ্চে। তিনি হলেন চরমুগুরিয়া অ্যাকশন মামলায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। তারিখটা ছিল ১৯৩২ সালের ২৩শে আগস্ট।

২৮শে আগস্ট আক্রান্ত হলেন ঢাকার অ্যাডিশন্যাল এস. পি. মিঃ গ্রাসবী। তবে এই আক্রমণে তিনি শুধু একাই নন, গ্রাসবীর দেহরক্ষীর গুলীতে তরুণ বিপ্লবী বিনয় রায়ও আহত হয়ে ধরা পড়লেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে অবশেষে একদিন তিনি চলে গেলেন সুদূর আন্দামান দ্বীপের উদ্দেশ্যে। সঙ্গী হরিপদ আর কেশব রায় পুলিসের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেলেন শেষপর্যন্ত।

২৮শে সেপ্টেম্বর স্ট্র্যাণ্ড রোডে আক্রান্ত হলেন স্টেটস্‌ম্যান-সম্পাদক মিঃ ওয়াটসন।

আশ্চর্য বরাত লোকটার! এর আগেও অফিসের সদর ফটকের সামনে একবার তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন মাত্র কিছুদিন আগে। কিন্তু লাভ হয়নি কিছুই। বরং আততায়ী যুগান্তর দলের একনিষ্ঠ কর্মী অতুল সেনকেই সেদিন চরম মূল্য দিতে হয়েছিল ঘটনাস্থলে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে।

সামান্য আহত হয়ে এবারও তিনি বেঁচে গেলেন শেষপর্যন্ত। ঠিক চার্লস টেগার্টের মতোই। ইতিপূর্বে পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্টের

ওপরও কম আক্রমণ হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য, প্রতিবারই তিনি বেঁচে গেছেন অদ্ভুত কপালজোরে। এ ব্যাপারে ওদের দুজনের ভাগ্য যেন একই সূত্রে গাঁথা।

তবে শেষোক্ত আক্রমণের জন্য মূল্য দিতে হল আরো বেশি। ওয়াটসন আহত হলেও সম্মুখ-সংগ্রামে এপক্ষে প্রাণ দিলেন দলের দুজন নিরলস কর্মী অনিল ভাদুড়ী আর মণি লাহিড়ী। সাজাও হল কয়েকজনের।

তবে এরপরে কিন্তু আর এক মুহূর্তও দেরি করেননি ওয়াটসন। ভিলিয়ার্সে'র মতো তিনিও সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে সোজা বিলেত। আর বীরত্ব দেখিয়ে কাজ নেই বাপু! যথেষ্ট হয়েছে। এবার মানে মানে সরে পড়াই ভাল।

১৮ই নভেম্বর ঘায়েল হলেন রাজসাহীর জেল-সুপার মিঃ লিউক। ঘায়েল হলেন জেলফটকের কাছেই। সংবাদপত্রের ভাষায়ঃ

রাজসাহীর জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে গুলী

'অদ্য সায়াহ্নকালে রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ চার্লস লিউক তাঁহার স্ত্রী এবং কন্যার সহিত মোটর ভ্রমণে বাহির হইলে জেলের বাহিরে এবং রাজসাহী জেনারেল পোস্ট অফিসের নিকট রাস্তার উপর তাঁহার উপর গুলী নিক্ষিপ্ত হয়।

তিনি ঘাড়ে এবং গালে তিনটি স্থানে জখম হইয়াছেন।...তাঁহাকে একখানি ট্রেনে কলিকাতায় পাঠান হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।'

[আনন্দবাজার : ১৮-১১-৩২]

বিচারে দুঃসাহসী কিশোর ভোলানাথ কর্মকারের সাজা হল সাত বছরের কারাদণ্ড।

আবার মেদিনীপুর। আবার সেই বি. ভি.। আবার সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

ইতিমধ্যে দলে বেশ কিছুটা অদল-বদল ঘটেছে। আগে কখন, কাকে, কিভাবে আঘাত হানতে হবে, সে সব পরিচালনার দায়িত্ব ছিল মেজদা হরিদাস দত্ত, রসময় শূর, নিকুঞ্জ সেন, সুপতি রায় ও প্রফুল্ল দত্ত প্রমুখ অ্যাকশন স্কোয়াডের সদস্যদের ওপর। এককথায় তাঁরাই ছিলেন সেদিন বি. ভি.-র সমস্ত সংগ্রামের নেপথ্য-নায়ক।

অধুনা তার কিছু হেরফের ঘটেছে।

প্রথমেই ধরা পড়লেন হরিদাস দত্ত। এতদিন গেরুয়া পরে, গলায় কণ্ঠি ধারণ করে, বিশুদ্ধ 'গোবিন্দ দাস বাবাজী' সেজে থাকলেও এবার আর তিনি কিছুতেই পারলেন না পুলিসের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে। গোবিন্দ দাস বাবাজীকে চিনতে এবার আর এতটুকুও ভুল হয়নি তাদের।

পরবর্তী শিকার রসময় শূর। তিনিও একদিন ধরা পড়লেন আকস্মিকভাবে। প্রতিটি অ্যাকশন পরিচালনায় তাঁর স্থান ছিল পুরোভাগে। তাঁর গ্রেপ্তার নিঃসন্দেহে দলের ওপর একটা প্রচণ্ড আঘাত।

সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ, মেজর সত্য গুপ্ত, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আগে থেকেই বক্‌সা দুর্গে বন্দী।

এবার ডাক এল সত্য বক্সীর। তারপর একে একে সুপতি রায়, নিকুঞ্জ সেন, প্রফুল্ল দত্ত, বীরেন গুহরায়, নীরদ দত্তগুপ্ত, কামাখ্যা ঘোষ প্রমুখ সবাই।

না, কাউকেই বাইরে থাকতে দেওয়া হবে না। একটি প্রাণীকেও না। তোমাদের চিনতে আর বাকি নেই।

এতকাল মেদিনীপুর কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব ছিল প্রফুল্ল দত্তর ওপর। এবার তাঁর সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করলেন যতীশ গুহ। সেই যতীশ গুহ, যিনি পরবর্তীকালে সুভাষের অন্তর্ধানের ব্যাপারে জড়িত থাকার অপরাধে দিল্লী ফোর্টে নীত হয়ে মিলিটারীর নির্মম অত্যাচারে শেষপর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

১৯৩৩ সাল। নেতৃবৃন্দ সবাই প্রায় কারারুদ্ধ। তবু মেদিনীপুর সেই আগের মতোই বেপরোয়া। জবাব দিতে হবে। আরো শক্ত জবাব।

শাসক সম্প্রদায়ও চুপ করে বসে নেই। মেদিনীপুরকে শায়েস্তা করার জন্য কত রকম বিধিনিষেধ যে জারি করা হয়েছে, তার বোধহয় কোন আদি-অন্ত নেই। সংবাদপত্র থেকেই তার ছোট্ট একটি উদাহরণ দিচ্ছি শোন:

'মেদিনীপুর শহরে হুকুম হইয়াছে, রাত্রি ৮টার পর রাস্তায় বাহির হইলেই হাতে একটি করিয়া লণ্ঠন রাখিতে হইবে।

মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটি কি রাস্তায় আলো দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন? অথবা পুলিস কি কোন লণ্ঠন কোম্পানীর এজেন্সী লইয়াছে?...শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে এই স্রেফ বেকুবীর অর্থ কি? ...অর্ডিন্যান্সের বিশেষ ক্ষমতা হাতে পাইয়া পুলিসের কি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিল?' [আনন্দবাজার: ২৮-৭-৩২]

পুলিসের না হলেও বিভিন্ন জেলা-শাসকদের কিন্তু সত্যিই সেদিন মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল মল্লিকা। ভয়ে ত্রাসে প্রতিটি জেলা-শাসক তখন দিশেহারা। না, আমরা কিছুতেই কোয়ার্টার ছেড়ে বাইরে যেতে রাজী নই। অফিস থেকে ফাইল পত্র সব এখানে নিয়ে এসো। যা করার, এখানে বসেই করব।

অবশেষে একদিন সবাই একযোগে চরমপত্র পেশ করলেন সরকার বাহাদুরের কাছে। চুলোয় যাক চাকরি। হয় আমাদের প্রাণরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা কর, নয়তো বিদেয় দাও, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। শুধু শুধু এখানে থেকে গুলী খেয়ে মরতে আমরা রাজী নই।

অগত্যা ডাক পড়ল অতিরিক্ত সেনাবাহিনীর। যে করে হোক, বিপ্লবীদের দমন করতেই হবে। এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কি লেখা রয়েছে শোন:

বাঙলায় বৈপ্লবিক বিভীষিকা

'বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলে বঙ্গদেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, ভারত সরকার তাহা বাঙ্গলা সরকারের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। অনেক প্রকার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও সরকারী কর্মচারীদের নিধন বন্ধ হয় নাই।...

ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারের সহিত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, এই প্রদেশের সৈন্যসংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ছয়দল ভারতীয় পদাতিক এবং ইংরেজ পদাতিক বঙ্গদেশে যাইবে এবং যতদিন আবশ্যক, ততদিন তথায় থাকিবে।

[আনন্দবাজার : ১৯-৮-৩২]

তবু ভয় যায় না শ্বেতাঙ্গ শাসকদের। না, কাউকেই বিশ্বাস নেই। বিশেষ করে ঐ স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের। ওদের অসাধ্য কিছু নেই। ওরা সব পারে।

কথাটা মিথ্যে নয় মল্লিকা। এ প্রসঙ্গে বিদায়ী পুলিস কমিশনার সেই চার্লস টেগার্ট বিলেতে ফিরে গিয়ে কি বলেছেন শোন :

সমস্ত স্কুল-কলেজে বিপ্লবীদের আড্ডা

'লণ্ডন, ১লা নভেম্বর। রয়েল এম্পায়ার সোসাইটির এক সভায় স্যার চার্লস টেগার্ট ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, যদি একথা বলা যায় যে, এমন কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নাই, যেখানে প্রধান প্রধান নেতাদের অধীনে কোনও একজন বিপ্লবী নাই, তবে নিশ্চয়ই অতিরঞ্জন করা হইবে না। ইহার ফল হইতেছে এই যে, এই সমস্ত নেতার আদেশক্রমে যুবকগণ হত্যা করিতেছে এবং পুলিস এই সমস্ত যুবকদিগের সন্ধান পাইতেছে না।...'

[আনন্দবাজার : ৩-১১-৩২]

তবু মেদিনীপুরের সেই একই চেহারা। আসুক না সেনাবাহিনী।

আসুক ব্রিটিশ ফৌজ। কি করবে ওরা। গুলী করবে। ফাঁসি দেবে। দিক না। তা বলে আমরা পিছিয়ে যাব। কক্ষণো না। জবাব আমরা দেবই।

কিন্তু কাকে জবাব দেবে। লোক কোথায়। পেডি, ডগলাস দুজনেই শেষ। চেয়ার যে খালি।

সত্যিই তাই মল্লিকা। সে কি শোচনীয় অবস্থা সেদিন শাসক সম্প্রদায়ের। কেউ মেদিনীপুর যেতে রাজী নয়। সবার মুখেই এক কথা। কোথায় যাব। মেদিনীপুর। মাই গড। জানো তো ওদের প্রতিশ্রুতির কথা। ওখানে গিয়ে শেষে কি বেমক্কা গুলী খেয়ে মরব নাকি। কাজ নেই বাপু অত বীরত্ব দেখিয়ে।

এখন উপায়। এ যে প্রেস্টিজ নিয়ে টানাটানি। খোঁজ। খোঁজ। খোঁজ। যে করে হোক, একজন শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট খুঁজে বের কর। নইলে মুখ দেখানোও যে ভার হবে।

কিন্তু সব বৃথা। 'No young whiteman volunteered to come down to Midnapore to take charge of this district.'

অনেক চেষ্টা, অনেক সাধ্য-সাধনার পরে অবশেষে যাঁকে পাওয়া গেল, তিনি হলেন মিঃ বার্জ।

সুতরাং, এবার তোমার পালা মিঃ বার্জ। জানি, কাজটা সহজ নয়। জানি, পর পর দুজনকে হারিয়ে তোমরা আগের চাইতে অনেক বেশি সতর্ক হয়ে উঠেছ। সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থাও করেছ ব্যাপকভাবেই। তা, উপায় কি। মরতে আমরা কোনদিন ভয় পাইনে। না হয় আর একবার তার প্রমাণ দেব। তা বলে রক্তের অক্ষরে লেখা সঙ্কল্প তো আর ব্যর্থ হতে পারে না।

চেষ্টা করা হল এপ্রিলেই, কিন্তু সংস্কারবশত সারাটা মাস বীরপুঙ্গব এমনভাবে আত্মগোপন করে রইলেন যে, কিছুতেই তাঁর নাগাল পাওয়া গেল না।

বাধ্য হয়েই তখন কয়েকমাস অপেক্ষা করতে হল মেদিনীপুরকে। উদ্যোগ-আয়োজন সবই প্রস্তুত। শুধু সুযোগের অপেক্ষা মাত্র।

সুযোগ পাওয়া গেল ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর।

স্থান, পুলিস গ্রাউণ্ড। মহামেডান ক্লাব ভার্সাস টাউন ক্লাবের খেলা। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও কেউ কেউ অংশগ্রহণ করবেন সে খেলায়। তাই মাঠের সর্বত্র প্রহরার ব্যবস্থা।

তাছাড়া মাঠের একদিকে জেলখানা, অন্যদিকে পুলিস আর্মারী। কার সাধ্য তাদের বেষ্টনী ভেদ করে মাঠে প্রবেশ করে।

অসাধ্য বলে কোন শব্দ বিপ্লবীর অভিধানে নেই। তাই পুলিসের দুর্ভেদ্য বেড়াজাল ভেদ করে কখন যে দুটি মৃত্যু-পাগল কিশোর মাঠে ঢুকে পড়ে জনতার ভিড়ে মিশে গেলেন, কেউ তা টেরই পেল না।

জোন্স, লিনটন, স্মিথ, জঙ্গী কাপ্তান প্রভৃতি আগেই এসে গিয়েছে। এবার এলেন বার্জ। হাজার হোক সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট। তাই, দেখতে দেখতেই বেশ একটু ভিড় জমে উঠল বার্জের গাড়িটার চারপাশে।

সঙ্গে সঙ্গে পোজিশন নিলেন বি. ভি.-র দুই মৃত্যুঞ্জয়ী কিশোর, অনাথ পাঁজা আর মৃগেন দত্ত। অনাথ রইলেন পশ্চিম দিকে, আর উত্তর দিকে মৃগেন।

বার্জ তখনো নামেননি গাড়ি থেকে। তবে নামব-নামব করছেন। ঐ যে তিনি মাটিতে পা রেখেছেন দুজন সশস্ত্র দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে। রেডি।

বুঝি এক লহমার ব্যাপার, তারপরই হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে অনাথের পিস্তল গর্জে উঠল—ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিক থেকে মৃগেনের রিভলবার সাড়া দিল দিক্‌বিদিক কাঁপিয়ে—ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

দৌড়! দৌড়! দৌড়! শুরু হল দৌড় প্রতিযোগিতা। সবার আগে সেই জঙ্গী কাপ্তান। পেছনে স্মিথ, লিনটন, জোন্স প্রভৃতি

সবাই। কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম! তাই দৌড়ে গাড়িতে উঠে নিমেষে মাঠ ছেড়ে সব হাওয়া।

ড্রাম! ড্রাম! না, আর পালানো সম্ভব হল না জোন্স সাহেবের। গুলীর আঘাতে ঠ্যাং ভেঙে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বসে পড়লেন মাঠের ওপর।

আর অনাথ! অনাথ তখন কি করলেন ভাবতে পার মল্লিকা!

না, একবারও তিনি চেষ্টা করলেন না পলায়নপর জনতার মধ্যে মিশে যেতে। বরং বার্জকে ভূলুণ্ঠিত দেখে সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুরন্ত আক্রোশে চেপে বসলেন তাঁর বুকের ওপর। তারপরই পিস্তলের সব ক'টা গুলী উজাড় করে দিলেন এক এক করে। শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

ওদিকে ততক্ষণে তৎপর হয়ে উঠেছে রক্ষীদল। হাতে তাদের উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র।

ভ্রূক্ষেপও নেই অনাথ বা মৃগেনের। তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। করুক না এবার ওরা যা খুশি! এখন তো শুধু যাবার অপেক্ষা মাত্র।

ড্রাম! ড্রাম! সঙ্গে সঙ্গে বীর কিশোরদ্বয় লুটিয়ে পড়লেন শক্ত মাটির বুকে। সারা মুখে তাঁদের বিজয়ীর হাসি। কোন ক্ষোভ বা দুঃখের চিহ্নও নেই সেখানে।

কেনই বা থাকবে! মৃত্যু তো তাঁদের কাছে একটা খেলামাত্র। 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান'—কবির এই উক্তি তো একমাত্র তাঁদের মুখেই সাজে।

রক্তস্নাত মেদিনীপুর। পাশাপাশি শায়িত তিনটি প্রাণহীন দেহ। সবার রক্তই সমান লাল। সেখানে শাসক আর শোষিতের মধ্যে কোন তফাত নেই।

ব্যর্থতার জ্বালায় এবার যেন উন্মাদ হয়ে গেল শাসক-সম্প্রদায়।

প্রথমে পেডি, তারপর ডগলাস, সবশেষে বার্জ। না, আর কোন কথা নয়। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে এবার শেষ করে দাও মেদিনীপুরকে।

কাজেও ওরা তাই করেছিল মল্লিকা। নিপীড়নে, নিষ্পেষণে, অত্যাচারে, উৎপীড়নে, দানবিক প্রতিহিংসার যে বীভৎস তাণ্ডবে সারা মেদিনীপুরের আকাশ-বাতাস সেদিন মথিত হয়েছিল, মধ্যযুগের বর্বরতাকেও বুঝি তা হার মানায়।

শুধু কি দৈহিক অত্যাচার! নিরপরাধ জনসাধারণের বাড়ি-ঘর-দুয়ার সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একেবারে একাকার।

অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে কত লোক যে সেদিন মেদিনীপুর ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল, তার বোধহয় কোন গোনাগুনতি নেই।

বল, ওরা কোথায় আছে? তোমাদের পুরস্কার দেব। আড়াই হাজার, পাঁচ হাজার, দশ হাজার···যা চাও। শুধু ওদের আস্তানাটা কোথায় বল! কি বললে! জানো না! ওসব বাজে কথা। ভাল চাও তো এখনো বল! নইলে···

নইলে তার পরিণাম কি, তার একটা প্রমাণ দেখতে চাও মল্লিকা? প্রমাণ—সন্তোষ বেরা। পুলিসের নির্মম অত্যাচারে মৃত্যুর কোলে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন এই সন্তোষ বেরা, তবু একটি কথাও তিনি প্রকাশ করলেন না শেষপর্যন্ত। দেশ ও জাতির জন্য এ আত্মত্যাগের তুলনা কোথায় বল?

ঠিক এমনি করেই গেলেন বি. ভি.-র আরো একজন অনমনীয় তরুণ—নবজীবন ঘোষ। গোপালনগর থানায় তিনি ছিলেন অন্তরীণ বন্দী। সেই অন্তরীণ অবস্থাতেই পুলিসের অমানুষিক প্রহারে তিনি একদিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এখানেই শেষ নয়। ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে জারি হল কারফিউ আইন। সেই সঙ্গে শুরু হল শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের রাতারাতি নোটিশ দিয়ে জেলা থেকে বহিষ্কারের পালা।

শ্রদ্ধেয় মন্মথ দাস, চারুচন্দ্র দাস, যতীন্দ্রনাথ দাস, জওহরলাল অধিকারী, যতীশ গুপ্ত, চিত্তরঞ্জন দাস, রামমোহন সিংহ, বিনয়জীবন ঘোষ, নারায়ণ মুখার্জী, প্রমথ ব্যানার্জী, নরেন্দ্রনাথ দাস, অম্বিকাপ্রসন্ন সেন, শচীন সেন, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, কিশোরীপতি রায়, সাতকড়িপতি রায় প্রমুখ কাউকেই রেহাই দেওয়া হল না সেই সরকারী নির্দেশের আওতা থেকে। দেশপ্রেমের মাশুল দিতে গিয়ে সবাইকে সেদিন পথে দাঁড়াতে হল পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে।

বার্জ-হত্যাকে কেন্দ্র করে সেদিন মেদিনীপুরের ওপর দিয়ে যে কি উন্মত্ত প্রতিহিংসার ঝড় বয়ে গিয়েছিল, শ্রদ্ধেয় নরেন দাস রচিত 'History of Midnapore' গ্রন্থ থেকে তার সামান্য একটু নজীর এখানে তুলে দিচ্ছি মল্লিকা।

'...The authorities [Midnapore] at the instigation of the European Association became mad with vengeance. 'Midnapore should be taught a lesson' was the cry of the white people in India. Throughout the length and breadth of the country the White Press publicly demanded persecution of the people of Midnapore. The Anglo Indian Press particularly the 'Statesman' and the 'Englishman' publicly asked the Government to bring the leaders of the movement and shoot them down publicly without any trial.'

[মেদিনীপুরের সরকারী কর্তাদের ওপর ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন থেকে চাপ এল, জিঘাংসায় উন্মত্ত হয়ে অত্যাচার চালিয়ে যাও।... মেদিনীপুরকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়...মেদিনীপুরকে পিষে ফেল। সরকারের কাছে স্টেটস্‌ম্যান, ইংলিশম্যান কাগজগুলির খোলাখুলি দাবী—গুপ্ত সমিতির নেতাদের ধরে এনে বিনাবিচারে গুলী করে মেরে ফেল।]

ঘটনার দিনই গ্রেপ্তার করা হল নির্মলজীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, সনাতন রায়, সুকুমার সেন, কামাখ্যা ঘোষ, নন্দদুলাল সিংহ প্রমুখ আদর্শবান যুবকবৃন্দকে।

তারপরই শুরু হল মামলা। সাক্ষী-সাবুদও সংগ্রহ করা হল কিছু কিছু। এমন কি, রাজসাক্ষীরও অভাব হল না। মিরজাফর সবদেশেই আছে এবং থাকবেও। এক্ষেত্রে যিনি রাজসাক্ষীরূপে মিরজাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন—নাম তাঁর শৈলেশচন্দ্র ঘোষ।

কিন্তু তখনকার দিনে বাঘা বাঘা সব আইনজীবী—বীরেন্দ্র শাসমল, জে. সি. গুপ্ত, নিশীথ সেন প্রমুখের বুক-কাঁপান জেরার সামনে ওসব রেডিমেড সাক্ষী আর কতক্ষণ! ঝড়ের মুখে খড়-কুটোর মতোই তারা সব উড়ে গেল একে একে। দেখা গেল আগাগোড়া সবটাই সাজান ব্যাপার। এমন কি, রাজসাক্ষী শৈলেশ ঘোষের উক্তিও আগাগোড়া পরস্পর-বিরোধী। কোন কথার সঙ্গেই পরবর্তী কোন কথার মিল নেই। প্রমাণ নেই।

গভীর আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হাসলেন আইনজীবিবৃন্দ। স্রেফ বাজে মামলা। অত্যন্ত কাঁচা গাঁথুনি। আসামীদের বেকসুর খালাস দেওয়া ছাড়া এক্ষেত্রে আর কোন উপায় নেই।

তাছাড়া আসামীরা বার্জ-হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এমন কোন প্রমাণও নেই। কোন বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া যায়নি তাদের কাছে। এ অবস্থায় বেকসুর খালাস দেওয়া ছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই আদালতের সামনে।

যথাসময়ে রায় দিলেন ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান মিঃ এইচ. জি. ওয়েট।

কিন্তু একি! ফাঁসির হুকুম হয়েছে নির্মলজীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায় আর ব্রজকিশোর চক্রবর্তীর। সনাতন রায়, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেন আর নন্দলাল সিংহকে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন

দ্বীপান্তর। শান্তিগোপাল সেনকেও যাবজ্জীবন দণ্ড দেওয়া হয়েছে অনুরূপ অন্য একটি মামলার সৃষ্টি করে।

ধিক্কার উঠল বাংলার গোটা আইনজীবী-মহলে।

এই কি আইন! এই কি বিচার! এ যে কাজীর বিচারকেও হার মানায় দেখছি! জুরির বিচার হলে কক্ষণো এমন হতে পারত না।

কে শুনবে সেকথা! শুনবেই বা কেন? শাসকদের ইজ্জত রাখতে হবে তো! সুতরাং বাগে যখন পাওয়া গেছে, তখন সাতকড়িকে না পাওয়া গেলে পাঁচকড়ি আর দুকড়িকে এনে একসঙ্গে ঝুলিয়ে দাও।

মল্লিকা, যে ব্রিটিশ প্রেস্টিজের নাম ছিল জগৎ-জোড়া, সেদিন এই ছিল তাদের ন্যায়বিচারের আসল রূপ। অন্তত দেশপ্রেমিক তরুণদের ক্ষেত্রে কোথাও তাদের এ হেন ন্যায়বিচারের বড় একটা ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়নি।

১৯৩৪ সাল। ২৫শে অক্টোবর। ভোর সাড়ে পাঁচটা।

বীরদর্পে ফাঁসি-মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন মেদিনীপুরের দুই সিংহ-শিশু রামকৃষ্ণ রায় আর ব্রজকিশোর চক্রবর্তী। কিসের শঙ্কা! কিসের ভয়! শহীদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের স্পর্শধন্য এই বধ্য-মঞ্চ তো তাঁদের কাছে তীর্থভূমি!

পরদিন নির্মলজীবন ঘোষ। আজ তাঁর যাবার পালা।

সেই একইভাবে ফাঁসি-মঞ্চে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বীর বালক নির্মলজীবন ঘোষ।

সহকর্মী রামকৃষ্ণ ও ব্রজকিশোর আগেই শহীদ-তীর্থে চলে গেছেন। এবার তাঁকেও যেতে হবে।

কোন দুঃখ নেই। কোন ক্ষোভ নেই। হাত বাড়ালেই স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। তার জন্য মূল্য দিতে হয়। এমনি করে কতজনই তো মূল্য দিয়েছেন। তাহলে দুঃখ কিসের!

আর শৈলেশ ঘোষ! মেদিনীপুরের এতগুলো তরুণের মৃত্যুর জন্য যিনি দায়ী, তাঁর কি হল!

না, ইংরেজ সরকার বেইমান নয়। অন্তত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সেদিন যারা মিরজাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের প্রতি কোনদিনও তারা বেইমানী করেনি। তাই সঙ্গে সঙ্গেই তারা তাঁকে বিলেতে পাঠিয়ে দিয়েছিল সরকারী খরচে। যাও, মানুষ হয়ে ফিরে এস।

ফিরে তিনি যথাসময়েই এসেছেন। কেনই বা আসবেন না! আজকের সমাজে শৈলেশ ঘোষদেরই তো জয়জয়কার!

১৯৩৪ সালের ২রা জুলাই আরো একটি বিপ্লবী তরুণকে প্রাণ দিতে হল শ্রীহট্ট জেলের ফাঁসি-মঞ্চে। তিনি হলেন ইটাখোলা অ্যাকশন মামলায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের বিজ্ঞান-বিভাগের ছাত্র অসিত ভট্টাচার্য।

হাজার আবেদন করা সত্ত্বেও ফাঁসির পরে তাঁর মৃতদেহ তাঁর আত্মীয়-স্বজনের হাতে দেওয়া হয়নি। বাঙালীকে আর বিশ্বাস নেই। এমন নির্বিকার চিত্তে যারা একের পর এক হাসতে হাসতে ফাঁসি-মঞ্চে প্রাণ দিতে পারে, তাদের হাতে শহীদের মৃতদেহ ছেড়ে দেওয়া আর কোনদিক থেকেই নিরাপদ নয়। ঐ একটি অসিতের মধ্য থেকেই যে তখন হাজার হাজার অসিত জন্ম নেবে না, তা কে বলতে পারে!

ঐ একই মামলায় বিরাজ দেব, বিদ্যাধর আর গৌরাঙ্গ দাসকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

ইংরেজ ভয় পেলেও ভরসা হারাবার জাত নয়। তাই বিপ্লব দমনে ব্যর্থ হয়ে এবার তারা বাংলার মসনদে এনে হাজির করল মহামান্য রাজপুরুষ স্যার জন অ্যাণ্ডারসনকে।

সোজা লোক নন এই অ্যাণ্ডারসন। আয়ারল্যাণ্ডের সিন্‌ফিন্‌ আন্দোলনের মোকাবিলা করতে গিয়ে ইতিপূর্বে তিনি যে ব্ল্যাক অ্যাণ্ড

ট্যান নীতির প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে ধন্ধ ধন্ধ পড়ে গিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী মহলে।

হ্যাঁ, শাসক বটে! এই তো চাই! বাংলাদেশকে শায়েস্তা করতে হলে এমনি শাসকই তো আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। দেখা যাক, এবার কত শক্তি ধরে মেদিনীপুর, কত প্রাণ আছে বাংলায়, আর কত সাহস আছে এই ভারতবর্ষের!

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন বি. ভি.-র নেতৃবৃন্দ। তাই হোক। প্রমাণ হয়ে যাক যে, কত শক্তি ধরে মেদিনীপুর, কত প্রাণ আছে বাংলায়, আর কত সাহস আছে এই ভারতবর্ষের!

সংখ্যায় আমরা মুষ্টিমেয়। অস্ত্রবলও আমাদের সামান্য। কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে ন্যায়যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ভর করে শুধু সংখ্যায় বা অস্ত্রবলের প্রাবল্যে নয়, প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে। সেই প্রাণশক্তি বাংলাদেশের আছে কিনা হাতে হাতেই তার প্রমাণ হয়ে যাক!

শাসকরূপে অ্যাণ্ডারসনকে কাছে পেয়ে সে কি আস্ফালন তখন বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স, ইয়োরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন, স্টেটস্‌ম্যান, ইংলিশম্যান প্রমুখ সরকারী মুখপত্রগুলির। 'No track with the terrorists. Give the dog a bad name to hang him. If another European was murdered detenus should be shot.'

একই সুরে সুর মেলালেন খয়ের খাঁ ও একান্ত রাজভক্তের দল। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ।

এমন কি, দেশের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরাও বাদ গেলেন না। বাধ্য হয়ে তাঁরাও তখন বিবৃতি দিতে শুরু করলেন অ্যাণ্ডারসনী চাপের কাছে নতি স্বীকার করে।

ওরা সন্ত্রাসবাদী। দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করাই ওদের একমাত্র কাজ। ওরা আমাদের কেউ নয়। ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমাদের।

পরাধীনতার অভিশাপ বুঝি একেই বলে মল্লিকা। নইলে দেশের মুক্তির জন্য যাঁরা সবচাইতে বেশি প্রাণ দিয়েছেন, সবচাইতে বেশি নির্যাতন সহ্য করেছেন—শুধু শাসকদের বিচারে নয়, দেশবাসীর চোখেও তাঁরা হলেন কিনা সন্ত্রাসবাদী! অর্থাৎ, দেশের স্বাধীনতাই তাঁদের লক্ষ্য নয়, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হল দেশব্যাপী অরাজকতা সৃষ্টি করা।

যাক, অ্যাণ্ডারসনের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। জবরদস্ত শাসক অ্যাণ্ডারসন। তাই মসনদে বসেই তিনি কাজে হাত দিলেন অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে। যে করে হোক, বিপ্লবীদের নিশ্চিহ্ন করা চাই।

শুধু আঘাত আর নির্যাতনের পথে পা বাড়ালেই হবে না। বিপ্লবীদের সমূলে উৎখাত করতে হলে সেই সঙ্গে দেশের যুব-শক্তির চরিত্র হনন করে চিরকালের মতো তাদের পঙ্গু করে দিতে হবে।

ইংরেজ শাসনের মূলনীতিই হল ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল। অর্থাৎ, একপক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য অপরপক্ষকে মাথায় তুলে আস্কারা দেওয়া।

এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। প্রধানতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের যত সব সমাজবিরোধী দুর্বৃত্তদের প্রচুর উৎকোচে বশীভূত করে প্রথমেই গাঁয়ে গাঁয়ে তৈরি করা হল ভিলেজ গার্ড বাহিনী। অর্থাৎ, এখন থেকে তোমরাই হলে গাঁয়ের মাতব্বর।

এবার ওদের দিকে একটু ভাল করে নজর রাখ। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই ধরিয়ে দাও। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার।

ভিলেজ গার্ড! বেশ গাল-ভরা নাম। তা বলে তাদের আসল স্বরূপটি কিন্তু সেদিন দেশের মানুষের কাছে অজানা ছিল না, মল্লিকা। এই ভিলেজ গার্ড প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কি বলেছেন শোন :

'Sir John Anderson, the Governor of Bengal, set up a number of 'Village guards' to keep watch over

the revolutionaries.' [History of Freedom Movement—Vol. III, P. 511.]

কথায় বলে, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। এখানেও তাই হল। ভিলেজ গার্ড তো নয়, যেন দারোগার বাবা।

সরকারী হুকুমে হিন্দু ছেলেদের ওপর খবরদারি করার সুযোগ পেয়ে সে কি হম্বিতম্বি তখন এক এক জনের! এই কর, ঐ কর, এসব চলবে না—এমনি ধারা হুকুম যেন লেগেই আছে সর্বক্ষণ। ফলে, অনিবার্যভাবেই একদিন ঘোর সংঘর্ষ বেধে গেল নারায়ণগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে দেওভোগ গ্রামে।

১৯৩৪ সাল। ১০ই এপ্রিল।

রাত তখন অনেক। চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। দুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না।

অতি সন্তর্পণে গাঁয়ের পথ ধরে হেঁটে চলেছেন বি. ভি.-র নেতৃস্থানীয় কর্মী সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানার্জী আর এ গাঁয়েরই অতি বিশ্বস্ত কর্মী মতি মল্লিক। কথাবার্তা শেষ হয়েছে। এবার সুকুমার ও মধু ব্যানার্জী ফিরে যাবেন নারায়ণগঞ্জের আস্তানায়।

হঠাৎ বিপর্যয় ঘটে গেল। কোথা থেকে ভিলেজ গার্ড বাহিনীর বড়কর্তা রমজান মিঞা এসে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দলবল নিয়ে। না, কাউকেই ছাড়া হবে না। আমি হাবিলদার সাহেব রমজান মিঞা। আমার হুকুমে তোমাদের সবাইকে 'গিরেপ্তার' করা হল।

অ্যাণ্ডারসনী আইনে কারো কাছে অস্ত্র পাওয়া গেলে তার একমাত্র শাস্তি ছিল—প্রাণদণ্ড। সুতরাং আত্মসমর্পণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। ফলে, শুরু হল তুমুল সংঘর্ষ। দুপক্ষই সমান শক্তিশালী। কেউ কাউকে ছাড়তে রাজী নয়।

গ্রাম! গ্রাম! গ্রাম! সহসা এক সময়ে রিভলবার গর্জে উঠল দিক্‌বিদিক্ কাঁপিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে হাবিলদার সাহেবের প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল শক্ত মাটির বুকে। সেই ফাঁকে স্কুমার আর মধু ব্যানার্জী যে কোথায় সরে পড়লেন তার কোন হদিসই পাওয়া গেল না।

এড়াতে পারলেন না মতি মল্লিক। শত্রুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে করতে কখন যে তিনি বড় রাস্তা থেকে গড়িয়ে অনেকটা নিচে একটা খালের মধ্যে পড়ে গেছেন, স্কুমার বা মধু তা আদৌ বুঝতে পারেননি। বুঝতে পেরেছিলেন অনেকটা পরে। সিংহ-শাবক তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ।

খবর শুনে হৈ-চৈ পড়ে গেল শাসক-মহলে।

বলে কি! শেষে কিনা স্বয়ং অ্যাণ্ডারসন সাহেবের পোষ্যপুত্র রমজান হাবিলদার নিহত! এ যে ভয়ঙ্কর কথা! এখন উপায়!

একজন অবশ্য ঘটনাস্থলেই ধরা পড়েছে, কিন্তু বাকি সবাই কোথায় গেল! কি তাদের নাম! হাজার নির্যাতনেও যে আসামী এ বিষয়ে মুখ খুলতে রাজী নয়। কি করা যায় এখন!

শেষপর্যন্ত ধরে বসল মতি মল্লিকের বাবা রাজকুমার মল্লিককে। ছেলেকে আপনি সব কথা খুলে বলে রাজসাক্ষী হতে বলুন। কথা দিচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাকে বিলেত পাঠিয়ে দেব পড়াশুনা করার জন্য। আর সেই সঙ্গে আপনাকে দেব নগদ দশ হাজার টাকা।

—বলেন কি! যেন আকাশ থেকে পড়লেন রাজকুমার মল্লিক। বাপ হয়ে ছেলেকে আমি বেইমানী করতে শেখাব! মাপ করবেন, এ কাজ আমার দ্বারা কোনমতেই সম্ভব নয়।

—তাহলে ছেলেকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলতে হবে।

—সবই তাঁর ইচ্ছা। সহসা কার উদ্দেশ্যে দুহাত জোড় করে প্রণাম করে বললেন রাজকুমার মল্লিক, তাঁর মনে কি আছে তিনিই জানেন। তা বলে জেনে-শুনে অধর্ম করব! অসম্ভব। বরং আজ থেকে মনে করব যে, ছেলেকে আমি দেশের কাজে বলি দিয়েছি, তবু অধর্মের কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

গল্প নয় মল্লিকা, রূপকথাও নয়। সাধারণ একজন ব্যবসায়ী। লেখাপড়া সামান্য জানেন। তবু সন্তানের নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তিনি অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে রাজী হলেন না একমাত্র অধর্মের ভয়ে। এই ছিল সেদিনের মানুষের চরিত্র।

আর আজ।

যেদিকে তাকানো যায় শুধু লোভ আর স্বার্থপরতা। অন্যায় আর অবিচার। ক্ষুদ্রতা আর হীনতা। বস্তুত, লোভ ও স্বার্থের বশবর্তী হয়ে আজকের মানুষ নির্বিকার চিত্তে যা করতে পারে, সেদিনের পরাধীন দেশের মানুষগুলোর পক্ষে তা কল্পনারও বুঝি অতীত ছিল।

এসব দেখি আর মনে মনে ভাবি যে, এই কি আমাদের স্বাধীনতার স্বরূপ! বিনয়, বাদল, দীনেশ, প্রদ্যোতের মতো আদর্শ চরিত্রের ছেলেরা কি এরই জন্য সেদিন হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছিলেন? এ জিজ্ঞাসার জবাব কোথায়?

যাক, মতি মল্লিকের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। সচরাচর এসব ক্ষেত্রে যা হয়, মতি মল্লিকের বেলায়ও তার কোন ব্যতিক্রম হল না। সাজা হল প্রাণদণ্ড। এবং সে আদেশ কার্যকরী করা হল ১৫ই ডিসেম্বর উষালগ্নে।

১৯৩৪ সাল। বাংলার যৌবন সেদিন কারারুদ্ধ। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ বড় একটা বাইরে নেই। এক এক করে সবাইকেই আটক করা হয়েছে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। বাংলার প্রাণশক্তি স্তব্ধ, গতিহীন।

একমাত্র ব্যতিক্রম বি. ভি.-র যতীশ গুহ আর দেওভোগ ঘটনার মতি মল্লিকের সঙ্গী সেই সুকুমার ঘোষ ও মধু ব্যানার্জী প্রমুখ গুটি কয়েক পলাতক নেতৃস্থানীয় কর্মী। পুলিস হাজার চেষ্টা করেও তখনো পর্যন্ত তাঁদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

এবার তৎপর হয়ে উঠলেন যতীশ গুহ।

আর দেরি নয়। হয়তো আর বেশিদিন সময় পাওয়া যাবে না। তার আগেই অ্যাণ্ডারসনী চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে হবে।

মেদিনীপুরের তৃতীয় জেলা-শাসক বার্জকে আগেই জবাব দেওয়া হয়েছে। এবার আবার নতুন করে জবাব দেবার পালা।

কিন্তু এবার আর কোন আই. জি. বা জেলা-শাসক নয়।

মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার। সুতরাং টান দিতে হবে ঐ খোদ কর্তাকে ধরেই। বুঝিয়ে দিতে হবে যে, হাজার নির্যাতনেও বাংলা বা বাঙালী এখনো মরে যায়নি। তারা শুধু মুখ বুজে মারই খেতে জানে না, প্রয়োজন হলে পাল্টা মার দিতেও জানে।

কলকাতা বা অন্য কোন সমতলভূমিতে তাঁর নাগাল পাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং চলে যাও সবাই দার্জিলিং। ওখানেই তিনি এখন রয়েছেন গ্রীষ্ম-যাপনের জন্য। অবিলম্বে ওখানে গিয়ে যে করে হোক, ধর ওকে। চ্যালেঞ্জের জবাব দাও।

দলীয় নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে দার্জিলিং অভিমুখে যাত্রা করলেন উজ্জ্বলা মজুমদার আর মনোরঞ্জন ব্যানার্জী। আর ঢাকার জয়দেবপুর থেকে সরাসরি পৌঁছে গেলেন দুর্ধর্ষ কিশোর ভবানী ভট্টাচার্য আর রবি ব্যানার্জী।

৪ঠা মে তারিখে রবি আর ভবানী গিয়ে উঠলেন লুইস জুবিলী স্যানাটোরিয়ামে। উজ্জ্বলা মজুমদার আর মনোরঞ্জন আশ্রয় নিলেন স্নো ভিউ হোটেলে।

উজ্জ্বলা মজুমদার আর মনোরঞ্জন ব্যানার্জী। দেখে মনে হয়, অভিজাত বংশের ভ্রমণ-বিলাসী দুটি ভাই-বোন। তাছাড়া সঙ্গীত-রসিকও বটে। কারণ, সঙ্গে রয়েছে একটি সুদৃশ্য হারমোনিয়াম।

কিন্তু ঐ হারমোনিয়ামটা সম্বন্ধে উজ্জ্বলা মজুমদারের এত সতর্কতা কেন?

কি আছে ওটার ভেতরে?

তুমি ঠিকই অনুমান করেছ মল্লিকা। ঐ হারমোনিয়ামটার অভ্যন্তরেই লুকায়িত রয়েছে বিপ্লবীদের বহু সাধনার ধন সেই মারাত্মক মারণাস্ত্র, যা দিয়ে অসুরকে আসুরিক ভাষায় জবাব দিতে হয়।

প্রথমে চেষ্টা করা হল ফ্লাওয়ার শো এগজিবিশনে।

কিন্তু না, সুবিধে হল না। দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ শক্তির সান্ত্রী-পরিবেষ্টিত লাটসাহেবকে কিছুতেই সেদিন পাওয়া গেল না রিভলবারের রেঞ্জের মধ্যে। কাছেই এগুনো গেল না। সুতরাং সুযোগের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

সুযোগ পাওয়া গেল ৮ই মে লেবংয়ের ঘোড়দৌড়ের মাঠে। জানা গেল, সেদিন নাকি স্বয়ং অ্যাণ্ডারসন মাঠে উপস্থিত থেকে বিজয়ী দলকে পুরস্কার বিতরণ করবেন। সুতরাং সুবর্ণ সুযোগ।

যথাসময়ে ভবানী আর রবি দর্শকের টিকিট কেটে ঢুকে গেলেন মাঠের অভ্যন্তরে।

তাঁদের আসন গ্রহণ করতে দেখেই মনোরঞ্জন আর উজ্জ্বলা মজুমদার ফিরে গেলেন শিলিগুড়ি স্টেশনের দিকে। তাঁদের কর্তব্য শেষ। দলীয় নির্দেশে এবার তাঁদের ফিরে যেতে হবে কলকাতায়।

গভর্ণরের আসনের ঠিক ডান পাশ ঘেঁষে দর্শকদের স্থান। মাঝখানে একটা নিচু দেয়াল। দর্শকদের মধ্যে বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ। ধামাধরা রাজা-মহারাজাও রয়েছে কিছুসংখ্যক।

আর রয়েছে অজস্র পুলিস, সার্জেন্ট, এডিকং ও গুপ্তচরের দল। হাজার হোক, গভর্ণর! সুতরাং কোনদিক থেকেই সতর্কতার এতটুকু ত্রুটি নেই।

কিশোর ভবানী আর রবি তখন স্থির, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বুকে দুর্বার সাহস। চোখে দিগন্তসীমার মতো উন্মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। ঐ যে দূরে সেই শয়তানটা বসে আছে পাত্র-মিত্র সঙ্গে নিয়ে। ফ্লাওয়ার শো এগজিবিশনে হাজার চেষ্টা করেও নাগাল পাওয়া যায়নি। আজ যাবে কোথায়!

কিন্তু অনেকটা দূর। এখান থেকে রিভলবারের পাল্লার মধ্যে পাওয়া যাবে কি!

তবু চেষ্টা করতে হবে। জবাব দেবার এমন সুবর্ণ সুযোগ জীবনে আর হয়তো কোনদিনই পাওয়া যাবে না।

যথাসময়ে মহামান্য লাট বাহাদুর উঠে দাঁড়ালেন আসন ত্যাগ করে। ঘোড়দৌড়ের পালা শেষ। এবার পুরস্কার-বিতরণ।

সঙ্গে সঙ্গে ভবানীও উঠে দাঁড়ালেন আসন ছেড়ে। চোখে-মুখে তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্পের রেখা। এই সুযোগ।

কিন্তু এখনো অনেকটা দূর। পাল্লার মধ্যে পাওয়া যাবে কিনা বলা শক্ত। আর একটু কাছে এগিয়ে যেতে পারলে ভাল হত।

কিন্তু না, উপায় নেই। চারপাশে সাহেব-সুবো, প্রহরী, গুপ্তচর আর মোসাহেবের দল। এগুতে গেলেই সন্দেহ করবে। হয়তো গোটা ব্যাপারটাই বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং লক্ষ্যস্থির করতে হবে এখান থেকেই।

বুঝি এক লহমার ব্যাপার। তারপরই শোনা গেল কান-ফাটানো আওয়াজ—দ্রাম! দ্রাম!

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল প্রতিটি মানুষ। আশ্চর্য, এত সশস্ত্র প্রহরী, এত লোকজন, তার মধ্যে কিনা এই কাণ্ড!

মুহূর্ত মাত্র, তারপরই শুরু হল চিৎকার, হৈ-হল্লা আর চেঁচামেচি। ধর, শীগ্গীর ধর ওকে!

একে ১৯৩৪ সাল, তার ওপর আবার অ্যাণ্ডারসন। সুতরাং সতর্কতার এতটুকুও ত্রুটি ছিল না।

সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণরের এডিকং সাহেব পর পর চারবার গুলী-বর্ষণ করলেন ভবানীকে লক্ষ্য করে। ফলে, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই ভবানী ঢলে পড়লেন গুরুতরভাবে আহত হয়ে।

ওদিকে রবির হাতের আগ্নেয়াস্ত্র ততক্ষণে আগুন ছড়ানো শুরু করেছে—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!



'মাই গড!' সঙ্গে সঙ্গে বীরপুঙ্গব তাঁর স্টেনো মিস থর্টনের আড়ালে আত্মগোপন করলেন দুহাতে মুখ চাপা দিয়ে। রবির গুলী তাঁর ঠোঁট ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল অনেক দূরে।

বলা বাহুল্য, থর্টনও রেহাই পেলেন না। গুলীবিদ্ধ হয়ে তিনিও এবার বসে পড়লেন তাঁর মহামান্য প্রভুকে অনুসরণ করে।

বসে পড়লেন আরো একজন। তিনি হলেন দেহরক্ষী দলের একজন শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট। রবির নিক্ষিপ্ত গুলী তাঁকেও ছোবল দিতে ভুল করেনি।

বেগতিক দেখে স্টুয়ার্ডের আসন থেকে মিঃ টানডিগ্রীণ ও বারোয়ারীর রাজা আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়লেন রবির ওপর। সঙ্গে যোগ দিল কর্তব্যপরায়ণ দেহরক্ষীর দল। আততায়ী বেকায়দায় পড়েছে। রিভলবারের গুলীও শেষ। সুতরাং এতক্ষণ সাহস না পেলেও এবার আর বীরত্ব দেখাতে কোন অসুবিধে নেই।

বীরত্ব নয় তো কি! নিরস্ত্র একটি কিশোরের প্রতি দল বেঁধে আক্রমণ চালিয়ে চিরদিনের মতো তাঁকে পঙ্গু করে দেওয়াটাকে বীরত্ব ছাড়া আর কি বলা যায় মল্লিকা?

অথচ পাশাপাশি একটি বিপরীত চিত্র দেখ। অচৈতন্য অবস্থায় ভবানী তখন হাসপাতালে। চারপাশে তাঁর অগণিত সেপাই-সান্ত্রী ও শ্বেতাঙ্গ শাসকদের দল। বাঙালীকে আর বিশ্বাস নেই। ওরা সব পারে। সুতরাং সতর্ক থাকাই ভাল।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে ভবানী প্রথমেই কি বলেছিলেন জানো? না, নিজের কোন কথা নয়। বাবা-মা-ভাই-বোন বা সহকর্মী রবির কথাও নয়। শুধু একটি মাত্র ছোট্ট প্রশ্ন।

'Is Anderson still alive?'

পাশাপাশি এ দুটি চিত্রের মধ্যে কোন্‌টাকে তুমি বীরত্ব বলে আখ্যা দেবে মল্লিকা?

এদিকে খবর শুনে সারা দেশ জুড়ে তখন সে কি তুমুল আলোড়ন!

সবার মুখে একই কথা। যাদের রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না, সেই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ইংরেজ সরকারের গর্বস্ফীত চ্যালেঞ্জের উপযুক্ত জবাব দিলেন কিনা বাংলাদেশেরই দুই দামাল কিশোর, ভবানী আর রবি! হাজার সাবাস ওদের!

অবশ্য অ্যাণ্ডারসনের মৃত্যু হয়নি। তা নাই বা হল! কারণ, মৃত্যুটাই বড় কথা নয়। এক অ্যাণ্ডারসন গেলে আর-এক অ্যাণ্ডারসন আসবে। সেখানে সবাই এক।

আসল কথা হল অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করা। হিংস্রতা ও পাশবিকতার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ আঘাত হানা।

সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে অফুরন্ত প্রাণ-সম্পদে ভরপুর বাংলাদেশের এ দুটি মৃত্যুভয়হীন কিশোর যেভাবে ওদের ঐ সাম্রাজ্যবাদী দম্ভকে পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন, সংসারে তার তুলনা কোথায়?

যাক, আগেকার কথায় ফিরে যাই। ভবানী আর রবি দুজনেই বন্দী। কিন্তু মনোরঞ্জন আর উজ্জ্বলা মজুমদারের খবর কি? তাঁরা তখন কোথায়?

খবর পাওয়া গেল শিলিগুড়ি স্টেশনে।

সন্ধ্যা তখন হয়-হয়। কলকাতার গাড়ি ছাড়ার সময় হয়েছে।

হঠাৎ বিরাট এক পুলিস বাহিনীর আবির্ভাব। জরুরী ম্যাসেজ এসেছে দার্জিলিং থেকে। একটি মেয়েকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

অত্যন্ত ডেঞ্জারাস টাইপের মেয়ে। পরনে পিঙ্ক রঙের শাড়ি। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। গায়ের রঙ খুব ফর্সা। নাম—কুমারী উজ্জ্বলা মজুমদার। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ প্রতিটি কামরা। দেখা পেলে সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার।

এই তো একটি মেয়ে চুপচাপ বসে আছে এখানে। গায়ের রঙও বেশ ফর্সা।

কিন্তু চোখে চশমা নেই তো! পিঙ্ক রঙের শাড়িই বা কোথায়! এ তো দেখছি সাদাসিধে ধরনের সাধারণ সাদা রঙের শাড়ি।

উহুঁ, এ মেয়ে সে মেয়ে নয়। চল অন্য কামরায়।

তখনকার মতো ফাঁড়া কাটলেও শেষপর্যন্ত কিন্তু রেহাই পাওয়া গেল না। অবশেষে ঠিক দশ দিন পরে ১৮ই মে তারিখে পিঙ্ক রঙের শাড়ির খোঁজ পাওয়া গেল খ্যাতনাম্নী কংগ্রেস-কর্মী শোভারাণী দত্তর বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার। একজন নয়, দুজনেই।

গ্রেপ্তার করা হল ঢাকা ও কলকাতার আরো অনেককেই।

দেওভোগ ঘটনার অন্যতম নায়ক সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানার্জী এবং উজ্জ্বলা মজুমদারের সহকর্মী মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, সুশীল চক্রবর্তী প্রমুখ কেউ বাদ গেলেন না। জাল ফেলে সবাইকে টেনে তোলা হল একে একে।

সুকুমার ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হল মেটিয়াবুরুজের সেই রাজেন গুহর আস্তানা থেকে।

বলা বাহুল্য, রাজেনবাবুও রেহাই পেলেন না। ইতিপূর্বে বিনয় বোস, বিমল দাশগুপ্ত প্রমুখ এমনি কতজনকে তিনি নিজের গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন একান্ত আপনজনের মতো। কোনদিন কারো মনে এ নিয়ে এতটুকুও সন্দেহের উদ্রেক হয়নি।

দুর্ভাগ্য, এবার আর তা হল না। ফলে, ছেলে গিরীন্দ্র গুহ সহ তাঁকেও এবার গ্রেপ্তার বরণ করতে হল পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অপরাধে।

একমাত্র ব্যতিক্রম যতীশ গুহ। তখনকার মতো রেহাই পেলেও একটা চঞ্চল জিজ্ঞাসা কিন্তু সর্বক্ষণ জেগেই রইল পুলিসের দৃষ্টিতে।

উঁহু, লোকটিকে বাইরে থেকে যতটা গোবেচারা বলে মনে হয়, আসলে যেন ঠিক তা নয়। কোথায় যেন অন্য একটি মানুষ লুকিয়ে আছে ওর ঐ মুখোশের আড়ালে, যাকে ঠিক বোঝা যায় না। ঠিক আছে, জাল তো পাতাই রয়েছে। যাবে আর কোথায়!

বাদবাকি সবাইকে ছেড়ে দিয়ে একমাত্র ভবানী ভট্টাচার্য, রবি ব্যানার্জী, উজ্জ্বলা মজুমদার, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানার্জী আর সুশীল চক্রবর্তীকে আসামী তালিকাভুক্ত করে ৭ই আগস্ট তারিখে শুরু হল বিচার।

রবিকে আনা হল ডাণ্ডি করে। পুলিসের নৃশংস আক্রমণ চির-কালের মতো তাঁকে পঙ্গু করে দিয়েছে।

আদালত-গৃহে অ্যাণ্ডারসনী দম্ভকে আর-একবার খান খান করে ভেঙে দিলেন কিশোর বিপ্লবী ভবানী ভট্টাচার্য। ট্রাইবুন্যালের সভাপতি জে. ইয়ুনির প্রশ্নের উত্তরে তিনি কি বলেছিলেন জানো?

কোন কিছুর পরোয়া না করে দৃপ্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছিলেন:
—'I came to assassinate the Governor. My object was to murder him. I have nothing more to say. None but myself and Rabi took part in the action connected in this conspiracy.' [Amrita Bazar Patrika, 26. 8. 34.]

[আমি গভর্ণরকে হত্যা করব বলে এসেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে হত্যা করা। আমি আর রবি ছাড়া একাজে অন্য কেউ জড়িত ছিল না।]

রায় দেওয়া হল ১২ই সেপ্টেম্বর।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই হল। ভবানী ও রবিকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। তবে একবার নয়, দুবার। অ্যাণ্ডারসনী রাজত্বে কারো কাছে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গেলে তার একমাত্র শাস্তি ছিল, মৃত্যু। সুতরাং আগ্নেয়াস্ত্র রাখা ও হত্যার চেষ্টা করা—এ দুটি বিভিন্ন অপরাধে দুবার করে তাঁদের প্রাণ দিতে হবে ফাঁসির রজ্জুতে।

অশেষ করুণা সদাশয় সরকার বাহাদুরের। তাই মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর বেলায় কিছুটা খাতির করা হল। তাঁকে একবার মাত্র প্রাণ দিলেই চলবে।

আরো একটু বেশি খাতির করা হল উজ্জ্বলা মজুমদারকে।

হাজার হোক মহিলা! তাই তাঁকে দেওয়া হল যথাক্রমে বিশ বছর দ্বীপান্তর, আর চৌদ্দ বছর সশ্রম কারাবাস।

সুকুমার ঘোষ ও মধু ব্যানার্জীর চৌদ্দ বছরের দ্বীপান্তর। অবশ্য সুকুমার ঘোষের একবার নয়, দুবার। আর সুশীল চক্রবর্তীর বারো বছর।

অবশ্য হাইকোর্টে কিছুটা রদবদল হল। সেখানে ফাঁসির পরিবর্তে মনোরঞ্জনকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। উজ্জ্বলা মজুমদার ও সুকুমার ঘোষের চৌদ্দ বছর। বাদবাকি যা আছে তাই।

এবার দাবী তুললেন পাদ্রী সাহেবের দল। বিশেষ করে মিসেস্ ফ্লিঞ্চ। রবি আমাদের ঢাকার ব্যাপটিস্ট মিশনের অত্যন্ত কৃতী ছাত্র। মিশনের ছেলেকে ফাঁসি দেওয়া চলবে না।

চাপে পড়ে জাতভাইদের দাবী মেনে নিলেন অ্যাণ্ডারসন। তাই হোক। ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে আমি তাঁকে আন্দামানে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিচ্ছি।

তবু খুশি হতে পারলেন না মিশনারীর দল। উঁহু, তা হয় না। ওটাও তোমাকে রদ করতে হবে বাপু।

বছরখানেক ধানাই-পানাই করে এবারও নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন অ্যাণ্ডারসন। ঠিক আছে, আমি তাকে আন্দামান থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছি।

তবে দুটো শর্তে। এক—জেল-গেট থেকেই তাকে সোজা গিয়ে উঠতে হবে বিলেতের জাহাজে। দুই—হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত কোন-দিনই সে দেশে ফিরে আসতে পারবে না।

১৯৩৫ সাল। ৩রা ফেব্রুয়ারি। রাজসাহী সেন্ট্রাল জেলে সেদিন ভবানীর জীবনের শেষ রাত্রি। বিদায়ের আগে ভবানী তার জীবনের শেষ চিঠি লিখলেন আত্মীয় প্রিয়জনদের লক্ষ্য করে—'অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু ভয় পায়, সাধক সেখানে সিদ্ধিলাভ করে…'

উজ্জ্বলা মজুমদার তখন মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে। সহকর্মী ভবানীর জীবনের সেই অন্তিম লগ্ন যে সেদিন তাঁর মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, সেকথা তাঁর নিজের লেখনী থেকেই খানিকটা এখানে তুলে দিচ্ছি।

'...তারপর? তারপর রাজসাহী জেলের এক অসহ্য রাত। বহুদূরে অপর এক জেলে বসেই মনে মনে শুনি—রাতের গভীরে ভবানীর কণ্ঠে ফাঁসির রজ্জু পরিয়ে দিয়েছে বিদেশী শাসক। মুহূর্তে ধূলায় গড়িয়ে পড়েছে তার সোনার দেহ। সে রজনীর ইতিহাস গৌরবে সুন্দর, অশ্রুজলে বিধুর। সে রাত ভুলবার নয়। সেই রাতে একটি বাণীকে বুঝতে চেয়েছিলাম, ভবানীরই কণ্ঠে অনেকবার শোনা রবীন্দ্রনাথের একটি গানে:

'কাঁপিবে না ক্লান্ত কর
টুটিবে না বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি
দীর্ঘরাত্রি রব জাগি
দীপ নিভিবে না।'

তবু দীপ নিভে গেল। নির্মম ফাঁসির রজ্জু ভবানীর কণ্ঠ-বীণাকে স্তব্ধ করে দিল। কিন্তু অদৃশ্য রেখায় 'অদৃশ্য আলোকে'র অন্তহীন সামর্থ্যে ঐ দীপ থেকে সেদিন যে আলোক বিচ্ছুরিত হয়েছিল, ওই মধুকণ্ঠ থেকে যে ধ্বনি বিকিরিত হয়েছিল তা যে অভ্রান্ত ও শাশ্বত।

শহীদ-কুলের বিভায় সমুজ্জ্বল যে বিপ্লববাণী, তাকে নিরস্ত করার সামর্থ্য কোন যুগে কোন শক্তিই আয়ত্ত করে পারেনি।'

[সবার অলক্ষ্যে, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৪]

এবার তোমাকে বৈপ্লবিক সংস্থা অনুশীলন সমিতি সম্বন্ধে কিছু বলব মল্লিকা।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, অগ্নিযুগের শেষ অধ্যায়ে যা শুরু

হয়েছিল চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, সেই শেষপর্বে অন্যান্য দলগুলোর তুলনায় অনুশীলন সমিতির ভূমিকা বেশ একটু নিষ্প্রভ।

কি এর কারণ ?

কারণ আর কিছু নয়, আসলে তাঁদের লক্ষ্য ছিল তখন অন্যদিকে। অর্থাৎ, কোন বিচ্ছিন্ন আক্রমণ নয়, কোন আঞ্চলিক ব্যাপার নয়। চাই সর্বভারতীয় বিপ্লব। চাই সশস্ত্র সেনা-বিদ্রোহ, যে প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে একবার করা হয়েছিল মহানায়ক রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে।

তোড়জোড় শুরু হয়েছিল ১৯৩১ সাল থেকেই। নেতৃস্থানীয় সবাই সেদিন লৌহ-কারার অন্তরালে।

কিন্তু এভাবে বন্দী-জীবন মেনে নিলে আর তো চলবে না। পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে বাইরে যাওয়া প্রয়োজন। সুতরাং চল এবার সবাই বাইরে। তারপর দৃঢ়পায়ে এগিয়ে চল আপন লক্ষ্যের দিকে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী বিপ্লবী পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের নির্দেশে প্রথমেই বক্‌সা ক্যাম্প থেকে পালালেন কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী আর জীতেন গুপ্ত।

প্রভাত চক্রবর্তী আর পরেশ গুহও একদিন উধাও হলেন অন্তরীণ অবস্থা থেকে।

সব শেষে এল পূর্ণানন্দের পালা। যে করে হোক, জেল থেকে পালাতেই হবে।

প্রচেষ্টা সার্থক হল আলিপুর জেলে থাকাকালীন সময়ে ।

প্রবল বৃষ্টির মধ্যে একজনের কাঁধে একজন দাঁড়িয়ে যেভাবে সেদিন তিনি সহকর্মী নিরঞ্জন, হরিপদ ও সীতানাথ দে সহ আলিপুর জেলের ঐ আকাশছোঁয়া পাঁচিল ডিঙিয়ে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মগোপন করেছিলেন, তা যে কোন ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসকেও বুঝি হার মানায়।

ওদিকে ততক্ষণে পাগলা ঘন্টি বেজে উঠেছে। হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! আসামী পালাচ্ছে! ঐ যে ওরা পাঁচিলের ওপর উঠেছে! তৈয়ার হো যাও!

ঘণ্টা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তৎপর প্রহরীর দল ছুটে এল ছোট গেট দিয়ে।

কিন্তু কার সাধ্য ওদিকে এক পা এগোয়! গেট আগলে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দলের একনিষ্ঠ কর্মী অমূল্য সেন। প্রাণ থাকতে তিনি গেট ছাড়তে রাজী নন।

আঘাতে আঘাতে সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল অমূল্য সেনের, তবু তিনি নিজের প্রতিজ্ঞায় অবিচল রইলেন শেষপর্যন্ত।

বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে সহকর্মী পূর্ণানন্দ, নিরঞ্জন, হরিপদ ও সীতানাথ দে-র আজ বাইরে যাওয়া প্রয়োজন। যত নির্যাতনই আসুক না কেন, কর্তব্যের খাতিরে সেই সুযোগ তাঁদের দিতেই হবে।

অমূল্য সেনের সেই অনমনীয় দৃঢ়তা সেদিন ব্যর্থ হয়নি মল্লিকা। ঘুরে ঘুরে পূর্ণানন্দ প্রমুখ সবাই সেদিন চলে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন দলের নিজস্ব ঘাঁটি জগদ্দল কেন্দ্রে।

শুধু যেতে পারেননি হরিপদ। কিছুক্ষণ বাদেই আবার তিনি ধরা পড়েছিলেন বালীগঞ্জ স্টেশন-সংলগ্ন একটা রাজপথের ধারে।

বাকি সবার পক্ষেও বেশিদিন আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব হল না। পাল্টা আঘাত এল ১৯৩৬ সালের ২০শে জানুয়ারি, টিটাগড়ে। পূর্ণানন্দ সহ অনেকেই সেদিন ধরা পড়লেন একে একে।

আর ধরা পড়লেন কুমিল্লার পলাতক বিপ্লবী কুমারী পারুল মুখার্জী। ধরা পড়লেও তার আগেই তিনি নষ্ট করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন বেশ কিছু গোপনীয় কাগজ-পত্র।

শুরু হল পাশাপাশি দুটি মামলা।

একটি আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা। পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, সীতানাথ দে, প্রভাত চক্রবর্তী, পরেশ গুহ, জীতেন গুপ্ত, হরিপদ দে,

ধীরেন ভট্টাচার্য প্রমুখ চল্লিশ জনকে অভিযুক্ত করা হল ষড়যন্ত্রের অপরাধে।

অন্যটি টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা। আসামীর সংখ্যা মোট উনত্রিশ জন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, প্রীতিরঞ্জন দাস পুরকায়স্থ, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শান্তিরঞ্জন সেন, প্রফুল্লকুমার সেন, পারুল মুখার্জী, শ্যামবিনোদ পালচৌধুরী, প্রণব কুমার রায়, কালীপদ ভট্টাচার্য, হরেন্দ্রনাথ মুন্সী, বিভূতি দত্ত, নিরঞ্জন ঘোষাল, ধনেশ ভট্টাচার্য প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ।

বলা বাহুল্য যে, কাউকেই রেহাই দেওয়া হল না। রেহাই দেবার প্রশ্নই ওঠে না। হাতের মুঠিতে একবার যখন পাওয়া গেছে তখন প্রতিহিংসা নেবার এমন অপূর্ব সুযোগ যে সদাশয় সরকার হারাবেন না, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং সবাইকেই দণ্ডিত করা হল দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ডে। অথচ কোন action তাঁরা করেছেন বলে প্রমাণ নেই।...

পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটল ১৯৩৭ সালের শেষভাগে।

শুরু হল দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন। শাসনের নামে দেশের যুবশক্তিকে এভাবে কারারুদ্ধ করে রাখা চলবে না।

হাজার হাজার যুবক-যুবতী বন্দী। বিনা বিচারে আটক বন্দীর সংখ্যাও কম নয়। তাছাড়া কত শত শত তরুণ যে অন্তরীণ জীবন-যাপন করছে, তার বোধহয় কোন গোনাগুনতি নেই। তার ওপর রয়েছে আন্দামানে নির্বাসিত বন্দীর দল। ওদের ভাগ্য নিয়ে এভাবে আর ছিনিমিনি খেলা চলবে না।

একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল বিলেতের পার্লিয়ামেন্টের লেবার পার্টির সদস্যদের মুখে।

এই কি ইংরেজ শাসনের নমুনা। দেশের যৌবনকে পাশবিক শক্তি দিয়ে এভাবে কারারুদ্ধ করে রাখলে ইংরেজ শাসনের ব্যর্থতাটাই কি বড় হয়ে দেখা দেবে না সারা পৃথিবীর চোখে?

সরকার ও বন্দীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য এবার এগিয়ে এলেন গান্ধীজী।

এভাবে হাজার হাজার ছেলেকে আটক করে রাখা মানে দেশের শ্রেষ্ঠ যুবশক্তির অবদান থেকে কংগ্রেসকে বঞ্চিত করা। সুতরাং যে করে হোক, দুপক্ষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

শুধু ছোট্ট একটি শর্ত। ওরা মুখে একবার বলুক যে, ভবিষ্যতে আর কোনদিনই ওরা হিংসার পথে পা বাড়াবে না।

আলোচনার সুবিধার জন্য সুরেন ঘোষ, জ্যোতিষ ঘোষ, রমেশ আচার্য, রবি সেন, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, জীবন চ্যাটার্জী, মেজর সত্য গুপ্ত, ভূপতি মজুমদার, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, পূর্ণ দাস, অরুণ গুহ, ভূপেন দত্ত, প্রতুল গাঙ্গুলী, রসিক দাস, প্রতুল ভট্টাচার্য প্রমুখ সমস্ত State Prisoner-দেরকে (Regulation III-তে আটক) বহির্বাংলার নানা জেল থেকে নিয়ে আসা হল হিজলী বন্দী-নিবাসে।

কিন্তু সব বৃথা। কিছুতেই তাঁরা রাজী হলেন না গান্ধীজীর প্রস্তাবের কাছে নতি স্বীকার করতে।

তাঁদের সাফ কথা, কোনরকম শর্তাধীনে মুক্তি পেতে আমরা রাজী নই। আর ভবিষ্যতে কি করব না করব, সে দায়িত্ব পুরোপুরি আমাদের। সে সম্বন্ধে কোনরকম প্রতিশ্রুতি দিতে আমরা অক্ষম।

পরদিনই সে খবর বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়।

'The Revolutionary Leaders refused Conditional Release !'

আর একবার প্রেসিডেন্সি জেলে, কিন্তু ফল দাঁড়াল সেই একই। অর্থাৎ, কোনরকম শর্ত নয়, প্রতিশ্রুতিও নয়। আগে মুক্তি, তারপর অন্য কথা।

শেষপর্যন্ত তাই মেনে নিতে হল মহামান্য সরকার বাহাদুরকে। ফলে, শুরু হল বন্দী-মুক্তি। একসঙ্গে নয়, ধাপে ধাপে।

শুধু মুক্তি দেওয়া হল না দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দিগণকে। কারণ, ইতি-মধ্যে মহাসমর শুরু হয়ে গেছে। এ অবস্থায় এসব বিপজ্জনক যুবকদের মুক্তি দিয়ে কোনরকম ঝুঁকি নিতে সরকার প্রস্তুত নন।

ফলে, সেই দীর্ঘ বন্দী-জীবন। সেই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন দিন যাপনের গ্লানি। কোথায় এর শেষ কে জানে!

লৌহ-কপাটের দ্বার খুলল প্রায় এক যুগ বাদে, জীবন সায়াহ্নে এসে। তখন যুদ্ধ শেষ।

ইতিমধ্যে কত কাণ্ড ঘটে গেছে। কত রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে। কত উত্থান-পতন। কত গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী। কত আনন্দ-বেদনার টুকরো টুকরো ইতিহাস। ঘরছাড়া এই পথিকের দল তার স্বাদ থেকে একেবারেই বঞ্চিত। পাষাণ-কারার অন্তরালে দিন আর রাত্রির যে একই চেহারা।

সেদিন এই বিপ্লবী নায়কদের অভিনন্দন জানিয়ে সাময়িক পত্রিকায় কি লেখা হয়েছিল শোন:

'অবশেষে বাঙলার রাজবন্দীদের শেষদল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বিদেশী গভর্ণমেণ্ট এবং তাহাদের প্রভাবাধীন প্রতিক্রিয়া-পন্থী শাসকের দল বাঙলার এই সব স্বদেশপ্রেমিক বীর সন্তানকে দীর্ঘদিন বিনাবিচারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইহারা বীরত্বে, ত্যাগে এবং দেশসেবার বলিষ্ঠ একনিষ্ঠ সাধনায় বাঙলা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

জগতের যে কোন দেশ শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের ন্যায় দুহিতা এবং শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, অনিল রায়, রবীন্দ্রমোহন সেন, রমেশ আচার্য, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, সত্য গুপ্তের ন্যায় বীর সন্তান লাভ করিয়া গর্ব বোধ করিতে পারে।

স্বদেশের স্বাধীনতার সাধনায় ইঁহাদের আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বল আদর্শ জগৎকে বিস্মিত করিয়াছে এবং ইঁহাদের বীর্যময় কর্মোত্তম ভারতের স্বাধীনতার শত্রুদের হৃদয়ে সন্ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে।

আজ আমরা ইঁহাদের আনন্দের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি। ইঁহাদের আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় এবং কর্মসাধনায় বাঙলা দেশে নূতন জীবনের সঞ্চার হইবে, আমরা ইহাই আশা করি।'...

[সাপ্তাহিক দেশ : ২৬শে মে, ১৯৪৬ সাল]

অগ্নিযুগের কথা আপাতত এখানেই শেষ করছি মল্লিকা। আবার তোমাকে নতুন করে তাঁদের কাহিনী শোনাব দ্বিতীয়-পর্বে।

লিখতে গিয়ে আজ বার বার মনে পড়ছে অগ্নিযুগ-সংখ্যা উল্টোরথে প্রকাশিত প্রবীণ বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেনের সেই কথাগুলো :

'স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা জীবন পণ করেছিলেন, দুঃখকে জয় করে দুঃখাতীতের মুক্তির সন্ধানে অভিযাত্রী হয়েছিলেন, তাঁদের নিয়েই তো ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যদি ভারতবর্ষই না রইল তবে সে কিসের ইতিহাস, কার ইতিহাস ?

বাংলার বিপ্লব-যজ্ঞে বুকের পাঁজরে পূজার হোমানল জ্বেলে রেখেছেন বাংলাদেশেরই কত শহীদ। তাঁদের ক'জনের কথা আমরা জানি ? যাঁদের নাম শুনেছি, তাঁদের বহুবিচিত্র জীবনের কতটুকুই বা জানি আমরা ? আর নাম যাঁদের শুনিনি তাঁদের সংখ্যা তো নিরূপণ করা অসম্ভব। তা বলে কি দেশ ও জাতি তাঁদের অস্বীকার করবে ?'

অস্বীকার করেনি কি ?

দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সেদিন যাঁরা জীবনের জয়যাত্রার পথ রচনা করে গিয়েছেন, কতটুকু তাঁদের স্বীকৃতি দিয়েছে আজকের এই স্বাধীন দেশের মানুষ ?

সরকারী উদ্যোগে প্রচুর অর্থব্যয় করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা

সংগ্রামের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, কোথায় সেখানে স্থান বাংলা-দেশের এই অগণিত মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদদের ?

একটি পাতাও সেখানে তাঁদের জন্য ব্যয় করা হয়েছে কি ? কোথাও দেওয়া হয়েছে কি তাঁদের এতটুকু স্বীকৃতি বা মর্যাদা ?

না হয়নি।

হাসিমুখে মৃত্যু-বন্দনা করে যতই তাঁরা ভীত, আতঙ্কিত ভারত-বাসীকে সেদিন অপরিম্লান জীবনের পথ দেখিয়ে থাকুন না কেন, আজ আর তাঁদের কোন দামই নেই স্বাধীন দেশের এই ভাগ্য-বিধাতাদের বিচারে। তাঁরা অপাংক্তেয়, ফসিল মাত্র।

কেন এই হীনমন্যতা ? কি এর কারণ ?

'মিসগাইডেড' নেতা সুভাষ বা তাঁর অনুগামী বাংলাদেশের তথা-কথিত 'ভ্রান্ত' বিপ্লবী-সমাজ আর যাই করুন, লাভ-লোকসানের হিসেব খতিয়ে কোনদিনও দেশ-সেবা করেননি। এটাই কি তাঁদের সবচাইতে বড় অপরাধ ?

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই ;
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।'
—রবীন্দ্রনাথ

'কমিউনিস্টদের আপনারা চিনে রাখুন। মনে রাখবেন, ওরাই সেদিন আমাদের নেতাজীকে জাপানীদের দালাল বলে কটূক্তি করেছিল।'

মাঠে-ময়দানে এ ধরনের অভিযোগ নিশ্চয়ই তুমি শুনে থাকবে মল্লিকা। বিশেষ করে নির্বাচনের প্রাককালে। তখন তো বলতে গেলে এটাই সবচাইতে বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় এক শ্রেণীর বক্তাদের কাছে।

অভিযোগ সত্য। শুধু সত্য নয়, যাকে বলে নির্মম সত্য। সুভাষ-বিরোধিতার ব্যাপারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে সেদিন কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, ইতিহাসই তার সবচাইতে বড় সাক্ষী।

কিন্তু শুধু কি ওরাই? এ ব্যাপারে অভিযোগকারীদের ভূমিকাই কি খুব একটা সমর্থনযোগ্য ছিল?

'সুভাষ বোস ফিরে এলে আমিই সবার আগে খোলা তরবারী নিয়ে তাকে রুখে দাঁড়াব।' এ উক্তি কার? পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নয় কি?

'হাজার হোক, সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন।' এ উক্তি কে করেছিলেন? নির্বাচনে পরাজিত হবার পরে স্বয়ং গান্ধীজীর মুখ থেকেই কি এই বক্রোক্তি শোনা যায়নি?

তাহলে শুধু একপক্ষকে দোষ দিয়ে লাভ কি? তফাতটা কোথায়?

কেন এই বিরোধ? কেন সেদিন সুভাষকে বহিষ্কার করা হয়েছিল কংগ্রেস থেকে?

নির্বাচিত সভাপতির বিরুদ্ধে অহিংস-নীতিতে বিশ্বাসী দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী নেতৃবর্গ যেভাবে সেদিন হিংস্র মূর্তি ধরে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা কি গণতন্ত্রসম্মত হয়েছিল? এই কি গণতন্ত্রের নমুনা?

তাছাড়া অপরাধটাই বা কি?

একমাত্র কারণ দেখা যায় যে, কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড, তথা গান্ধীজীর মতামত উপেক্ষা করে সুভাষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাটা কি অপরাধ?

এই সেদিনও হাই কম্যাণ্ডের মতামত উপেক্ষা করে মোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কই, তাঁকে তো বহিষ্কার করা হল না!

তাহলে সুভাষের বেলায় ব্যতিক্রম হল কেন? সুভাষ, তথা তাঁর সমর্থক বামপন্থী দলগুলোকে ছলে-বলে-কৌশলে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যই নয় কি?

সুভাষের পথ চিরাচরিত পথ নয়। বিরাট তার ভূমিকা। কর্মক্ষেত্রও বহুদূরবিস্তৃত। তার মধ্যে তাঁর ছাত্রজীবন, আই. সি. এস. খেতাব বর্জন, দেশবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ, সব শেষে তিন-আইনের বন্দী হিসেবে দীর্ঘদিন মান্দালয় জেলে অবস্থানের কাহিনী নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়। তাই পুনরাবৃত্তি না করে আমি শুধু এই বিরোধ-পর্বের প্রধান ঘটনাগুলোই একে একে তোমার কাছে তুলে ধরব মল্লিকা। মনে রেখো, এ আমার মনগড়া কাহিনী নয়, ইতিহাস। এক মর্মান্তিক বেদনাদায়ক ইতিহাস, যা অপ্রিয় হলেও সত্য।

শুরু হয়েছিল ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত সেই কলকাতা কংগ্রেসে, যেবার জি. ও. সি. বেশে সুভাষ ও তাঁর বহু পরিশ্রমে গড়া ভলান্টিয়ার্স

বাহিনী দেখে গান্ধীজী ঠাট্টা করে বলেছিলেন—'পার্ক সার্কাসের সার্কাস'!

যেদিকে পাল্লা ভারী সেদিকে ঝুঁকে পড়াইতো বুদ্ধিমানের লক্ষণ। তাই সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী জনসেবক সমস্বরে রব তুললেন—সার্কাস! সার্কাস! পার্ক সার্কাসের সার্কাস!

মুহূর্তে ভোল পালটে কিভাবে যে সেদিন তাঁরা সুভাষের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে মুখর হয়ে উঠেছিলেন, তখনকার সময়ের পত্র-পত্রিকা থেকে তার কয়েকটি নমুনা এখানে তুলে দিচ্ছি মল্লিকা।

'সেলাম নেহেরু, কেটে পড় বাছা,
সেলাম বৃদ্ধ গান্ধী।
হাফ প্যান্টের নাই বটে কাছা
তবুও কোমর বান্ধি—
বুকে জোর থাকে চলে এস সাথে
স্বাধীনতা শুধু কাম্য
স্বাধীনতা ধ্বজা ধর এক হাতে
আর হাতে ধ্বজা সাম্য,
মুখে কহ শুধু জয়তু বঙ্গ
জয়তু সুভাষচন্দ্র
নতুবা দাও হে পৃষ্ঠ ভঙ্গ
যে হও, তামিল অন্ধ্র—
দেখিস না এই বিশ্ব ব্যাপিয়া
মাথা তুলিয়াছে চ্যাংড়া,
যুবা ইয়োরোপ, যুবক এশিয়া
কাঁচা পীচ কাঁচা ল্যাংড়া॥'

[শনিবারের চিঠি]

'হে চির তরুণ ধন্য।
গান্ধী গোখেল হইল হন্ত
তুমি এলে সেই জন্য।
শোভে ঝলমল জরির পোশাক
রাবড়ি সেবিত অঙ্গে,
শিখ মারাঠিরা বিষম অবাক
মিলিটারী দেখে বঙ্গে।'

[শনিবারের চিঠি]

'সিংহ চর্মে শোভিত রাসভ
দিকে দিকে তাই ওঠে জয়রথ,
ভেকদল আজ করে কলরব
হাতীরে না মানে হাতী।'

[শনিবারের চিঠি]

'হেথা জাতীয় সমরে যুবা সৈনিক
যেন পারাবত লক্কা,
কারো ভাঙা শিরদাঁড়া, সম্বল কারো
ঘুণ ধরা বুকে যক্ষ্মা।'

[শনিবারের চিঠি]

'সেই শ্রীমান খোকারে ঘিরিয়া যত
ডাকাতের হল gang-*
পাকা গুরু হয়ে সেথা নয়া ভগবান
বাড়াইয়া আছে ঠ্যাং।'

[শনিবারের চিঠি, ভাদ্র, ১৩৩৫]

* বিপ্লবীদের কটাক্ষ করে ডাকাতের gang বলা হয়েছে।

এখানেই শেষ নয় মল্লিকা। কারো রোগ-শোক নিয়ে ব্যঙ্গ করাটা আর যাই হোক, সভ্য রীতি নয়। শালীনতা বিসর্জন দিয়ে তাও কিন্তু সেদিন করতে বাকি রাখেনি তথাকথিত ঐ দেশসেবকের দল। মান্দালয় জেলে থাকাকালীন সুভাষ একবার যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছেন বলে চিকিৎসকরা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, সে খবর তুমিও জানো। তাই নিয়েও সেদিন কটাক্ষ করে লেখা হয়েছিল :

'ইতিমধ্যে কলিকাতা কংগ্রেস আসিয়া পড়িল। বিরাট আয়োজন, বিষম হট্টগোল হৈ-চৈ। বাংলা মায়ের কোলজোড়া ছেলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বাংলার নবজাগ্রত তরুণ সংঘের দুইজন বা ততোধিক একত্রিত হইলেন। ফাঁকা জায়গা দেখিয়া লেফ্‌ট্‌-রাইট্‌ ক্রমে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিলেন।

সুবিখ্যাত 'দেশবন্ধুবাস' তরুণী ভলান্টিয়ারদের লইয়া পাড়ায় পাড়ায় হানা দিতে আরম্ভ করিল।

'নেশানাল' সৈন্যদলের জন্য ৮,০০০ জোড়া বুট ও হাজার হাজার খদ্দরের মিলিটারী হাফ প্যান্ট ও সার্টের অর্ডার চলিয়া গেল। খদ্দরের ক্যাপ ও পিস্তল রাখিবার খাপ তৈয়ার হইতে লাগিল। বিউগল ও বংশীধ্বনিতে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিল। পথে-ঘাটে নূতন জাতীয় সঙ্গীত ঐকতান সহযোগে শ্রুত হইতে লাগিল।

'কে আবার বাজায় বাঁশী, এ ভাঙা কুঞ্জবনে।' 'ফরোয়ার্ড' 'বাংলার কথায়' 'নোটিশের উপর নোটিশ।'

সেনাধ্যক্ষ সুভাষচন্দ্র নিজের বুকের দোষের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া ডাক্তারের সাহায্যে ভলান্টিয়ার সৈন্য বাছিতে লাগিলেন। যাহারা উচ্চতায় ৫ ফুট ৬ ইঞ্চির চাইতে কম এবং যাহাদের বুকের

মাপ ৩৪ ইঞ্চির বেশি নহে তাহারা অমনোনীত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বসুজাতা শ্রীমতী লতিকার নেতৃত্বে তরুণী সৈন্যদল ছাতে ছাতে কুচ্‌কাওয়াজ করিতে লাগিল।

...স্বয়ং সুভাষচন্দ্র একটি উপযুক্ত ঘোড়া বাছিয়া লইয়া ঘোড়ার জন্য চুমকির কাজ করা সাজ ও নিজের জন্য জরির কাজ করা ৩০০ টাকা মূল্যের এক সুট তৈয়ার করিয়া প্রমাণ সাইজ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নেতৃত্ব প্রাক্‌টিশ করিতে লাগিলেন।......

তারপর প্রেসিডেন্ট আসিলেন। সেও এক কাণ্ড। মল্লিক-বাড়ির বড়-তরফের বিবাহ তো ছেলেমানুষ। ১০১ তোপ, ৩৪ ঘোড়া, ১,০০০ ঘোড়সওয়ার, ২,০০০ মোটর সওয়ার, ২০,০০০ পদাতিক পুরুষ সৈন্য, ২ হাজার রমণী বাহিনী, তিন কেতা ব্যাণ্ডের দল, ২৫টি তোরণ-দ্বার, কমসে কম ৫ লক্ষ দর্শক, বিউগল, ব্যাণ্ড, বাঁশী, ঘোড়ার হ্রেষা, মানুষের বন্দে মাতরং ও জাতীয় সঙ্গীতে 'কে আবার বাজায় বাঁশী, এ ভাঙা কুঞ্জবনে,' ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার খুটখুট আওয়াজ, ফুলের মালা, কাগজের মালা, বাতাসা, খই।

মনে পড়িল, সাত শতাব্দী পূর্বে মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী যেদিন বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সেদিনও এমন আয়োজন হয় নাই।

মনে পড়িল, পলাশী যুদ্ধের পর আম্রকানন-প্রত্যাগত বীরের দলও এমনভাবে কলিকাতায় প্রবেশ করে নাই।'

[শনিবারের চিঠি]

এই কলকাতা অধিবেশনেই গান্ধীজী প্রস্তাব আনলেন—আমরা ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস বা স্বায়ত্ত-শাসন চাই। পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতাও নয়। ইংরেজের আওতার মধ্যে থেকে শুধু ঐটুকু পেলেই আমরা খুশি।

—আমি প্রতিবাদ করছি। বিপ্লবী বাংলার প্রতিনিধিরূপে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন সুভাষ। ঐ আধখানা স্বাধীনতা আমি চাইনে। চাই পূর্ণ স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতায় কোন খাদ নেই। শর্ত নেই।

নিঃশ্বাস ফেলতেও বুঝি ভুলে গেলেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত প্রবীণ কংগ্রেসী নেতৃবর্গ।

গান্ধীজী ভারতের মুকুটহীন সম্রাট। কার এতবড় সাহস যে, তাঁর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে! কে এই বিদ্রোহী যুবক।

সুভাষ। সুভাষ! সুভাষ।

দেশবন্ধুর মন্ত্রশিষ্য সুভাষ! 'খোকা ভগবান' সুভাষ। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 'গক', আজন্ম-বিপ্লবী সুভাষ!

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। শিক্ষা, দীক্ষা, সাহস, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও চিন্তাধারার দিক থেকে সত্যিই তিনি অতুলনীয়।

ঠিক তার বিপরীত হলেন কাজের বেলায়। সেখানে তিনি যেমন দুর্বল, তেমনই অসহায়।

সত্যি বলতে কি, বিংশ শতাব্দীর গত তিন দশকে তিনি যে মোট কতবার 'আমি সোস্যালিস্ট', কখনো বা 'আমি কমিউনিস্ট', এমনি পরস্পর-বিরোধী বিবৃতি দিয়েছিলেন, তার সঠিক হিসেব দেওয়া বোধ করি কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না।

দৃপ্তকণ্ঠে তিনি সমর্থন জানালেন সুভাষের প্রস্তাবকে। হ্যাঁ, এই তো চাই! এই তো হওয়া উচিত! আমাদের একমাত্র দাবী—পূর্ণ স্বাধীনতা। পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন কিছুই আমরা মেনে নিতে রাজী নই।

ব্যস্, ঐ পর্যন্তই। ভোট গ্রহণ কালে দেখা গেল অন্য চেহারা। তখন তিনি পুরোপুরি গান্ধী-পন্থী।

১৩৫০—৯৭৩ ভোটের ব্যবধানে সুভাষের হার হল। হার হল নীতিগত দিক থেকে নয়, অন্য কারণে। কারণ—গান্ধীজী। কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা গান্ধীজীর পক্ষে নতুন কিছু নয়। ভোট গ্রহণের পূর্বে এবারও তেমনি একটা আশঙ্কার কথা ছড়িয়ে দেওয়া হল প্রতিনিধিদের মধ্যে। ভোটে পরাজিত হলে গান্ধীজী নাকি দূরে সরে যাবেন কংগ্রেস ত্যাগ করে। ফলে, যা হবার তাই হল।

[ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল, সুভাষচন্দ্র বসু]

প্রতিবাদ করলেন শ্রদ্ধেয় সত্য বক্সী! ২রা জানুয়ারি 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় 'Muddled' শিরোনামা দিয়ে তিনি লিখলেন :

'It will be a grievous blunder on the part of the older leaders of Congress if they run away with the idea that the numerical voting strength in favour of Gandhiji's resolution is any index of its popularity···He who runs must take note of the determined and articulate rebellion against authority; he who runs must take note of the rebellion against popery, political or otherwise. No one is content today to take things as accepted, or trim one's convictions to the conveniences of fancies of men however reputed.

···It is no doubt true that persons and personalities do count, and the older order does not change in a day. A course of action that has to secure the approval of the ballot-box by marshalling on its sides all sorts of distinguished names of the country—revered Pandits and Maulanas, and above all, the mysterious spell of Sabarmati, does not seem to show intrinsic strength. It is a losing cause, and principles do not take long to defeat personalities.

There is nothing so dissipating and so demoralising as the confusion of thought and ideas.··· A programme of 'muddling on' does not encourage or inspire···It was hoped that the mental weaknesses or the intellectual hypocrisies involved in impossible compromises would be got over....The older leaders have again sought refuge in reservations and subterfuges.

Sj. Subhas Ch. Bose's amendment made the issue both clear and straight···That is the beginning of the struggle. The next few months will show whether subterfuges and mental reservations win, or a bold idea boldly conceived grips the heart, the intellect and the imagination of the country.'

হেরে গিয়েও কিন্তু এতটুকু দমলেন না সুভাষ। যুব-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে ভাষণ দিতে গিয়ে গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমের প্রাচীন ভাবধারাকে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বললেন :

'···ভারতের যৌবন আর প্রবীণ পক্ককেশ নেতাদের স্কন্ধে সব ভার নিক্ষেপ করিয়া জোড়হস্তে মূক মেষপালের মতো অনুগমন করিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা বুঝিয়াছে, স্বাধীন মহান শক্তিমান ভারত তাহারাই গড়িবে। সে দায়িত্ব তাহারা গ্রহণ করিয়াছে।'

'···সবরমতীর ভাবধারা তাহার প্রচারমুখে এই ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছে যে, আধুনিকতা মন্দ, কল-কারখানায় পর্যাপ্ত-দ্রব্যজাত সৃষ্টি অন্যায়, অভাব বৃদ্ধি করা অনুচিত, জীবনযাত্রার প্রয়োজন ও প্রাচুর্য বর্ধিত করা উচিত নহে। সর্বপ্রযত্নে গোরুর গাড়ির যুগে ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয় এবং দৈহিক উন্নতি অথবা সামরিক শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল আত্মার উন্নতি-সাধনই লক্ষ্য হওয়া উচিত।'

'···ভারতে আজ আমরা কর্মযোগের দর্শন চাহি। আমাদের বর্তমান যুগের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া বাঁচিতে হইবে। আমরা সর্বদ্বার-

রুদ্ধ জগতের কোণে বাস করিতে পারিব না। যখন ভারত স্বাধীন হইবে তখন তাহাকে আধুনিক শত্রুগণের সহিত আধুনিক প্রথাতেই যুদ্ধ করিতে হইবে—অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে।'

'গোরুর গাড়ির দিন গিয়াছে, চিরদিনের মতো গিয়াছে। স্বাধীন ভারতকে সর্বদা অস্ত্রে-বর্মে সুসজ্জিত থাকিতে হইবে—কালের প্রতীক্ষায়, যতদিন না জগৎ অস্ত্রশস্ত্র পরিহারের সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতেছে।' [আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯২৮ সাল]

সেই চিরাচরিত নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্ব।

প্রবীণের বক্তব্য—হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়, শুধু ভালবাসা। এই ভালবাসা দিয়েই আমি ইংরেজের হৃদয় পরিবর্তন করে স্বাধীনতা এনে দেব।

নবীন তা বিশ্বাস করতে রাজী নয়। তার যুক্তি, সাপ মারতে হলে লাঠির দরকার। মনসা পূজায় কোনদিনও সাপ মরে না।

প্রবীণ চায়, আপস-আলোচনার মাধ্যমে সাবধানে পা ফেলে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে।

নবীনের মতে, এটা কোন যুক্তিই নয়। ভিক্ষায় কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না। আলাপ-আলোচনা বা দর-কষাকষির মাধ্যমেও নয়। চাই সংগ্রাম। বৃথা কালক্ষয় না করে এখনই সংগ্রামের পথে পা বাড়ানো উচিত।

একজনের প্রথম ও শেষ কথাই হল, অহিংসা। এমন কি, স্বাধীনতার চাইতেও বুঝি সে অহিংস-নীতি তাঁর কাছে অনেক বেশি পবিত্র, অনেক বেশি মূল্যবান।

অন্যজনের জীবনভোর একটাই মাত্র স্বপ্ন—স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সে সব কিছু দিতে প্রস্তুত। সব কিছু করতে প্রস্তুত। মোদ্দা কথা, ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবেই হোক, স্বাধীনতা চাই-ই।

লক্ষ্য এক, কিন্তু মত ও পথ আলাদা।

গান্ধীজীরও সেকথা অজানা ছিল না। অনেক কথাই তিনি শুনেছিলেন সুভাষের বিরুদ্ধে। অনেক অভিযোগ। অনেক নালিশ।

শুধু মুখেই নয়, লিখিতভাবেও। সুভাষ বিদ্রোহী। সুভাষ সন্ত্রাসবাদী। বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। শুধু শুধু তাঁকে মান্দালয় জেলে আটক করে রাখা হয়নি। আটক করে রাখা হয়েছিল সেই একই কারণে। মোট কথা, সুভাষ আর যাই হোক, অহিংস-নীতিতে পুরোপুরি আস্থাবান নন।

প্রমাণ, পুলিস দপ্তরের গোপন নথীপত্র। স্পষ্টই সেখানে লেখা রয়েছে :

'...In 1924 the terrorist members of the Swarajya party supported the candidature of Mr. Subhas Chandra Bose as Chief Executive Officer of the Corporation and it is noteworthy that after his appointment to that post many jobs in the Corporation were given to terrorists.'

[১৯২৪ সালে স্বরাজ্য দলের বিপ্লবী সদস্যগণ কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদের জন্য মিঃ সুভাষচন্দ্র বোসকে সমর্থন করেছিলেন, এবং এটা লক্ষণীয় যে, তাঁর ঐ পদে নিয়োগের পর কর্পোরেশনের অনেক চাকরি বিপ্লবীদের দেওয়া হয়েছিল।]

শুধু একবার নয়, বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষের ঘনিষ্ঠতার কথা এমনিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে অসংখ্যবার। যেমন :

'At this time there was an agreement between Subhas Bose and the terrorists that the latter should run the Bengal Provincial Congress Committee under his guidance.

[এ সময়ে সুভাষ বোস ও বিপ্লবীদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল

যে, তাঁরা তাঁর নির্দেশমত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পরিচালনা করবেন।]

বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষের এই ঘনিষ্ঠতার কথা কি করে সেদিন জানা সম্ভব হয়েছিল পুলিসের পক্ষে! সেকথাও তাদের গোপন নথী-পত্রে লিখিত রয়েছে বেশ স্পষ্টভাবেই।

'Early in 1925 a prominent member of the Congress party admitted during an interview with a high Government official that he knew personally of the existence in Bengal of a terrorist movement, the members of which, were hand in glove with the Swarajist.' [Ibd. P. 2]

[১৯২৫ সালের প্রথম দিকে কংগ্রেসের একজন বিখ্যাত নেতা জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানেন যে, বাংলাদেশে একটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের অস্তিত্ব আছে, যারা স্বরাজ্য দলের মুখোশ পরে রয়েছেন।]

বিখ্যাত নেতাটি কে! না, সে সম্বন্ধে রিপোর্টে কোন উল্লেখ নেই। ইংরেজ আর যাই হোক অকৃতজ্ঞ নয়, তাই লিখতে গিয়েও উপকারী বন্ধুকে সতর্কভাবে আড়াল করে রাখতে তাদের ভুল হয়নি।

খোলাখুলিভাবেই একদিন প্রশ্ন করেছিলেন গান্ধীজী—বিপ্লবীদের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করা কোনরকমেই কি সম্ভব নয়?

—না। সুভাষের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—কারণ? পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন গান্ধীজী।

—কারণ, বিপ্লব মানে শুধু ধ্বংস নয়, সৃষ্টিও বটে। একহাতে তার রণতূর্য, অন্যহাতে সৃজনমুখর বাঁশরী। তাই একই সঙ্গে তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে ধ্বংস ও সৃষ্টির আহ্বান। এককথায় বিপ্লবের অর্থ—অন্যায় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। আপনি কি তা চান

না? সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে আপনিই কি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নন?

জবাব শুনে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন গান্ধীজী। আশ্চর্য, যেমন গুরু, তেমনই তাঁর শিষ্য। দেশবন্ধুও ঠিক এমনি কথাই বলতেন। বিপ্লবীদের প্রসঙ্গ উঠলে খোলাখুলিভাবেই তিনি বলতেন—'ওদের নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের কথা ভাবলে আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যায়।'

সুভাষের মুখেও আজ সেই একই কথার প্রতিধ্বনি। একই আকুলতা। কোথায় এর শেষ কে জানে!

লক্ষ্য এক, তবু দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা। তাই দিন কয়েক যেতে না যেতেই আবার সেই বিরোধ। আবার সেই ভুল-বোঝাবুঝির পালা।

ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের দাবী-সম্বলিত খসড়া প্রস্তুত। এবার এই খসড়া তুলে দিতে হবে বড়লাট লর্ড আরউইনের হাতে। নাও, সবাই এবার সই কর একে একে। ওয়ার্কিং কমিটির সবার সই এখানে থাকা প্রয়োজন।

সবাই সই দিলেন একে একে। এমন কি, জওহরলালও বাদ গেলেন না। বেঁকে বসলেন শুধু একজন। না, আমি সই দেব না।

—কারণ? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন গান্ধীজী।

—আমি তো আগেই বলে দিয়েছি সেকথা। দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিলেন সুভাষ, আমার দাবী ঐ আধখানা স্বাধীনতা নয়, পূর্ণ স্বাধীনতা। এ ব্যাপারে কোনরকম আপস করতে আমি রাজী নই।

স্থির, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন গান্ধীজী। চিরপরিচিত জগতে সুভাষ মস্ত বড় একটা প্রহেলিকা যেন। ওকে ঠিক চেনা যায় না। বোঝা যায় না। আবার অস্বীকারও করা যায় না।

বরং জওহরলালকে কিছুটা বোঝা যায়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা যৌবন-শক্তির অপরিমেয়তায় জওহরলাল মাঝে মাঝে যতই মাথা চাড়া দিয়ে

উঠতে চেষ্টা করুক না কেন, প্রয়োজনের মুহূর্তে সে আত্মসমর্পণ করতে জানে। বশ মানতে জানে।

কিন্তু সুভাষ! কার সাধ্য নিজের বিশ্বাস বা আদর্শ থেকে তাকে একচুল বিচ্যুত করে। এ ব্যাপারে সে নির্মম ও ক্ষমাহীন।

বিরোধ আরো ঘনীভূত হল ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত লাহোর কংগ্রেসে। সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল।

গান্ধীজী হিসেবে ভুল করেননি। কি করে বনের পাখিকে সোনার শেকল পরাতে হয় তিনি তা ভাল করেই জানেন। সুতরাং এ জওহরলাল যেমন শান্ত, তেমনই সমাহিত।

বাকি রইলেন একমাত্র সুভাষ। তাকেও একদিন পোষ মানতে হবে এমনি করে। না মেনে যাবে কোথায়?

আশ্চর্য, কলকাতা কংগ্রেসে না মানলেও এবার কিন্তু নিজে থেকেই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পেশ করলেন গান্ধীজী। সেই সঙ্গে আরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারকে এই দাবী মেনে নিতে হবে। অন্যথায় শুরু হবে আইন-অমান্য আন্দোলন।

গোল বাধল গান্ধীজীর পরবর্তী একটি বিবৃতি নিয়ে। দেখা গেল, মুখে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বললেও আসলে তিনি যা চাইছেন, তা সেই পুরনো ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন সুভাষ। সেই একঘেয়ে পুরনো কথা! সেই পুরনো দাবী! একমাত্র কালক্ষয় করা ছাড়া কতটুকু লাভ হবে এই প্রস্তাবের ফলে?

স্বাধীনতা শিশুর হাতের খেলনা নয়। চাইলেই তা পাওয়া যায় না। তার জন্য মূল্য দিতে হয়। সংগ্রাম করতে হয়। কোথায় তার প্রস্তুতি?

সবার চোখে-মুখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা। কি বলতে চান বিদ্রোহী সুভাষ?

—চাই পাশাপাশি জাতীয় সরকার গড়ে তুলতে। যেভাবে গড়ে তুলেছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের সিন্‌ফিন্‌ বিদ্রোহীরা।

—না, আমাদের এদেশে তা সম্ভব নয়।

—কে বলে সম্ভব নয়! বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন সুভাষ, একফোঁটা আয়ারল্যাণ্ডে যা সম্ভব হয়েছে, আমাদের এখানে তা সম্ভব হবে না কেন? নিশ্চয় সম্ভব।

ফল পাওয়া গেল হাতে হাতেই। সঙ্গে সঙ্গেই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তালিকা থেকে বাতিল করে দেওয়া হল সুভাষের নাম। গান্ধীজীর ভাষায়—'যারা একমতের মানুষ, একমাত্র তাদেরই ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকা উচিত।'

সুভাষ একমতের নন। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁর স্থান পাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আর সুভাষ! সঙ্গে সঙ্গে তিনি অধিবেশন ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তাঁর বাষট্টি জন অনুগামীকে সঙ্গে নিয়ে। আবেদন-নিবেদনে কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না, এ সত্যটা ওরা কবে বুঝবে! কবে বুঝবে যে, প্রেম বা ভালবাসা বিলিয়ে কোনদিনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়!

৩১শে ডিসেম্বর শেষ হল, কিন্তু কোথায় স্বাধীনতা! কোথায় কি! কোন জবাবই এল না বড়লাট লর্ড আরউইনের দিক থেকে।

বড়লাটকে লক্ষ্য করে এবার শেষ আবেদন জানালেন গান্ধীজী।

'আমি নতজানু হয়ে রুটি চেয়েছিলাম। পেলাম শুধু পাথর। সুতরাং একটি মাত্র পথই এখন আমার সামনে খোলা আছে, তা হল আইন-অমান্য আন্দোলন। সমুদ্র থেকে জল তুলে অনায়াসেই লবণ তৈরি করা যেতে পারে, অথচ তার জন্য আমার গরীব দেশবাসীকে কি বিপুল হারেই না ট্যাক্স গুনতে হয়। কেন এই বর্বর আইন? এ আইন আমি মানিনে। মানব না।'

'সুতরাং আগামী ১১ই মার্চ আমি আমার আশ্রমবাসীদের নিয়ে সমুদ্র উপকূলে গিয়ে এই লবণ-আইন অমান্য করব। যতক্ষণ একটি মাত্র অহিংস যোদ্ধা জীবিত থাকবে, ততক্ষণ এ আন্দোলন থামবে না।'

'আমি জানি আমাকে গ্রেপ্তার করে আমার এই পরিকল্পনাকে আপনি বানচাল করে দিতে পারেন। কিন্তু জেনে রাখুন যে, আমার পেছনে হাজার হাজার লোক এগিয়ে আসবে। হাসিমুখে কারাবরণ করতে তাদের এতটুকুও বাধবে না।'

সুভাষ তখন জেলে। অপরাধ—গত বছরের আগস্ট মাসে নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক দিবস উপলক্ষে বে-আইনী শোভাযাত্রা পরিচালনা করা। রায় দেওয়া হয়েছে ২৩শে জানুয়ারি। মোট ন' মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

তারিখটা তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ মল্লিকা। ২৩শে জানুয়ারি। সুভাষের জন্মদিন।

ওদিকে ১২ই মার্চ সবরমতী আশ্রম থেকে গান্ধীজী তাঁর পদযাত্রা শুরু করলেন উনআশি জন আশ্রমবাসী নিয়ে।

লক্ষ্য, দু'শ মাইল দুরবর্তী সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত ছোট্ট একটি গ্রাম—ডাণ্ডি। পায়ে পায়ে হেঁটে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবশেষে তিনি আইন-অমান্য করবেন তাঁর আশ্রমবাসীদের সঙ্গে নিয়ে।

কাণ্ড দেখে ইংরেজ হেসেই খুন। বিশেষ করে স্টেটস্‌ম্যান প্রমুখ সরকারী মুখপত্রগুলির তো কথাই নেই। তারা তো ঠাট্টাই শুরু করে দিল রীতিমত। এই নাকি মিঃ গান্ধীর আইন-অমান্য আন্দোলন! নাঃ! মজা মন্দ নয় দেখছি!

কিন্তু একি! দেখতে দেখতে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল শাসক মহাপ্রভুদের। এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখছি! কিসের প্রেরণায় আজ ঘুমন্ত ভারতবাসী এমন করে জেগে উঠল! কার ইঙ্গিতে? ঐ

অর্ধ-উলঙ্গ ফকীরটা যে ভেতরে ভেতরে এত শক্তি ধরে তা কে জানত!

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন গান্ধীজী। মুখে সেই শিশুর মতো হাসি। হয় গ্রেপ্তার কর, নয় তো লবণ-আইন তুলে নাও। হয় আমার ঈপ্সিত বস্তু নিয়ে ঘরে ফিরব, নয়তো আমার মৃতদেহ সমুদ্রের জলে ভাসবে। দুটোর একটাও যদি না কর, তবে আমরা হাসিমুখে তোমাদের গুলীর সামনে বুক পেতে দেব, তবু এই অন্যায় আইন মানব না।

রাস্তার দুপাশে কাতারে কাতারে লোক। বৃদ্ধ, যুবক, শিশু কেউ বাদ নেই। চল ভাই সব ডাণ্ডি! আমরাও যাব আমাদের বাপুজীর সঙ্গে। বন্দে মাতরম্! ভারতমাতাকী জয়! মহাত্মা গান্ধীকী জয়! চল ভাই সব, পা চালিয়ে।

মল্লিকা, তোমরা একালের ছেলেমেয়ে। সত্যিকারের আইন-অমান্য আন্দোলন যে কি জিনিস তা বোধহয় আজ তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! যেদিকে তাকানো যায় শুধু আইন ভাঙার মহোৎসব। বন্দে মাতরম্! তোমাদের আইন আমরা মানিনে। মানব না।

সেখানেও সবার পুরোভাগে বাংলার সেই বিপ্লবিগণ। প্রমাণ—পুলিস দপ্তরের সেই গোপন নথীপত্র।

'The Bengal terrorists took an active part in the Civil Disobedience Movement in 1930 and many of them were imprisoned for picketing.'

[বাংলার বিপ্লবিগণ ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়-ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই পিকেটিং করে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।]

হকচকিয়ে গেল ইংরেজ সরকার। এই যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে

কে! না, আর উপেক্ষা করা চলে না। যে করে হোক, এ আন্দোলন স্তব্ধ করতেই হবে।

শুরু হল অকথ্য নির্যাতন। গ্রেপ্তার, লাঠি, গুলী, টিয়ার গ্যাস কিছুই বাদ গেল না।

কিন্তু সব বৃথা। এক যায়, আর আসে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। দলে দলে এগিয়ে আসে। বুঝি আর শেষ নেই এই আসা-যাওয়া মিছিলের!

বিশেষ করে মেয়েরা। আজ দিন-কাল পালটে গেছে। মানুষের চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সেদিন!

সেদিন কিন্তু মেয়েদের পক্ষে প্রচলিত বিধি-নিষেধের বাইরে পা বাড়ানো খুব একটা সহজ ছিল না। তা সত্ত্বেও দেশপ্রেমের দুর্বার প্রেরণায় সেদিন তারা যেভাবে সব কিছু উপেক্ষা করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সত্যিই তা অভূতপূর্ব।

গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হল ৫ই মে তারিখে। তারপর দেখতে দেখতে ষাট হাজার লোক গ্রেপ্তার বরণ করল একে একে। নতুন জেলখানা তৈরি হল, তাতেও তিলধারণের জায়গা নেই। এবার! এবার কি করবে তোমরা? কোথায় রাখবে আমাদের? মারবে? লাঠি-পেটা করবে? গুলী করবে? বেশ, কর!

রুখে দাঁড়ালেন বাংলার বিপ্লবীরা। তাঁদের সাফ কথা, ওসব বৈরাগ্যসাধন মুক্তিতে আমাদের আস্থা নেই। তত্ত্বকথাও আর শুনতে চাইনে। আমাদের সোজা হিসেব—এক ঘা দেবে তো পাল্টা দশ ঘা ফিরিয়ে দেব। প্রমাণ চাও! বেশ, তাই দেব।

প্রমাণ দিল চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা, কলকাতা, মেদিনীপুর ও এমনি কত জায়গা। চরম আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে একের পর এক তাঁরা রক্তের অক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লিখে দিলেন যে, বাংলার বেপরোয়া যুবশক্তি কোনদিনও মরতে ভয় পায় না। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তারা মূল্য দিতে জানে।

একদিকে দুর্বার আইন-অমান্য আন্দোলন, অন্যদিকে বিপ্লবীদের বেপরোয়া অস্ত্রাঘাত। এই দু'মুখী আক্রমণে ইংরেজ তখন দিশেহারা। কি করা যায় এখন! কাকে ছেড়ে কাকে ধরা যায়! বিপদ যে দুদিকেই!

সুভাষ মুক্তি পেলেন ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে। তারপর সেই একই অবস্থা। ঘূর্ণীর মতো আজ এখানে, কাল ওখানে, পরশু কোথায় তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

এল ১৯৩১ সাল। জানুয়ারি মাস। সুভাষ তখন উত্তরবঙ্গ পরিভ্রমণে রত। সংগঠনকে আরও জোরদার করে তুলতে হবে। আরও শক্তিশালী।

বাদ সাধলেন মালদহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। না, এ জেলায় তোমাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আমার হুকুম।

—এ হুকুম বে-আইনী। গর্জে উঠলেন সুভাষ, একজন আত্ম-সম্মানবিশিষ্ট ভারতবাসী হিসেবে এ হুকুম আমি কিছুতেই মানতে রাজী নই।

অগত্যা গ্রেপ্তার। প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে নিয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বিচার। জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুম অমান্য—একি চাট্টিখানি অপরাধ! সুতরাং সাজা দেওয়া হল সাত দিনের কারাদণ্ড।

সেই রাত্রেই নাটোর হয়ে সুভাষকে পাঠিয়ে দেওয়া হল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। হাজার হোক, সুভাষ বোস! এক্ষুণি হয়তো এ নিয়ে মিছিলের পর মিছিল বেরিয়ে পড়বে সব কিছু বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে। সুতরাং ছোট শহর মালদহ থেকে ওঁকে সরিয়ে দেওয়াই সবচাইতে নিরাপদ।

আবার সংঘাত বাধল ২৬শে জানুয়ারি তারিখে।

কংগ্রেস তখন বে-আইনী ঘোষিত। সভা-সমিতি-মিছিল ইত্যাদিও নিষিদ্ধ। কিন্তু সেকথা শোনে কে!

২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা সঙ্কল্প গ্রহণের দিন। পরাধীন জাতির কাছে এই দিনটির চাইতে পবিত্র আর কিছুই নেই। সুতরাং সব কিছু উপেক্ষা করেই মনুমেন্ট বেদীর ওপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। মিছিলও বেরুবে। সে মিছিলের পুরোভাগে থাকবেন স্বয়ং সুভাষ।

ওদিকে মনুমেণ্টের চারপাশে সকাল থেকেই বিরাট পুলিস বাহিনী প্রস্তুত। সেই সঙ্গে অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট ও ঘোড়সওয়ারের দল। কাউকেই তারা ধারে-কাছে এগুতে দিতে রাজী নয়।

সব কিছু উপেক্ষা করে যথাসময়ে বিরাট মিছিল নিয়ে এগিয়ে গেলেন সুভাষ। হাতে তাঁর জাতীয় পতাকা। মুখে একটি মাত্র ধ্বনি—বন্দে মাতরম্!

ইঙ্গিত পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র হায়েনার দল ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্তের মতো। তারপরই শুরু হল একটানা লাঠিচার্জ। সামনে-পেছনে-ডাইনে-বাঁয়ে শুধু লাঠি, লাঠি আর লাঠি! ঢালাও হুকুম পাওয়া গেছে। সুতরাং একতরফা চালিয়ে যাও।

বাধা দিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। কাকে মারছ তোমরা! জানো উনি কে? উনি যে কলকাতার মেয়র!

কে কার কথা শোনে! বৃষ্টিধারার মতো লাঠি পড়ছে অবিরাম। তার মধ্যে কে গেল, কে রইল, তার হিসেব-নিকেশ করার মতো অবকাশ তখন কোথায়!

রক্তে রক্তে সারা দেহ লাল হয়ে গেল সুভাষের। তবু তিনি নির্বিকার। সব কিছু উপেক্ষা করে তিনি এগুতে লাগলেন হিমালয়ের মতোই মাথা উঁচু করে। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে তারপরই এক সময়ে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন শক্ত মাটির বুকে।

আবার বিচার। আবার কারাদণ্ড। এবারের মেয়াদ হল মোট ছ'মাস।

হঠাৎ একটা খবর শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ। গান্ধীজী নাকি কয়েকটি শর্তে ইংরেজের সঙ্গে রফা করতে চলেছেন। যেমন—যাবতীয় ধৃত বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। তাঁদের জরিমানার টাকাও ফিরিয়ে দিতে হবে। আর লবণ তৈরির ব্যাপারে সমুদ্র উপকূলবর্তী জনসাধারণকে অন্তত কিছুটা রেহাই দিতে হবে। ব্যস্, এইটুকু পেলেই তিনি খুশি।

খবর শুনে অসহ্য ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বন্দী সুভাষ। সেই পুরনো টালবাহানা! সেই হরেক রকম দর-কষাকষি! সেই চৌরিচৌরা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি!

১৯২২ সালেও এমনি করে একবার গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন সামান্য একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সেদিনও তিনি বড়লাট লর্ড রেডিংকে এমনি করে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন তাঁর অভিপ্রায়ের কথা।

'আমি আপনাকে সাত দিন সময় দিচ্ছি। তার আগেই আপনি খবরের কাগজ থেকে সবরকম বিধি-নিষেধ তুলে নিন। আর যে সব লোক অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য জেলে রয়েছে, তাদের মুক্তি দিন। যদি সাত দিনের মধ্যে তা করেন, তাহলে আমি বারদৌলী আন্দোলন তুলে নেব। অন্যথায় আমরা আমাদের আন্দোলনে অগ্রসর হব।'

সমগ্র দেশ আশা ও প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব। আজ ১লা ফেব্রুয়ারি। মাঝে সাত দিন। ৯ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে ঐতিহাসিক বারদৌলী আন্দোলন।

কোথায় আন্দোলন, আর কোথায় কি!

সব কিছু বিপর্যস্ত হল ৫ই ফেব্রুয়ারি গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা গ্রামে অনুষ্ঠিত সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

সত্যাগ্রহীদের একটা মিছিল যাচ্ছিল সেদিন চৌরিচৌরা গাঁয়ের পথ ধরে। হঠাৎ পথরোধ করে দাঁড়াল পুলিস বাহিনী। না, মিছিল যেতে দেওয়া হবে না এ পথ দিয়ে। এটা বে-আইনী।

কথা-কাটাকাটি থেকে বচসা। তারপর সংঘর্ষ। শেষপর্যন্ত থানায় আগুন ধরিয়ে দিল উত্তেজিত জনতা। ফলে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন কনস্টেবলের মৃত্যু।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন গান্ধীজী। ভারতবাসী এখনো অহিংস-নীতিতে পুরোপুরি অভ্যস্ত হতে পারেনি। সুতরাং আর আন্দোলন নয়।

দেশবন্ধু, সুভাষ, মতিলাল নেহরু, লালা লাজপত রায় সবাই তখন জেলে। জেল থেকেই তাঁরা গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন কঠোর ভাষায়।

চৌরিচৌরার ব্যাপার একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তার জন্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে কেন?

বিরাট এই ভারতবর্ষে কে, কোথায়, কবে অহিংস থাকতে পারেনি তার জন্য কি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন পিছিয়ে দিতে হবে?

ক্ষোভে, দুঃখে জেল থেকে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সত্তর পাতা-ব্যাপী এক চিঠি লিখে পাঠালেন লালা লাজপত রায়। এর মানে কি! কি এমন কারণ ঘটেছিল, যার জন্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে এভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল?

আর দেশবন্ধু? সুভাষের লেখা থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি।

'I was with the Deshabandhu at the time and I could see that he was beside himself with anger and sorrow at the way Mahatma Gandhi was repeatedly bungling.' [The Indian Struggle, Part II, P. 108]

[সে সময়ে আমি দেশবন্ধুর সঙ্গে ছিলাম। আমি দেখেছি যে,

মহাত্মা গান্ধী বার বার যেভাবে ভুল করে যাচ্ছিলেন, তা দেখে তিনি রাগে এবং দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন।]

কংগ্রেসের পরবর্তী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল গান্ধীজীকে। বিশেষ করে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের প্রশ্নের সামনে।

কেন সংগ্রাম প্রত্যাহার করা হল? কেন স্বাধীনতা সংগ্রামকে এমন করে স্তব্ধ করে দেওয়া হল? কেন? কেন?

সবাইকে ছাপিয়ে গেলেন প্রখ্যাত নেতা মুঞ্জে। তিনি প্রস্তাব আনলেন—গান্ধীজীকে ভর্ৎসনা করা হোক! বলাই বাহুল্য যে, সে প্রস্তাব শেষপর্যন্ত গৃহীত হয়নি।

১৯২২-এর পর ১৯৩১। আশ্চর্য, এবারেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি!

গান্ধীজী নাকি ইতিমধ্যে বড়লাটের সদিচ্ছার প্রমাণ পেয়েছেন। তাই আন্দোলন তুলে নিয়ে তাঁর সঙ্গে একটা চুক্তি করতে তিনি বদ্ধপরিকর।

কিন্তু দেশ! দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দেশের ঘুমন্ত জনসাধারণ সবেমাত্র আজ ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়িয়েছে। বার বার এভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হলে তারা কি হতাশায় ভেঙে পড়বে না? আবার ঘুমিয়ে পড়বে না?

'ইনক্লাব জিন্দাবাদ!'

কথাটা সর্বপ্রথম কার মুখ থেকে বেরিয়েছিল জানো মল্লিকা?

ভগৎ সিং। মহান বিপ্লবী ভগৎ সিং। তিনিই এই মহামন্ত্রের উদ্‌গাতা।

ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরু। অগ্নিযুগের ইতিহাসে তিনটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনজনেই তখন মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনছেন লাহোর সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে।

স্বভাবতঃই ভারতবাসী তখন ক্ষুব্ধ, চঞ্চল। মন সায় দেয় না, কিন্তু উপায় কি! সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নির্মম প্রতিহিংসা থেকে কিছুতেই যে তাঁদের রক্ষা করার উপায় নেই।

হঠাৎ যেন একটু আলো দেখতে পাওয়া গেল চোখের সামনে। গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে সর্বাগ্রে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাহলে ভগৎ সিং-দের মুক্তি দেওয়া হবে তো! নিশ্চয়ই তাই!

মুক্তি না হোক, অন্তত প্রাণদণ্ড রোধ তো হবেই! গান্ধীজী যেখানে রয়েছেন, সেখানে ভাবনা কি!

দেখতে দেখতে সামান্য কথাটা অসামান্য হয়ে দেখা দিল গোটা ভারতবাসীর সামনে। তারপরই আসমুদ্র-হিমাচল সোচ্চার হয়ে উঠল এই একটিমাত্র দাবী নিয়ে।

ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর প্রাণদণ্ড রোধ করতে হবে। গান্ধী-আরউইন চুক্তির এটাই হবে প্রধান শর্ত।

শুধু গান্ধীজী নন, শুধু আরউইন নন, উভয়পক্ষকেই এ ব্যাপারে ভারতবাসীর কাছে তাঁদের সদিচ্ছার প্রমাণ দিতে হবে।

বাংলা, তথা ভারতের বিভিন্ন বন্দিশালাগুলোতেও সেই একই চঞ্চলতা। ভগৎ সিং-দের ফাঁসি রোধ করতে হবে। অন্যথায় এ চুক্তি মূল্যহীন।

একই দাবী পেশ করলেন চট্টগ্রাম জেলে আবদ্ধ গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখ যুব-বিদ্রোহের বিচারাধীন বন্দীর দল।

গোপনে তাঁরা চিঠি লিখে পাঠালেন গান্ধীজীকে:

'আমরা ফাঁসির প্রতীক্ষায় দিন গুনছি। তার জন্য কোন দুঃখ নেই আমাদের। কিন্তু ওঁদের আপনি বাঁচান বাপুজী। আপনিই একমাত্র লোক, যিনি ওঁদের প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম।'

গান্ধীজীর কাছে গোপনে প্রেরিত এই চিঠির কথা কিন্তু পুলিস

কর্তৃপক্ষের জানতে এতটুকুও বাকি থাকেনি, মল্লিকা। প্রমাণ—মামলার রায়। বিচারপতি মিঃ ইয়ুনি স্পষ্টই সেখানে বলেছিলেন :

'In March 1931 the under trial accused in Chittagong Armoury Raid Case sent a letter to Mr. Gandhi'...

চরমপত্র দিলেন বক্সা দুর্গে আবদ্ধ বিভিন্ন দলের প্রথম সারির বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ।

সবাই মিলে পরামর্শ করে একসঙ্গে তিনখানি চিঠি তাঁরা লিখে পাঠালেন গান্ধীজী, জওহরলাল ও স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর উদ্দেশ্যে। চিঠিতে সব কিছু তাঁরা লিখে জানালেন খোলাখুলিভাবে।

কাউকে ফাঁসি দেওয়া চলবে না। দিলে এ চুক্তি আমরা মেনে নেব না। তখন যদি কোনরকম অশান্তি হয় তো তার জন্য দায়ী হবেন চুক্তির দুপক্ষের নেতারাই।

যথাসময়ে তেজবাহাদুর সে চিঠি তুলে দিলেন বড়লাট লর্ড আরউইনের হাতে। চিঠিতে তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে।

মন দিয়ে চিঠিটা পড়লেন আরউইন। তারপর এক সময়ে প্রশ্ন করলেন—আলোচনা করতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু কার সঙ্গে আমি কথা বলব এ সম্বন্ধে? ওদের প্রতিনিধি কে?

—সুভাষ বোস।

—সুভাষ বোস! যেন সাপ দেখে আঁতকে উঠলেন আরউইন। না না, সুভাষ বোসের সঙ্গে আমি এ সম্বন্ধে কোন আলাপ করতে রাজী নই। আর কেউ আছে কি?

—আছেন, তবে তিনি এখন পলাতক। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হলে তাঁকে যাওয়া-আসার অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, সেই সুযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে না।

—কে সেই লোক? আরউইনের মুখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

—সূর্য সেন।

—মাই গড্! কানের কাছে বাজ পড়লেও বুঝি এতখানি চমকে উঠতেন না আরউইন, সূর্য সেন! দি গ্রেট্ সূর্য সেন!

আশ্চর্য, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বক্সা ক্যাম্পে সরকারী চিঠি এসে হাজির। অত্যন্ত নরম সুর—তোমাদের প্রস্তাব তোমরা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে লিখে জানাও।

তাই জানানো হল। কিন্তু এবার চিঠির জবাব এল অনেক দেরি করে। সুরও ততটা নরম নয়। কারণ, ওদিকে তখন স্টেটস্‌ম্যান, ইয়োরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ইত্যাদি শ্বেতাঙ্গ সংস্থাগুলি রীতিমত শোরগোল তুলেছে: 'No track with the terrorists'.—ফলে, আলোচনা সেখানেই ইতি।

তা বলে ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হল না মল্লিকা। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ তৎপর হয়ে উঠলেন নতুন এক পরিকল্পনা নিয়ে। সে পরিকল্পনা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনই অভূতপূর্ব।

'আমাদের দাবী উপেক্ষা করে কাউকে ফাঁসি দিলে আমরা তার প্রতিশোধ নেব। পনেরো দিনের মধ্যেই নেব। লোকালয় থেকে বহু-দূরে পাহাড়-ঘেরা এই বক্সা ক্যাম্পে আমরা বন্দী। এই বন্দী-নিবাসে থেকেই আমরা বুঝিয়ে দেব যে, বাংলার প্রাণশক্তি এখনো মরে যায়নি।'

চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ৫ই মার্চ। তারপর শুরু হল বন্দী-মুক্তির পালা। সবাই মুক্তি পেলেন। সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হল।

শুধু মুক্তি পেলেন না অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলার বিপ্লবিগণ। বোঝা গেল, কি গান্ধীজী, কি আরউইন, কারো বিচারেই বিপ্লবীরা ঠিক বন্দীর পর্যায়ে পড়েন না। কারণ, তাঁরা গান্ধীজীর অহিংস-নীতিতে আস্থাবান নন। সুতরাং তাঁরা এক-ঘরে, সমাজচ্যুত। তাঁদের হুঁকো-নাপিত বন্ধ।

৮ই মার্চ তারিখে মুক্তি পেলেন সুভাষ। ১৪ই মার্চ তিনি বি. ভি.-র সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে গেলেন গান্ধীজীর কাছে। ব্যাপারটা সম্বন্ধে পরিষ্কার বোঝাপড়া করা দরকার।

তার চাইতেও বড় কথা ভগৎ সিং, শুকদেব আর রাজগুরু। তাঁদের কি হবে! ঐ তিনটি তরুণের ফাঁসির বদলে দ্বীপান্তর আদেশ হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেসে যাবে না, বরং ইংরেজের সদিচ্ছার পরিচয় পেয়ে দেশবাসী খুশিই হবে।

সে দায়িত্ব এখন পুরোপুরি গান্ধীজীর। একমাত্র তিনিই পারেন এ ব্যাপারে বড়লাটকে বাধ্য করতে।

—কিন্তু বড়লাট যদি আমার অনুরোধ না রাখেন? সব কথা শুনে প্রশ্ন করলেন গান্ধীজী।

—তাহলে আপনিও সঙ্গে সঙ্গে চুক্তি ভেঙে দেবেন। স্পষ্ট জবাব দিলেন সুভাষ, চুক্তির ফলে জনসাধারণের ন্যূনতম দাবী যদি রক্ষিত না হয়, তাহলে সে চুক্তি মেনে নিয়ে লাভ কি? জনসাধারণই বা তা মানবে কেন?

এখানেই কিন্তু থামলেন না সুভাষ। গান্ধীজীর সঙ্গে একই ট্রেনে তিনি রওনা হয়ে গেলেন দিল্লীতে। যে করে হোক, গান্ধীজীকে দিয়ে ওঁদের ফাঁসির হুকুম রদ করানো চাই-ই!

তারপর! কি উত্তর পেল দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের আকুল প্রত্যাশার বিনিময়ে?

দেশের কতটুকু লাভ হল গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে?

ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরুরই বা কি হল?

সে কাহিনী যেমন মর্মান্তিক, তেমনি বেদনাদায়ক। শ্রদ্ধেয় অনন্ত সিংহের মুখ থেকেই সে কাহিনী তুমি শোন।

'১৯৩১ সালের ৫ই মার্চ গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট বা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল। গান্ধীজীর শর্ত অনুযায়ী আইন-অমান্য আন্দোলনে ধৃত সমস্ত কংগ্রেস-কর্মী মুক্তি পেল। হিংসাত্মক কার্যে দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তির দাবীতে গান্ধীজী বড়লাট আরউইনকে কোন অনুরোধ জানাননি। এমন কি, দেশবাসীর একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের প্রাণদণ্ড রোধের জন্য কোন দাবীও বড়লাটের কাছে পেশ

করা প্রয়োজন মনে করেননি। ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ তাঁদের ফাঁসি হয়ে গেল। ব্রিটিশের Divide and Rule [বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করা] নীতির জয় হল—কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা কর, আর কঠোর হস্তে বিপ্লবীদের দমন কর।' [অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়: সাপ্তাহিক বসুমতী: ১৮ই এপ্রিল, ১৯৬৮]

অভিযোগ করার কিছু নেই। কারণ, বিপ্লবীদের সম্বন্ধে নিজের মনোভাব গান্ধীজী কোনদিনই গোপন রাখেননি। ১৯৩০ সালের ২রা মার্চ তারিখেই সেকথা তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন বড়লাটকে এক চিঠি দিয়ে। তাতে খোলাখুলিভাবেই তিনি লিখেছিলেন:

'আমার উদ্দেশ্য, ক্রমবর্ধমান সহিংস সংগ্রামীদের সংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে আমার আন্তরিক শক্তিকে পরিচালিত করা।'

তবু ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুকে কেন্দ্র করে সেদিন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তার পরিণতি কিন্তু মোটেই শুভ হয়নি মল্লিকা। যুগান্তর দলের অন্যতম নায়ক শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের লেখা থেকেই সে কাহিনী আমি এখানে তুলে ধরছি।

'চুক্তি সই করে গান্ধীজী সিমলা ছাড়ার আগে বিবৃতি দিয়ে যান যে, ঐ চুক্তি যদি দেশে সর্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত হয় তাহলে তিনি আশা করেন যে, এমন কি সহিংস কাজের জন্য যাঁদের ফাঁসির হুকুম হয়ে আছে, তাঁরাও মুক্তি পাবেন। বিবৃতি দিয়ে তিনি করাচী পৌঁছবার আগেই ভগৎ সিং-দের ফাঁসি হয়ে যায়। ফলে, যুগান্তর ও নওজোয়ান সভার নেতৃত্বে দেশের জাগ্রত জনগণ যে বিক্ষোভ দেখায় তাতে গান্ধী-নেতৃত্ব দেশের লোকের কাছে অনেকখানি প্রতিষ্ঠা হারায়।' [ইতিহাসের উপাদান: সাপ্তাহিক বসুমতী: ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬]

কথাটা অত্যুক্তি নয় মল্লিকা। সত্যিই সেদিন অত্যন্ত কঠোর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল গান্ধীজীকে।

করাচীতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাব, বাংলা ও অন্যান্য

প্রদেশের বিক্ষুব্ধ তরুণদল তাঁকে সংবর্ধনা জানালো কালো ফুলের মালা আর কালো পতাকা প্রদর্শন করে।

তাদের অভিযোগ, ভগৎ সিং-দের ফাঁসির জন্য গান্ধীজীই একমাত্র দায়ী। কেন তিনি চুক্তি করার সময় তাঁদের মুক্তির শর্ত অন্তর্ভুক্ত করেননি? এ চুক্তি কোন চুক্তিই নয়। এ চুক্তি আমরা মানিনে।

নিন্দা বা প্রশংসায় বিচলিত হবার মতো মানুষ আর যিনিই হোন না কেন, গান্ধীজী নন। তাই নিঃশব্দেই তিনি সে মালা নিজের গলায় তুলে নিলেন কোনরকম প্রতিবাদ না করে। মুখে তেমনি প্রসন্ন হাসি। তিনি যে গোটা ভারতের বাপুজী! এত সহজে তাঁর বিচলিত হলে চলবে কেন!

গভীর রাত্রি। করাচী কংগ্রেস সুপ্ত, নিদ্রামগ্ন।

শুধু ঘুম নেই গান্ধীজীর চোখে। ঝড় আসন্ন। উদ্দাম ঝড়। কোথায় তার শেষ পরিণতি কে জানে!

যে করে হোক এ ঝড়কে শান্ত করতেই হবে। সামনে গোলটেবিল বৈঠক। সেই বৈঠকে যোগ দেবার জন্য হয়তো তাঁকেই এবার যেতে হবে বিলেতে। কংগ্রেস সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। ভগৎ সিংকে কেন্দ্র করে এ সময়ে কংগ্রেস দুটো আলাদা শিবিরে ভাগ হয়ে যাক, তা কোনদিক থেকেই কাম্য নয়।

কে পারে আসন্ন এই ঝড়কে শান্ত করতে!

বল্লভভাই!—আজাদ! রাজেন্দ্রপ্রসাদ! রাজাগোপাল! আব্দুল গফুর খান!

না, কেউ পারে না। বিক্ষুব্ধ তরুণদল ওদের কথা শুনবে না। গ্রাহ্যই করবে না।

তবে কে পারে! জওহরলাল!

অসম্ভব। বড় বেশি উচ্ছ্বাসপ্রবণ। কিছুটা অস্থিরচিত্তও বটে।

তাছাড়া বলতে গিয়ে প্রায়ই মাত্রা হারিয়ে ফেলে। সুতরাং সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার উপায় নেই।

পারে শুধু একজন। সুভাষ। চিরবিদ্রোহী সুভাষ। তরুণ সমাজের অবিসংবাদী নেতা সুভাষ। একমাত্র সুভাষই পারে আজ এই বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করতে।

গভীর রাত্রে গান্ধীজীর শিবিরে ডাক পড়ল সুভাষের। পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। সব কথা বুঝিয়ে বলা দরকার সুভাষকে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

যুক্তি মেনে নিলেন সুভাষ। না, প্রকাশ্য অধিবেশনে এ নিয়ে কোনরকম বিরোধিতাই তিনি করবেন না। কারণ, কংগ্রেসে ভাঙন ধরলে সবচাইতে লাভবান হবে ইংরেজ। সে সুযোগ তাদের কোনরকমেই দেওয়া চলে না।

তবে একটা শর্তে। প্রকাশ্য অধিবেশনে বিরোধিতা না করলেও তার বাইরে এ নিয়ে প্রতিবাদ করার সর্বপ্রকার অধিকার তাঁর থাকবে। সেখানে কোন কিছু দিয়েই তাঁর মুখ বন্ধ রাখা যাবে না।

কাজেও তাই করলেন সুভাষ। কোন প্রতিবাদ তিনি করলেন না প্রকাশ্য অধিবেশনে। তারপরই উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন নওজোয়ান সম্মেলনের সভাপতিরূপে ভাষণ দিতে গিয়ে।

কেন আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হল?

কেন চুক্তির সময়ে ভগৎ সিং-দের মুক্তির কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি?

ভারতবাসী কি পেল এই গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে?

শতাব্দীর ঘুম ভেঙে যে ভারতবাসী এতদিন পরে সংগ্রাম-মুখর হয়ে উঠেছিল, তাদের যৌবনশক্তিকে আবার স্তব্ধ করে দেওয়া ছাড়া এ চুক্তিতে আর কোন কিছু লাভ হয়েছে কি?

এই কি গান্ধীবাদ? অহিংসার নামে ক্ষাত্রধর্ম বিসর্জন দিয়ে জাতিকে নেতিবাদ শেখানোটাই কি গান্ধীনীতি?

ভগৎ সিং-এর ব্যাপার কিন্তু এখানেই শেষ হল না, মল্লিকা। আরো আছে। সে কাহিনী যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি অপ্রত্যাশিত।

হঠাৎ সেদিন এক প্রস্তাব উত্থাপন করা হল প্রকাশ্য অধিবেশনে। উত্থাপন করলেন অহিংস-মন্ত্রের ঋষি স্বয়ং গান্ধীজী। নিজে থেকেই তিনি শহীদ ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের প্রস্তাব আনলেন তাঁদের সাহস ও আত্মত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করে। সে প্রস্তাব গৃহীতও হল সঙ্গে সঙ্গেই। শুধু তাই নয়, ভগৎ সিং আর শুধুমাত্র ভগৎ সিং রইলেন না সেদিন থেকে। গান্ধীজীর ভাষায় তিনি হলেন—'সর্দার ভগৎ সিং।'

নিঃসন্দেহে গান্ধীজীর এই প্রস্তাব অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু কি হয়েছিল ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত বেলগাঁও কংগ্রেসে!

সবাই চাইলেন বিশ্বের মহান বিপ্লবী লেনিনের মৃত্যুতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি শোক-প্রস্তাব পাশ করা হোক।

না, কিছুতেই না। বাধা দিলেন সভাপতি স্বয়ং গান্ধীজী। পাশ করা তো দূরের কথা, কোনরকম প্রস্তাবই তিনি তুলতে দিলেন না কংগ্রেসের সেই অধিবেশনে। কারণ, তাঁর মতে লেনিন একজন উপদ্রবকারী ছাড়া আর কিছুই নন।

তবে একা লেনিন নন, ভগিনী নিবেদিতা বা যুগপ্রবর্তক রাজা রাম-মোহন রায়ের মতো প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরাও রেহাই পাননি এ ধরনের বিশেষণ থেকে। যেমন—রামমোহন একটি বামন (pigmy) মাত্র। আর ভগিনী নিবেদিতা একটি বিলাস-বহুল জীবনে অভ্যস্তা অস্থির-চিত্ত (volatile) রমণী ছাড়া আর কিছুই নন।

মহাত্মার মতো লোকের কাছ থেকে এ ধরনের উক্তি খুবই বেদনা-দায়ক নয় কি! তুমি কি বল, মল্লিকা!

আরো দৃষ্টান্ত, মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ যতীন দাস। সেই যতীন দাস, ১৯২৮ সালে সুভাষের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স গঠনে যাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হয়ে তেষট্টি দিন অনশন করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সে কাহিনী তুমিও জানো। খবর শুনে সেকি তীব্র আলোড়ন সেদিন সারা পৃথিবী জুড়ে! সবাই একবাক্যে ধিক্কার জানাল ইংরেজ সরকারের অন্যায় জেদ ও অবিমৃষ্যকারিতাকে।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। চঞ্চল হয়ে উঠলেন বিশ্বের অন্যান্য মনীষীবৃন্দ। ইতিপূর্বে আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তিযোদ্ধা টেরেন্স ম্যাক-সুইনীও এমনিভাবে অনশনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, সেকথা তোমার অজানা নয়। খবর পেয়ে সেই ম্যাকসুইনী পরিবার সঙ্গে সঙ্গে তার পাঠালেন সুদূর আয়ারল্যাণ্ড থেকে।

'Family of Terence Mc Swiney have heard with grief and pride of the death of Jatin Das. Freedom will come.'

একমাত্র ব্যতিক্রম গান্ধীজী।

একটি কথাও তাঁর মুখ থেকে কেউ শুনতে পেল না যতীন দাস সম্বন্ধে। এমন কি, সুভাষ অনুরোধ করা সত্ত্বেও না।

পরে একদিন সুভাষের জিজ্ঞাসার উত্তরে জানালেন যে, যতীন দাসের মৃত্যুর ব্যাপারটা তাঁর মতে একটা ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যার [diabolical suicide] ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই ইচ্ছা করেই এতদিন এ সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেননি। কারণ, বলতে হলে সেক্ষেত্রে অপ্রিয় কথাই তাঁকে বলতে হত।

জবাব শুনে একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা বাংলা দেশ। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে যিনি দধীচির মতো তিল তিল করে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন, বাংলার সেই পুণ্যাত্মা শহীদ যতীন দাস সম্বন্ধে মহাত্মার একি নির্মম উক্তি!

কিন্তু কেন? অনশন তো মহাত্মারই রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার! এমন কতবারই তো তিনি অনশন করেছেন জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে। তাহলে যতীন দাসের বেলায় তাঁর এই অহেতুক

রূঢ়তার কারণ কি ?: ছদিন বাদে লেবুর রস পান করে আমৃত্যু অনশন ভঙ্গ করেননি বলেই কি ?

অথচ একই প্রসঙ্গে সুভাষের মুখ থেকে শোনা গেল ঠিক তার বিপরীত কথা। নোয়াখালি জেলা যুব-সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন ঃ

'...বাংলাদেশের যুব-সমাজের ভেতর থেকে সহস্র সহস্র যতীন দাস আমরা চাই, যারা তাঁর আত্মোৎসর্গের ভাবকে রূপায়িত করবে। তীব্র জাতীয় চেতনাসম্পন্ন নতুন একদল যুবক আমাদের অবশ্যই চাই। কারণ তারাই ভাবী ভারতবর্ষকে নির্মাণ করবে, যে ভারতবর্ষে কৃষক, শ্রমিক-নির্বিশেষে সকল নরনারী স্বাধীনতার আশীর্বাদ উপভোগ করবে।

আপনাদের আমি আহ্বান করছি। অদূর ভবিষ্যতে কি গৌরবময় ভূমিকা আপনাদের গ্রহণ করতে হবে, তা অনুভব করুন। তারপর আপনারা অগ্রসর হয়ে চলুন একটি মাত্র ভাবনা নিয়ে—মাতৃভূমির মুক্তিব্রতই আমার একমাত্র কর্তব্য।'

শুধু একবার নয় মল্লিকা, মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ যতীন দাসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সুভাষ এমনিভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন অসংখ্যবার। নিজের রচিত বই, এমন কি, পরবর্তীকালে আজাদ হিন্দ্ সরকারের সর্বাধিনায়করূপেও যতীন দাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কোনবারই তিনি ভুল করেননি।

শুধু কি যতীন দাস! কি হয়েছিল সেদিন শহীদ গোপীনাথের বেলায় ?

গান্ধীজী অনেক বড়। তার চাইতেও বড় তাঁর নীতি। সে নীতি এত বড় যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তার নাগাল পাওয়া সত্যিই বড় শক্ত। এমন কি, তাঁর একান্ত স্নেহাস্পদ জওহরলাল পর্যন্ত সে সত্যটাকে পরবর্তীকালে অস্বীকার করতে পারেননি। খোলাখুলি-ভাবেই তিনি লিখেছেন :

'জাতির নেতা গান্ধী আর অতিমানব গান্ধীর মধ্যে বরাবরই ছিল

একটা দুস্তর ব্যবধান। তাই গান্ধী ও আমাদের রাজনীতির মধ্যে মতদ্বৈধতার অন্ত ছিল না। অতিমানব গান্ধীর কণ্ঠে ছিল প্রত্যাদেশের বাণী। সেখানে তিনি শুধু ভারতবর্ষের নন, সমগ্র বিশ্বের।’

[ডিসকভারী অফ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৪৭১]

কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি মল্লিকা। সাধারণ মানুষ জাতির নেতা গান্ধীজীকে বরং সেদিন কিছুটা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু বুঝতে পারেনি অতিমানব গান্ধীজীকে। সেখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন রীতিমত দুর্বোধ্য।

যেমন দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল শহীদ গোপীনাথ সাহার বেলায়।

১৯২৪ সাল। ১২ই জানুয়ারি। সহসা সেদিন বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের পয়লা নম্বর শত্রু চার্লস টেগার্টকে লক্ষ্য করে গোপীনাথের পিস্তল আগুন ছড়াল—গ্রাম! গ্রাম! গ্রাম!

কিন্তু এ কি! এ তো টেগার্ট নয়! এ যে একজন সাধারণ নাগরিক, আর্নেস্ট ডে!

আদালতে দৃপ্তকণ্ঠে গোপীনাথ জানালেন: ভুল করে একজন নিরপরাধ লোককে মেরেছি বলে আমি দুঃখিত। তার চাইতে বেশি দুঃখিত এই জন্য যে, টেগার্টকে আমি মারতে পারিনি। না, মৃত্যুর জন্য আমার এতটুকুও দুঃখ নেই। কারণ, আমি জানি যে, আমার প্রতিফোঁটা রক্তবিন্দু ভারতের ঘরে ঘরে শত শত গোপীনাথের জন্ম দেবে।

যথাসময়ে একদিন গোপীনাথ শহীদ-তীর্থে চলে গেলেন ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ উৎসর্গ করে।

কি দুঃসহ অবস্থা সেদিন সুভাষের! জেল-গেট থেকে ফিরে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি ধ্যানমৌনী তাপসের মতো তাকিয়ে রইলেন সামনে টাঙানো ভারতবর্ষের বৃহৎ মানচিত্রটার দিকে।

কবে তোমার কথা সত্য হবে গোপীনাথ? কবে তোমার মতো শত শত যুবক জন্ম নেবে ভারতের মাটিতে? আর কতদিন দেরি?

ধ্যান ভাঙল সহকর্মীদের পায়ের শব্দে। আশ্চর্য, সুভাষের দুচোখে বাঁধনহারা অশ্রু। সারামুখ আরক্ত। মনে হয় এখুনি বুঝি চোখ-মুখ ফেটে রক্ত ছিটকে পড়বে অজস্রধারায়।

একটা স্তব্ধ মুহূর্ত। তারপরই সুভাষ বললেন আত্মসম্বরণ করে:

—গোপীনাথের ফাঁসি হয়ে গেল। ফাঁসির পরেই একজন শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট বাইরে এসে কি বললে জানো?

'He played like fawn
And at the dawn
Was slain on the lawn.'

মে মাসে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভা বসল সিরাজগঞ্জে। সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ।

গোপীনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখানে গৃহীত হল এক প্রস্তাব। তাতে বলা হল—'যদিও কংগ্রেস অহিংস-নীতিতে আস্থাবান, তবু গোপীনাথের এই আত্ম-বলিদানের আদর্শ ভ্রান্ত হলেও অভিনন্দনযোগ্য।'

খবর শুনে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন গান্ধীজী। কংগ্রেসের মধ্যে এসব কেন? ওদের জন্য কেন আমাদের এই মাথাব্যথা?

ফলে, যা হবার তাই হল। সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা প্রস্তাব আনা হল আমেদাবাদের অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে। সেখানে নিহত আর্নেস্ট ডে-র অকালমৃত্যুর জন্য প্রচুর শোক-প্রকাশ করা হল। শোকসন্তপ্ত পরিবারকেও সমবেদনা জানানো হল যথাযথভাবে।

একমাত্র ব্যতিক্রম গোপীনাথ। এক-তরফা নিন্দা ছাড়া সেদিন আর কিছুই জুটল না তাঁর কপালে।

এবার প্রতিবাদ জানালেন বাংলার দেশবন্ধু। শহীদ গোপীনাথ আজ ভাল-মন্দ, নিন্দা-প্রশংসা, সব কিছুর উর্ধ্বে। দেশগতপ্রাণ ঐ

শহীদের উদ্দেশ্যে প্রশংসা না হোক, মানবিক ধর্ম অনুযায়ী একটু সহানুভূতির কথাও কি বলা যায় না ?

যায়! নিশ্চয়ই যায়! তবে বাংলার জন্য নয়, পাঞ্জাবের জন্য।

কারণ, গরজ বড় বালাই। দেশবন্ধু আর সুভাষ বোসের পাল্লায় পড়ে বাংলা তো আগেই গেছে। ভগৎ সিংকে কেন্দ্র করে এবার পাঞ্জাবও যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তো রইল কি ?

নইলে গোপীনাথ আর ভগৎ সিং দুজনেই আদর্শ বিপ্লবী। দুজনেই ফাঁসি-মঞ্চে প্রাণ দিয়েছেন দেশের জন্য। তবু কেন এই তারতম্য ? কেন এই চিত্ত-দারিদ্র্য ?

ভগৎ সিং যে রিভলবারটা দিয়ে স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করেছিলেন, সেটা কি অহিংস রিভলবার ?

দিল্লীর অ্যাসেম্বলী হলে তিনি যে বোমাটি নিক্ষেপ করেছিলেন, তার গায়ে কি অহিংসার বাণী লেখা ছিল ? তাছাড়া ভগৎ সিং-এর ব্যাপারটাই বা কি! বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে শান্ত করার জন্য সেদিন তিনি ভগৎ সিং প্রমুখ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন একথা সত্য। কিন্তু তারপর ?

মাত্র কয়েকদিন। তারপরই আবার তাঁর মুখে শোনা গেল বিপরীত কথা। অর্থাৎ, এসব বৈপ্লবিক কার্যকলাপ তাঁর মতে একটা স্রেফ গুণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কংগ্রেসের উচিত, পরবর্তী অধিবেশনে এসব গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে একটা প্রস্তাব পাশ করা। তাঁর নিজের ভাষায় :

'Bhagat Singh worship has done and is doing incalculable harm to the country.···The result is goondaism and degradation wherever this mad worship is being performed.

It was the peremptory duty of the A. I. C. C. to condemn at the forthcoming meeting of the

trecherous outrage and reiterate its policy of nonviolence in unequivocal terms.'

মত ও পথ আলাদা হলেও সবারই লক্ষ্য এক। সবারই একমাত্র উদ্দেশ্য স্বাধীনতা। তাহলে ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি গান্ধীজীর এই রূঢ়তা কেন? এ জিজ্ঞাসার জবাব দেবে কে?

জবাব দিল সেই বক্সা দুর্গ। দাবী উপেক্ষিত হলে পনেরো দিনের মধ্যে প্রতিশোধ নেবার কথা কিন্তু তাঁরা ভুলে যাননি মল্লিকা। এবার এল সেই অকল্পনীয় সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করার পালা।

ভূটান-সীমান্তে অবস্থিত দুর্ভেদ্য বক্সা দুর্গ। চারপাশে সদা-সতর্ক প্রহরীর দল। তাদের চোখ এড়িয়ে মশা-মাছিরও সেখানে ঢোকবার জো নেই।

কিন্তু সব বৃথা। এত সতর্কতা সত্ত্বেও একদিন সর্বদলীয় নির্দেশে বি. ভি.-র অন্যতম নায়ক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় প্রেরিত গোপন সঙ্কেত চলে এল কলকাতায় অবস্থিত অন্যান্য সদস্যদের হাতে। প্রতিশোধ নাও। মনে রেখো, মাত্র পনেরো দিন সময়।

দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! পর পর ছ-টা গুলী খেয়ে কে লুটিয়ে পড়ল অমন করে?

পেডি। মেদিনীপুরের দুর্দান্ত জেলা-শাসক জেমস্ পেডি। ভুলের মাশুল যোগাতে গিয়ে তাকেই সেদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হল নিজের জীবনের বিনিময়ে।

ভগৎ সিং-এর ফাঁসি হয়েছিল ২৩শে মার্চ। আর পেডিকে বিদায় নিতে হল ৭ই এপ্রিল। ঠিক পনেরো দিনে প্রমাণিত হল যে, বিপ্লবীদের শপথ ফাঁকা আওয়াজ নয়, কথায় ও কাজে তাঁরা এক।

গান্ধীজী ও সুভাষ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দুটি নাম। একজন প্রবীণ, অন্যজন নবীন। একজন বর্তমান, অন্যজন ভবিষ্যৎ।

কেউ ছোট নন। কারও অবদানই তুচ্ছ নয়। তবু তফাত ছিল। দৃষ্টি-ভঙ্গীরও পার্থক্য ছিল। ছিল বলেই নীতি ও কর্মধারা নিয়ে দুজনের মধ্যে সংঘাত বেধেছে বার বার।

গান্ধীজী অসাধারণ পুরুষ। বিশেষ করে জাতির গণচেতনার মূলে তাঁর অবদান সব কিছু সমালোচনার ঊর্ধ্বে। সেখানে সত্যিই তিনি ভারতের মুকুটহীন সম্রাট।

ফাঁক ছিল অন্য জায়গায়। ইতিমধ্যে পৃথিবী যে শিক্ষা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্প ও আধুনিক চিন্তাধারার দিক থেকে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে, সে সম্বন্ধে তিনি ছিলেন আশ্চর্য রকম নির্লিপ্ত ও উদাসীন।

সুভাষের বিশেষত্ব ছিল সেইখানেই। কি আধুনিক ভাবধারা, কি পৃথিবীর রাজনীতি, কি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী, সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন এক অনন্য-সাধারণ পুরুষ। বস্তুত, ইয়োরোপীয় রাজনীতি সম্বন্ধে এতখানি দূরদর্শিতা সেদিন ভারতের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে সত্যিই দুর্লভ ছিল।

প্রমাণ, গোলটেবিল বৈঠক। সুভাষের মতে এটা ইংরেজের একটা ভাঁওতা মাত্র। এর আসল উদ্দেশ্য হল সারা বিশ্বের কাছে ভারত যে স্বাধীনতালাভের অনুপযুক্ত, জোর গলায় সেকথা প্রমাণ করা। সুতরাং গান্ধীজীর পক্ষে বিলেতে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়া উচিত নয়।

গান্ধীজী এ যুক্তি মানতে রাজী নন। সংসারে কারও প্রতিই তাঁর কোন অবিশ্বাস নেই। বিদ্বেষ নেই। ঘৃণা নেই। ইংরেজও তাঁর ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং তাদের সদিচ্ছা সম্বন্ধে এতটুকুও দ্বিধা নেই তাঁর মনে।

কিন্তু প্রমাণ! গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুযায়ী কি হল বন্দী-মুক্তির?

কি হল বাংলার হিজলী বন্দী-নিবাসে?

নিরস্ত্র অসহায় বন্দীদের এভাবে নির্বিচারে হত্যা করার নজীর পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি?

তবু গান্ধীজী আশাবাদী। তবু তিনি কারও প্রতি বিশ্বাস হারাতে রাজী নন।

গোলটেবিল বৈঠকে গিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা না হোক, অন্তত ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস যে আসবে না, তা কে বলতে পারে!

গান্ধীজীর মনোভাব লক্ষ্য করে অবশেষে ক্ষুব্ধভাবে সুভাষ বললেন:

'I will not stand in the way of Mahatma going to the Round Table Conference. Let him come back disillusioned. I will then stand vindicated.'

সোজা কথায়—গান্ধীজী যেতে চাইছেন—যান। তবে কার কথা সত্য, যথাসময়েই তা বোঝা যাবে।

২৯শে আগস্ট গান্ধীজী বিলেত যাত্রা করলেন গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে। গান্ধী-আরউইন চুক্তির মধ্যেই ইংরেজের সদিচ্ছার বেশ কিছুটা প্রমাণ মিলেছে। দেখা যাক, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এবার তাদের কাছ থেকে কিছু আদায় করা যায় কিনা!

এদিকে বিপ্লবীদের তৎপরতা তখন সমানভাবেই চলছে। লোম্যান, হাডসন, সিম্পসন, গার্লিক, পেডি—সবাইকে ধূলিশয্যা নিতে হয়েছে একে একে।

তারপরই এল ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নোর পালা। ডুর্নোর কথা আগেই তোমাকে বলেছি। ডুর্নো ঘায়েল হলেন ১৯৩১ সালের ২৮শে অক্টোবর। আততায়ী সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিক পলাতক। কোথায় যে তাঁরা ডুব মারলেন, পুলিস তার কোন হদিসই পেল না।

ফল হল মারাত্মক। আততায়ীদের ধরতে না পেরে এবার শাসকদের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল ঢাকাবাসীদের ওপর। সবাইকে পেটাও। আচ্ছা করে শিক্ষা দাও ওদের। ভেঙে গুঁড়িয়ে সব একাকার করে দাও। কাউকে রেহাই দিও না।

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন সুভাষ। পেয়েছে কি ওরা! কি অধিকার আছে ওদের ঢাকাবাসীদের এভাবে নির্যাতন করার? এ কি মগের মুলুক নাকি যে, যা খুশি করলেই হল? এর বিচার চাই!

বাধা দেওয়া হল নারায়ণগঞ্জ রেল স্টেশনে। না, তোমাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না ঢাকাতে। ভালোয় ভালোয় ফিরে যাও। সাহেবের হুকুম।

সাহেব তো হুকুম দিয়েই খালাস। কিন্তু সুভাষ কি সেই লোক, যিনি সাহেবের হুকুম মাথা পেতে নেবেন নিঃশব্দে? সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি ধারাবাহিকভাবে।

নারায়ণগঞ্জে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার

'নারায়ণগঞ্জ, ৭ই নভেম্বর। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে নারায়ণগঞ্জে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জে. সি. গুপ্ত ও তদন্ত কমিটির অন্যান্য সভ্যগণ ঢাকা রওনা হইয়াছেন।

অদ্য অপরাহ্ণকালে কলিকাতা স্টীমার নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিলে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে ঢাকা জেলার মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া একটি নোটিশ জারি করা হয়। মিঃ এল. জি. ডুর্নোর প্রাণনাশের চেষ্টার ফলে গ্রেপ্তার প্রভৃতির জন্য ঢাকায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত বসু ঢাকায় যাইতেছিলেন।

...একখানা স্টীমারে তাঁহাকে চাঁদপুর প্রেরণ করা হয়। একজন ছাড়া ঐ দলের অন্যান্য সকলকে ঢাকায় যাইতে দেওয়া হয়।'

[আনন্দবাজার : ৮-১১-৩১]

ঢাকা থেকে চাঁদপুর। ব্যস্, আর কোন কথা নয়। ঝামেলা না করে এবার লক্ষ্মীছেলের মতো কলকাতায় ফিরে যাও। দোহাই তোমার!

কে কার কথা শোনে। ভদ্রলোকের এক কথা—ঢাকা আমি যাবই। তবে আগেকার পথে নয়, এবারে যাব অন্য পথে।

চাঁদপুর থেকে কুমিল্লা। রাত্রে আখাউড়া ও ভৈরব হয়ে ঢাকা অভিমুখে। কিন্তু তারপর! তারপর সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

ঢাকার পথে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার

'ঢাকা, ১১ই নভেম্বর। ঢাকা হইতে ৪ মাইল দূরবর্তী তেজগাঁও স্টেশনে অদ্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার হইয়াছেন। মিঃ ডুর্নোর উপর আক্রমণের পর ঢাকায় পুলিসী জুলুম সম্পর্কে তদন্তের জন্য গঠিত বেসরকারী তদন্ত কমিটির কাজে যোগদানের জন্য তিনি ঢাকা প্রবেশের চেষ্টা করাতেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মহকুমা হাকিম শ্রীযুক্ত সুভাষবাবুকে ফিরিয়া যাইতে বলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হন। তাঁহাকে তখন শর্তবদ্ধভাবে জামীন দিতে চাওয়া হয়, এবং জেলা ত্যাগ করিয়া পুনরায় মামলার শুনানীর দিন আসিতে বলা হয়।

সুভাষবাবু এই শর্তে জামীন লইতে সম্মত হন না—তখন তাঁহাকে মোটর যোগে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।'

[আনন্দবাজার : ১২-১১-৩১]

ঢাকা জেলে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

সাক্ষাৎকার সম্পর্কে কড়াকড়ি

'ঢাকা, ১২ই নভেম্বর। অদ্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, অবিনাশ ভট্টাচার্য, সুরেন সেনগুপ্ত এবং উকিল শ্রীযুক্ত রজনী দাশ ও যোগেন গুহঠাকুরতা ঢাকা জেলে যাইয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর

সহিত সাক্ষাৎ করিবার আবেদন করেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে এই শর্তে অনুমতি দেওয়া হয় যে, সুভাষবাবু আসিয়া লোহার শিক ও জালের পশ্চাতে দাঁড়াইবেন এবং সাক্ষাৎপ্রার্থীরা বাহিরে থাকিয়া কথাবার্তা বলিবেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এই ব্যবস্থার কথা জানিয়া ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বলেন, 'সাধারণ কয়েদীর ন্যায় এরূপ অবমাননাকর অবস্থার মধ্যে আমি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই না।' এই বলিয়া তিনি স্থানান্তরে চলিয়া যান। সুতরাং সাক্ষাৎপ্রার্থীরা তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারেন নাই।'

[আনন্দবাজার : ১৩-১১-৩১]

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর জামীনে মুক্তি

'ঢাকা, ১৪ই নভেম্বর। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে শর্তবদ্ধ জামীনে মুক্তি দেওয়ার আদেশের কৈফিয়ৎ অদ্য দর্শাইবার জন্য দায়রা জজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর রুল জারি করিয়াছিলেন। অদ্য উহার শুনানী উঠিবার পুর্বেই সদর মহকুমা হাকিম মিঃ এস. এম. চট্টোপাধ্যায় অদ্য প্রাতে শর্তবদ্ধ জামীনের আদেশ বাতিল করিয়া ৫০০৲ টাকার ব্যক্তিগত জামীনের আদেশ দিয়াছেন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বসুর উপর যে ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছিলেন তাহাও প্রত্যাহার করিয়াছেন।

অপরাহ্ণ ১টার সময় সুভাষবাবুকে মুক্তি দেওয়া হয়। তথা হইতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বার লাইব্রেরীতে গমন করেন। সুভাষবাবু তথায় দেশের অবস্থা সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন।'

[আনন্দবাজার : ১৫-১১-৩১]

ঢাকায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

'ঢাকা, ১৫ই নভেম্বর। গত ২৮শে অক্টোবর তারিখে পুলিস যে সব বাড়িতে হানা দিয়াছিল তাহার প্রায় সমস্তগুলিই শ্রীযুক্ত বসু

পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক বাড়ির লোকজনদের সহিত আলাপ করেন এবং যেসব জিনিসপত্রের ক্ষতি সাধন করা হইয়াছে তাহাও পরিদর্শন করেন।

যাঁহারা পুলিসের হাতে নির্যাতিত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত বসু তাঁহাদিগকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, সমগ্র দেশ তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিবে।'

[আনন্দবাজার : ১৬-১১-৩১]

ঢাকা থেকে ময়মনসিং। সেখান থেকে নেত্রকোণা। তারপর একে একে কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ ইত্যাদি পূর্ববঙ্গের বহু জায়গা।

কিন্তু সেই মামলার কি হল! এবার সে কাহিনী শোন সংবাদ-পত্রের পাতা থেকে।

১৪৪ ধারা অমান্যের অভিযোগ প্রত্যাহার

'শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা আছে, এই অজুহাতে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে ঢাকা জেলায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই আদেশ অমান্য করার জন্য সুভাষবাবুর নামে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারা অনুসারে এক মামলা রুজু করা হইয়াছিল। ২৩শে নভেম্বর তারিখে এই মামলার শুনানী হইবার কথা ছিল।

ইতিমধ্যেই সুভাষবাবুর পক্ষ-সমর্থনকারী উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র গুহঠাকুরতাকে জানান হইয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট এই মামলা প্রত্যাহার করিয়াছেন। সুতরাং ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৮ ধারা অনুসারে সুভাষবাবুকে নিরপরাধ বলিয়া খালাস দেওয়া হইয়াছে।'

[আনন্দবাজার : ২০-১১-৩১]

ইয়োরোপীয় রাজনীতি সম্বন্ধে সুভাষ যে কতখানি ওয়াকিবহাল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল যথাসময়েই। সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে এলেন বিরাট একটি ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে।

তবে একেবারে শূন্য হাতে নয়। সঙ্গে নিয়ে এলেন প্রচুর অপযশ, প্রচুর নিন্দা আর চার্চিলের দেওয়া নতুন একটি পরিচয়-পত্র—'হাফ-নেকেড ফকীর'।

ইংরেজের ইচ্ছাই পূর্ণ হল। দেশে-বিদেশে প্রচুর অপপ্রচার করা হল এ নিয়ে। আমরা কি করব! আমরা তো ওদের স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত। ওরা নিজেরাই যদি এ নিয়ে একমত হতে না পারে, তবে আমরা তার জন্য কি করতে পারি বলো!

অতুলনীয় চরিত্রের অধিকারী গান্ধীজী যে সেদিন ইংরেজের চোখে কি রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছিলেন, নিচের একটা চিঠির কয়েকটা লাইন থেকেই তুমি তা কিছুটা অনুমান করে নিতে পারবে, মল্লিকা।

এ চিঠির লেখক এডওয়ার্ড টমসন শুধু জওহরলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুই নন, ভারতের একজন সত্যিকারের শুভার্থী বন্ধুও বটে। বন্ধু জওহরলালকে তিনি লিখেছিলেন :

'গোলটেবিল বৈঠকের আগে গান্ধীজীর কোন ত্রুটি আমার নজরে পড়েনি। এবার পড়ল। গান্ধীজী শুধু অহংসর্বস্ব নন, অসংলগ্নও বটে। উনি ইংল্যাণ্ডে না এলেই ভাল করতেন।' [বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স, পৃঃ ২০৮]

ইংরেজের ধারণা যাই হোক না কেন, গান্ধীজী কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়েননি। শেষ চেষ্টা হিসেবে গোলটেবিল বৈঠকে তিনি যে আবেদন রেখেছিলেন, তা সত্যিই খুব মর্মস্পর্শী। কিছুটা করুণও বটে। তাতে তিনি বলেছিলেন :

'ঈশ্বরের নামে তোমাদের কাছে আমি আবেদন করছি, এই দুর্বল বাষট্টি বছরের বৃদ্ধকে শেষবারের মতো তোমরা একটু সুযোগ দাও। তোমাদের অন্তরের ক্ষুদ্র এককোণে তাকে আর তার প্রতিষ্ঠানকে একটু স্থান দাও।'

এইটুকু বলেই থামেননি তিনি। সেই সঙ্গে একটা ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছিলেন ইংরেজ শাসকদের।

'ভবিষ্যৎ কি তোমরা সত্যিই দেখতে পাও না? আমার এই দাবী

উপেক্ষিত হলে ইতিহাস তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবে না। আর সেই ইতিহাস লিখিত হবে সন্ত্রাসবাদীদের রক্ত-মাখা লেখনীতে।'

[কংগ্রেসের ইতিহাস, ডাঃ পট্টভি, পৃঃ ৪৯৮]

সন্ত্রাসবাদী! কথাটা শুধু ইংরেজের নয়, তথা গান্ধীবাদীদেরও। এ ব্যাপারে আশ্চর্য মিল দেখা যায় দুপক্ষের মধ্যে। উভয়পক্ষেরই বক্তব্য এই যে, বিপ্লবীরা দেশপ্রেমিক নয়, সন্ত্রাসবাদী। এত ফাঁসি, এত দ্বীপান্তর, যা একমাত্র বিপ্লবীদের ভাগ্যেই সেদিন জুটেছিল, তা সবই অর্থহীন। সবই মূল্যহীন। কারণ, তারা সন্ত্রাসবাদী। তারা দেশের শত্রু।

'দেশের শত্রু!' স্বয়ং গান্ধীজীর উক্তি। বাংলার মরমী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে একদিন তিনি খোলাখুলিভাবেই বলেছিলেন কথাটা।

চরকার সাহায্যে কোনদিন স্বরাজ আসবে—শরৎচন্দ্র কোনদিনই বিশ্বাস করতেন না একথা। এ নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও কম করেননি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। তাই খোলাখুলিভাবেই সেদিন শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন গান্ধীজী :

'But why don't you believe that the attainment of Swaraj will be helped by spinning ?'

দ্বিরুক্তি না করে সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিয়েছিলেন বাংলার শরৎচন্দ্র :

'I think attainment of Swaraj can only be helped by soldiers, and not by spiders.'

এখানেই থামেননি শরৎচন্দ্র। তারপরই পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন :

'আপনার মতে তাহলে অহিংসাই একমাত্র অস্ত্র ?'

উত্তেজিত হয়ে জোর গলায় গান্ধীজী জবাব দিয়েছিলেন :

'সে বিষয়ে আমার দ্বিমত নেই। সশস্ত্র-বিপ্লবে যারা বিশ্বাসী তারা ভ্রান্ত—আর যারা সন্ত্রাসবাদী, তারা দেশের শত্রু।'

বাংলার মৃত্যুভয়হীন বিপ্লবীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের মমত্ববোধ ছিল সর্বজনবিদিত। এ কারণে নিজের লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক এবং পিস্তল দুই-ই সেদিন তাঁকে হারাতে হয়েছিল সরকারী নির্দেশে।

গান্ধীজীর মুখ থেকে এ ধরনের উক্তি শুনে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মুখর হয়ে উঠেছিলেন তীব্র প্রতিবাদে।

'শত্রু শব্দের অর্থ কি? মতবিরোধই যদি শত্রুতা বোঝায়, তা হলে যদি কেউ আপনাকেও শত্রু বলে আখ্যা দেয়—আপনার ব্যক্তিগত আপত্তি থাকা উচিত নয় কি?…বিপ্লবী অর্থে এই সন্ত্রাসবাদী দলকে আমি শ্রদ্ধা করি—কারণ, তারাও দেশকে ভালবাসে। ভালবাসে বলেই তো জীবনের সবচেয়ে যা কিছু প্রিয়, সবই উৎসর্গ করে দেয় বুলেটের সামনে। এই যে এদের ত্যাগ, এই যে এদের আদর্শ—এটা হয়তো আপনার মতে ভ্রান্ত হতে পারে—কিন্তু দেশের শত্রু এরা হল কেমন করে?'

জবাব দিতে না পেরে শেষপর্যন্ত গান্ধীজী প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন নিজের উক্তি। [অধ্যাপক দিলীপ ঘোষরায় রচিত 'গান্ধীবাদ কি সচল?' নিবন্ধ থেকে গৃহীত : সাপ্তাহিক বসুমতী : ১৫ই আগস্ট, ১৯৬৮]

তবে গোলটেবিল বৈঠকে রাখা গান্ধীজীর সেই ভবিষ্যৎ-বাণী কিন্তু মিথ্যে হয়নি, মল্লিকা। কংগ্রেস আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেও তথাকথিত 'সন্ত্রাসবাদী'দের কর্মপ্রচেষ্টা কিন্তু সেখানেই স্তব্ধ হয়ে যায়নি।

আবেদন-নিবেদনে তাঁরা বিশ্বাসী নন। নতজানু হয়ে করুণা-ভিক্ষা করাও তাঁদের ধর্ম নয়। তাই সবাই পিছিয়ে পড়লেও তাঁরা কিন্তু সেদিন পিছিয়ে থাকেননি। ফাঁসি, দ্বীপান্তর, নির্যাতন, অত্যাচার সব কিছু উপেক্ষা করে একাই সেদিন তাঁরা জীবনের জয়গান গেয়ে এগিয়ে চলেছিলেন অপ্রতিহত গতিতে। পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের এই কর্মপ্রচেষ্টাকে লোকসমক্ষে যতই ছোট করে দেখানো হোক না কেন,

হাসিমুখে প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার এই জ্বলন্ত ইতিহাসকে তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই!

'ইংরেজকে বিশ্বাস নেই। ওরা সব পারে। শঠতা, কপটতা, বিশেষ করে কথার খেলাপ করতে পৃথিবীতে কোথাও ওদের তুলনা নেই।'

সুভাষের কথা। শুধু একবার নয়, গান্ধীজী, তথা ভারতবাসীকে একথা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন বার বার। অনেক দিন। অনেক জায়গায়। অনেকভাবে।

এমন কি, পরবর্তীকালে (১৯৪৩ সাল, জুন) টোকিও থেকে প্রচারিত এক বেতার-ভাষণের মাধ্যমেও তিনি এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন একাধিকবার। বলেছিলেন:

'পাখিদের মধ্যে কাক, পশুদের মধ্যে খ্যাঁক-শিয়াল, আর মানুষের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সবচাইতে ধূর্ত ও নিষ্ঠুর।'

গান্ধীজী বিশ্বাস করেননি। জওহরলাল তো নয়ই। কারণ, গান্ধীজীর নিজের ভাষাতেই: 'এ মানুষটি (জওহরলাল) যত না ভারতবাসী, তার চাইতে অনেক বেশি ইংরেজ।' সুতরাং প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু ইতিহাস। ইতিহাস কি বলে?

কি পেয়েছিল ভারতবাসী প্রথম মহাযুদ্ধের পরে?

কতটুকু পাওয়া গেল গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিনিময়ে?

কি লাভ হল এত ঢাক-ঢোল বাজিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে?

একমাত্র ব্যর্থতা আর অহেতুক কালহরণ করা ছাড়া আর কিছু লাভ হয়েছে কি?

শুধু কি তাই। আরউইনের পরে বড়লাট হয়ে এলেন ঝানু-ব্যুরোক্রাট লর্ড ওয়েলিংডন। তারপর কোথায় গেল চুক্তি, আর কোথায় রইল ইংরেজের প্রতিশ্রুতি?

শুরু হল প্রচণ্ড দমননীতি আর ব্যাপক ধর-পাকড়।

বিশেষ করে বাংলাদেশে। ওরা শুধু মরতেই জানে না, মারতেও জানে। সুতরাং ঢোকাও ওদের লৌহ-কপাটের অন্তরালে। কাউকে বাইরে থাকতে দেওয়া হবে না। একটি প্রাণীকেও না।

কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ অবাক। একি অন্যায় কথা! এমন তো কথা ছিল না!

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিপ্লবীদের তোমরা মুক্তি দাওনি, আমরা তা মেনে নিয়েছি। ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুকে ফাঁসি দিয়েছ, আমরা তা সহ্য করেছি। তারপর বাংলার হিজলী বন্দী-নিবাসে অহেতুক গুলী চালিয়ে তোমরা নিরস্ত্র অসহায় বন্দীদের হত্যা করলে—সুভাষ এ নিয়ে যথেষ্ট হৈ-চৈ করলেও আমরা টুঁ শব্দটিও করিনি।

গোলটেবিল বৈঠকের নাম করে গান্ধীজীকে বিলেতে ডেকে নিয়ে এভাবে তাঁকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিলে, তাও মুখ বুজে মেনে নিয়েছি। তা সত্ত্বেও এখন কিনা তোমরা গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভঙ্গ কর এভাবে···

চুক্তি! কিসের চুক্তি! ওয়েলিংডন অটল, অনড়। ওসব চুক্তি-টুক্তির কথা বলতে হয় তো আরউইনকে বলোগে। আমার কাছে ওসব চলবে না।

১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল বম্বেতে।

প্রস্তাবে বলা হল: 'সরকারের কাছ থেকে সাত দিনের মধ্যে আমরা সদুত্তর চাই। অন্যথায় আবার শুরু হবে আইন-অমান্য আন্দোলন।'

বটে! এবার আসল মূর্তি ধারণ করলেন লর্ড ওয়েলিংডন। আন্দোলন করবে! দাঁড়াও, মজাটা দেখাচ্ছি!

কাজেও তিনি তাই করলেন, মল্লিকা। জওহরলালকে আগেই

গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এবার গ্রেপ্তার হলেন গান্ধীজী স্বয়ং। গ্রেপ্তার হলেন সীমান্ত-গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ সবাই। মাত্র দুমাসের মধ্যেই মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়াল বত্রিশ হাজারেরও বেশি। এই হল ইংরেজের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির নমুনা!

সুভাষও বাদ গেলেন না। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য না হলেও সুভাষকে সেবার বম্বের সেই বৈঠকে যোগ দিতে হয়েছিল বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে। এবার ঘরে ফেরার পালা।

কিন্তু একি! বম্বে থেকে ত্রিশ মাইল দূরে কল্যাণ স্টেশনে হঠাৎ এভাবে থেমে গেল কেন ডাক-গাড়িটা?

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই হল। এগিয়ে এল বিরাট পুলিস বাহিনী। ১৮১৮ সালের তিন-আইনে তোমাকে বন্দী করা হল। চল এবার আমাদের সঙ্গে। অপরাধ-টপরাধ বুঝিনে। তোমাকে বন্দী করা হল। ব্যস্, ফুরিয়ে গেল!

নিয়ে যাওয়া হল মধ্য প্রদেশের সিডনী সাব-জেলে। তারপরে জব্বলপুর সেণ্ট্রাল জেলে।

কিন্তু এবার বাদ সাধল দেহ। তাই শেষপর্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়া হল ভাওয়ালী স্বাস্থ্য-নিবাসে। নাও, থাক এখানে।

কিছুতেই কিছু হল না। দেহের ভাঙন দিনের পর দিন এগিয়ে চলল এইভাবে। গায়ে সব সময়েই অল্প অল্প জ্বর। পেটে অসহ্য জ্বালা। হজমশক্তি নেই বললেই চলে।

শেষপর্যন্ত ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হল লক্ষ্ণৌয়ের বলরামপুর হাসপাতালে।

এবার টনক নড়ল ইংরেজ ডাক্তার কর্নেল বাকলির। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর নয়। বাঁচতে হলে সোজা চলে যাও ইয়োরোপে।

রাজী হলেন মহামান্য সরকার। তবে একটি শর্তে। যেতে হবে নিজের খরচে, আর কলকাতা হয়ে যাওয়া চলবে না। সোজা এখান থেকে যেতে হবে।

১৯৩৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি সুভাষ পাড়ি দিলেন ভিয়েনার উদ্দেশ্যে।

বিশেষ পরিচিত দু-একজন ছাড়া পুলিস আর কাউকেই সেদিন সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে দিল না বম্বের জাহাজ ঘাটে। বন্ধ অ্যাম্বুলেন্সে করে জেটিতে এনে স্ট্রেচারে করে সোজা তাঁকে তুলে দেওয়া হল ইতালীয়ান জাহাজ 'গঙ্গা'র অভ্যন্তরে।

সবাই বিষণ্ণ। সবার মনই ভারাক্রান্ত। সুভাষ অসুস্থ। এই অসুস্থ দেহ নিয়েই আজ তাঁকে জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। আবার কবে তিনি ফিরে আসবেন কে জানে!

সহসা পরিস্থিতি জটিল হয়ে দেখা দিল ছোট্ট একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

ক'দিন আগেই সুভাষ একটি বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে দুখানি চিঠি পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে। ইয়োরোপে থাকাকালীন তিনি ওখানকার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছুক। তার জন্যে দুজনের কাছ থেকে দুটি পরিচয়-পত্র প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি ইতিমধ্যেই এসে গেছে। আসেনি গান্ধীজীর চিঠি। তবে আসবে। নিশ্চয়ই আসবে। হয়তো এক্ষুণি এসে যাবে। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে গান্ধীজী তাঁকে বিমুখ করবেন না নিশ্চয়ই।

প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল অপেক্ষা করে করে।

সুভাষ অস্থির, চঞ্চল। জাহাজের নোঙর তোলার সময় হয়েছে। কিন্তু কই, গান্ধীজীর চিঠি তো এখনো এল না!

সহসা কি দেখে সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুভাষের। ঐ যে ৗজীর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই এসে গেছেন! এবার নিশ্চিন্ত। কই, চিঠি দিন!

কোথায় চিঠি! কোথায় কি! গান্ধীজী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, সুভাষকে কোনরকম পরিচয়-পত্র দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন সুভাষ। তারপরই এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের চিঠিটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ভাসিয়ে দিলেন সাগরের জলে। কোন প্রয়োজন নেই। এখন থেকে নিজের পরিচয়েই তিনি দাঁড়াতে চেষ্টা করবেন প্রতিটি ক্ষেত্রে, কারো দেওয়া পরিচয়-পত্র বা সুপারিশের জোরে নয়।

মল্লিকা, সুভাষ সাধারণ মানুষ নন। শিক্ষা-দীক্ষা বা চরিত্র-মাধুর্যে কোথায় যে তাঁর স্থান, গান্ধীজীর তা অজানা নয়। তবু যে কেন তিনি সেদিন সুভাষকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝে ওঠা সত্যিই বড় কষ্টকর। তবে কি গোড়া থেকেই তিনি সুভাষকে তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে তাঁর প্রতি বিরূপ ছিলেন? এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া একমাত্র গান্ধীজী ছাড়া আর কারো পক্ষেই বুঝি সম্ভব নয়।

৮ই মার্চ সুভাষ ভিয়েনা পৌঁছে আশ্রয় নিলেন ডাঃ ফুর্থের স্বাস্থ্য-নিবাসে। একটু সুস্থ হয়েই সুইজারল্যাণ্ড।

তারপর একে একে চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড ইত্যাদি বহু দেশ।

পোল্যাণ্ড কৃষি বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কি করে কৃষি আর কৃষক-জীবনের আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব, সে সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন প্রত্যক্ষভাবে।

কেন্দ্রীয় আইনসভার সভাপতি ও স্পীকার বিঠলভাই প্যাটেলও সেদিন ভিয়েনায় ছিলেন চিকিৎসার জন্য। দেখতে দেখতে গভীর অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল দুজনের মধ্যে।

একজন নবীন, অন্যজন প্রবীণ। তবু চিন্তাধারার দিক থেকে

দুজনেই এক। দুজনেই বামপন্থী। দুজনেই প্রগতিবাদী। তাই বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও পরস্পরকে চিনে নিতে মোটেই ভুল হল না।

সহসা একটা অপ্রত্যাশিত খবর ভেসে এল স্বদেশ থেকে। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। সেই পরাজয়ের কাহিনী।

জেল থেকে মুক্তি পাবার পরদিনই নাকি (৭ই এপ্রিল) গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সেই সঙ্গে সরকারের কাছে রেখেছেন এক করুণ আবেদন। সত্যাগ্রহীদের তোমরা মুক্তি দাও। আর অর্ডিন্যান্সগুলো তুলে নাও।

গ্রাহ্যও করেননি বড়লাট লর্ড ওয়েলিংডন। এমন কি, দেখা করতে পর্যন্ত রাজী হননি গান্ধীজীর সঙ্গে। অর্থাৎ, কোন কথা নয়। কোন শর্ত নয়। পরাজিত প্রতিপক্ষের আবার শর্ত কি!

খবর শুনে প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন নবীন সুভাষ আর প্রবীণ বিঠলভাই।

এর মানে কি! কেন আন্দোলন প্রত্যাহার করা হল? তাই যদি করা হবে, তবে বার বার এই আন্দোলনের প্রহসন কেন?

৯ই মে, ১৯৩৩। দুজনে মিলে এক যুক্ত বিবৃতি দিলেন ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে। তাতে বলা হল :

'আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ রেখে মহাত্মা গান্ধী শেষে যে কাণ্ড করলেন, তাতে মেনেই নেওয়া হল যে, কংগ্রেসের বর্তমান পদ্ধতি অচল। আমরা সুস্পষ্টভাবে মনে করি, রাষ্ট্রনেতা হিসেবে মহাত্মা গান্ধী ব্যর্থ। সুতরাং সময় এসেছে এখন নতুন নীতির ওপর নতুন পদ্ধতিতে কংগ্রেসকে ঢেলে সাজাবার। কংগ্রেসকে পুনর্গঠিত করতে হলে নেতৃত্বের বদল হওয়া দরকার।'

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে পণ্ডিত নেহরু চিরদিনই একটি মস্তবড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন। কখন যে তিনি কোন্‌দিকে ঝুঁকে পড়বেন, তা বলা শক্ত।

এহেন অস্থিরচিত্ত লোকও কিন্তু সেদিন আন্দোলন প্রত্যাহার

করার জন্য গান্ধীজীর সমালোচনা না করে পারেননি, মল্লিকা। জেল থেকে মুক্তি পেয়েই তিনি গান্ধীজীকে লিখলেন :

'আপনি আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন, এ খবর যখন পাই তখন অসুখী বোধ করেছিলাম।...এ কাজের সপক্ষে যে সমস্ত কারণ আপনি দেখিয়েছেন এবং ভবিষ্যতের কাজ সম্পর্কে যে সমস্ত প্রস্তাব আপনি করেছেন, তাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। জীবনের কঠোরতম আঘাত আপনার বিবৃতি আমাকে দিয়েছে।... কংগ্রেসকে আজ 'ককাস' ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সুবিধাবাদের আজ জয়-জয়কার...।' [বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স : পৃঃ ১১২]

সবচাইতে কঠোর সমালোচনা করলেন বম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মিঃ নরীম্যান। তীব্রভাষায় তিনি বললেন :

'...গান্ধীজীর এই অসংশোধনীয় মনোভাবের প্রতিকার কি? রাজনীতি আর ধর্মের জগাখিচুড়ি, আর তার ভুল-ভ্রান্তির এই ছেদহীন পরিক্রমা—এর হাত থেকে জাতি কবে পরিত্রাণ পাবে?... উপায় আছে। গান্ধীজীর চারপাশ ঘিরে রয়েছে ঐ যে ভৈরবীচক্র, স্বাধীন-সত্তাহীন কতকগুলি কলের পুতুল, গান্ধীজীকে দেখে যারা মাথা নাড়ে, কথা কয়, সায় দেয়, ওদের স্থানে যদি এমন একটি মানুষ পাওয়া যেত, যার ব্যক্তিত্ব আছে, যে সোজা কথা সহজ করে বলতে পারে, আর যার আছে রাজনৈতিক মস্তিষ্ক।'

গণতান্ত্রিক মতে সবারই সমালোচনা করার অধিকার আছে। নরীম্যানও তার ব্যতিক্রম নন। তা সত্ত্বেও অহিংস-নীতিতে আস্থাবান গান্ধী-গোষ্ঠী কিন্তু সেদিন নরীম্যানের এই মন্তব্যকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেনি, মল্লিকা। ফল পেতে হয়েছিল তাঁকে হাতে হাতেই।

'হতভাগ্য নরীম্যান! কংগ্রেসের কর্তাদের বিচারে তাঁকে ধরাশায়ী হতে দেরি হল না। নরীম্যানের দেশ-সেবার পথে নেমে এল কালো যবনিকা।' [ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম : মৌলানা আজাদ : পৃঃ ১৬]

নরীম্যানের কণ্ঠ রোধ করা হল, তা বলে ইতিহাসের কণ্ঠ কিন্তু রোধ করা সম্ভব হল না, মল্লিকা। বরং সেখানে নরীম্যানের বক্তব্যই মুদ্রিত হয়ে রইল চিরকালের মতো। বার বার এভাবে মাঝপথে আন্দোলন থামিয়ে দেবার প্রসঙ্গে দেশবরেণ্য ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ-চন্দ্র মজুমদার কি বলেছেন শোন :

'Gandhi, the politician, hopelessly blundered. He sounded the order of retreat just when the public enthusiasm had reached the heating point.'

[গান্ধী রাজনীতিবিদ, অথচ অদ্ভুত একটি ভুল করে বসলেন। এমন সময়েই তিনি পশ্চাদপসরণের আদেশ দিলেন, যখন জনগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা চরমে উঠেছিল।]

এবার শোন দেশবন্ধুর কথা :

'The Mahatma opens campaign in brilliant fashion, he works it up with unerring skill, he moves from success to success till reaches the zenith of his campaign, but after that he loses his nerve and begin to falter.'

[মহাত্মা তাঁর আন্দোলন খুবই চমকপ্রদ পদ্ধতিতে শুরু করেন। নির্ভুল এবং অসাধারণ নৈপুণ্যে ক্রমশঃ সাফল্যের চরম মুহূর্তে এসে দাঁড়ান। কিন্তু তারপরই তাঁর স্নায়ুযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। শুরু হয় তাঁর দ্বিধাগ্রস্থ পথচলা।]

আর জওহরলাল! এ সম্বন্ধে পরবর্তীকালে তিনি যে বক্তব্য রেখেছে, এবার তা শোনা যাক!

'I felt annoyed with him for choosing a side issue for the final sacrifice···After so much sacrifice and brave endeavour was our movement to tail off into something insignificant ?

I felt angry with him at his religious and sentimental approach to a political question, and his frequent references to God in connection with it.…'
[Nehru on Gandhi : P. 72 : Toward Freedom, 236.9]

[চরম আত্মোৎসর্গের জন্য আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যের বাইরে ছোট একটা কারণ বেছে নেবার জন্য আমি তাঁর ওপর খুবই বিরক্ত হয়েছিলাম। এই আত্মদান ও সাহসী প্রচেষ্টার পর আমাদের আন্দোলন কি এমন একটা তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর কারণের পেছনেই ছুটে চলবে ?

একটি রাজনৈতিক বিষয় বিবেচনা করতে গিয়ে যেভাবে তিনি ধর্ম ও ভাবপ্রবণতার আশ্রয় নিয়ে ঘন ঘন ঈশ্বরকে টেনে আনতে শুরু করেছেন, তা দেখে তাঁর ওপর আমার রীতিমত রাগই হয়েছিল।]

সবই সত্যি। তা বলে একথাও মিথ্যে নয় যে, গান্ধীজী তাঁর জীবন ও সাধনা দিয়ে বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষকে সর্বাধিক পরিমাণে আলোড়িত করেছিলেন এবং নিজের দেশকে পরিচিত করেছিলেন বিশ্বের দরবারে। তাই হাজার মতের অমিল থাকা সত্ত্বেও জওহরলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে সেদিন গান্ধীজীর কাছে মাথা নত না করে গত্যন্তর ছিল না।

তাছাড়া গান্ধীজীর তূণে সেদিন এমন দুটি মোক্ষম অস্ত্র ছিল, যাকে ভয় না করে উপায় ছিল না। তার মধ্যে একটি হল, মাঝে মাঝেই কংগ্রেস ছেড়ে যাবেন বলে ভীতি-প্রদর্শন। অন্যটি—অনশন। সুভাষের ভাষায় :

'…Whenever any opposition raised outside his cabinet, he could always coerce the public by threatening to retire from the Congress or to fast unto death.' [The Indian Struggle : Subhas Chandra Bose : P. 245]

[যখনই তাঁর বিরুদ্ধে কোনরকম প্রতিবাদ উঠত, ঠিক তখনই তিনি কংগ্রেস ছেড়ে যাওয়া বা আমরণ অনশন করার হুমকী দিয়ে জনসাধারণকে তাঁর মতে চলতে বাধ্য করতেন।]

দেশবন্ধু আর বিঠলভাই প্যাটেল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দুটি উল্লেখযোগ্য নাম।

এ দুটি মানুষ কিন্তু প্রথম-দর্শনেই সুভাষকে চিনে নিতে এতটুকুও ভুল করেননি, মল্লিকা। ভুল করেননি আরও একজন। তিনি হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। সেকথা পরে আসছে।

দেশবন্ধু আগেই গত হয়েছেন। এবার প্যাটেলজীর পালা। জীবনীশক্তি ক্রমেই কমে আসছে একটু একটু করে। এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র।

শিয়রে উপবিষ্ট সুভাষ। চোখে-মুখে তাঁর রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তির কালিমা। স্বাধীনতার অক্লান্ত যোদ্ধা প্যাটেলজী আজ স্বদেশ থেকে কত দূরে এসে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছেন মহাপ্রস্থানের দিকে। এ দুঃখের সান্ত্বনা কোথায়!

অপরিসীম স্নেহে প্যাটেলজী তাকিয়ে থাকেন তারুণ্যের দীপ্তিতে দীপ্যমান সুভাষের ঐ মুখখানির দিকে। তারপরই এক সময়ে সারা মুখ তাঁর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কিসের একটা অস্বাভাবিক দ্যুতিতে।

গীতার শ্লোক মিথ্যে নয়। সে এসে গেছে। অন্যায় ও পাপের হাত থেকে পৃথিবীকে ভার-মুক্ত করার জন্য এরই মধ্যে সে এসে গেছে। দানবের হাত থেকে মাতৃভূমির মুক্তি অর্জন করা আর সুদূর-পরাহত নয়। সংগ্রাম শুরু হল বলে।

—শোন সুভাষ! রাশি রাশি স্নেহ ঝরে পড়ে প্যাটেলজীর কথায়, যে কাজ শুরু করেছ তা শেষপর্যন্ত চালিয়ে যেয়ো। আমি জানি তুমিই সেই লোক, যে ভারতের নোঙরহীন তরীকে ঠিক পথে

চালিত করতে পারবে। আমার উইলে তোমার জন্য আমি একলক্ষ টাকা রেখে গেলাম। বিদেশে প্রচারকার্য চালাবার জন্য তোমার ইচ্ছামত তুমি এটা খরচ করো।

বলতে বলতে এক সময়ে প্যাটেলজীর চোখ দুটো বুজে এল পরম শান্তিতে। অনন্ত নির্ভরতায়। নিশ্চিন্ত আরামে। সে ঘুম আর কোনদিনই ভাঙল না।

একটা নিদারুণ শূন্যতায় বুকটা হাহাকার করে ওঠে সুভাষের। প্রবাসী জীবনের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু প্যাটেলজী আজ তাঁর কর্মবহুল জীবনের পালা শেষ করে চলে গেলেন। নির্বান্ধব পৃথিবীতে এখন সে নিঃসঙ্গ, একা।

কিন্তু ঐ একলক্ষ টাকা! কি হল সেই টাকাটার! সত্যিই কি সেই টাকাটা পেয়েছিলেন সুভাষ?

না, পাননি। বাদ সাধলেন গান্ধী-শিষ্য সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। আদালতের সাহায্যে তিনিই উইলের সেই শর্তটাকে সেদিন নাকচ করে নিয়েছিলেন নানাবিধ আইনের ফ্যাঁকড়া তুলে।

কিন্তু যদি সুভাষ না হয়ে আর কেউ হতেন? যদি জওহরলাল হতেন? সে ক্ষেত্রে বড় ভাইয়ের নির্দেশটাকে নাকচ করার জন্য সর্দারজী এতখানি উঠে-পড়ে লাগতেন কি? বোধহয় না!

প্যাটেলজীর মৃত্যুর পর আবার শুরু হল দেশ-পরিক্রমা। আজ ফ্রান্স, কাল রোম, পরশু হয়তো বা অন্য কোন এক জায়গায়।

নিঃসঙ্গ নির্বাসিত জীবন। আত্মীয়-স্বজনহীন, বন্ধনহীন, একাকী। এ জীবনে একটানা পথ চলা ছাড়া আর সান্ত্বনা কোথায়!

ডাক এল খাস ইংল্যাণ্ড থেকে। ওখানকার ভারতীয়দের সর্বদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে সুভাষকে সভাপতিত্ব করতে হবে।

কিন্তু না, ইংরেজ সরকার তাঁকে ওখানে যেতে দিতে রাজী নয়। দেওয়া সম্ভবও নয়। সুভাষ বোসকে তারা হাড়ে-হাড়েই চেনে। সুতরাং কোনরকম ঝুঁকি নিতে তারা প্রস্তুত নয়।

আপত্তি নেই জওহরলালের বেলায়। কারণ, স্বয়ং গান্ধীজীর ভাষায় :

'He is more English than Indian in his thoughts and make-up. He is often more at home with Englishmen than with his countrymen.' অর্থাৎ, জওহরলাল যত না ভারতবাসী তার চাইতে অনেক বেশি ইংরেজ। তাই দেশবাসীর চাইতে তিনি অনেক বেশি খুশি হন ইংরেজের সাহচর্যে।

[কংগ্রেসের ইতিহাস : ডাঃ পট্টভি : ২য় খণ্ড : পৃঃ ১৩২]

সুতরাং জওহরলাল সম্বন্ধে আপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। আপত্তি করেওনি। বরং যথেষ্ট সমাদরই তাঁকে করা হয়েছিল আমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়ে।

কিন্তু জওহরলাল আর সুভাষ এক নন। সুভাষ মহাবিদ্রোহী। তদুপরি আয়ারল্যাণ্ডের সিন্‌ফিন্‌ বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী। খোলাখুলিভাবেই সেকথা তিনি প্রকাশ করেছেন বার বার। এহেন লোককে ইংল্যাণ্ডে ঢুকতে দেওয়াও যে বিপজ্জনক।

বাধ্য হয়েই সুভাষ তাঁর ভাষণ পাঠিয়ে দিলেন ডাকযোগে।

ভাষণ তো নয়, যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সাম্রাজ্যবাদী ইয়োরোপের মাটিতে দাঁড়িয়ে এমন অগ্নি-ঝরা ভাষণ দেবার মতো দুঃসাহস সেদিন এই একটি মানুষ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে কল্পনারও বুঝি অতীত ছিল।

'...ইংরেজের এই মনোভাব আর তার অস্তিত্ব হয়তো আরো অনেকদিন এমনি আটুট থাকবে, যদি আমরা অস্ত্রের সাহায্য বা আর্থিক অবরোধের দ্বারা ইংরেজ ও তার সমর্থকদের জীবন অচল, ভীতিপ্রদ আর অতিষ্ঠ করে তুলতে না পারি। আইন-অমান্য আন্দোলন তা করতে পারেনি।'

১০ই জুন, ১৯৩৩ সাল। লণ্ডনের ফিয়ার্স হলে ডাঃ কিরণ ভট্টাচার্যের মুখে সুভাষের প্রেরিত এই ভাষণ শুনে বিলেতের টোরী-সম্প্রদায় চটে লাল।

সঙ্গে পোঁ ধরল ওখানকার রক্ষণশীল পত্র-পত্রিকাগুলি। তারপর শুরু হল প্রচার-বিশারদ ইংরেজের স্বভাবসিদ্ধ অপপ্রচার। সুভাষ বোস কমিউনিস্ট। সুভাষ বোস ফ্যাসিস্ট। ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির উচিত এই বিপজ্জনক মানুষটির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। নইলে পরে পস্তাতে হবে।

মুখের ওপর জবাব দিলেন সুভাষ। জবাব দিলেন ভিয়েনা থেকে। সংক্ষিপ্ত এক বিবৃতি প্রচার করে খোলাখুলিভাবেই জানালেন তিনি তাঁর মনের কথা।

'পৃথিবী জুড়ে এখন নানা মতবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তার মধ্যে শেষপর্যন্ত কোন্‌টা যে টিকে থাকবে তার কোন স্থিরতা নেই। ভাল করে দেখে-শুনে তার মধ্যে যা সত্য, যা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর, তাই আমরা গ্রহণ করব। আগে থেকে কোন নির্দিষ্ট মতবাদের কাছে আমাদের মস্তিষ্ক বন্ধক রাখতে আমরা রাজী নই।'

আবার শুরু হল বিভিন্ন দেশ-পরিক্রমা। নির্বাসিত জীবনের এই নিঃসঙ্গ দিনগুলোকে হেলায় হারালে চলবে না। জানতে হবে অনেক কিছু। জানতে হবে ইয়োরোপের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভাঙা-গড়ার ইতিহাস। পরিচিত হতে হবে নতুন দেশের নতুন মানুষের সঙ্গে। নতুন ভাবধারার সঙ্গে।

জেনিভা থেকে ফ্রান্স। তারপর একে একে বুদাপেস্ট, সোফিয়া, বুখারেস্ট ও বেলগ্রেড।

সেই সঙ্গে চলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার কাজ। শুধু জানলেই চলবে না। সেই সঙ্গে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সবাইকে জানাতে হবে। জানাতে হবে গোটা বিশ্বকে।

হঠাৎ ছন্দপতন ঘটে গেল। খবর এল পিতা মৃত্যুশয্যায়। অবস্থা আশঙ্কাজনক। কি হবে বলা যায় না।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন সুভাষ। পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতা হি

পরমং তপঃ। যত বিধি-নিষেধই থাক না কেন, এ সময়ে তাঁর কাছে তাঁকে ফিরে যেতেই হবে।

ওরা ডিসেম্বর বিমানযোগে করাচি। সেখান থেকে সোজা দমদম। কোথায় তখন স্নেহময় পিতা জানকী বসু! দুদিন আগেই সব শেষ।

তা বলে অভ্যর্থনার ত্রুটি হল না।

দীর্ঘদিন বাদে দেশের মাটিতে পা দিতে না দিতেই সাদর অভ্যর্থনা জানাল বিরাট এক পুলিস বাহিনী। তারপরই তারা এক নির্দেশনামা তুলে ধরল পিতৃ-বিয়োগব্যথায় কাতর সুভাষের চোখের সামনে।

'বিমানঘাঁটি থেকে সোজা এলগিন রোডে যেতে হবে। বাড়ির বাইরে যাওয়া চলবে না। একমাত্র বাড়ির লোক ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে বাক্যালাপ নিষিদ্ধ। ডাকযোগে চিঠিপত্র যাই আসুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে না খুলেই তা পুলিসের কাছে জমা দিতে হবে। যে কোন একটি আদেশ অমান্য করলেই সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড।'

এখানেই থামলেন না সদাশয় ইংরেজ সরকার। দিন কয়েক যেতে না যেতেই আবার এক নতুন আদেশ। অবিলম্বে ইয়োরোপে ফিরে যেতে হবে। তোমার মতো বিপজ্জনক লোককে কিছুতেই দেশের মাটিতে থাকতে দেওয়া হবে না। নাও, প্রস্তুত হও।

১৯৩৫ সালের ৮ই জানুয়ারি সরকারী নির্দেশে আবার সুভাষকে ইয়োরোপে ফিরে যেতে হল নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করে। সেই নির্বাসন জীবনে।

প্রথমেই গেলেন নেপ্‌লস্। তারপর রোম। দেখা হল মুসোলিনীর সঙ্গে। সেখান থেকে আবার সেই ভিয়েনা। তারপর জেনিভা ও ফ্রান্স।

ইতিমধ্যে ১৬ই জানুয়ারি সুভাষের লেখা 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঢেউ উঠেছে গোটা ইয়োরোপ জুড়ে। ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ইতিপূর্বে কেউ এমন করে তুলে

ধরতে পারেনি সারা পৃথিবীর কাছে। মুখোশ-পরা ইংরেজের আসল চেহারাটাও বুঝি এমন করে কেউ খুলে দিতে পারেনি এর আগে।

বন্ধ করো। বন্ধ করো ঐ বই। ধরা পড়ে গিয়ে গর্জে উঠল সুসভ্য ইংরেজ সরকার। কিছুতেই এই বই ভারতবর্ষে যেতে দেওয়া হবে না। কোনমতেই না। সুতরাং মাত্র একসপ্তাহ বাদে, ২৩শে তারিখেই সুভাষের লেখা সেই বইটিকে বাজেয়াপ্ত করে দেওয়া হল গোটা ভারতবর্ষে।

সুইজারল্যাণ্ডে দেখা হল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রোমা রঁলার সঙ্গে।

অবশ্য তার আগেই 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' সম্বন্ধে রোমা রঁলা তাঁর অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সুভাষের কাছে। তাতে তিনি লিখেছিলেন—'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জানতে হলে এই বই অপরিহার্য। ঐতিহাসিকের মহত্তম গুণ আপনার লেখায় ফুটে উঠেছে।···রাজনীতির সীমাহীন কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকেও দলীয় মনোভাব আপনার বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেনি। এটা দুর্লভ।···আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন এই কামনা করি। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য আপনাকে সুস্থ হয়ে উঠতেই হবে।'

১৯৩৬ সাল। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস। গান্ধীজীর ইচ্ছানুযায়ী সভাপতি হলেন জওহরলাল।

তরুণদল চঞ্চল। পুরনো মতবাদে এখন আর তারা কেউ-ই আস্থাশীল নয়। তারা চায় নতুন আবেগ। নতুন তরঙ্গ। নতুন পথ-নির্দেশ।

কেউ কেউ এর মধ্যেই সোস্যালিজমের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কেউ বা আবার মেতে উঠেছে কমিউনিজম নিয়ে। কে পারে এই উদ্বেলিত যুবশক্তিকে একটা নতুন চমক দেখিয়ে শান্ত করতে।



জওহরলাল।

সুভাষকে বাদ দিলে একমাত্র জওহরলাল সম্বন্ধে দেশের যুবশক্তি এখনো কিছুটা আশাবাদী। সুতরাং জওহরলাল ছাড়া গতি নেই।

তাছাড়া জওহরলাল সম্বন্ধে ভয়েরও কোন কারণ নেই। নিজস্ব মতবাদ নিয়ে মুখে যাই বলুক না কেন, প্রয়োজনের মুহূর্তে সে বশ্যতা স্বীকার করতে জানে।

তাছাড়া আরো কারণ আছে। ১৯৩৫ সালে যে নতুন শাসনতন্ত্র চালু করা হয়েছে, তার ফলে প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা এখন আর সুদূরপরাহত নয়। নির্বাচনের মাধ্যমে অনায়াসেই তা পাওয়া যেতে পারে।

বাদ সেধেছে ঐ প্রগতিবাদী যুব-সম্প্রদায়। তাদের মতে এটা ইংরেজের একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, প্রদেশগুলিতে কিছু কিছু সুবিধা পাওয়া গেলেও কেন্দ্রীয় শাসনকার্যের ব্যাপারে সে সব কোন প্রশ্ন নেই। সেখানে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে এমন চাতুর্য-সহকারে আসন ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হয়েছে যে, কোনরকমেই কংগ্রেসের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার কোন আশা নেই।

যুব-সম্প্রদায়ের আপত্তি সেইখানেই। তাদের বক্তব্য, এই শর্তে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার অর্থই হল সাম্প্রদায়িকতাকে মেনে নেওয়া। সুতরাং কংগ্রেসের পক্ষে কিছুতেই সরকারের এই ফাঁদে পা দেওয়া উচিত হবে না।

জওহরলালের চটক আছে। দেখা যাক, এ ব্যাপারে সে কোন মীমাংসায় আসতে পারে কিনা!

জওহরলাল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শুনে সবচাইতে বেশি খুশি হলেন সুভাষ।

ষোল আনা গান্ধী-ভক্ত হলেও জওহরলালের রাজনৈতিক

দূরদর্শিতা ও কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে তখনো তিনি কিছুটা আশাবাদী। তাই জওহরলালকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখলেন :

'আজ যাঁরা নেতৃত্বের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র তোমার ওপরই আমি ভরসা রাখি। তুমিই পারবে কংগ্রেসকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে।···আমি একান্তভাবেই আশা করব যে, তোমার নিজস্ব আদর্শানুযায়ী সিদ্ধান্তে পৌছতে তোমার ব্যক্তিত্বকে তুমি বিনা দ্বিধায় প্রয়োগ করবে। নিজেকে দুর্বল ভেবো না।··· কংগ্রেসের গদী-দখলের চেষ্টা যেমন করে হোক বন্ধ করতে হবে। আর ওয়ার্কিং কমিটিকে সম্প্রসারিত করতে হবে। এ দুটো কাজ যদি তুমি করতে পার, অধঃপতনের পথ থেকে কংগ্রেসকে তুমি বাঁচাতে পারবে।···যদি আমি লক্ষ্নৌ যাবার সুযোগ পাই, আমি দাঁড়াব তোমার পাশে।'

এবার এক নতুন সিদ্ধান্ত নিলেন সুভাষ।

এ নির্বাসিত জীবন আর নয়। এবার আমি ফিরে যাব আমার দেশের মাটিতে। কি করবে ইংরেজ? বন্দী করবে? করুক। তবু তো দেশের মাটি!

সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেখতে দেখতে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে। সুভাষ তাঁর দেশে ফিরে যাবেন ইংরেজের যাবতীয় বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে। এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প।

তার আগেই আহ্বান এল আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তিযোদ্ধা ডি. ভ্যালেরার কাছ থেকে।

সবেমাত্র তারা ইংরেজের কবল থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে। এ সুযোগে তারা সাদর সংবর্ধনা জানাতে চায় ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা সুভাষকে।



১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডাবলিনে বীরোচিত সংবর্ধনা জানানো হল সুভাষকে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে। সত্যিকার সংগ্রামীকে কি করে সম্মান দেখাতে হয় তারা তা জানে।

এবার ঘরে ফেরার পালা।

বাধা দিতে চেষ্টা করলেন ভিয়েনার ইংরেজ রাষ্ট্রদূত জে. ডব্লিউ. টেলার। এ প্রচেষ্টা ত্যাগ করুন। জেনে রাখুন, আমাদের বৈদেশিক দপ্তর আপনার এ কাজ অনুমোদন করেন না। তাই সতর্ক করে দিচ্ছি যে, স্বাধীনভাবে আপনার ভারতে প্রবেশ করা মোটেই সম্ভবপর হবে না। 'You cannot expect to remain at liberty.'

আমি যাবই। নিজের সঙ্কল্পে সুভাষ স্থির, অনড়। এভাবে বছরের পর বছর ধরে নির্বাসিত জীবন মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

১১ই এপ্রিল, ১৯৩৬ সাল। বম্বের জাহাজ ঘাটে সেদিন জনতার প্রচণ্ড ভিড়। আজ সুভাষ আসবেন। চিরবিদ্রোহী সুভাষ।

বাধা দিল পুলিস বাহিনী। না, কাউকেই কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হবে না। একটি প্রাণীও না। আসুক না সুভাষ বোস। তারপর যা করার আমরাই করব। ভ্যান-গাড়ি প্রস্তুতই রয়েছে।

কাজেও তাই হল। জাহাজ ভিড়তেই কড়া পুলিস পাহারায় সুভাষকে নিয়ে তোলা হল কালো রঙের সেই ভ্যান-গাড়িটাতে। তারপর সোজা আর্থার রোড পুলিস ফাঁড়ি। সবশেষে যারবেদা জেল।

দূরে দণ্ডায়মান বিরাট জনতার কণ্ঠে এবার ধ্বনি উঠল—সুভাষ বোস কি জয়। সুভাষ বোস জিন্দাবাদ।

আর সুভাষ। যেতে যেতে একটিমাত্র কথাই তিনি বলতে পেরেছিলেন জনতার উদ্দেশ্যে, 'বাইরের স্বাধীনতার চাইতে দেশের

কারাগারও আমার কাছে অনেক প্রিয়।' 'Keep the flag of India's freedom flying.'

এবার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল গোটা ভারতবর্ষ। ওয়ার্কিং কমিটি, সোস্যালিস্ট পার্টি, দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, কেউ বাদ গেল না। প্রতিবাদ হিসেবে ১০ই মে 'সুভাষ-দিবস' পালিত হল ভারত-বর্ষের সর্বত্র। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বিক্ষোভ।

কেন সুভাষকে বন্দী করা হল? কি তাঁর অপরাধ? অপরাধ কিছু থাকলে প্রকাশ্য আদালতে তা প্রমাণ করা হচ্ছে না কেন?

প্রতিবাদ করলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখলেন:

'…বাংলা দেশে হাজার হাজার নরনারী আজ বন্দিশালায়। বিচারের দাবী করছিই, সেই দাবীর পেছনে দুঃখ আছে দুঃসহ, কিন্তু তার জোর নেই। বিনা বিচারে যারা দণ্ড ভোগ করছে অপরিমিত কাল ধরে, তাদের মধ্যে দেশের যে বেদনা আছে, তার চেয়ে অনেক বড়ো আছে দেশের অসম্মান।

বিচারের অধিকারে আছে মনুষ্যত্বের সম্মান। তার থেকে আমরা বঞ্চিত। কেননা, আমরা বিশ্বের গোচর নই, আমাদের মূল্য নেই। এই দেশব্যাপী অভিসম্পাতের আক্রমণ হতে যদি কোনদিন নিজেদের রক্ষা করতে পারি তা হলেই আমাদের প্রত্যেক অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হবে দেশে-বিদেশে।…'

একই প্রশ্ন উঠল বিলেতের পার্লামেন্টে। সুভাষ সম্বন্ধে সরকারের নীতি কি? কেন তাঁকে এভাবে বছরের পর বছর ধরে নির্বাসিত জীবনে বাধ্য করা হচ্ছে?

উত্তর পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গেই। সেই চিরাচরিত উত্তর। সুভাষ বোস সন্ত্রাসবাদী।

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষপর্যন্ত সুভাষকে আটক বন্দী করে রাখা হল কার্শিয়াং-এ। গির্দা পাহাড়ে অবস্থিত মেজদা শরৎ বোসের নিজস্ব বাংলোতে।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস শেষ হল। প্রগতিবাদী বামপন্থী দলগুলির সেদিন অনেক আশা ছিল সভাপতি জওহরলালের ওপর। কিন্তু সে আশা বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে দেরি হল না।

কোথায় সংগ্রামী জওহরলাল! কোথায় তাঁর সংগ্রামের পথ-নির্দেশ!

তার ছিটে-ফোঁটাও পাওয়া গেল না এবারকার সভাপতি জওহরলালের মধ্যে। এ জওহরলাল বৃদ্ধ, স্থবির ও সংগ্রাম-বিমুখ।

এ প্রসঙ্গে একটি চিঠি থেকে খানিকটা অংশ আমি এখানে তুলে ধরছি, মল্লিকা। চিঠির লেখক যুক্তপ্রদেশের প্রখ্যাত কংগ্রেস-নেতা রফি আমেদ কিদোয়াই। এ চিঠি থেকেই তুমি বুঝতে পারবে যে, কংগ্রেস সভাপতি জওহরলালের ভূমিকা সেদিন দেশের প্রগতিবাদী শক্তিগুলোকে কতখানি হতাশ করে তুলেছিল।

'প্রিয় জওহরলালজী,

...আপনার ওপরই ছিল আমাদের সবচাইতে বড় ভরসা। কিন্তু মনে হয় আপনিও আমাদের কাছে মিথ্যে হয়েই দাঁড়ালেন।... আপনার সামনে সত্যিই একটা সুযোগ এসেছিল। ইচ্ছা করলে এই সুযোগে আপনি আপনার ইচ্ছামত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারতেন।...আপনি তাদেরই সরিয়েছেন, যারা আপনাকে শক্তি যোগাতে পারত। গান্ধী-গোষ্ঠী চালাকি করে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করেছে।...'

[বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স : পৃঃ ১৭৫]

এ তো গেল রফি আমেদের কথা। এবার একান্ত স্নেহের পাত্র জওহরলাল সম্বন্ধে গান্ধীজীর নিজের কি বক্তব্য শোনা যাক।

প্রিয় শিষ্য আগাথা হ্যারিসনকে লিখিত চিঠিতে এ সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'আশার কথা এই যে, জওহরলাল যখন আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে, তখন সে হয়ে ওঠে পুরোপুরি চরমপন্থী। কাজের বেলা কিন্তু তা নয়। তখন সে খুব সতর্ক এবং সংযত। আমার মনে হয় জওহরলাল তার অধিকাংশ সহকর্মীর সিদ্ধান্ত মেনে চলবে।'

[বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স : পৃঃ ১৭৫]

তবু একদিন সংঘাত বাধল, মল্লিকা।

কারণ, চরম অবলুপ্তির আশঙ্কায় গান্ধী-চক্রের কাছে যতই নতি স্বীকার করুক না কেন, আসলে জওহরলালের মধ্যে সর্বক্ষণই বাস করত একটা আদর্শবাদী নির্ভীক সত্তা, যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাঝে মাঝে ছিটকে বেরিয়ে পড়ত স্ফুলিঙ্গের মতো।

গান্ধীবাদীদের তা মনঃপূত নয়। তাঁরা চান পূর্ণ বশ্যতা, যেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বলে কিছুই থাকবে না।

এই নিয়েই সূত্রপাত। তারপরেই হঠাৎ একদিন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজাগোপালাচারী, কৃপালনী প্রমুখ ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্যদের পদত্যাগ-পত্র এসে হাজির। হয় আমাদের কথামত চল, নয়তো তোমার সঙ্গে আর আমরা নেই। যা ভাল বোঝ কর।

পরদিনই জওহরলাল পড়ি-কি-মরি করে ওয়ার্ধায় ছুটলেন গান্ধীজীর কাছে।

হাজির অপরপক্ষও। জওহরলাল যে সঙ্গে সঙ্গে এখানে ছুটে আসবে, এ তো জানা কথাই। না এসে যাবে কোথায়! নরীম্যানের দৃষ্টান্ত তো তার ভুলে যাবার কথা নয়!

মাত্র এক মিনিটের মামলা। গান্ধীজীর সঙ্গে কি কথা হল কে জানে! কিন্তু দেখা গেল যে, সব ঠিক। কারো কোন অভিযোগ নেই। কোন অভিমানও নেই। সব হরিহর-আত্মা।

তবে লাভ হল জওহরলালেরই। পুরস্কার হিসেবে গান্ধীজীর ইচ্ছায় পরবর্তী ফৈজপুর কংগ্রেসের সভাপতির পদটাও তাঁর ভাগ্যেই জুটে গেল।

অবস্থার আরো অবনতি ঘটল ফৈজপুর কংগ্রেসে।

কোথায় সংগ্রাম! কোথায় তার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী! ১৯৩৩ সালে সেই যে মাঝপথে সংগ্রাম প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল, সেই শেষ। তারপর বছরের পর বছর ধরে শুধু কথা, কথা আর কথা। ফলে, বহু তরুণ কংগ্রেস থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে বামপন্থী দলগুলিকে ভারী করে তুলল কোন দিকে কোন পথের সন্ধান না পেয়ে।

সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর অভাবে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন রীতিমত ঘোরালো। এমন কি, বিদেশী রাজনীতিবিদদের চোখে পর্যন্ত সেদিন কংগ্রেসের এই সংগ্রামবিমুখতা ধরা পড়তে দেরি হয়নি। এই প্রসঙ্গে আমি এডওয়ার্ড টমসনের লেখা দুটি চিঠি থেকে কিছুটা অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি, মল্লিকা। সেই এডওয়ার্ড টমসন, যিনি ব্যক্তিগত জীবনে শুধু জওহরলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুই নন, ভারতেরও একজন সত্যিকারের শুভার্থী বন্ধু বলে পরিচিত। ১৯৩৬ সালের ১লা নভেম্বর বন্ধু জওহরলালকে তিনি লিখেছেন :

'...একটি কথা ছাড়া গান্ধীজী সম্বন্ধে আর কিছু বলব না। আইন-অমান্য আন্দোলন কিছুটা সাফল্য লাভ করা সত্ত্বেও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তিনি যদি অতঃপর নতুন কোনও পথ আবিষ্কার করতে না পারেন, তাহলে হয়তো তিনি কেবল নামে-মাত্র একজন ক্ষমতাশীল 'গণপতি' হয়েই থাকবেন ; গণদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা ছাড়া তাদের একটা স্থির লক্ষ্যে পরিচালনা করতে পারবেন না'।

[বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স]

পরের চিঠিটি লিখেছেন ১৯৩৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর।

'...কংগ্রেসের অবস্থা ক্রমশঃই জনসাধারণের কাছে গোলকধাঁধার মতো হয়ে উঠেছে। ফলে, স্বভাবতঃই তারা সন্দিগ্ধ। কংগ্রেসীরা যে ভাষায় কথা বলে, তার অর্থ একটাই হওয়া উচিত। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, তাদের কথা ও কাজের মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল তফাত।' [বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স : পৃঃ ২০৭]

সুভাষ তখন কার্শিয়াং-এর গির্দা পাহাড়ে আটক বন্দী। একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন জীবন। দিন আর রাত্রির মধ্যে সেখানে কোন তফাত নেই।

আবার বাদ সাধল সেই দেহ। বাধ্য হয়েই ন'মাস পরে ডিসেম্বর মাসের ১৭ই তারিখে তাঁকে নিয়ে আসা হল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। অবশেষে মুক্তি দেওয়া হল ১৯৩৭ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে। বিনা শর্তে।

সারা দেশ মেতে উঠল সুভাষের মুক্তির খবর শুনে। আমাদের সুভাষ ফিরে এসেছে! ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে দীর্ঘ পাঁচ বছর বাদে!

৬ই এপ্রিল সংবর্ধনা জানানো হল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। সভাপতি সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন : 'ইংরেজ তোমার মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল। দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমি তোমাকে পরিয়ে দিলাম ফুলের মুকুট।'

কিন্তু দেহ অপটু। স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে হলে বিশ্রাম দরকার। পরিপূর্ণ বিশ্রাম। নইলে যে কোন মুহূর্তে আবার রোগের আক্রমণ ঘটা বিচিত্র নয়।

বিশ্রাম নিলেন ডালহৌসী পাহাড়ে ডাঃ ধরমবীরের অতিথি হয়ে। ১৯৩৯ সালের ২৫শে এপ্রিল তারিখে।

৭ই অক্টোবর আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। ডাঃ ধরমবীর সহজে রাজী হননি। রাজী হয়েছেন একটিমাত্র শর্তে। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সুভাষকে আর একবার ইয়োরোপে যেতে হবে। যেতেই হবে। যাওয়া খুবই দরকার।

কলকাতা থেকে কার্শিয়াং। তারপর আবার কলকাতা। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসবে কলকাতায়। এ সময়ে তাঁর কাছে থাকা দরকার।

১৮ই নভেম্বর আবার ইয়োরোপে। ডাঃ ধরমবীরের নির্দেশ। যেতেই হবে।

সুভাষের সেই সতর্কবাণী তোমার বোধহয় স্মরণ আছে, মল্লিকা! ইয়োরোপ থেকে জওহরলালকে তিনি লিখেছিলেন: 'নিজেকে দুর্বল ভেবো না। কংগ্রেসের গদী-দখলের চেষ্টা যে করে হোক, বন্ধ করতেই হবে।'

বন্ধ করা কিন্তু কিছুতেই সম্ভব হল না, মল্লিকা।

নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়-জয়কার। তারপরই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ। স্বাধীনতা নয়। স্বায়ত্তশাসনও নয়। মন্ত্রিত্ব।

অবশ্য দুদিন আগে পর্যন্ত বলা হয়েছিল অন্য কথা। সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না। কিন্তু এখন আর সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা মেনে নিয়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে তেমন কোন আপত্তি দেখা গেল না।

অবশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাপারে হাত দেবার কোন সুযোগ নেই। প্রদেশ-গুলোতেও পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীর মর্যাদা নেই। আসল জিনিসগুলো নিজেদের হাতে রেখে শুধু মামুলি কয়েকটা ব্যাপার ওরা ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে মাত্র। তা হোক, তবু তো মন্ত্রিত্ব! ইংরেজের আওতায় থেকে এটুকুই বা মন্দ কি!

সাত সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হল। কার্যত মেনে নেওয়া হল যে, কংগ্রেস আসলে বর্ণ হিন্দুদের একটা সম্প্রদায়-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। মুসলমান বা অনুন্নতদের সম্বন্ধে তাদের কোন কথা বলার অধিকার নেই। কোন দায়িত্ব নেই।

ফলে বিপদ হল বিশেষ করে, কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মুসলমান সদস্যদের। তাদের একুল-ওকুল দুই-ই গেল। কি কংগ্রেস, কি মুসলীম লীগ, সর্বত্রই তারা অপাংক্তেয় হয়ে রইল ভাগ্যের পরিহাসে।

অবাক হবার কিছুই নেই। এতো জানা কথাই। সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা মেনে নেওয়াটা যে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে, সে সম্বন্ধে সুভাষ আগেই তাঁর সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন বার বার। কেউ সেদিন কর্ণপাত করেননি তাঁর কথায়। বুঝতেও চেষ্টা করেননি কেউ। কারণ, ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে সেদিন সবচাইতে বড় প্রশ্নই ছিল—মন্ত্রিত্ব। তার কাছে আর সব কিছুই ছিল গৌণ।

বুঝতে পেরেছিলেন অনেক পরে। প্রমাণ, ১৯৪৫ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর বম্বে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্বীকারোক্তি।

'The acceptance of the principle of communal electorate was a mistake. It has created the problem.'

সর্দারজী ভুল স্বীকার করেই রেহাই পেলেন। কিন্তু দেশ ও জাতি তার সর্বনেশে পরিণতি থেকে রেহাই পেল কি?

সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারাকে মেনে নেওয়ার অর্থ কি দ্বিজাতি তত্ত্বের স্রষ্টা জিন্নার 'পাকিস্তান' দাবীকে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেওয়া নয়?

ক্ষমতার মোহে আমাদের নেতৃবৃন্দ কি সেদিন নিজের হাতেই পাকিস্তান বনেদের গোড়াপত্তন করেননি ভারতের মাটিতে?

এখানেই শেষ নয়, মল্লিকা। এই দিশাহীন নেতৃত্বের ফলে সেদিন বাংলাদেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা আরো মারাত্মক।

পর পর সাত সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হল, হল না বাংলাদেশে। বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা যায়নি। সুতরাং কংগ্রেসের পক্ষে মন্ত্রিসভা গঠনের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

হঠাৎ একটা অপূর্ব সুযোগ এসে গেল হাতের মুঠোয়। এগিয়ে এলেন কৃষক প্রজা পার্টি'র প্রধান নায়ক জনাব ফজলুল হক। এস, আমরা মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করি। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। আমাদের উভয় দলের সমন্বয়ে সরকার গঠিত হলে বাংলাদেশের মাটি থেকে মুসলীম লীগকে চিরতরে উচ্ছেদ করতে দুদিনও সময় লাগবে না। এস, হাতে হাত মেলাও!

মল্লিকা, ভুল সবারই হয়। কংগ্রেস বা গান্ধীজীও তার ব্যতিক্রম নন। জীবনে এমন বহুবারই তিনি ভুল করেছেন। স্বীকারও করেছেন সেকথা। এমন কি, নিজের সেই ভুলকে তিনি 'হিমালয়ান ব্লাণ্ডার' বলে স্বীকার করতেও কোনদিন কুণ্ঠিত হননি।

কিন্তু সেদিন কংগ্রেস যে ভুল করেছিল, তাকে ইতিহাসের সবচাইতে শোচনীয় ভুল বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবে-না মল্লিকা। আজও সেই ভুলের মাশুল দেওয়া শেষ হয়নি। কোনদিনই হবে না। বাংলা ও বাঙালীকে সেই ভুলের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে আজীবন।

হকসাহেবের দাবী উপেক্ষিত হল। বৃথাই তিনি দিনের পর দিন মাথা খুঁড়ে মরতে লাগলেন কংগ্রেসের দরজায়। কেউ তাঁর আবেদনে সাড়া দিল না। একটি প্রাণীও না।

ফলে, যা হবার তাই হল। ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়ে এবার তিনি হাত মেলালেন সেই মুসলীম লীগের সঙ্গে। ফলে, কোয়ালিশন সরকারের পরিবর্তে গঠিত হল মুসলীম লীগ সরকার। যার শেষ পরিণতি বাংলা-বিভাগ।

সেদিন কংগ্রেস এই অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় না দিলে কিছুতেই যে বাংলা-বিভাগ হত না, এ নিষ্ঠুর সত্যকে আর কোন রকমেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

এল ১৯৩৮ সাল। সামনেই হরিপুরা কংগ্রেস। এবার কার পালা?

শুধু সাধারণ মানুষ নয়, গান্ধীজীর মনেও সেই একই প্রশ্ন। এবার কার পালা? কে হবেন হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি?

সবাই বশ মেনেছে একে একে। এমন কি জওহরলালও তার ব্যতিক্রম নয়। বাকি শুধু একজন। আজও সে কারো কাছে মাথা নোয়ায়নি।

অবশ্য মাথা সে ঠিকই নোয়ায়। দেখা হলেই নোয়ায়। কিন্তু মাথা নোয়ায় তার ব্যক্তিত্বের কাছে, নীতির কাছে নয়। সেখানে সে এক ও অদ্বিতীয়।

ওকে কি কাছে পাওয়া যায় না? জওহরলালের মতো পোষ মানানো যায় না?

১৮ই জানুয়ারি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী আচার্য কৃপালনী ঘোষণা করলেন: 'পরবর্তী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সুভাষ। বাংলা ও বাঙালীর সুভাষ।'

আনন্দের একটা ঢেউ বয়ে গেল যেন গোটা ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে। বিশেষ করে যুব-সম্প্রদায়ের তো কথাই নেই। সুভাষের পথ চিরাচরিত পথ নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এবার নিশ্চয়ই একটা নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে।

সুভাষ তখন বাদ্‌গাস্টিনে। সেখান থেকে লণ্ডন।

এবার আর বাধা দিল না ইংরেজ সরকার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে

কি করে যে পূর্বেকার ভূমিকা ভুলে যেতে হয়, চতুর ইংরেজ তা ভাল করেই জানে।

১০ই জানুয়ারি ডরচেস্টারের বিরাট জনসভায় সংবর্ধনা জানানো হল সুভাষকে।

দেখা হল এট্‌লী, বেভিন, হ্যালিফ্যাক্স প্রমুখ ইংরেজ ধুরন্ধরদের সঙ্গে। বিভিন্ন পার্লামেণ্ট সদস্যগণও বাদ গেলেন না।

বাদ গেলেন না সেই স্বনামধন্য জেটল্যাণ্ডও। মাত্র একবছর আগে যিনি পার্লামেণ্টে বলেছিলেন: 'মিঃ বোসের সত্যই অসাধারণ যোগ্যতা আর কর্মদক্ষতা রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই ক্ষমতা তিনি সর্বদাই ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োজিত করেছেন।'

এবার জেটল্যাণ্ডের অন্য চেহারা। ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার ভূমিকাও তাই। পরদিনই তাদের মন্তব্য প্রকাশিত হল:

'এই প্রথম ইংরেজ সুভাষ বোসকে দেখতে পেল। ওর মধুর ব্যবহার, সংযত আচরণ ও ভারতীয় সমস্যা আলোচনার নিঃসংশয় ও নিশ্চিন্ত ধরনে আমরা মুগ্ধ।'

২৪শে জানুয়ারি করাচির মাটিতে এসে পা দিলেন সুভাষ। সে কি উদ্বেলিত জনতার ভিড় সেদিন করাচির বিমানঘাঁটিতে! সামান্য আশা, শুধু একটু চোখের দেখামাত্র!

কিন্তু কোথায় সুভাষ! ফুলে ফুলে ততক্ষণে গোটা দেহটাই বুঝি তাঁর ঢাকা পড়ে গেছে।

শুরু হল হরিপুরা কংগ্রেস।

প্রথমেই সভাপতি-বরণ। নির্বাচিত সভাপতিকে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া নতুন কিছু নয়। কিন্তু ভারতের লক্ষ লক্ষ মুক্তি-পাগল মানুষ সেদিন সুভাষকে যেভাবে বীরোচিত সংবর্ধনা জানিয়েছিল, কংগ্রেসের ইতিহাসে সত্যিই তা অভূতপূর্ব, মল্লিকা।

পাঁচ মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা। এখানে-ওখানে অসংখ্য সুসজ্জিত তোরণ। পথের দুধারে লক্ষ লক্ষ আগ্রহাকুল নর-নারী। কণ্ঠে তাদের একই ধ্বনি—রাষ্ট্রপতি সুভাষ বসু জিন্দাবাদ। ভারতের কনিষ্ঠতম কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ বসু জিন্দাবাদ। সুভাষ দীর্ঘজীবী হোক।

সবশেষে সভাপতির ভাষণ।

কিন্তু একি! গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ অবাক। চরকার কথা নেই। গো-রক্ষা সমিতির কথা নেই। আছে শুধু নতুন নতুন কথা। ইয়োরোপে যুদ্ধ আসন্ন, ভারতকে তার সুযোগ নিতে হবে। শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনাকে মেনে নিতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার খসড়া তৈরি করতে হবে। দেশকে সমাজতন্ত্রের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে। এমনি সব নতুন নতুন কথা, যা আজো কেউ শোনেনি কোন কংগ্রেস সভাপতির কাছ থেকে।

এবার হরিপুরা কংগ্রেসে গৃহীত একটি প্রস্তাব থেকে বিশেষ কয়েকটি কথা আমি তোমার সামনে তুলে ধরছি, মল্লিকা। কথাগুলো তুমি ভাল করে লক্ষ্য কর। পরে দরকার হবে।

ইয়োরোপে তখন যুদ্ধের ঘনঘটা চলছে। বিস্ফোরণ ঘটতে আর খুব একটা বেশি দেরি নেই। পরিস্থিতি লক্ষ্য করে প্রস্তাব গৃহীত হল :

'ভারতবর্ষ কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে না। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের জন্য অর্থ বা লোকবলও নিয়োগ করবে না।··· ভারতে যে সমরায়োজন চলছে, কংগ্রেস তা সমর্থন করবে না। ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়াবার চেষ্টা করা হলে কংগ্রেস তা প্রতিরোধ করবে।'

সুভাষের পরিচয় তাঁর কথায় নয়, কাজে। তাই এবার শুরু হল সেই নতুন পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার কাজ। সুভাষের একান্ত আগ্রহে তার সভাপতি হলেন পণ্ডিত জওহরলাল। আর সমর্থক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

মল্লিকা, এই সেই সুভাষের সৃষ্ট ঐতিহাসিক প্ল্যানিং কমিশন, যা আজ স্বাধীন ভারতে চলে আসছে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে।

পরবর্তীকালে জওহরলাল তাঁর নিজের বইতে অনেক গুণগানই করেছেন এই প্ল্যানিং কমিশন সম্বন্ধে। তিনিই যে তার সভাপতি, সেকথাও জানাতে ভোলেননি।

শুধু একটি কথাই জানাতে ভুলে গেছেন যে, ঐতিহাসিক এই প্ল্যানিং কমিশনের স্রষ্টা তিনি নন, সুভাষ।

গান্ধীবাদীরা সমর্থন করতে না পারলেও দেশের চিন্তাশীল লোকদের মধ্যে কিন্তু সুভাষের এই প্ল্যানিং কমিশন সেদিন সত্যিই একটা আলোড়ন তুলেছিল, মল্লিকা। প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি। চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন জওহরলালকে।

'ভারতের শিল্পোন্নয়নে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে সেদিন ডঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হল। আলোচনা খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। আমি এর প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছি। কংগ্রেসের দৃষ্টি এর দিকে ফেরাবার জন্য সুভাষ যে কমিশন করেছে, জানলাম, তার সভাপতি হতে তুমি সম্মতি জানিয়েছ। তাই এ সম্বন্ধে তোমার মত জানতে ইচ্ছে করছে।' [বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স : পৃঃ ২৯৫]

২৬শে জুলাই সুভাষ মহাজাতি সদন নির্মাণকল্পে একখণ্ড জমির জন্য আবেদন জানালেন কলকাতা কর্পোরেশনের কাছে। টাকার জন্য ভাবনা নেই। সহকর্মীদের সাহায্যে গঠিত 'সুভাষ ফাণ্ডে' ত্রিশ হাজার টাকা গচ্ছিত রয়েছে। জমিটা পাওয়া গেলে কাজ শুরু করতে আর কোন অসুবিধে নেই।

দাবী মঞ্জুর হল ৩রা আগস্ট। মোট এক বিঘে আঠারো কাঠা জমি। লিজ-এর মেয়াদ মোট নিরানব্বই বছর। বাৎসরিক খাজনা একটাকা মাত্র।

এল ১৯৩৯ সাল।...

এবার ত্রিপুরী কংগ্রেস। স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচাইতে কলঙ্কময় অধ্যায়, ত্রিপুরী কংগ্রেস।

বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রস্তাব করা হল তনজনের নাম। মৌলানা আজাদ, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া আর সুভাষ। এঁদের মধ্যেই কাউকে সভাপতি করা হোক।

যুব-সম্প্রদায় তথা কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি, লেবার পার্টি, রায়-পন্থী ইত্যাদি বামপন্থী দলগুলির দাবী—আমরা সুভাষকে চাই। ইয়োরোপে যুদ্ধ আসন্ন। জাতির পক্ষে এটা মস্তবড় একটা সুযোগ। সুভাষ ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই এ সময়ে শক্ত হাতে হাল ধরা সম্ভব নয়।

প্রথমেই দাবী জানাল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৬ই অক্টোবর দলীয় মুখপত্র 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে খোলাখুলি-ভাবেই লেখা হল সেকথা। সামনে কঠিন, কঠোর সংগ্রামের দিন। এ সময়ে সুভাষেরই প্রয়োজন সবচাইতে বেশি।

১৭ই তারিখে দাবী জানালেন সাজ্জাদ জাহির, জেড্. এ. আমেদ, মোহন সিং যশ, পি. সুন্দরাইয়া, ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ, ভগৎ সিং, রামমূর্তি প্রমুখ কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ। সুভাষ উপযুক্ত লোক। তাঁকেই আমরা চাই।

নিশ্চয়ই তুমি খুব অবাক হয়েছ, মল্লিকা। কিন্তু এটাই সত্যি। আজ এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতা হলেও সেদিন ওঁরা সবাই যুক্ত ছিলেন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে।

২২শে তারিখে আবেদন জানালেন হুমায়ুন কবীর, নবাবজাদা সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী, মোয়াজ্জেম আলী চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, আবুল মনসুর আমেদ, এ. রসিদ খাঁ প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলীম নেতৃবৃন্দ। আমরাও সুভাষকে চাই।

আর দাবী জানালেন আচার্য পি. সি. রায়। সুভাষই যোগ্য ব্যক্তি। তার সঙ্গে কারোরই তুলনা হয় না।

রবীন্দ্রনাথেরও তাই মত। খোলাখুলিভাবেই তিনি সেকথা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন গান্ধীজী ও জওহরলালকে। প্ল্যানিং কমিশনের মতো একটা নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে সুভাষের দ্বিতীয়বার সভাপতি হওয়া খুবই প্রয়োজন। উপসংহারে তিনি লিখেছেন :

'কাজ করবার যন্ত্র যদি বিকল হয়ে ওঠে, ওকে চালাতে পারে সে-ই, যার চালাবার শক্তি আছে। চালকের পথে যদি বাধা এসে দাঁড়ায়, বাধা সরিয়ে দেওয়াও ঐ চালকের কাজ। যন্ত্রের চালক মানুষ হিসেবে বড় নাও হতে পারে, কিন্তু সে যে যন্ত্রবিদ এ বিষয়ে তো সন্দেহ নেই।' [বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স : পৃঃ ২৯৯]

এই প্রসঙ্গে আরও একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহা। সুভাষের প্ল্যানিং কমিশনের ব্যাপারে তিনিই কবিকে উৎসাহী করে তুলেছিলেন বিশেষভাবে।

হঠাৎ সরে দাঁড়ালেন মৌলানা আজাদ। সেই সঙ্গে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে তিনি জানালেন :

'কংগ্রেস প্রতিনিধিদের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা যেন ডাঃ সীতারামিয়াকে সমর্থন করেন। আমি এটাই আশা করব যে, তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছেন।'

সরে দাঁড়ালেন না সুভাষ। গান্ধীজী অনেক বড়। কিন্তু তার চাইতে বড় দেশ। সেই দেশের দাবী। জনতার দাবী। যুব-সম্প্রদায়ের দাবী। তাদের সেই দাবীকে উপেক্ষা করার মতো সাধ্য তাঁর কোথায়!

তার চাইতে নির্বাচন হোক! কংগ্রেস কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ভোটের মাধ্যমে রায় দিক যে, তারা কাকে চায়?

পরদিনই (২১শে জানুয়ারি) সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়ে আরো স্পষ্ট করে সুভাষ জানালেন তাঁর মনের কথা।

'মৌলানা আজাদের ন্যায় বিশিষ্ট নেতার আবেদনের ফলে যদি অধিকাংশ প্রতিনিধি আমার পুনর্নির্বাচনের বিরুদ্ধে ভোট দেন, তবে আমি বিশ্বস্তভাবে তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নেব এবং সাধারণ সৈনিক হিসেবে কংগ্রেস ও দেশের সেবা করব।'

অত্যন্ত রুষ্ট হলেন গান্ধীপন্থী নেতৃবৃন্দ। নিয়ম যাই থাক না কেন, গান্ধীজীই এতকাল তাঁর ইচ্ছামত সভাপতি নির্বাচন করে এসেছেন। এবারও তাই করতে হবে।

২৩শে তারিখে সেই আশাই ব্যক্ত করলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালনী, ভুলাভাই দেশাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে।

'পট্টভি সীতারামিয়াকে আমরা কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলে মনে করি। আমরা কংগ্রেস প্রতিনিধিদের কাছে তাঁকে জয়যুক্ত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।'

সুভাষ অবাক। ব্যক্তিগতভাবে ওঁরা যত খুশি আবেদন জানাতে পারেন, কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে এ ধরনের বিবৃতি দিলেন কোন্ অধিকারে? কিসের যুক্তিতে? তা করতে হলে সর্বাগ্রে সভাপতির অনুমোদন নিয়ে বৈঠক আহ্বান করা দরকার। প্রস্তাব পাস করানো দরকার। এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু করা হয়েছে কি?

প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে। প্রথমেই প্রতিবাদ করলেন যুক্তপ্রদেশের প্রখ্যাত কংগ্রেস-নেতা, সেই স্পষ্টবক্তা রফি আমেদ কিদোয়াই। এক বিবৃতি দিয়ে তিনি জানালেন:

'সর্দার প্যাটেল ও ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্যের বিবৃতি পড়ে আমি অবাক হয়েছি। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পক্ষে শ্রীযুক্ত বসুর বিরুদ্ধে ক্ষতিকর বিবৃতি দেওয়া সঙ্গত হয়নি।'

সর্দার প্যাটেলের মতে ওয়ার্কিং কমিটিই কংগ্রেসের সব কাজ

পরিচালনা করেন এবং সভাপতি নামে-মাত্র নেতা। কিন্তু তিনি বেশ সুবিধাজনকভাবে ভুলে গিয়েছেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি সভাপতিরই সৃষ্টি। তিনিই তাঁদের তাঁর ইচ্ছামত নিয়োগ করে থাকেন।'

তার চাইতেও মারাত্মক বিবৃতি দিলেন ডাঃ খারে। তিনি বললেন :

'কংগ্রেস কর্তৃক দেশের সর্বত্র প্রভুত্ব বিস্তার হওয়া সত্ত্বেও যে ডাঃ পট্টভি নিজের মিউনিসিপ্যাল শহর ও জেলা-বোর্ডকে নিজের অনুগত রাখতে পারেননি, শ্রীযুক্ত সুভাষ বসুর সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। যে ডাঃ পট্টভি নিজের শহরে জাস্টিস পার্টির সম্মুখীন হতে পারেননি, তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখীন হতে সক্ষম হবেন, একথা কি করে আশা করা যায়? যদি সত্যিই আপনারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করতে চান, তবে শ্রীযুক্ত বসুকেই ভোট দিন। তাঁকে ভোট দেবার অর্থ গণতন্ত্র আর স্বরাজকে ভোট দেওয়া।'

বিবৃতি দিলেন সেই নরীম্যান, যাঁকে গান্ধীজীর সমালোচনা করার অপরাধে চরম শাস্তি নিতে হয়েছিল মাথা পেতে। তাঁর অভিমত :

'কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র মতে প্রতিনিধিদের সত্যিই যদি গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সভাপতি নির্বাচন করার অধিকার থাকে, তবে প্রতিনিধিদের স্বাধীনভাবেই ভোট দেওয়া উচিত। আমি আশা করি, সারা দেশের প্রতিনিধিগণ কারো ভয়ে বা অনুগ্রহ না দেখিয়ে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবেন।'

যুক্ত বিবৃতি দিলেন মিঃ মাসানী ও মিঃ মেহের আলী।

'এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, রাজনৈতিক। এর মধ্যে প্রাদেশিকতার কোন প্রশ্ন নেই। তাই আমরা শ্রীযুক্ত বসুকেই সমর্থন করব বলে সিদ্ধান্ত করেছি।'

অজস্র নিন্দা করলেন সমাজতন্ত্রী নেতা আচার্য নরেন্দ্র দেব ও সর্দার শার্দুল সিং কবিশের। তাঁদের মতে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের

পক্ষে এ ধরনের বিবৃতি দেওয়া শুধু অন্যায় নয়, অপরাধও বটে। প্রতিনিধিদের উচিত সুভাষ বসুকে জয়যুক্ত করা।

সামান্য ব্যাপার, খুবই সামান্য। অথচ এই সামান্য ব্যাপারটাই সেদিন দেখতে দেখতে অসামান্য হয়ে দেখা দিল গান্ধীবাদী কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলির কাছে।

কেন এই বিরোধ?

সভাপতি হিসেবে সুভাষ কি কংগ্রেসের নীতি-বহির্ভূত কোন কাজ করেছিলেন? না, করেননি। প্রমাণ, কংগ্রেসের ইতিহাস।

'ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারে (সুভাষের) মতপার্থক্য ছিল, কিন্তু তা নিয়ে কোনদিনও তিনি নিজেকে জাহির করেননি। বিতণ্ডায়ও কোনদিন প্রবৃত্ত হননি। পক্ষপাতিত্ব তাঁর কোনদিনই ছিল না। নেতাদের সঙ্গে কোন কোন ব্যাপারে তাঁর মতান্তর হত, কিন্তু তার জন্য কোন সমস্যা বা কোনরকম অবাঞ্ছিত পরিবেশের সৃষ্টি হয়নি। বলতে গেলে গোটা বছরটাই কেটে ছিল শান্তির মধ্য দিয়ে।' [কংগ্রেসের ইতিহাস : ডাঃ পট্টভি : পৃঃ ১০৪]

তাহলে এই সুভাষ-বিরোধিতার কারণ কি?

ইতিপূর্বে জওহরলাল সভাপতি হয়েছেন মোট তিনবার। এর আগেই দুবার হয়েছেন পর পর। তাহলে সুভাষের বেলায় আপত্তি কেন? কি এর কারণ?

কারণ, সুভাষ আর জওহরলাল এক নন। মুখে যতই আদর্শবাদের কথা বলুন না কেন, জওহরলাল সুবিধামত পোষ মানতে জানেন। বশ্যতা স্বীকার করতে জানেন।

আর সুভাষ! ১৯২৮ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত তাঁর সেই একই চেহারা। বক্তব্যও সেই একই। এ অবস্থায় কে আর খাল কেটে কুমীর আনতে চায় সাধ করে? একবছরে অনেক শিক্ষা হয়েছে।

তবু শেষ চেষ্টা করেছিলেন সুভাষ। বলেছিলেন: 'সভাপতি-পদের জন্য আমি লালায়িত নই। আচার্য নরেন্দ্র দেবের মতো একজন

সত্যিকারের সমাজতন্ত্রী নেতাকে নির্বাচিত করা হোক, আমি এক্ষুণি নাম প্রত্যাহার করে নেব।'

রাজী হলেন না গান্ধীবাদী নেতাগণ। হওয়া সম্ভবও ছিল না। কারণ, এটা গণতন্ত্রের প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা নেতৃত্বের। ক্ষমতার। প্রভুত্বের। সেখানে হেরে যাওয়া মানেই তো চরম অবলুপ্তি।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হল ১৯৩৯ সালের ৩০শে জানুয়ারি।

সুভাষ জয়ী হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন মোট ১,৫৭৫ ভোট, আর পট্টভি সীতারামিয়ার পক্ষে পড়েছে ১,৩৪৬ ভোট।

সংখ্যার দিক থেকে সুভাষ সবচাইতে বেশি ভোট পেয়েছেন বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, কেরল, কর্ণাট, আসাম, আজমীর ও তামিলনাদে। সীতারামিয়াকে বিশেষভাবে সমর্থন জানিয়েছেন বিহার, উৎকল, গুজরাট, অন্ধ্র, বম্বে, নাগপুর আর মহারাষ্ট্র।

উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশ থেকে সেদিন মোট উনআশি জন সুভাষের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন গান্ধীবাদী নেতা ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে। তবু কিছুতেই কিছু হল না। জয় হল সুভাষেরই।

আনন্দে উত্তাল হয়ে উঠল গোটা ভারতবর্ষ। বিশেষ করে প্রগতিবাদী যুব-সম্প্রদায়। সুভাষ দ্বিতীয় বারের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। কথার মারপ্যাঁচ নয়। আবেদন-নিবেদনও নয়। এবার শুরু হবে আসল সংগ্রাম।

কিন্তু একি ?

পরদিনই ভারতের কোটি কোটি মানুষ বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল সংবাদপত্রে একটা বিবৃতি দেখে।

'...পট্টভি সীতারামিয়ার পরাজয় আমারই পরাজয়।...হাজার হোক, সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন।...তাঁর জয়লাভে আমি আনন্দিত।'

এ কার বিবৃতি ? জনসাধারণ বিভ্রান্ত। কে দিয়েছেন এই বিবৃতি ? এ কি চোখের ভুল, নাকি অসুস্থ চিত্তের মায়াবিভ্রম ?

না, কোনটাই নয় কোথাও অস্পষ্টতা নেই। কোথাও এতটুকু কুয়াশার জাল নেই। সব কিছুই দিবালোকের মতো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। বিবৃতি দিয়েছেন গান্ধীজী। অহিংস-মন্ত্রের ঋষি মহাত্মা গান্ধী।

কিন্তু এ কোন্ মহাত্মা গান্ধী! 'হাজার হোক, সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন'—এ যে অতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। মহাত্মার মতো মানুষ সুভাষ সম্বন্ধে এতবড় নির্মম উক্তিটা করলেন কি করে?

গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার—নির্বাচন। যে-কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই মানুষের মৌল অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুভাষও সেই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমেই জয়ী হয়েছেন। তাহলে পট্টভির পরাজয়ে মহাত্মার পরাজয়ের প্রশ্ন আসে কি করে? সুভাষের জয় তাঁর নিজের জয় হবে না কেন?

জেলা-সম্মেলনের সভাপতিরূপে সুভাষ তখন মালদহে। তাঁর মনেও সেই একই জিজ্ঞাসা। নির্বাচনে জয়-পরাজয় আছেই। তাই নিয়ে মহাত্মার মতো লোক এতখানি রূঢ় হতে পারলেন কি করে?

যাঁকে নিয়ে এই বিরোধের সূত্রপাত সেই পট্টভি সীতারামিয়াও কিন্তু এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর খুঁজে পাননি, মল্লিকা। পরবর্তীকালে স্পষ্টই তিনি লিখেছেন:

'সুভাষের দ্বিতীয় বার সভাপতি হবার প্রশ্নকে গান্ধীজী এতখানি দোষের মনে করলেন কেন? নির্বাচনের পরেও গান্ধীজীর মনোভাবের যে কোন পরিবর্তন ঘটেনি, তা খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করা হয়েছিল।…সুভাষ সম্বন্ধে গান্ধীজীর আচরণের আর কোন কথা ছিল কিনা, তা বলতে পারেন একমাত্র গান্ধীজীই।' [কংগ্রেসের ইতিহাস: ডাঃ পট্টভি: ২য় খণ্ড: পৃঃ ৬৭৯]

কলকাতায় ফিরেই সুভাষ এক বিবৃতি দিলেন গান্ধীজীর বিবৃতির জবাবে। বিবৃতিটা তুমি ভাল করে পড়ে দেখ, মল্লিকা। তফাতটা নিশ্চয়ই তোমার নজরে পড়বে।

'এবারকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখে আমাদের স্বাধীনতার শত্রুরা যদি

মনে করে যে, কংগ্রেসের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিয়েছে, তাহলে আমি স্পষ্ট করেই বলব যে, আমাদের ঐক্য বরাবরের মতোই অটুট থাকবে। কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যে মতান্তর থাকা অসম্ভব নয়। তা বলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যখন তারা সংগ্রাম করে, তখন তারা হয়ে ওঠে এক ও অভিন্ন।

মহাত্মার সঙ্গে কোন কোন ব্যাপারে কিঞ্চিৎ মতভেদ ঘটে থাকলেও মহাত্মার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমি কারো চাইতে কম শ্রদ্ধাবান নই। আমার সম্বন্ধে মহাত্মাজী কি অভিমত পোষণ করেন জানিনে। তবে যাই হোক না কেন, তাঁর বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হবার জন্য আমি সব সময়েই যত্নবান থাকব। কেননা, সবার বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হতে পারলেও যদি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের আস্থাভাজন হতে না পারি, তাহলে সত্যিই তা আমার পক্ষে মর্মন্তুদ হবে। [আনন্দবাজার পত্রিকা : ৪ঠা ফেব্রুয়ারি : ১৯৩৯]

একটা মিটমাটের আশা নিয়ে ১৫ই ফেব্রুয়ারি সুভাষ সেবাগ্রাম রওনা হলেন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ফিরে এলেন বুকভরা ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে। গান্ধীজীর উপদেশ—সুভাষ ইচ্ছে করলে তার মনোমত নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারে। এছাড়া এ ব্যাপারে তাঁর পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। 'How can we meet on the political platform ? Let us agree to differ there.'

কিন্তু কি হয়েছিল ১৯৩৬ সালে ?

সেদিন কিন্তু এই গান্ধীজীই জওহরলালের সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বিরোধটাকে মিটিয়ে দিয়েছিলেন চোখের নিমেষে।

কিন্তু সেদিন পারলেও আজ আর কোন কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, জওহরলাল আর সুভাষ এক নয়। তাই বিবৃতি দিতে গিয়ে খোলাখুলিভাবেই তিনি বলেছিলেন—'আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, গোড়া থেকেই আমি তার (সুভাষের)

পুনর্নির্বাচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম। এর কারণ আজ আমি বলতে চাইনে।'

স্পষ্ট উক্তি। এ উক্তির মধ্যে কোথাও কোন কুয়াশার জাল নেই। সুভাষ দ্বিতীয় বারের জন্য সভাপতি হন—গান্ধীজী গোড়া থেকেই তা চাননি। কেন চাননি, তিনি তা বলতে রাজী নন।

২২শে ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শুরু হবার কথা। কিন্তু বাদ সাধল সেই দেহ। স্বাস্থ্য অবশ্য কোনদিনই ভাল ছিল না। কিন্তু এবার যেন একটু বাড়াবাড়ি বলেই মনে হল।

দেখে বেঁকে বসলেন ডাঃ নীলরতন সরকার। না, এ অবস্থায় কোনরকমেই বাইরে যাওয়া চলবে না। যাওয়া অসম্ভব।

তার পাঠালেন সুভাষ। আমি অসুস্থ। বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হোক।

কেউ কান দিল না সভাপতির সেই আবেদনে। দেবার কথাও নয়। হলই বা কংগ্রেস-সভাপতি, তা বলে তার নির্দেশ যে মানতেই হবে তার কি মানে আছে! বিশেষ করে এ সময়ে!

সুতরাং যথাসময়ে বৈঠক শুরু হল সভাপতির অনুপস্থিতিতেই। তারপর সেই পুরনো খেলা। সেই চাপ দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করানোর চেষ্টা। অর্থাৎ—এই রইল আমাদের পদত্যাগ-পত্র। সভাপতি হিসেবে এবার তুমি যা ভাল বোঝ, কর। তোমার কোন ব্যাপারে আমরা নেই। সোজা কথায়, আত্মসমর্পণ কর, নয় তো ঘর সামলাও। নরীম্যানের কথাটা ভুলে যাওনি আশা করি। জওহরলালের অবস্থাও স্বচক্ষেই দেখেছ। এবার কোন্‌টা নেবে বেছে নাও।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে জওহরলাল চিরদিনই অদ্বিতীয় পুরুষ। তিনি এই পদত্যাগ-পত্রে সই করলেন না। পরিবর্তে দিলেন ছোট্ট একটি বিবৃতি।

এবার ষোলকলা পূর্ণ হল। যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে খুঁজে ভারতবাসী বৃথাই এতদিন মাথা খুঁড়ে মরছিল, এবার তার একটা চমৎকার সদুত্তর পাওয়া গেল জওহরলালের বিবৃতি থেকে।

সুভাষের ব্যাপারে গান্ধীবাদী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ যা কিছু করেছেন, তা সবই নাকি গণতন্ত্রসম্মত। এ ব্যাপারে কোথাও নাকি গণতন্ত্রের এতটুকু অমর্যাদা হয়নি।

আসলে সব দোষ সুভাষের। গণতান্ত্রিক উপায়ে সভাপতি নির্বাচিত হলেও সুভাষই নাকি এ অবস্থার জন্য একমাত্র দায়ী। সুতরাং এ ব্যাপারে সুভাষকে কোনরকম সহায়তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

সেই জওহরলাল, যাঁকে সুভাষ চিরদিন শ্রদ্ধা করে এসেছেন বড়ভাইয়ের মতো। এই সেদিনও যাঁকে লক্ষ্য করে তিনি ইয়োরোপ থেকে লিখেছিলেন :

'আমি তোমাকে পুরোপুরি সমর্থন করব···নিজেকে তুমি ভুল বুঝো না। দুর্বল ভেবো না।···যে কঠোর কর্তব্য তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, তুমি নির্বিঘ্নে তা সমাধা করো। লক্ষ্ণৌ যাবার সুযোগ পেলে আমি দাঁড়াব তোমার পাশেই।'

সারা দেশ নিস্পন্দ হয়ে তাকিয়ে রইল একটি মাত্র মানুষের দিকে। কি করবেন এখন সুভাষ!

সামনেই ত্রিপুরী কংগ্রেস। গান্ধীবাদী সদস্যরা শুধু ওয়ার্কিং কমিটি থেকেই পদত্যাগ করেননি, পার্লামেণ্টারি বোর্ড থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন। এ সমস্যার সমাধান কি?

জওহরলাল হারিয়ে গেছেন। সুভাষও কি এবার তেমনিভাবেই হারিয়ে যাবেন গান্ধী-চক্রের কাছে নতিস্বীকার করে?

নাকি বরাবরের মতোই মাথা উঁচু করে বলবেন—'আমি সুভাষ। অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে কোনদিনই আমি আপস করিনি। এবারও করব না।'

ইতিহাসের পাতা একবার উল্টে গেলে আর তাকে ফেরানো যায় না।

কোথায় আজ গান্ধীজী! কোথায় পণ্ডিত নেহরু, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ রথী-মহারথীবৃন্দ! কেউ বেঁচে নেই।

তা বলে কি ত্রিপুরী কংগ্রেসের সেই কলঙ্কময় অধ্যায়কে অস্বীকার করা যাবে কোনদিন?

না, তা সম্ভব নয়। কারণ, মানুষের মৃত্যু আছে, কিন্তু ইতিহাসের মৃত্যু নেই।

সবার দৃষ্টি তখন ত্রিপুরীর দিকে। ঝড় আসন্ন। একদিকে গান্ধী-বাদী কংগ্রেস, অন্যদিকে অনমনীয় বিপ্লবী সুভাষ। সুভাষ কি পারবেন বরাবরের মতো এবারও এই ঝড়ের মুখে সোজা হয়ে দাঁড়াতে?

অবশ্য এ ঝড় একেবারে আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত নয়। কংগ্রেস সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। যে কেউ তার সভ্য হতে পারে। এমন কি, সহিংস বিপ্লবীরাও তার ব্যতিক্রম নয়। তাদের বেলায়ও কোনদিক থেকে আপত্তির কোন প্রশ্ন নেই।

আপত্তি শুধু ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের বেলায়। সেখানে গান্ধীজী অত্যন্ত সতর্ক, অত্যন্ত হুঁশিয়ার। একমাত্র নিজের অন্তরঙ্গ সহকর্মী ছাড়া আর কাউকেই তিনি সেখানে প্রবেশাধিকার দিতে রাজী নন।

এ নিয়েও গান্ধীজীর সঙ্গে কম সংঘাত বাধেনি সুভাষের।

শুরু হয়েছিল ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত সেই লাহোর কংগ্রেসে।

সুভাষের বক্তব্য, কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। সবার সেখানে সমান অধিকার। তাই যদি হয়, তবে একজনের খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর না করে গণতান্ত্রিক মতে নির্বাচনের মাধ্যমে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হোক।

—না। গান্ধীজী অটল, অনড়।

—বেশ, তাহলে বামপন্থী দলগুলো থেকে অন্তত কয়েকজনকে কমিটিতে নেওয়া হোক। তারাও কংগ্রেসের সদস্য। তারাও কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তাদের এভাবে কোণঠাসা করে রাখার পেছনে কোন যুক্তি নেই।

তবু রাজী হননি গান্ধীজী। বরং উল্টো সুভাষের নামটাই তিনি খারিজ করে দিয়েছিলেন ওয়ার্কিং কমিটি থেকে। তাঁর সাফ কথা, কেবলমাত্র একমতাবলম্বী লোকদের নিয়েই ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হওয়া উচিত। সুভাষ একমতাবলম্বী নয়। সুতরাং তাকে ওয়ার্কিং কমিটিতে রাখার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এতদিন পরে এবার তার অনিবার্য পরিণতি দেখা দিয়েছে গান্ধীজীর নির্বাচিত প্রার্থী ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া পরাজিত হবার পরে। একসঙ্গে মোট বারোজন সদস্য ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন সুভাষের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে। বাপুজীর পরাজয় যে তাঁদেরও পরাজয়! এতবড় আঘাতটাকে তাঁরা নিঃশব্দে মেনে নেবেন কি করে?

চিকিৎসকের সাবধান-বাণী উপেক্ষা করে ১৯৩৯ সালের ৫ই মার্চ রবিবার নির্বাচিত সভাপতি সুভাষ রওনা হলেন ত্রিপুরীর উদ্দেশ্যে।

গায়ে ১০২° ডিগ্রি জ্বর। অন্যান্য উপসর্গও রয়েছে। তবু তিনি স্থির, দৃঢ়সঙ্কল্প। যে করে হোক, ত্রিপুরী যেতেই হবে।

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পদত্যাগ করার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, কংগ্রেসের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। এ অবস্থায় কোনরকমেই তাঁকে দূরে সরে থাকলে চলবে না।

ওদিকে গান্ধীবাদী সদস্যগণ তখন প্রস্তুত। গান্ধীজীর অমতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাটাই তো মস্তবড় একটা অপরাধ! তার ওপর কিনা জয়লাভ! হোক সে কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি, তবু এহেন অবাধ্য লোককে কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না।

যথাসময়ে শোভাযাত্রা শুরু হল নির্বাচিত সভাপতিকে নিয়ে।

কিন্তু কোথায় সভাপতি! সুভাষ তখন উত্থানশক্তিহীন। জ্বর উঠেছে ১০৬° ডিগ্রি অবধি। দাঁড়াবার শক্তিটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। তাই সভাপতির জায়গায় রাখা হল তাঁর একটি প্রতিকৃতি। আর সুভাষকে নিয়ে যাওয়া হল অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি করে।

কাণ্ড দেখে হেসেই খুন গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও এ নিয়ে কম হল না।

অসুখ না আরো কিছু! আসলে এসব হল ভড়ং দেখিয়ে সহানুভূতি আদায় করার চেষ্টা। ওসব করে লাভ হবে না কিছু। অত সহজে আমরা ভুলছিনে।

স্বার্থে আঘাত লাগলে মানুষের নির্মমতা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, ভাবতে পার মল্লিকা! চিন্তা করতে পার একবার!

ছেড়ে দিলাম ডাঃ নীলরতন সরকারের কথা। কিন্তু তাঁদেরই নির্বাচিত মেডিক্যাল বোর্ড শেষপর্যন্ত কি রায় দিলেন সুভাষকে পরীক্ষা করে! অবস্থা গুরুতর। বিপজ্জনকও বটে।

সুভাষের হয়ে ভাষণ পাঠ করলেন তাঁর মেজদা শরৎচন্দ্র বসু। আর আপস-আলোচনা নয়। কোনরকম টালবাহানা বা দর-কষাকষিও নয়। সময় নির্দিষ্ট করে সরকারকে চরমপত্র দিতে হবে। দাবী উপেক্ষিত হলে সঙ্গে সঙ্গে শুরু করতে হবে সংগ্রাম। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শেষ সংগ্রাম।

১৯২৮ থেকে ১৯৩৯। সেই একই কথা। একই দাবী। সংগ্রাম চাই। চাই একটানা আপসহীন সংগ্রাম।

কেউ কান দেয়নি সুভাষের কথায়। গান্ধীজী বা জওহরলাল কেউ না। তা বলে এবার কিন্তু তাঁর আবেদনে সাড়া দিতে আর এতটুকুও দেরি করলেন না গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুর্বার বেগে। তবে এ সংগ্রাম ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, সুভাষের বিরুদ্ধে।

গান্ধীজী ত্রিপুরীতে আসেননি। হাজার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আসতে রাজী হননি। তিনি তখন ছোট্ট একটা দেশীয় রাজ্য রাজকোটে কি একটা সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কাজের ফলে কংগ্রেসে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, ওটা নাকি তার চাইতেও জরুরী।

তা বলে কোনদিক থেকে কোনরকম ত্রুটি হল না। সব কিছু সুদে-আসলে পুষিয়ে দিলেন তাঁর একান্ত অনুগামী গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ।

প্রথমেই এক অদ্ভুত প্রস্তাব আনলেন ওয়ার্কিং কমিটির বিশিষ্ট সদস্য পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ। এবার সভাপতি তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করুন। শুধু গঠন করলেই হবে না। সে কমিটি সব দিক থেকে গান্ধীজীর মনোমত হওয়া চাই। অন্যথায় সে কমিটি বৈধ বলে স্বীকৃত হবে না।

প্রস্তাব গৃহীত হল ২১৮-১৩৫ ভোটের ব্যবধানে। কারণ—সোস্যালিস্ট পার্টি। রায়-পন্থীরা আগেই সরে দাঁড়িয়েছিল, এবার সরে দাঁড়াল সোস্যালিস্ট পার্টি। প্রথম থেকে প্রতিটি ব্যাপারে সমর্থন জানিয়ে এলেও এবার দেখা গেল তাদের অন্য চেহারা। হাজার হোক, কংগ্রেস বড় পার্টি। সুভাষকে সমর্থন জানিয়ে তাদের সঙ্গে বিবাদ করাটা ঠিক নয়। বোধহয় নিরাপদও নয়।

এবার তুমি পন্থ-প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত কৌশলটা লক্ষ্য কর, মল্লিকা।

একদিকে গান্ধীজীর নির্দেশ—সুভাষ তার নিজের ইচ্ছামত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করুক। অন্যদিকে প্রস্তাব গৃহীত হল, সুভাষকে গান্ধীজীর মনোমত করে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে। অন্যথায় সে কমিটি হবে অবৈধ।

এর একটাকে মেনে নিতে গেলে অন্যটা মেনে নেওয়া চলে কি? কিন্তু তা বললে তো আর হবে না। দুটোই তোমাকে মানতে হবে একসঙ্গে। নয়তো বিদেয় হও।

ঠিক যেন শাঁখের করাত। এদিকে গেলেও বিপদ, আবার ওদিকে গেলেও বিপদ।

কিন্তু কেন? ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার একমাত্র অধিকার সভাপতির। সেখানে গান্ধীজীর মতামতের প্রশ্ন আসে কেন?

উত্তর পাওয়া গেল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গান্ধীবাদী নেতা শেঠ গোবিন্দদাসের ভাষণে। তিনি খোলাখুলিভাবেই বললেন:

'…ফ্যাসিস্টদের মধ্যে মুসোলিনীর, নাৎসীদের মধ্যে হিটলারের এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে স্ট্যালিনেরযে স্থান, কংগ্রেস-সেবীদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীরও সেই স্থান।…কংগ্রেসের লিখিত গঠনতন্ত্রে তাঁহার জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট নাই ইহা সত্য, কিন্তু ইহা কেহ অস্বীকার করিতে·পারিবেন না, রাষ্ট্রপতি পদে মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত ব্যক্তিকে নির্বাচন করা এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্য পদে মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত ব্যক্তিগণকে মনোনীত করা একটা প্রথায় দাঁড়াইয়াছে।' [আনন্দবাজার পত্রিকা : ১১ই মার্চ : ১৯৩৯ সাল]

যেটুকু বলতে বাকি ছিল তাও এবার পূর্ণ হল সমর্থকদের সমবেত উল্লাসধ্বনিতে। সবাই মিলে তাঁরা জয়ধ্বনি দিলেন—'হিন্দুস্থানকা হিটলার কী জয়! মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়!'

চমৎকার! সত্যিই চমৎকার!

কংগ্রেস অহিংস-নীতিতে আস্থাবান গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। আশ্চর্য, তা সত্ত্বেও 'এহেন জয়ধ্বনি শুনে একটি প্রতিবাদধ্বনিও শোনা গেল না কোন গান্ধীবাদী নেতার মুখ থেকে। বরং দেখে মনে হল, গান্ধীজীর এই নতুন সম্মান-প্রাপ্তিতে তাঁরা যেন খুশিই হয়েছেন মনে মনে। হবারই কথা। কারণ, হিটলারের তখন সময়টা ভাল যাচ্ছিল।

শুধু প্রতিবাদ করলেন একটিমাত্র মানুষ। তিনি হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। খবর শুনে মর্মাহত কবি লিখলেন :

'…অবশেষে আজ, এমন কি, কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারী নীতির জয়ধ্বনি শোনা গেল।…স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট, সেই বেদীতেই আজ ফ্যাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে।…'

এখানেই থামেননি কবি। পরে আরো এক জায়গায় তিনি লিখেছেন :

'…কংগ্রেসেরও অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি। যাঁরা এর কেন্দ্রস্থলে এই

শক্তিকে বিশিষ্টভাবে অধিকার করে আছেন, সঙ্কটের সময় তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, বিচারবুদ্ধি সোজাপথে চলেনি। পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য, যে বৈধতা রক্ষা করলে যথার্থভাবে কংগ্রেসের বল ও সম্মান রক্ষা হত, তার ব্যভিচার ঘটতে দেখা গেছে, এই ব্যবহার বিকৃতির মূলে আছে শক্তি ও স্পর্ধার প্রভাব।

…এই তপঃক্ষেত্রে যাঁরা রক্ষকরূপে একত্র হয়েছেন, তাঁদের মন কি উদারভাবে নিরাসক্ত? তাঁরা পারস্পরিক আঘাত করে যে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিশুদ্ধ সত্যেরই জন্যে? তার মধ্যে কি সেই উত্তাপ একেবারেই নেই, যে উত্তাপ শক্তিগর্ব ও শক্তিলোভ থেকে উদ্ভূত? ভিতরে ভিতরে কংগ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তিপূজার বেদী গড়ে উঠেছে, তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাইনি—যখন মহাত্মাজীকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলিনী ও হিটলারের সমকক্ষ বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন? ··

…আমি সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি জওহরলালকে।…আমি তাঁকে প্রশ্ন করি, কংগ্রেসের দুর্গদ্বারের দ্বারীদের মনে কোথাও কি এই ব্যক্তিগত শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করেনি?'

সুভাষ অসুস্থ। মেডিক্যাল বোর্ডের মতে অবস্থা গুরুতর। প্রতিপক্ষ ভুলে গেলেও কবি কিন্তু সেকথা ভুলে যাননি। ত্রিপুরীতে অবস্থিত অসুস্থ সুভাষকে লক্ষ্য করে তিনি লিখলেন:

'কল্যাণীয়েষু,

অসুস্থ শরীর নিয়ে কংগ্রেসের দুঃসাধ্য কাজে তোমাকে পীড়িত করেছিল সেজন্য আমরা সকলেই উৎকণ্ঠিত ছিলাম, এখনো উৎকণ্ঠার কারণ আছে। আশা করি উপযুক্ত শুশ্রূষায় ও বিশ্রামে তুমি আরোগ্যের পথে চলেছ; এবং বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে সম্মানদানের যে সঙ্কল্প আমার মনে আছে তা সফল হতে বিলম্ব হবে না। ইতি—

১১।৩।৩৯ তোমাদের

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

অধিবেশন শেষ। এবার সভাপতিকে বিদায় দেবার পালা। সে অশোভন দৃশ্যের কথা চিন্তাও বুঝি করা যায় না। 'কংগ্রেসের ইতিহাস' থেকে তার কিছুটা অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

'...বরাবরই সভাপতিকে বেশ ঘটা করে জাঁক-জমক সহকারে বিদায় দেওয়া হয়। ত্রিপুরীতে তার ব্যতিক্রম দেখা গেল।...বিদায়ের কালে কাছে ছিলেন তাঁর পরিবারের লোকজন, দুজন ডাক্তার আর ওয়ার্কিং কমিটির দুজন সদস্য মাত্র।' [কংগ্রেসের ইতিহাস : ডাঃ পট্টভি : ২য় খণ্ড : পৃঃ ১২৪]

অবাক হবার কিছু নেই। সুভাষের জয় মানেই তো বাপুজীর পরাজয়। হোক সে কংগ্রেস সভাপতি, তবু এহেন অবাধ্য লোককে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বিক্ষোভে ফেটে পড়ল গোটা বাংলাদেশ। সুভাষের অপমান আমাদের অপমান। বাংলার অপমান। বাঙালীর অপমান। গান্ধী-বাদীদের এই অন্যায় আচরণ কিছুতেই আমরা মুখ বুজে সহ্য করব না।

আগাগোড়া সমর্থন জানিয়ে শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে যাবার জন্য সোস্যালিস্ট পার্টিকে কিন্তু সেদিন কম বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি, মল্লিকা। কবিতা, গান, ছড়া—অনেক কিছুই সেদিন রচিত হয়েছিল তাদের ত্রিপুরীর ভূমিকাকে কটাক্ষ করে। একটি গান এখানে তুলে দিচ্ছি।

মোরা সব কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল
লাল বুলি আওড়ান আমাদের ছল
কাজে মোরা কংগ্রেসী পাণ্ডা
জওহরলালের ধরি ঝাণ্ডা
চিৎকার করে শুধু বাড়ায়েছি গান্ধীর বল
মোরা সব কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল।

লাল জুজু ভয়ে সদা সঙ্কুচিত
ত্রিপুরীতে তাই মোরা বল্লভিত
দক্ষিণী শক্তির ভক্ত
চেয়ে আছি কংগ্রেস তক্ত
অহিংস বাঘ সাথে মোরা ফেরুদল
মোরা সব কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল ॥*

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী
[আনন্দবাজার : ১৯-৩-৩৯]

সুভাষ তখনো রীতিমত অসুস্থ। তাই ত্রিপুরী থেকে ফেরার পথে তাঁকে ধানবাদ স্টেশনে নামিয়ে জামাডোবায় নিয়ে যাওয়া হল অগ্রজ সুধীর বসুর বাড়িতে।

কে বিশ্বাস করে সেকথা। গান্ধীবাদী নেতা বল্লভভাই প্যাটেলের ভাষায়—এটা হল সুভাষের 'পলিটিক্যাল ফিবার'। সুতরাং ও অসুখ সহজে সারবার নয়।

আর জওহরলালের তো কথাই নেই। কাগজে-কাগজে, সভায়-সমিতিতে মুখে তাঁর সেই একই কথা। সব দোষ সুভাষের। সুভাষই এই অচল অবস্থার জন্য দায়ী। সে ফ্যাসিস্ট। সুতরাং তাকে কোনরকমেই সমর্থন করা সম্ভব নয়।

অনেক দুঃখে, অনেক জ্বালায় এবার জওহরলালকে একটি চিঠি লিখলেন সুভাষ।

রাজনৈতিক জীবনে ইতিপূর্বে অনেক তিরস্কারই জওহরলালকে শুনতে হয়েছে গান্ধীজীর কাছে। প্রমাণ, তাঁরই সম্পাদিত—'বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স'।

গান্ধীজীর লেখা অনেক চিঠিই সেখানে তিরস্কারে ভরা। কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও বা খোলাখুলিভাবে। কিন্তু সুভাষের লেখা সেদিনের

* শ্রদ্ধেয় নেপাল মজুমদার রচিত 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

সেই চিঠিটির মধ্যে যে কঠিন তিরস্কার ও নির্মম সমালোচনা ছিল, তা বোধহয় কোনদিনই ভুলে যাবার নয়।

দীর্ঘ চিঠি। প্রায় সাতাশ পাতা। তার কিছু কিছু অংশ তোমাকে শোনাচ্ছি।

'কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি, তুমি আমার সম্বন্ধে প্রচণ্ড বিরূপ ভাব পোষণ করছ। আমার বিরুদ্ধে কোথাও সামান্য ত্রুটি দেখলেই তুমি তার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ো না। স্বপক্ষে কিছু থাকলে অনায়াসেই সেটা তোমার চোখ এড়িয়ে যায়।

কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি কর্মক্ষেত্রে, সব সময়েই আমি তোমাকে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য দেখিয়ে এসেছি। রাজনৈতিক জীবনে বরাবরই বড় ভাই এবং নেতার সম্মান দিয়েছি। উপদেশও চেয়ে নিয়েছি কোন কোন সময়ে।...তা সত্ত্বেও প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে আমাকে জনসাধারণের কাছে হেয় ও তুচ্ছ করতে তোমার বাধে না।...সত্যি বলতে কি, বারোজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য একযোগে আমাকে হতমান করতে যত না সমর্থ হয়েছেন, তুমি একাই করেছ তার চাইতে অনেক বেশি।

ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি আমি। আমার অগোচরে যখন অন্যান্য সদস্যরা ডাঃ পট্টভিকে সভাপতি পদের জন্য মনোনীত করলেন, তার মধ্যে কোন অন্যায়ই তোমার চোখে পড়ল না। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হয়ে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্য সদস্যরা পট্টভির সমর্থনে আবেদন জানালেন, তাও তোমার মতে অন্যায় নয়!

তোমার অভিযোগ, সভার কাজ পরিচালনার ব্যাপারে আমি নাকি সভাপতির পূর্ণ দায়িত্ব পালন করিনি। তুমি সভায় উপস্থিত থাকলে কার সাধ্য সভাপতির কাজ করে? ওয়াকিং কমিটিতে তোমার মতো এমন বাক্যবাগীশ যদি আর একজন সদস্য থাকতেন, আমার তো মনে হয় না যে, আমার কাজ শেষ করতে পারতাম।

নির্মম সত্য বলতে হয়তো বলি, তুমি কখনো কখনো ওয়ার্কিং

কমিটিতে আদুরে গোপালের মতো ব্যবহার করতে এবং প্রায়ই রেগে উঠতে। তোমার এই স্নায়ু-সবলতা এবং লাফানো-ঝাঁপানো সত্ত্বেও কি ফল পেলে?

তুমি সাধারণত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠিক থাকতে পার, শেষে তো এলিয়ে পড়। সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্যদের তোমার সঙ্গে ব্যবহার করার এক চমৎকার কৌশল ছিল। ওঁরা তোমাকে শুধু বকবক করতে দেবেন, শেষে ওঁরা তোমাকে ওঁদের প্রস্তাবের খসড়া করতে বলে শেষ করবেন।

একবার প্রস্তাবের খসড়া করতে দিলেই, প্রস্তাবটি যারই হোক না কেন, তুমি মহাখুশি। আমি তো খুব কমই দেখেছি, তুমি শেষ অবধি নিজের যুক্তি আঁকড়ে ধরে আছ।

জানি না রাষ্ট্রপতির কর্তব্য সম্পর্কে তুমি কি ভাব। আমার মতে তিনি মহিমান্বিত কেরানী বা সেক্রেটারীর ওপরেই হবেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তোমার সেক্রেটারীর কাজ জবরদখল করার অভ্যাস ছিল বটে, কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রপতিরা যে তাই করবেন, এমন তো কোন কারণ নেই।

এখন তোমাকে তোমার নীতি ও কর্মপন্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবার আমন্ত্রণ জানানোই আমার উচিত, তবে তা ব্যাপক অস্পষ্টতায় নয়, বিস্তারিত বাস্তবতায়।

আমি জানতে চাই যে, তুমি কি সমাজবাদী, না বামপন্থী, অথবা মধ্যপন্থী, না দক্ষিণপন্থী, গান্ধীপন্থী, না আর কিছু?

তোমার কী মনে হয় যে, পন্থ-প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য হল মহাত্মাকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো?···যদি পুরাতন প্রহরীরা আমার বিরুদ্ধে লড়তেই চেয়েছিলেন, তাঁরা তা সোজাসুজি করেননি কেন? মহাত্মা গান্ধীকে আমাদের মধ্যে নিয়ে এলেন কেন?

এটা চমৎকার কৌশল সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, এই চালটা কি সত্য আর অহিংসার সঙ্গে খাপ খায়?'

এখানেই থামলেন না সুভাষ। রোগশয্যায় শুয়ে মোট উনপঞ্চাশ খানা চিঠি ও তার পাঠালেন তিনি গান্ধীজীর কাছে।

আমি অসুস্থ। দয়া করে একবার আসুন এখানে। অসুস্থ না হলে আমি নিজেই যেতাম আপনার কাছে। আর নতুন ওয়ার্কিং কমিটি যদি একমতাবলম্বী না হয়ে সমানুপাতিক ভিত্তিতে করা হয়, তাতে আপনার সম্মতি আছে কিনা জানাবেন।

গান্ধীজী এলেন না। আসা সম্ভবও ছিল না। বৃহত্তর ভারতের চাইতেও ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য রাজকোটের সমস্যা তখন তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত তিনি আসবেনই বা কি করে! তাই চিঠি দিয়েই তিনি জানালেন তাঁর মনের কথা। যা বলার আগেই বলে দিয়েছি। সম্ভব হলে তোমার মনোমত সদস্যদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন কর।

কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীজীর মনোমত সদস্যদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে বলে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তার কি হবে?

এ জিজ্ঞাসার কোন জবাব নেই।

এবার পাশাপাশি কতগুলো টুকরো টুকরো ছবি তোমার সামনে তুলে ধরব, মল্লিকা। ইতিমধ্যে কত যুগ কেটে গেছে, তবু তা আজও তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি অম্লান।

ছবিগুলো কংগ্রেস ও রবীন্দ্রনাথের।

একদিকে কংগ্রেস তখন যে-কোন উপায়ে সুভাষকে অপসারণ করতে বদ্ধপরিকর।

অন্যদিকে তাঁর মর্যাদা রক্ষার্থে কবি তখন ব্যাকুল, দৃঢ়সঙ্কল্প। তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণা: 'আমি জানি বাংলাদেশের জন-নায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের।'

একদিকে গান্ধীজীর কটাক্ষপূর্ণ ইঙ্গিত—'হাজার হোক, সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন।'

অন্যদিকে তাঁরই বন্দনা-গানে কবিকণ্ঠ মূর্ত হয়ে ওঠে মিষ্টি সঙ্গীতের মতো।

'সুভাষচন্দ্র, বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশ-নায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক।···বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশ্যে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি।'

অনেকদিনের পুরনো ছবি। অস্পষ্ট, কিন্তু অবিস্মরণীয়।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে এবারও এগিয়ে এলেন সেই রবীন্দ্রনাথ। গান্ধী-পন্থীদের অনমনীয় জেদ ও আপসহীন মনোভাবই যে এই শোচনীয় অবস্থার জন্য একমাত্র দায়ী, সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে ক্ষুব্ধ কবি এবার তার প্রতিকার প্রার্থনা করে চিঠি পাঠালেন গান্ধীজীকে।

UTTARAYAN
Santiniketan, Bengal
March 29, 1939.

Dear Mahatmaji,

At the last Congress session some rude hands have deeply hurt Bengal with an ungracious persistence. Please apply without delay balm to the wound

with your own kind-hands and prevent it from festering. With love.

Ever yours
(Sd.) Rabindranath Tagore.

যথাসময়ে তার জবাব দিলেন গান্ধীজী। সেই একই কথা। সুভাষকে যথাযোগ্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আপাতত এছাড়া আর কোন পথ দেখতে পাচ্ছেন না তিনি।

New Delhi
2. 4. 39.

Dear Gurudev,

I have your letter full of tenderness. The problem you set before me is difficult. I have made certain suggestions to Subhas. I see no other way out of the impassee.

I do hope you are keeping your strength. Charlie is still in the hospital. With love.

Yours
(Sd.) M. K. Gandhi.

উত্তেজনা আর জল্পনা-কল্পনার ঝড় বয়ে চলেছে তখন গোটা বাংলাদেশ জুড়ে।

কি করবেন এখন সুভাষ। যেভাবে আঁট-ঘাট বেঁধে ওরা আসরে নেমেছে, তাতে কোনরকমেই নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা সম্ভব নয়।

হয় বশ্যতা স্বীকার, নয়তো পদত্যাগ। এ দুটোর মধ্যেই একটাকে বেছে নিতে হবে সুভাষকে।

কোন্‌টা বেছে নেবেন তিনি? আত্মসমর্পণ, না পদত্যাগ

ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন কবি। না, এ ব্যাপারে চট করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। বিচারের ভার দেশবাসীর। দেশবাসীকে সব কিছু জানতে দিতে হবে। বুঝতে দিতে হবে। সুতরাং এ সম্বন্ধে ওদের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

২রা এপ্রিল কবি এ সম্বন্ধে চিঠি দিলেন সুভাষকে।

কলিকাতা

'কল্যাণীয়েষু,

কয়েকদিন কোলকাতায় এসে দেশের লোকের মনের ভাব ভালো করে জানবার সুযোগ পেয়েছি। সমস্ত দেশ তোমার প্রত্যাশায় আছে। এমন অনুকূল অবসর যদি দ্বিধা করে হারাও তাহলে আর কোনদিন ফিরে পাবে না। বাংলাদেশ থেকে তুমি যে শক্তি পেতে পার, তার থেকে বঞ্চিত হবে, অন্যপক্ষও চিরদিন তোমার শক্তি হরণ করতে থাকবে। এতবড়ো ভুল কিছুতেই কোরো না। তোমার জন্য বলছিনে, দেশের জন্য বলছি।

মহাত্মাজী যাতে শীঘ্রই তাঁর শেষ বক্তব্য তোমাকে জানান দৃঢ়ভাবে সেই দাবী করবে। যদি তিনি গড়িমসি করেন, তাহলে সেই কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করতে পারবে। তাঁকে বোলো শীঘ্রই তোমাকে ভবিষ্যতের কর্তব্য স্থির করতে হবে, অতএব আর বিলম্ব সইবে না। আশাকরি তোমার শরীর সুস্থ হবার দিকে চলেছে। আজই শান্তিনিকেতনে ফিরছি। ইতি—

তোমাদের

২।৪।৩৯ (স্বা:) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

শুধু সুভাষকে চিঠি দিয়েই থামলেন না কবি। দেশের মুখ চেয়ে সুভাষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্য এবার তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে তার করলেন গান্ধীজীকে।

'I earnestly appeal to you to arrange meeting immediately with Subhas and save situation from tragic disaster.'

জামাডোবায় সুভাষকেও তিনি তার করলেন অনুরূপভাবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। গান্ধীজী তখন রাজকোটে অত্যন্ত জরুরী কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর সময় কোথায়?

২১শে এপ্রিল তারিখে সুভাষ জামাডোবা থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন কিছুটা সুস্থ হয়ে। ২৮শে তারিখে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন বসবে কলকাতায়। গান্ধীজী থেকে শুরু করে সবাই উপস্থিত থাকবেন সেই অধিবেশনে। তখন যদি কিছু একটা সুরাহা হয়!

গান্ধীজী কলকাতায় এলেন ২৭শে এপ্রিল। আশ্রয় নিলেন সোদপুর আশ্রমে।

একনাগাড়ে চারঘণ্টা ধরে সেখানে আলাপ-আলোচনা হল দুজনের মধ্যে, কিন্তু সব বৃথা। গান্ধীজী অটল, অনড়। তাঁর যা বলার আগেই বলে দিয়েছেন, সুতরাং নতুন আর কিছু বলার নেই তাঁর।

২৮শে তারিখে অধিবেশন বসল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে।

শেষ চেষ্টা হিসেবে এবার এক নতুন প্রস্তাব করলেন সুভাষ।

'কি দেখতে পাচ্ছি আমরা আজ পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে? কি দেখতে পাচ্ছি গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স বা অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রে?

সেখানেও বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দল বিদ্যমান। কিন্তু জাতীয় সঙ্কটের দিনে তারা সবাই এক ও অভিন্ন। কারণ, দল বড় নয়, দেশ বড়।

আমরা কি এ ব্যাপারে ইতিহাস থেকে কিছু শিক্ষা নিতে পারি না?

ইয়োরোপে যুদ্ধ শুরু হল বলে। এ সময়ে আমাদের একমাত্র

কর্তব্য হল সবাই মিলেমিশে একসঙ্গে কাজ করা। তাই আমি প্রস্তাব করছি যে, অন্তত চারজন বামপন্থী সদস্যকে ওয়ার্কিং কমিটিতে নেওয়া হোক। তাতেও প্রতিপক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকবে। সুতরাং এ প্রস্তাবে আপত্তির কোন কারণ থাকা উচিত নয়।'

রাজী হলেন না গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ। হবার কথাও নয়। কারণ, একথা তখন দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে, মীমাংসা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়।

উদ্দেশ্য, যে-কোন উপায়ে সভাপতি-পদ থেকে সুভাষকে অপসারণ করা। তাই একযোগে তাঁরা প্রতিবাদ জানালেন সুভাষের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। না, একটি আসনও নয়। কমিটির সব ক'টি আসনই আমরা চাই।

গান্ধীজী বলছেন এক কথা, ওঁরা বলছেন অন্য কথা। এর পরিপ্রেক্ষিতে কি করবেন এখন সুভাষ?

আত্মসমর্পণ, না পদত্যাগ? কোন্‌টা বেশি সম্মানের? কোন্‌টা সুভাষের পক্ষে স্বাভাবিক?

জবাব মিলল পরদিন। অধিবেশনে নিজের পদত্যাগ-পত্র দাখিল করে সুভাষ বললেন:

'ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রস্তাব মতো গান্ধীজীকে দায়িত্ব গ্রহণ করে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করবার জন্য বার বার আমি অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু অতীতের বহু নিষ্ফল আবেদনের মতো আমার সেই আবেদন ব্যর্থ হয়েছে।...গান্ধীজীর উপদেশ মতো আমি যদি নিজের মনোমত কমিটি গঠন করতাম, তা না হত তাঁর মনোমত, না হত তাঁর আস্থাভাজন। তাছাড়া আমার নিজের বিশ্বাসের প্রশ্নও এখানে জড়িত রয়েছে।...তাই অনেক চিন্তা করে একান্ত সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আমার পদত্যাগ-পত্র আপনাদের কাছে উপস্থিত করলাম।...'

সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হল। নতুন সভাপতি হলেন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

গান্ধীজীর মনোমত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতেও এখন আর কোন অসুবিধার প্রশ্ন রইল না।

মোট দুজনকে নতুন কমিটিতে নেওয়া হল বাংলাদেশ থেকে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আর গান্ধীবাদী নেতা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। সেই ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, যিনি পরবর্তীকালে কংগ্রেস ত্যাগ করে পি. এস. পি., নির্দলীয়, যুক্তফ্রণ্ট, পি. ডি. এফ., লোকদল ইত্যাদি ঘুরে সম্প্রতি আবার কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন।

অধিবেশনের বাইরে তখন হাজার হাজার উত্তেজিত জনতা। কণ্ঠে তাদের একই শপথ।

গান্ধীবাদীদের এই অন্যায় জুলুম আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। কি অধিকার আছে ওদের বাংলা ও বাঙালীকে এভাবে অপমান করার। এর জবাবদিহি করতেই হবে। নইলে কাউকেই ছাড়া হবে না।

বাধা দিলেন সুভাষ। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাহায্যে তিনি সবাইকে গাড়িতে তুলে দিলেন একে একে। ওঁরা অতিথি। অতিথির অবমাননা করে বাংলার আতিথেয়তার সুনামকে কলঙ্কিত হতে দিতে তিনি রাজী নন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরী থেকে কবিগুরু অভিনন্দন-বার্তা পাঠালেন সুভাষের কাছে।

'অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও তুমি যে ধৈর্য ও মর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে তোমার নেতৃত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উদ্রেক হইয়াছে। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বাংলাকে এখনও সম্পূর্ণরূপে ধীরতা ও ভদ্রতা বোধ অব্যাহত রাখিতে হইবে; তাহা হইলেই আপাতদৃষ্টিতে যাহা তোমার পরাজয় বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাই চিরন্তন জয়ে পরিণত হইবে।'

আপাতদৃষ্টিতে সুভাষের পরাজয় হল। কিন্তু আসলে এ পরাজয় কার? সুভাষের, না গণতন্ত্রের?

শেষপর্যন্ত সুভাষ পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন গান্ধী-গোষ্ঠীর অসহযোগিতার ফলে। প্রমাণিত হল যে, গণতন্ত্র সম্বন্ধে মুখে যাই বলা হোক না কেন, আসলে গান্ধীজীই সব। এমন কি, জনগণের ভোটে নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতিরও সেখানে কোন মূল্য নেই, যদি না তাঁর পেছনে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত সমর্থন থাকে।

এবার পদত্যাগ সম্বন্ধে সুভাষের নিজের বক্তব্য শোনা যাক।

'গান্ধীজী এবং নেহরুর সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধিতা সত্ত্বেও সারা দেশে আমার অনুগামীদের সংখ্যা কত বিপুল এবং তার প্রভাব কতখানি, এই নির্বাচনের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হল।

কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুসারে পরবর্তী বছরের জন্য সভাপতি একটি কার্যকরী পরিষদ (ওয়ার্কিং কমিটি) গঠনের অধিকারী। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল যে, গান্ধী-পন্থী দলের পছন্দ অনুযায়ী যদি কার্যকরী পরিষদ গঠিত না হয়, তাহলে তারা আগের মতোই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলবেন। সে অবস্থায় সভাপতির স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

গান্ধীবাদী দলের মনোভাব থেকে বোঝা গেল যে, আমার নির্দেশ তারা মেনে চলবে না, কংগ্রেসের পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেও আমাকে দেবে না। আমি যদি নামে মাত্র সভাপতি থাকতে রাজী হই, একমাত্র তাহলেই তারা আমাকে বরদাস্ত করবে।...ফলতঃ সভাপতি-পদে ইস্তফা দেওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিল না।'

[মুক্তি সংগ্রাম : সুভাষচন্দ্র বসু]

ত্রিপুরী কংগ্রেসে হাজার বলা সত্ত্বেও রাজকোট ছেড়ে গান্ধীজী আসেননি। ওয়েলিংটন স্কোয়ারেও তাই। যে কারণেই হোক, সোদপুর আশ্রম ছেড়ে অধিবেশনে যোগ দিতে তিনি রাজী হননি।

অথচ কংগ্রেস মানেই গান্ধীজী। গান্ধীজীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাই সেখানে সব কিছু। সুভাষের ভাষায়: 'The entire intellect of the Congress has been mortgaged to one man.'

এমন কি, বিদেশী ঐতিহাসিকদের কাছেও সেদিন এই অপ্রিয় সত্যটা গোপন থাকেনি, মল্লিকা। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Michael Edwards তাঁর বিখ্যাত 'The Last Years of British rule in India' গ্রন্থে কি বলেছেন শোন:

'Gandhi now turned the technique of non-co-operation, not against the British, but against Congress's own President. Bose was forced to resign'.

প্রায় একই সময়ে আরো এমন একটি কাজ করা হল যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কাজটি হল জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্'-এর অঙ্গচ্ছেদ। ঠিক হল—অতঃপর কেবলমাত্র প্রথম দুটি কলি ছাড়া বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের আর কোন কিছুই গাওয়া চলবে না।

কারণ। কারণ, মুসলীম লীগ-প্রধান জিন্না। জিন্না নাকি বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত নিয়ে আপত্তি তুলেছেন। সুতরাং তাঁকে খুশি করা দরকার।

এতদিনকার চলার পথের সঙ্গী সুভাষ ও তাঁর অনুগামী বামপন্থী দলসমূহ—সোস্যালিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, হিন্দু মহাসভা, কাউকে প্রয়োজন নেই। সবাই দূরে সরে যাক একে একে।

তবু জিন্নাসাহেব থাক। হাজার হোক, কড়া লোক। অনেক চেষ্টা করেও এ পর্যন্ত তাঁর মন গলানো যায়নি। এমন কি, গোলটেবিল বৈঠকে ব্ল্যাঙ্ক চেক উপঢৌকন দিতে চেয়েও গান্ধীজী তাঁর 'না' কে কোনদিনও 'হ্যাঁ' করাতে পারেননি। জাতীয় সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ করে এই সুযোগে তাঁকে যদি কিছুটা খুশি করা যায় তো মন্দ কি।

খুশি করা গিয়েছিল কি ? ইতিহাস কি বলে মল্লিকা ?

আজন্ম বিপ্লবী সুভাষ। ফুলের মালা গলায় দিয়ে জেলে যাওয়া আর বেরিয়ে আসার মধ্যেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর নিজের ভাষায় :

'আমি কারো প্রতিচ্ছবি নই, প্রতিধ্বনি নই, কারো prototype নই—I am myself'.

কথাটা যে কত বড় সত্য তার প্রমাণ পাওয়া গেল মাত্র তিন দিন বাদে, ৩রা মে তারিখে। সেদিনই শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর নতুন দল 'ফরোয়ার্ড ব্লক' সৃষ্টির কথা।

দলের লক্ষ্য, কংগ্রেস-বিরোধিতা নয়, সংগ্রাম। বৃথা টালবাহানা করে ইতিমধ্যে সাত সাতটা বছর কেটে গেছে। আর দেরি নয়। এবার চাই আপসহীন সংগ্রাম। 'The Forward Block came into existence to fulfil a historical necessity'.

একটা ঝড় বয়ে গেল যেন গোটা ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে।

দেখতে দেখতে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী জনতা এগিয়ে এল মাথা উঁচু করে। হ্যাঁ, এইতো চাই। এইতো হওয়া উচিত। কথা অনেক হয়েছে। এবার চাই সংগ্রাম।

বিশেষ করে বৈপ্লবিক সংস্থাগুলির তো কথাই নেই। সংগ্রামের আহ্বানে সবাই এসে জড় হল একে একে।

এমন কি, অনুশীলন সমিতি, নীতিগত দিক থেকে যারা ছিল বরাবরই যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সমর্থক, এবার তারাও এগিয়ে এসে হাত মেলাল সুভাষের সঙ্গে। আমরাও আছি তোমার পেছনে। চাই আপসহীন সংগ্রাম।

একমাত্র ব্যতিক্রম যুগান্তর পার্টি। অবশ্য দল হিসেবে যুগান্তরের তখন আর কোন অস্তিত্ব ছিল না। এক বছর আগেই (১৯৩৮) দল ভেঙে দিয়ে তারা এক হয়ে মিশে গিয়েছিল কংগ্রেসের সঙ্গে।

তবে সবাই নয়। আসলে যুগান্তর কোন একক দল নয়,

অনেকগুলি দলের সমন্বয়ে গঠিত একটা বিরাট বৈপ্লবিক সংস্থা। ১৯৩৮ সালে আইনসঙ্গতভাবে যুগান্তর ভেঙে দেওয়া হলেও এককভাবে মাদারীপুরের পূর্ণ দাসের দল, উত্তরবঙ্গের দল ইত্যাদি বৈপ্লবিক সংস্থা-গুলির সমর্থন সুভাষের ওপর বরাবরই ছিল।

ডাক এল পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, নাগপুর, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বম্বে, মাদ্রাজ ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে। ফরোয়ার্ড ব্লক জিন্দাবাদ! আর কথার কচকচি নয়। বড় বড় গালভরা কথাও নয়। চাই সত্যিকারের সংগ্রাম।

অত্যন্ত রুষ্ট হলেন গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ। একি অন্যায় কথা! কংগ্রেস সাত সাতটা প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। তা সত্ত্বেও আবার সংগ্রামের কথা কেন?

৪ঠা জুন তারিখে গান্ধীজী এক আবেদন প্রচার করলেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ রাখা হল। এখন আর কোনরকম আন্দোলন করা ঠিক হবে না।

এখানেই শেষ নয়। দিন পনেরো বাদেই বম্বেতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে গৃহীত হল অদ্ভুত দুটি বিধি-নিষেধ।

এক, কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া কোথাও কোন সত্যাগ্রহ বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করা নিষিদ্ধ। দুই, এখন থেকে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে কোথাও কোনরকম সমালোচনা করা চলবে না।

কেন এই অদ্ভুত নির্দেশ। কি এর কারণ।

প্রথম কারণ, সুভাষ। গান্ধীজী নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন যে, সভাপতি-পদ ত্যাগ করার পর থেকে সুভাষের জনপ্রিয়তা নাকি অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে সংগ্রামী তরুণদলের মুখে তো এখন সুভাষ ছাড়া আর কোন কথাই নেই। এটা অশুভ লক্ষণ। সুতরাং সংগ্রাম নিষিদ্ধ করে সুভাষের অগ্রগতি রোধ করা দরকার।

কিন্তু দ্বিতীয়টা! ওটা কেন? গণতান্ত্রিক নিয়মে সবারই

সমালোচনা করার অধিকার রয়েছে। তাহলে এই অহেতুক নির্দেশের কারণ কি?

তবে কি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলো সম্বন্ধে সমালোচনা করার মতো সত্যিই কোন কারণ ঘটেছিল?

এ প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি চিঠি থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি, মল্লিকা। প্রথমটি লিখেছেন এই এডওয়ার্ড টমসন, যিনি ব্যক্তিগত জীবনে শুধু জওহরলালের বন্ধুই নন, ভারতবর্ষেরও একজন সত্যিকারের শুভার্থী বলে পরিচিত। জওহরলালকে তিনি লিখেছেন:

'কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা মাসে মাত্র পাঁচশো টাকা বেতন নিচ্ছেন শুনে আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিলাম।...শুনে খুবই খারাপ লাগল—এই যে আত্মোৎসর্গ, এর বেশির ভাগই ভুয়ো, কেননা তাঁরা বাকিটা ভাতা হিসেবে নিচ্ছেন।...' [পত্রগুচ্ছ : জওহরলাল]

পরেরটি স্বয়ং গান্ধীজীর লেখা। লিখেছেন জওহরলালকে:

'...৫০০৲ [পাঁচশত টাকা] বেতন এবং তদুপরি বড় বাড়ি ও মোটর গাড়ি, ভাতা ইত্যাদি সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা হচ্ছে। যতই ভাবছি, ততই শুরুতেই এতটা বাড়াবাড়ি আমার খারাপ লাগছে।' [পত্রগুচ্ছ]

এবার শোন জওহরলালের বক্তব্য। লিখেছেন গান্ধীজীকে:

'...সারা ভারত জুড়ে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি সম্বন্ধে ঘটনাবলী যে মোড় নিয়েছে তাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি।'... [পত্রগুচ্ছ]

সর্বশেষ চিঠিটির লেখক গান্ধীজীর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই। লিখেছেন জওহরলালকে:

'আমাদের কয়েকজন মন্ত্রীর কাছে যে সত্য ও অহিংসা ভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে খোলাখুলি এবং পুরোপুরি যাতে লেখো—বাপুজী তাই-ই চান...।' [পত্রগুচ্ছ]

চিঠিগুলো পড়ে তোমার কি মনে হল, মল্লিকা! সত্যি হোক, মিথ্যে হোক গুঞ্জন একটা ঠিকই উঠেছিল। তাই নয় কি?

তাহলে কেন এই অযৌক্তিক আদেশ? কেন জোর করে মানুষের মুখ বন্ধ করার জন্য এই হাস্যকর প্রচেষ্টা? তাহলে কি লাভ শুধু শুধু ইংরেজকে দোষ দিয়ে? তফাতটা কোথায়?

প্রতিবাদ করলেন সুভাষ। সঙ্গে যোগ দিল সোস্যালিস্ট, কমিউনিস্ট, র‍্যাডিকেল পার্টি ইত্যাদি বামপন্থী দলগুলি। যোগ দিলেন স্বামী সহজানন্দ, জয়প্রকাশনারায়ণ প্রমুখ সবাই।

এ নির্দেশ সম্পূর্ণ বে-আইনী ও গণতন্ত্রবিরোধী। এর একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হাত দেওয়া। সুতরাং এ নির্দেশ কোনরকমেই মেনে নেওয়া চলে না।

৯ই জুলাই প্রতিবাদ দিবস পালিত হল ভারতবর্ষের সর্বত্র। আর সেই সঙ্গে 'জাতীয় সংগ্রাম সপ্তাহ' পালন করার আহ্বান জানানো হল সেপ্টেম্বর মাসের ১২ই তারিখ থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে কড়া নোটিশ এসে হাজির। আমরা যেখানে সংগ্রাম নিষিদ্ধ করেছি, সেখানে সংগ্রামের আহ্বান তুমি জানিয়েছ কোন্ অধিকারে? অবিলম্বে কৈফিয়ৎ দাও।

বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে ৭ই আগস্ট সুভাষ তাঁর বক্তব্য জানালেন নব-নিযুক্ত কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে। তাতে তিনি লিখলেন:

'দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অধিকার আদায় করার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি, তার মধ্যে নাগরিক অধিকার অর্জন ও বাক্যের স্বাধীনতা অন্যতম। ইংরেজের হাত থেকে যে অধিকার দাবী করার বেলায় আমরা পঞ্চমুখ, কংগ্রেসের কাছ থেকে সে অধিকার পাবার কথা বলা কি মহাপাপ বলে গণ্য হবে? ডেমোক্রেসির দাবী কি আমরা উত্থাপন করব কংগ্রেসের বাইরে থেকে, ভেতর থেকে নয়?...সবশেষে আমি আপনাকে এই অনুরোধই করব যে,

প্রতিবাদ দিবস পালন করার জন্য যদি কোন কংগ্রেস-কর্মীকে দণ্ড ভোগ করতে হয়, তবে তা থেকে আমি যেন বঞ্চিত না হই।...'

শক্ত প্রশ্ন। আরো শক্ত এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। তাই সুভাষের মুখ বন্ধ করার জন্য এবার উত্তর এল অন্য দিক থেকে।

তারিখটা ছিল ১৪ই আগস্ট। সেদিনই ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল :

'গুরুতর নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির পদের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাস হইতে তিন বৎসরের জন্য তিনি কোন নির্বাচিত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না।'

বিক্ষোভে ফেটে পড়ল গোটা বাংলাদেশ। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জেলা থেকে কংগ্রেস অফিসে অসংখ্য চিঠি আসতে শুরু করল সুভাষের প্রতি সমর্থন জানিয়ে। ওয়ার্কিং কমিটির এই অন্যায় আদেশ আমরা মানিনে। সুভাষই আমাদের সভাপতি। সুভাষকেই আমরা চাই।

বটে! সঙ্গে সঙ্গে গোটা বাংলা কংগ্রেস বাতিল। পরিবর্তে বাংলার বুকে চাপিয়ে দেওয়া হল নতুন এক অ্যাডহক কংগ্রেস, যার নেতা হলেন কিরণশঙ্কর রায়। অর্থাৎ, বাংলা বা বাঙালীর সমর্থন থাকুক আর নাই থাকুক, এই অ্যাডহক কংগ্রেসই হবে এখন থেকে খাঁটি গান্ধীবাদী কংগ্রেস। তা ছাড়া সব কিছুই বাতিল।

গান্ধীবাদীদের ইচ্ছাই পূর্ণ হল। সুভাষকে তিন বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হল। আপসহীন সংগ্রাম চাই বলে ১৯২৮ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অনেক জ্বালিয়েছিল লোকটা। এবার নিশ্চিন্ত।

ভালই হল মল্লিকা। কে বলতে পারে, হয়তো এভাবে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা না হলে পরবর্তীকালে কোনদিনই আমরা তাঁকে নেতাজীরূপে দেখতে পেতাম না।

আবার পাশাপাশি দুটি ছবি। একটি গান্ধীবাদী কংগ্রেসের, অন্যটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের।

একদিকে কংগ্রেস থেকে সুভাষকে বহিষ্কার—অন্যদিকে গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে অপরাধী জেনেও কবি সানন্দে এগিয়ে এসেছেন সুভাষের মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। উল্লেখযোগ্য ছবি সন্দেহ নেই।

মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল ২৯শে আগস্ট ১৯৩৯ সালে। সেখানেও সুভাষের কণ্ঠে শোনা গেল সেই একই কথা। ইয়োরোপে যুদ্ধ আসন্ন। ভারতবাসীকে তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে হবে। আর বৃথা কালহরণ নয়। চাই সংগ্রাম।

'…আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় গগন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। আমরাও ইতিহাসের এমন এক চৌমাথায় গিয়ে পড়েছি, যেখান থেকে বিভিন্ন দিকে পথ বেরিয়ে গেছে। এখন আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই—যে নিয়মতান্ত্রিকতার পথ আমরা ১৯২০ সালে বর্জন করেছিলাম, পুনরায় কি সেই পথে ফিরে যাব? অথবা, আমরা কি গণ-আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়ে গণ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হব?

এখানে তর্ক-বিতর্ক আমি শুরু করব না। আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে, নবজাগ্রত ভারতীয় মহাজাতি গণ-আন্দোলন এবং গণ-সংগ্রামের পন্থা কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না। এই পন্থার দ্বারাই তারা অনেকটা সাফল্যলাভ করবে বলে বিশ্বাস করে। সর্বোপরি বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে একটা তুচ্ছ আপস করে তারা কিছুতেই তাদের জন্মগত অধিকার—স্বাধীনতা হেলায় ছেড়ে দেবে না।'

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২০শে আগস্ট : ১৯৩৯]

সুভাষের ভবিষ্যৎ-বাণীই সত্যি হল। মাত্র কয়েকদিন বাদেই (৩রা সেপ্টেম্বর) যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল গোটা ইয়োরোপ জুড়ে।

গত এক বছর ধরে এমন একটা দৃষ্টান্তও বোধহয় দেখানো যাবে না, যেখানে সুভাষ ইয়োরোপের আসন্ন যুদ্ধ সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেননি। কেউ কান দেয়নি তাঁর কথায়। না গান্ধীজী, না কংগ্রেস। এবার প্রমাণিত হল, বৈদেশিক রাজনীতি সম্বন্ধে সুভাষ কতখানি দূরদর্শী! কতখানি অভ্রান্ত!

কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন অশান্ত ঘুর্ণির মতো। মুখে সেই একই ডাক। চরম সুযোগ এগিয়ে এসেছে ভারতবাসীর জীবনে। আর দেরি নয়। সংগ্রাম আসন্ন। স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ঠিক তার বিপরীত কথা শোনা গেল গান্ধীজীর মুখে।

৬ই সেপ্টেম্বর বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে দেখা করে তিনি জানালেন, এ যুদ্ধে তাঁর সহানুভূতি সম্পূর্ণ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দিকে। হিটলারের বোমার ঘায়ে ইংরেজের ওয়েস্টমিনস্টার এ্যাবে বা পার্লামেণ্ট-ভবন ধ্বংস হবে, সে দৃশ্য তাঁর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁর অভিমত ঃ

'ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশের সঙ্কটকালে তার সঙ্গে সহযোগিতা করাই ভারতের কাম্য। ব্রিটেনের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতালাভ আমাদের কাম্য নয়। সে-পথ অহিংসার নয়।'

কংগ্রেসে গান্ধীজীর পরেই জওহরলালের স্থান। তাঁরও মুখে শোনা গেল সেই একই কথা ঃ

'ব্রিটেন যে সময়ে জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত, সে সময়ে আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করা হলে ভারতবর্ষের পক্ষে সেটা সম্মান-হানিকর কাজ হবে।'

সংগ্রামী জনগণ অবাক। একি অদ্ভুত কথা! কি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সেদিন হরিপুরা কংগ্রেসে?

যুদ্ধে সর্বপ্রকার অসহযোগিতার প্রস্তাবই কি সেদিন গৃহীত হয়নি সর্বসম্মতভাবে ?

তা ছাড়া একি অদ্ভুত যুক্তি ! শত্রুকে তার দুর্বল মুহূর্তে আঘাত করাই তো যুদ্ধের চিরাচরিত নীতি। আর ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী মহানায়কের মুখে কিনা এ সময়ে সহযোগিতার কথা ! কি পেয়েছিল ভারত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অকুণ্ঠ সহযোগিতার বিনিময়ে ? একমাত্র জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছু পেয়েছিল কি ?

নিষ্ঠাবান খাদিপন্থীদের মধ্যেও এ নিয়ে বিস্ময় কম ছিল না। কংগ্রেসের মূলনীতি অহিংসা। তার পক্ষে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সহযোগিতার প্রশ্ন আসে কি করে ? কোন্ যুক্তিতে ?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাজশক্তিকে সমর্থন করার জবাবে পৃথিবীখ্যাত মনীষী রোমা রঁলা গান্ধীজীকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন, সে তো এত সহজে ভুলে যাবার কথা নয় ! তিনি লিখেছিলেনঃ

'আপনার মতো একজন অদম্য সাহসী এবং বিশ্বাসপরায়ণ ব্যক্তি, যিনি আপসবিহীনভাবে পাইকারী নরহত্যার নিন্দা করেন, নিন্দা করেন জাতির সঙ্গে জাতির রণোন্মাদনার—তিনি যখন স্বেচ্ছায় এবং অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই নরমেধে অংশ গ্রহণ করেন, তখন পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যা আমাকে দিয়ে আপনার এই কাজ সমর্থন করাতে পারে। এবং যে সকল যুক্তি আপনি দেখিয়েছেন, ক্ষমা করবেন, তার কোনটাই সুযুক্তি নয়। এমন কি, আমি একথাও বলব যে, বরং বিনা যুক্তিতেই আমি আপনার ঐ কাজ বেশি বুঝতে সক্ষম হব, যুক্তি দিয়ে বোঝার চাইতে।

শুধু ফলের দিক দিয়ে বিচার করলে আপনার এই রাজানুরক্ত সুবিধাবাদ কোন কাজেই আসেনি। কিন্তু যদিও তা সুফলদায়ী হত, যদি এভাবে আপনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বারা আপনাদের স্বাধীনতা-স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারতেন, হে বন্ধু, বিনা রূঢ়তায় শুধু

এইটুকু বলতে অনুমতি দিন—লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তলিপ্ত ধ্বংসযজ্ঞে স্বেচ্ছায় সহায়তা করার মূল্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করলে তা হত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ। ভারতবর্ষকে সেই অপরাধের রক্ত-মাখা কালিমা কপালে নিয়ে বয়ে বেড়াতে হত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। সেই রক্ত ঈশ্বরের কাছে তাকে অভিযুক্ত করত।'

[Inde : পৃঃ ১৯৩]

১৫ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল ওয়ার্ধায়। সুভাষ কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত, তবু তাঁকেও সেই বৈঠকে যোগ দিতে হল বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে।

লাভ হল না কিছুই। বরং গান্ধীজী ও জওহরলালের বিপরীত অভিমতই তিনি ব্যক্ত করলেন ওয়ার্কিং কমিটির সেই বৈঠকে। ব্রিটেনের জয় ভারতবাসীর কাম্য নয়। কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরাজয় ও ধ্বংসের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষ তার বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতালাভের আশা করতে পারে। সুতরাং আর দেরি নয়। চাই সংগ্রাম।

কোথায় সংগ্রাম, কোথায় কি! কেউ কান দিল না সুভাষের কথায়। কংগ্রেসের ইতিহাস-রচয়িতা পট্টভি সীতারামিয়ার ভাষায়, ওসব তামাশা অনেক হয়েছে। সুতরাং আর সংগ্রাম নয়, চাই সহযোগিতা। অবশ্য এই সহযোগিতার বিনিময়ে কতটুকু পাওয়া যাবে, সে সম্বন্ধে বড়লাট বাহাদুরের কাছ থেকে একটা সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়া প্রয়োজন।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে মর্মাহত কবি তাঁর সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন:

'আমাদের পক্ষে শাসনকর্তাদের বিশ্বাসপরতা অনুভব করিনি, অনুভব করেছি সন্দিগ্ধ শক্তির কটাক্ষপাত। যুদ্ধের অবসান হবে, তখন শক্তির জয় হবে, মৈত্রীর নয়। শক্তির পক্ষে কৃতজ্ঞতা একটা বোঝা, তাকে স্বীকার করার দ্বারা যে নম্রতা এবং দায়িত্ববোধ আনে,

সেটা তার স্বভাবের পক্ষে পীড়াজনক। গত যুদ্ধে ভারতবর্ষ তার পরিচয় পেয়েছে। ঠিক যে সময়টাতে হিসেব-নিকেশের অবকাশ এসেছিল, ঠিক সেই সময়টাতেই প্রভূত পরিমাণে ঘনিয়ে এল চাবুক, জেল, জরিমানা, গোরা, গুর্খা ও প্যুনিটিভ পুলিস।'

বড়লাটের উত্তর পাওয়া গেল ১৭ই অক্টোবর। কোথায় প্রতিশ্রুতি, কোথায় কি! একমাত্র প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলির অধিকার সঙ্কুচিত করা, আর দেশরক্ষার অজুহাতে ব্যাপক গ্রেপ্তার ও অন্যান্য দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না তাঁর ঘোষণায়।

ক্ষুণ্ণ হয়ে ওয়ার্কিং কমিটি এবার পদত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলিকে। সহযোগিতার ফল যে এমন হাতে হাতেই পাওয়া যাবে তা কে জানত!

মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলেন। কিন্তু তারপর? পরবর্তী কর্মসূচী কি? সংগ্রাম?

না, সেসব কিছু নয়। কারণ, গান্ধীজীর মতে দেশ নাকি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নয়। তাছাড়া কোথাও নাকি আলো দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। সুতরাং সংগ্রামের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু সত্যিই কি তাই! সত্যিই কি দেশ প্রস্তুত ছিল না সেদিন! নাকি নেতারাই সেদিন পিছিয়ে পড়েছিলেন সংগ্রাম থেকে সহস্র মাইল দূরে!

উত্তর পাওয়া গেল ২০শে মার্চ (১৯৪০) রামগড় কংগ্রেসে। পাশাপাশি দুটি অধিবেশন। একদিকে মৌলানা আজাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের জাঁক-জমকপূর্ণ ব্যয়বহুল অধিবেশন, অন্যদিকে সুভাষের আপসবিরোধী সম্মেলনের দীন আয়োজন।

কিন্তু কি প্রমাণিত হল সুভাষের সেই আপসবিরোধী সম্মেলনে? কংগ্রেসের ইতিহাস-রচয়িতা পট্টভি সীতারামিয়ার লেখা থেকেই তার কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি:

'…সম্মেলনে বিরাট জনসমাগম হয়েছিল। সভাপতি (সুভাষ) তাঁর ভাষণে এক জায়গায় বললেন, 'আসন্ন সংগ্রামে কে কে অংশ নিতে চান, হাত তুলুন!' বিরাট জনতা সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে জানাল—তারা সবাই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।'

আর বর্ণাঢ্য কংগ্রেস অধিবেশনে। পট্টভির ভাষায়: '…There was really nothing new in it.' অর্থাৎ—সেই চিরাচরিত আবেদন-নিবেদন ছাড়া সেখানে নতুন আর কিছুই ছিল না।

প্রমাণ হিসেবে সেদিনের গৃহীত প্রস্তাব থেকে কয়েকটা লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি:

'The Working Committee will continue to explore all means of arriving at an honourable settlement even though the British Government has banged the door in the face of the Congress.'

সোজা কথায়, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেও আমরা আমাদের আবেদন-নিবেদন যথারীতি চালিয়ে যাব। ধৈর্য বটে!

তবে সবাই ভুলে গেলেও গান্ধীজী কিন্তু সেই মুহূর্তেও ভুলে থাকতে পারেননি সুভাষের কথা। বর্ষণসিক্ত অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে উপসংহারে তিনি বললেন:

'সুভাষকে আমি ছেলের মতোই দেখেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমি তার ভালবাসা হারিয়েছি।'

হয়তো গান্ধীজীর এই বেদনাদায়ক উক্তির মধ্যে সেদিন সত্যিই কোন খাদ ছিল না। তবে ইতিহাস কিন্তু তার বিপরীতটাই প্রমাণ করে, মল্লিকা। জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করে সুভাষকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নেবার জন্য কি ব্যাকুল হয়েই না কবিগুরু সেদিন (২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯) তার করেছিলেন গান্ধীজীর কাছে। লিখেছিলেন:

'Owing gravely critical situation all over India and especially in Bengal would urge Congress Working Committee immediately remove ban against Subhas and invite his cordial co-operation in supreme interest national unity.'

রাজী হননি গান্ধীজী। তাঁর গুরুদেবের একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও না। ২২শে ডিসেম্বর তারিখেই সেকথা তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন পরিষ্কারভাবে :

'Your wire considered by Working Committee. With knowledge they have they are unable lift ban. My personal opinion is you should advise Subhasbabu submit discipline if ban is to be removed. Hope you are well.'

এখানেই থামেননি গান্ধীজী। সুভাষ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট করে তিনি নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন (১৫ই জানুয়ারি, ১৯৪০) দীনবন্ধু এণ্ড্রুজকে লেখা একটা চিঠিতে।

'…I feel that Subhas is behaving like a spoilt child…'

বকাটে ছেলে। খাঁটি সত্যি কথা। নইলে এমন সুখের আই. সি. এস্.-এর চাকরি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এই দুঃখ-কষ্ট ভরা অনিশ্চিত জীবন মেনে নেয় কেউ কখনো।

বকাটে নইলে কি ঐতিহাসিক মহাসংগ্রাম শুরু করার আগে ব্রহ্ম রণাঙ্গন থেকে বেতারযোগে এমন আকুল প্রার্থনা জানায় কেউ কখনো :

'Father of our nation, in this holy war for India's liberation, we ask for your blessing and good wishes.'

'জাতির জনক' বলে গান্ধীজী আজ সর্বত্র পূজিত। বিশেষণটা কিন্তু ঐ বকাটে ছেলেটিরই দেওয়া, তথাকথিত ভাল ছেলেদের নয়।

আবার নতুন করে বিরোধের সৃষ্টি হল কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে।

কর্পোরেশন বাঙালীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। দেশবন্ধুর আমল থেকেই সেখানে কংগ্রেসের আধিপত্য চলে আসছে।

এবার বাদ সাধল মুসলীম লীগ। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও স্বতন্ত্র সদস্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কর্পোরেশন দখল করা তাদের পক্ষে এমন কিছু কষ্টকর নয়।

এগিয়ে গেলেন সুভাষ। যে প্রতিষ্ঠান থেকে একবার ইংরেজ প্রভুত্বের অবসান ঘটেছে, সেখানে আর কিছুতেই তাদের ঢুকতে দেওয়া হবে না। যে করে হোক, সে-পথ বন্ধ করতেই হবে।

গড়ে উঠল ফরোয়ার্ড ব্লক-মুসলীম লীগ প্যাক্ট। ফলে, সুভাষ হলেন কর্পোরেশনের অলডারম্যান, আর মেয়র মিঃ সিদ্দিকী। ঘোরতর ইংরেজ-বিদ্বেষী লোক এই মিঃ সিদ্দিকী। সেদিক থেকে উপযুক্ত লোক বেছে নিতে এতটুকুও ভুল করেননি সুভাষ।

ঢি-ঢি পড়ে গেল সর্বত্র। শেষে কিনা মুসলীম লীগের সঙ্গে প্যাক্ট! এ যে অনাসৃষ্টি কাণ্ড শুরু হল দেখছি! নাঃ! এতবড় অন্যায় কিছুতেই মুখ বুজে সহ্য করা চলে না।

সত্যিই অন্যায়! ইতিপূর্বে হাজার তোষামোদ করেও কংগ্রেস মুসলীম লীগের সঙ্গে কোন ব্যাপারে আপস-মীমাংসা করতে সক্ষম হয়নি। গোলটেবিল বৈঠকে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিতে চেয়েও গান্ধীজী জিন্নাসাহেবের মন গলাতে পারেননি। জাতীয় সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ করেও না।

আর সুভাষ বোস কিনা সেই মুসলীম লীগকে চোখের নিমেষে

জয় করে ফেললেন এমন করে। এর চাইতে বড় অন্যায় আর কি থাকতে পারে।

সমস্ত নিন্দা-কুৎসার জবাব দিলেন সুভাষ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় দাঁড়িয়ে। দীপ্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন :

'ভারতের সামনে আজ এক মহাসুযোগ এগিয়ে এসেছে। কি কংগ্রেস, কি মুসলীম লীগ, কি হিন্দু মহাসভা, যেই হোক না কেন, তারা যদি আসন্ন এই সংগ্রামে যোগ দিতে রাজী হয়, তবে প্যাক্ট তো দূরের কথা, আমি আজীবন তাদের গোলামী স্বীকার করে নিতেও এতটুকু দ্বিধা করব না। ইংরেজের গোলামী শেষ করার জন্য যদি দেশবাসীর গোলামী আমাকে করতে হয়, তাতে সবসময়েই আমি প্রস্তুত।'

এই সুভাষ। এই হল তাঁর আসল পরিচয়। স্বাধীনতা কে না চায়। কে না ভালবাসে। কিন্তু সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এমন করে মরীয়া হয়ে উঠতে পেরেছিলেন ক'জন? সুভাষ পেরেছিলেন। পেরেছিলেন বলেই তো আজো তিনি লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মানসলোকে বেঁচে আছেন স্বাধীনতার অগ্রদূত—মহাক্ষত্রিয় 'নেতাজী' রূপে।

ভারতে নেতার অভাব নেই। সেদিনও ছিল না, আজো নেই। কিন্তু কই, আর কারো পক্ষে তো নেতাজী হওয়া সম্ভব হল না।

আবার আঘাত। ইংরেজের দিক থেকে নয়, এল বিরোধী পক্ষের দিক থেকে। মহাজাতি সদন নির্মাণকল্পে কলকাতা কর্পোরেশন সুভাষকে একলক্ষ টাকা দেবে বলে স্থির হয়ে আছে। ওটা বানচাল করতে হবে।

কিন্তু কেন? মহাজাতি সদন কি সুভাষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি? ওটা কি জাতীয় সম্পদ নয়?

তা হোকগে, তবু বানচাল করতে হবে। বরং মহাজাতি সদন না হোক, সেও ভাল, তবু সুভাষ বোসের দ্বারা কিছুতেই নয়। এত

করে ঘা দেওয়া সত্ত্বেও লোকটা প্রতিটি ব্যাপারে সবার ওপর টেক্কা মেরে যাবে, তা হবে না। সুতরাং ওটা বন্ধ করতেই হবে।

ইতিহাসের কি বিচিত্র গতি! মাত্র একলক্ষ টাকা, তাও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নয়। তবু সেই টাকাটা সেদিন দেওয়া হল না সুভাষকে।

আর মাত্র তিন বছর বাদে সেই সুভাষেরই এক একটি গলার মালার দাম হল কি না লক্ষ লক্ষ টাকা! তাই নিয়েই বা কত কাড়াকাড়ি! কত আকুলি-বিকুলি! কত অবিশ্বাস্য প্রতিযোগিতা! ভাবতে গেলে স্বপ্ন বলে মনে হয়, অথচ একথা ঐতিহাসিক সত্য।

ওদিকে যুদ্ধ-পরিস্থিতি তখন অত্যন্ত জটিল। হিটলারের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে একে একে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও প্যারিসের পতন হয়েছে। ইংল্যাণ্ডও যায় যায়। ডানকার্কে তাকে প্রচণ্ড মার খেতে হয়েছে হিটলারের নাৎসী বাহিনীর হাতে।

দেখে দেখে মরীয়া হয়ে উঠলেন সুভাষ। কংগ্রেস কোনমতেই সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে রাজী নয়। শুধু কংগ্রেস কেন, কেউ রাজী নয়।

একসঙ্গে যাত্রা শুরু করলেও রায়-পন্থী এবং সোস্যালিস্ট পার্টি আগেই পিছিয়ে পড়েছে। এবার সরে দাঁড়িয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি। 'জাতীয় সংগ্রাম সপ্তাহ' পালন উপলক্ষে খোলাখুলিভাবেই তারা জানিয়ে দিয়েছে সেকথা। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোনরকম সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে তারা রাজী নয়।

যাক, সবাই যাক। সবাই সরে দাঁড়াক সংগ্রামের পথ থেকে। তা বলে সুভাষকে তো আর পিছিয়ে গেলে চলবে না! কেউ যদি না আসে তো একাই তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে স্বাধীনতা অর্জনের সেই মরণপণ সংগ্রামে। কে এল, কে পিছিয়ে গেল, তা নিয়ে এখন কালহরণ করার মতো অবকাশ কোথায়?

নাগপুর সম্মেলনে শেষবারের মতো নিজের সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করলেন সুভাষ : 'All power to the Indian people,' ভারত শাসনের একমাত্র অধিকার ভারতবাসীর। ভুয়ো প্রতিশ্রুতি নয়। দর-কষাকষি বা টালবাহানাও নয়। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য স্বাধীনতা। কোন দল নয়, সম্প্রদায় নয়, ব্যক্তি-বিশেষও নয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই আমাদের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতাকে অর্জন করতে হবে। কারণ, ভারত শুধু হিন্দুর নয়, শুধু মুসলমানের নয়, সবারই। আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা করা এমন কিছু কষ্টকর কাজ নয়।

কথাটা অত্যুক্তি নয়, মল্লিকা! প্রমাণ, কর্পোরেশন প্যাক্ট। কই, তার ফলে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল না! তাহলে বাধা ছিল কোথায়?

আরও প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৪০ সালের ২৫শে মে তারিখে।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন উপলক্ষে সুভাষ তখন ঢাকাতে। মুখে সেই একই আহ্বান। সংগ্রাম আসন্ন। শুধু হিন্দু নয়, ভারতের বিশাল মুসলীম-সম্প্রদায়কেও সেই জাতীয় সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে হবে। কারণ, ভারত শুধু হিন্দুর একার নয়, মুসলমানেরও। সুতরাং সবাই এগিয়ে এস ভাই। হাতে হাত মেলাও।

আবেদন ব্যর্থ হল না। দেখতে দেখতে অসংখ্য মুসলীম তরুণ এসে জড় হল সুভাষের চারপাশে। বাঙালী জীবনের সবচাইতে বড় কলঙ্ক—হলওয়েল মনুমেণ্ট। নিশ্চিহ্ন করে দাও ওটাকে বাংলার বুক থেকে। আমরা থাকব তোমার পেছনে। কথা দিলাম।

রাজী হলেন সুভাষ। অবশ্য হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ করা মানেই স্বাধীনতাপ্রাপ্তি নয়। তবু তাকে কেন্দ্র করে বিরাট মুসলীম সমাজ যদি সংগ্রামের পথে এগিয়ে আসে তো তার অবদান মোটেই তুচ্ছ হবে না।

গুরু দেশবন্ধু সব সময়েই বলতেন—'হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি ছাড়া ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রকে ধ্বংস করা অসম্ভব।' এই তো তার অপূর্ব সুযোগ।

২৯শে জুন অ্যালবার্ট হলের এক বিরাট জনসভায় দাঁড়িয়ে সুভাষ ঘোষণা করলেন তাঁর আসন্ন পরিকল্পনার কথা।

'হলওয়েল মনুমেণ্ট জাতীয় পরাধীনতার অন্ততম চিহ্নস্বরূপ। বহু বৎসর যাবৎ এই অলীক কলঙ্ক-চিহ্ন বাংলার বুকে দাঁড়াইয়া আছে।...এই বিষয়ে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সকলেই একমত। তাই যখন এমন একটা বিষয় পাওয়া গিয়াছে, যাহা লইয়া বাঙালী মাত্রেই একমত, তখন তাহা লইয়া আমাদের কার্য করিতে হইবে। ৩রা জুলাই সিরাজদ্দৌলার স্মৃতি দিবসের মধ্যে হলওয়েল মনুমেণ্টটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া লইবার দাবী বাংলা সরকারের নিকট করা হইয়াছে। আমরা চাই জাতির মিথ্যা কলঙ্কস্বরূপ এই মনুমেণ্টটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া লওয়া হউক।'

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ৩০শে জুন : ১৯৪০]

একই তারিখে ফরোয়ার্ড ব্লক পত্রিকায় এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সুভাষ জানালেন তাঁর আন্দোলনের প্রথম দিনের পরিকল্পনার কথা।

'আগামী ৩রা জুলাই থেকে আমাদের অভিযান শুরু হবে। আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে, প্রথম দিনের বাহিনী পরিচালনা করব আমি নিজে।'

ঘুম টুটে গেল ইংরেজ সরকারের। ওদিকে ইংল্যাণ্ড যায় যায়, আর এদিকে কি না সংগ্রামের প্রস্তুতি! তাও কি না আবার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম!

অসম্ভব। ইংরেজ শাসনের প্রধান নীতিই হল ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল। অর্থাৎ, একপক্ষের বিরুদ্ধে অন্যপক্ষকে লেলিয়ে দেওয়া। সুতরাং যে করে হোক, হিন্দু-মুসলমানের এই মিলিত আন্দোলনকে স্তব্ধ করতেই হবে। কিছুতেই ওদের এক হবার সুযোগ দেওয়া হবে না। হিন্দু-মুসলমান এক হলে যে সত্যিই বিপদের কথা।

শুরু হল ব্যাপক ধর-পাকড়, গ্রেপ্তার আর নির্যাতনের পালা। সুভাষ বোসের ফরোয়ার্ড ব্লকের কাউকেই বাইরে রাখা হবে না। একটি প্রাণীকেও না। ডাঃ পট্টভির ভাষায় :

…'ফরোয়ার্ড ব্লকের চরমপত্রের ফলে ইংরেজের আসল চেহারাটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। ফরোয়ার্ড ব্লক যাতে সংগ্রাম শুরু করতে না পারে তার জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। নির্বাসনে পাঠিয়ে, অন্তরীণ করে এবং অনুরূপ অন্যায়ভাবে ফরোয়ার্ড ব্লক সমর্থকদের নানাভাবে জব্দ করতে ইংরেজ এতটুকুও দ্বিধা করল না। জুলুমের প্রতিবাদে আত্মসম্মান বজায় রাখতে গিয়ে দলে দলে তারা কারাবরণ করতে লাগল।' [কংগ্রেসের ইতিহাস : ডাঃ পট্টভি : ২য় খণ্ড : পৃঃ ১৮৪]

কেন সেদিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সুভাষের ফরোয়ার্ড ব্লকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এমন করে ?

এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে তখনকার সময়ে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের লেখা 'বিশ্বসমর' বইটির চতুর্থ খণ্ডে। সেখানে স্পষ্টই তিনি লিখেছেন : 'একমাত্র সুভাষ বোসের মতো চরমপন্থীরাই অক্ষশক্তির জয় কামনা করত।' অর্থাৎ—সবাই ভাল। সবাই বন্ধু। সবারই একমাত্র কামনা—ইংরেজের জয়। একমাত্র ব্যতিক্রম 'বকাটে ছেলে' সুভাষ বোস আর তাঁর অনুগামীরা। সুভাষ সম্বন্ধে এর চাইতে উল্লেখযোগ্য ক্যারেকটার সার্টিফিকেট আর কি হতে পারে বল।

ঐতিহাসিক হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলন শুরু করার দিন ধার্য হল ৩রা জুলাই। ওদিকে ভেতরে ভেতরে কিন্তু অন্য একটি পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই।

বাইরে যেতে হবে। হিটলারের হাতে মার খেয়ে ইংরেজ এখন নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। এই অপূর্ব সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে। সংগ্রাম চালাতে হবে একসঙ্গে ঘরে-বাইরে দুদিক থেকেই।

ফরোয়ার্ড ব্লক, বি. ভি., অনুশীলন সমিতি, পূর্ণ দাসের দল,

অনিল রায় ও লীলা রায়ের শ্রীসঙ্ঘ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্থাগুলোর আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সাহসে, শৌর্যে, বীর্যে ও আত্মত্যাগে সত্যিই তাদের তুলনা নেই। সত্যিকারের সৈনিকের যা কিছু থাকা প্রয়োজন, সব কিছুই তাদের আছে।

তবু তাই যথেষ্ট নয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রাম চালাতে হলে আরো কিছু চাই। চাই আধুনিক অস্ত্র-সম্ভার। চাই সুদক্ষ সেনা বাহিনী। চাই আরো অনেক কিছু।

এই মুহূর্তে এখানে তা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই চরম আঘাত হানতে হবে বাইরে থেকেই। ভারত এখন অগ্নিগর্ভ। বাইরে থেকে যথাযথভাবে আঘাত হানতে পারলে ভেতরে মহাবিপ্লবের আবির্ভাব সুনিশ্চিত। সুতরাং সর্বাগ্রে দরকার বাইরে যাওয়া।

রাজনীতিতে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য অন্য কোন শক্তিমান দেশের সাহায্য নেওয়া মোটেই অন্যায় নয়। ইংরেজ ধর্ণা দেয়নি রাশিয়ার কাছে? হিটলার প্যাক্ট করেনি তার চিরশত্রু স্ট্যালিনের সঙ্গে? তাহলে ভারতের বেলায় তা দোষের হবে কেন?

বি. ভি. ও পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টির যোগাযোগে পরিকল্পনা মোটামুটি প্রস্তুত। প্রস্তুত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা আকবর শা। প্রস্তুত বিশ্বস্ত গাইড কমরেড ভগৎরাম। এখন শুধু ঝাঁপ দেবার অপেক্ষামাত্র।

বি. ভি. ছাড়াও অন্যান্য দলের দু-একজন প্রভাবশালী নেতা মোটামুটি জানতেন সুভাষের এই পরিকল্পনার কথা।

অনুশীলন সমিতির প্রখ্যাত নেতা রবি সেন তাঁদের অন্যতম। এই প্রসঙ্গে দলের অন্যতম নেতা শ্রদ্ধেয় নলিনীকিশোর গুহর 'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

'রবি সেনকে একদিন সুভাষবাবু বলেন—জাপানী কনসাল অফিসে আপনাদের দলের কে একজন আছেন বলিয়াছিলেন, এখন তাঁহার

সাহায্যে কিছু করা যায় কি? কনসাল অফিসে কাজ করিতেন জিতেন বসু। রবি সেন জিতেনবাবুকে বলেন—সুভাষবাবুর বিদেশে যাবার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

সেই সময় কনসাল কলিকাতায় ছিলেন না। ভাইস কনসাল ছিলেন। জিতেনবাবু তাঁহাকে সুভাষবাবুর কথা জানাইলে ভাইস কনসাল জিতেনবাবুকে বলেন—সুভাষবাবু যখন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, তখন জাপানের মিলিটারী এ্যাটাচি সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু সুভাষবাবু কোন আগ্রহ দেখান না। সুতরাং এখন জাপান এই ব্যাপারে খুব favourable attitude (উৎসাহ) নাও দেখাইতে পারে। যাই হোক, ভাইস কনসাল জিতেনবাবুকে বলেন—কনসাল আসিলেই এ বিষয়ে আলাপ করিয়া ফলাফল জানাইব।

ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই সুভাষবাবু রবি সেনকে বলেন—আর ভাইস কনসাল-এর সঙ্গে ঐ বিষয় লইয়া আলাপ চালাইবেন না। আমি আবশ্যকায় ব্যবস্থা করিয়াছি।'

স্বাভাবিক কারণেই জাপানী ভাইস কনসাল-এর সঙ্গে আর কোনরকম আলাপ-আলোচনা চালাতে নিষেধ করেছিলেন সুভাষ। কারণ, কীর্তি কিষাণ পার্টির সহযোগিতায় ওদিকে বি. ভি.-র প্রস্তুতি-পর্ব তখন সমাপ্তপ্রায়। প্রথমেই যেতে হবে পেশোয়ার। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে দুর্গম পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে কাবুল। কাবুল থেকে অন্য কোন দূতাবাসের সহযোগিতায় সোজা ইয়োরোপ।

হঠাৎ সমস্ত কিছু পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হয়ে গেল সাময়িকভাবে।

২রা জুলাই। নিঃশ্বাস ফেলার মতোও বুঝি তখন সময় নেই সুভাষের। কাল থেকে আন্দোলন শুরু। যে করে হোক, এই আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে হবে। বিপ্লবের এই অনির্বাণ শিখাকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

এরি মধ্যেই এক ফাঁকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গেলেন কবিগুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সামনে দুরন্ত সংগ্রাম। এ সময়ে তাঁর আশীর্বাদই যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন !

তারপরই নেমে এল বাস্তবের রূঢ় স্পর্শ।

বেলা তখন প্রায় দুটো। হঠাৎ কলকাতা পুলিসের ডেপুটি কমিশনার মিঃ জানভ্রিন এলগিন রোডের বাড়িতে এসে হাজির। ভারত-রক্ষা বিধির ১২০ ধারা মতে আপনাকে বন্দী করা হল। চলুন এবার প্রেসিডেন্সি জেলে।

বিক্ষোভের একটা তরঙ্গ বয়ে গেল দেশের এখানে-ওখানে সর্বত্র। বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে সভা-সমিতিও হল বিস্তর। এ গ্রেপ্তার বে-আইনী। সরকারের এই নির্লজ্জ আক্রমণ আসলে একটা প্রতিহিংসা নেবার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ সিদ্দিকী। মুসলীম লীগের বিশিষ্ট সদস্য হয়েও জোর গলায় তিনি বললেন :

'সুভাষ বসুর ন্যায় একজন সর্বজনমান্য নেতার এই অহেতুক গ্রেপ্তার আমাদের পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি অস্বস্তিকর আঘাত।'

বম্বে কর্পোরেশন তাঁদের অধিবেশন স্থগিত রাখলেন সুভাষকে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। আর মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক বললেন :

'আমরা সুভাষকে ভালবাসি। শ্রদ্ধা করি। এবং সবাই আমরা তাঁর প্রতি অনুরক্ত। এ দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনিই সবচাইতে জনপ্রিয়।'

একমাত্র ব্যতিক্রম কংগ্রেস। পরদিনই (৩রা জুলাই) ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী অধিবেশন বসল দিল্লীতে। না, একটি কথাও তাদের মুখ থেকে শোনা গেল না সুভাষ সম্বন্ধে। সুভাষ তাদের কেউ নন। পর পর দুবছরের কংগ্রেস সভাপতি সুভাষের যাই হোক না কেন, তাতে তাদের কিছু আসে যায় না।

কিন্তু সত্যিই কি তাই! মোটেই না। বাইরে উদাসীনতার ভান করলেও ভেতরে ভেতরে কিন্তু সুভাষ সম্বন্ধে তাদের অস্বস্তিকর কৌতুহলের সীমা-পরিসীমা ছিল না, মল্লিকা। প্রমাণ, পরবর্তীকালে জওহরলালকে লেখা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের একটি চিঠি।

'...চার-পাঁচদিন আগে বার্লিন থেকে সুভাষবাবুর একটা বিবৃতি বেতারে প্রচার করা হয়েছিল। পরদিনই ঘোষণা করা হল, ঐ বক্তৃতাটা রেকর্ড করা হয়েছে এবং তাতে সুভাষবাবুরই নিজের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। আমি শুনেছি। সুভাষবাবুর কণ্ঠস্বর। আমার কিন্তু মনে হয় ওটা রেকর্ড নয়, উনি নিজেই বলেছিলেন। তবে টোকিও থেকে যে বেতার-বক্তৃতা প্রচার করা হয়েছিল সেটা নিশ্চয় রেকর্ড। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, রেকর্ডখানা বিদ্যুতের সাহায্যে চালানো হচ্ছে।'

[পত্রগুচ্ছ : জওহরলাল]

প্রতিশ্রুতি মতো হিন্দুর পাশে পাশে এবার মুসলমান সমাজও এগিয়ে এল সর্বশক্তি নিয়ে। হিন্দু-মুসলীম ঐক্য জিন্দাবাদ! সুভাষ বসু জিন্দাবাদ! বাংলার বুক থেকে ঐ কলঙ্কের চিহ্ন দূর করতেই হবে। নইলে এ সংগ্রাম কোনদিনই থামবে না।

১৩ই জুলাই জনাব আব্দুল করিম সাহেবের সভাপতিত্বে বিরাট প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হল অ্যালবার্ট হলে। সভায় যত হিন্দু, তত মুসলমান। সবারই দাবী এক। সুভাষ বোসের মুক্তি চাই। আর হলওয়েল মনুমেন্টকে অপসারণ করতেই হবে। অন্যথায় আন্দোলন চলছে এবং চলবে।

আহত জন্তুর মতো গর্জে উঠল ইংরেজ সরকার। কড়া নির্দেশ, খবরের কাগজে হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলন সংক্রান্ত কোন খবরাখবর প্রকাশ করা চলবে না। আর ছাত্র-সম্প্রদায়, সাবধান! কোনরকম সভা-সমিতি বা আন্দোলনে তোমাদের যোগ দেওয়া চলবে না। দিলে কঠোর শাস্তি।

রুখে দাঁড়াল ইসলামিয়া কলেজের মুসলমান ছাত্রগণ। এ আদেশ বে-আইনী। কোনরকমেই এ অন্যায় আদেশ আমরা মানব না। কলেজ প্রাঙ্গণে সভা আমরা করবই। ইনক্লাব জিন্দাবাদ! সুভাষ বোস জিন্দাবাদ! হলওয়েল মনুমেণ্ট—দূর করো, দূর করো!

তবে রে! ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্ত পুলিস বাহিনী। তারপরই শুরু হল বেপরোয়া লাঠিচার্জ। পুলিসের হিংস্র আক্রমণ থেকে কেউ রেহাই পেল না সেদিন। একটি প্রাণীও না।

আর যায় কোথায়! খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে গোটা ছাত্র সমাজ রাস্তায় নেমে এল পিল পিল করে। কত শক্তি ধরে ইংরেজের গোলাম ঐ পুলিস বাহিনী এবার তা হাতে হাতেই প্রমাণ হয়ে যাক!

হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এলেন মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক। ছাত্র সমাজ ক্ষেপে গেছে। এ যে ভয়ঙ্কর কথা! যে করে হোক, ওদের শান্ত করতেই হবে।

সেদিন রাত্রেই সরকারী সিদ্ধান্তের কথা জানা গেল হকসাহেবের এক বিবৃতি থেকে। হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ করা হবে। এবার তোমরা শান্ত হও।

জয় হল সুভাষের। জয় হল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তির। প্রমাণিত হল যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তির কাছে যে-কোন প্রতিরোধই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে বাধ্য।

সবাইকে মুক্তি দেওয়া হল একে একে। একমাত্র ব্যতিক্রম সুভাষ। অনেক অভিযোগ তাঁর নামে। অনেক মামলা। বে-আইনী জনসভা করা, রাষ্ট্রদ্রোহকর প্রবন্ধ লেখা, এমনি হাজারো অভিযোগ। সুতরাং এহেন বিপজ্জনক লোককে বাইরে রেখে সরকার এ সময়ে কোনরকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়।

কিন্তু বাইরে যে আসতেই হবে সুভাষকে! কানের কাছে অহরহ বেজে চলেছে সেই একই আকুলতা। মুক্তি চাই। দেশের মুক্তি। সে আহ্বানকে উপেক্ষা করার মতো সাধ্য তাঁর কোথায়!

অক্টোবর মাসের ২৮ তারিখে জেল থেকেই সুভাষ কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

ঠিক তার একমাস পরে (২৯শে নভেম্বর), ঘুম থেকে উঠেই সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল অভাবনীয় একটি খবর শুনে।

মুক্তির দাবীতে সুভাষ আমরণ অনশন শুরু করেছেন। তার আগেই তিনি বাংলার গভর্ণর এবং মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর শেষ কথা।

'...আমার বিবেকের দুয়ারে আমি আজ বার বার করাঘাত শুনতে পাচ্ছি। এই অন্যায় এবং ঔদ্ধত্যকে কি আমাকে মুখ বুজে মেনে নিতে হবে? নাকি এই ন্যায়নীতিহীন অবিচারের বিরুদ্ধে জানাব আমার প্রতিবাদ? বিশেষ চিন্তার পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এই ঔদ্ধত্যের কাছে আমি কোনক্রমেই নতি স্বীকার করব না। অন্যায় করার চাইতে অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ানো আরো গুরুতর অপরাধ। সুতরাং প্রতিবাদ আমাকে করতেই হবে।

...এবার আমার দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে আমি বলব—ভুলে যেও না যে, দাসত্বের চাইতে বড় অভিশাপ আর নেই। ভুলে যেও না যে, অন্যায় এবং দুর্নীতির সঙ্গে আপস করার চাইতে বড় অপরাধ আর নেই। মনে রেখো, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে পেতে হলে জীবনের বিনিময়েই তা পেতে হবে। মনে রেখো, সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতিকে স্বীকার করে নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে অবিরাম।'

মুক্তি দেওয়া হল ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখে। কি করে, কার সাহায্যে সেদিন এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা হয়েছিল, সে কাহিনী এখানে আর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। কারণ, শুরুতেই সেকথা তোমাকে আমি বলেছি।

ওদিকে শাসক-কুল তখন নিশ্চিন্ত। পেলই বা মুক্তি! চারপাশে সতর্ক পুলিস প্রহরী। তার ওপর রয়েছে সাদা পোশাক পরিহিত

অসংখ্য গোয়েন্দা অফিসার। তাদের চোখ এড়িয়ে যাবে আর কোথায়।

তাছাড়া ক'দিনই বা! ২৭শে জানুয়ারি তারিখে মামলার তারিখ রয়েছে। ওদিনই তো আবার গিয়ে ঢুকতে হবে সেই লৌহ-কপাটের অন্তরালে। কোনরকমেই এবার আর তার রেহাই নেই।

কিন্তু কোথায় তখন সুভাষ!

সংগ্রামী ভারতের একক প্রতিনিধি সুভাষ তার অনেক আগেই শক্তিমান ব্রিটিশ শক্তির সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে পর্যুদস্ত করে চলে গেছেন অনেক দূরে, দুর্গম পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে সীমান্তের ওপারে।

দেখতে দেখতেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত। সুভাষ নিখোঁজ। সুভাষ অদৃশ্য। তন্ন তন্ন করে সর্বত্র খুঁজে দেখা হয়েছে, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। সে আশাও সুদূরপরাহত।

সবাই স্তম্ভিত। সবার দৃষ্টি তখন অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। সবার মনে একই সুর। ধন্য সুভাষ, সত্যিই তুমি ধন্য! কাঁটায় কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছ, তবু সর্বাঙ্গে রুধির মেখে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তুমি বুক পেতে দিয়েছ বার বার। নীলকণ্ঠের মতো সবটুকু বিষ নিজে পান করে তুমিই তো আমাদের দিয়েছ এই অভূতপূর্ব নব জাগরণের সন্ধান। তোমার মতো এমনি সর্বত্যাগী রুদ্র সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যেই তো একদিন মরমী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাস লিখেছিলেন :

'তুমি তো আমাদের মতো সোজা মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়েছ, তাইত দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়, তাইত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙ্গাইয়া চলিতে হয়, কোন বিস্মৃত অতীতে তোমার জন্যই তো প্রথম শৃঙ্খল রচিত

হইয়াছিল, কারাগার তো শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল, সেই তো তোমার গৌরব !

তোমাকে অবহেলা করিবে কার সাধ্য ! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে তো কেবল তোমারই জন্য ! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পার বলিয়াই তো ভগবান এতবড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন !

মুক্তি পথের অগ্রদূত ! পরাধীন দেশের হে রাজ-বিদ্রোহী ! তোমাকে শতকোটি নমস্কার ।'

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥